KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/২, লেকটাউন পার্ক, কল-৮৯
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিবর (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 23/4 24/1 26/1 26/2	Year of Publication : Sep - 2002 Oct - 2002 Oct - 2004 May - 2005
	Condition : Brittle / Good
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, রাহুল সেন	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

পাঠ

৮৬

বিভাব

প্রধান সম্পাদক ❖ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক ❖ রাহুল সেন

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার । অশোক মুখোপাধ্যায় । প্রদীপ দাশগুপ্ত ।
শান্তিনিকেতন
অনাথনাথ দাশ । অরুণ মুখোপাধ্যায় । স্বপনকুমার ঘোষ ।

প্রধান সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক
রাহুল সেন

প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল) । কলকাতা - ৬৮ । দূরভাষ : ৪৭৩-৩৬০০

নামাঙ্কন : পূর্ণেন্দু পত্রী
প্রচ্ছদ : অভিজিৎ নাথ

বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
ইস্টার্ন বুক এজেন্সি
৮/সি, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত। বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ ফোন : ৪১২ ১১৩৩ হইতে অক্ষরবিন্যস্ত এবং বর্ণনা প্রকাশনী, এ/১২৫ বাঘাযতীন আই ব্লক ক্রশিং, কলকাতা-৭০০ ০৯২ হইতে মুদ্রিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
শরৎকালীন সংখ্যা ১৪০৯

সূচি

সম্পাদকীয়

ভারতে মহাভারতে
ভারতের ঐক্য ও জাতিবিচার ❖ অরুণ দাশগুপ্ত ৩
কলিযুগ ❖ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ১৩
পুরাণে ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে
কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী ❖ দিলীপকুমার ভারতী ৩৫

অন্যান্য রচনা
বন্দিনীর বন্দি ❖ গোলাম মুরশিদ ৫৯
শৈলজানন্দের অপ্রকাশিত রচনা ও
অসংকলিত ভিন্নধর্মী গদ্য 'জাগরণী' ❖ বাঁধন সেনগুপ্ত ৬৯
দিনলিপি ❖ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭৩
জাগরণী ❖ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭৫

গল্পগুচ্ছ
আরে না না, মানবিকতা লোপ পায়নি ❖ সত্যপ্রিয় ঘোষ ৭৯
পাখি-ওড়া ছায়া ❖ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ৯৫
মাত্র আধখানা শতাব্দী ❖ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১০০
গুড বুক ও ব্যাড বুক ❖ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ১১২

নিকি বাইজির কথা ❖ শেখর বসু ১১৭
সাড়ে তিন হাতের কম ❖ সাধন চট্টোপাধ্যায় ১২৫
গেরো ❖ অসীম সেনগুপ্ত ১৩০
পূর্বপুরুষের কামনা ❖ সুব্রত সেনগুপ্ত ১৩৯
পাথরের পরি ❖ শচীন দাশ ১৪৪
কিছু মুহূর্ত ঈশ্বরের ❖ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৫
বন থেকে বেরুল হুতি ❖ মৃত্যুঞ্জয় সেন ১৬১

ক্রোড়পত্র

ক্ষৌর ❖ আবুল বাশার (বড়ো গল্প) ১৭৫
উত্থান ❖ সুব্রত মুখোপাধ্যায় (উপন্যাসিকা) ২০১
কোন্ বাড়ি কার দেশ ❖ কল্যাণ মজুমদার (উপন্যাস) ২৪৯

সম্পাদকীয়

বিভাবের ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হল। সময়ের এই দীর্ঘ পরিসরে আমরা আমাদের সাধ্যমতো যোগ্যমানের রচনায় কাগজটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। পাঠকের অকৃপণ সাধুবাদও পেয়েছি। কোনো-কোনো গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী নির্ধারণে সাহায্য করেছে। মনে হয়েছে মানের নিরিখে বিভাবকে হয়তো আরো ঐশ্বর্য্যবান করে তোলা যেত। সেই লক্ষ্যে আমাদের প্রয়াস অব্যাহত।

স্বাধীনতার এতগুলি বছর পরেও ভারত, প্রভেদের মধ্যে বহু-উচ্চারিত ঐক্যের বিকাশ ঘটাতে পারেনি। যে-দেশে কয়েকশো কিলোমিটার পর-পরই ভাষা বদলায়, উপাস্য দেবতা পালটায়, খাদ্যের অভ্যাস, এমনকী আবহাওয়ায় এত গরমিল, সেখানে ঐক্য শব্দটির উচ্চারণ যত সহজ, ততটাই দুরূহ তাকে কাজে পরিণত করা। 'জাতক'-এর সময় থেকে ইতিহাস অনুধাবন করলে কেউ-কেউ প্রভেদের মধ্যে ঐক্য, এই বাক্যবন্ধকে কবিকল্পনা বলেও মনে করতে পারেন। অতি-সম্প্রতি ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, ধর্ম-ধাপ্পায়, দেশের যে চেহারা ক্রমশই ভয়ালভীষণ হয়ে উঠছে, তাতে এক সার্বিক সর্বনাশের লক্ষণ প্রকট। অপদার্থ নেতারা ধর্ম, রাজনীতি, এবং ভোট-কে একে-অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠতে দিচ্ছেন। বর্তমান এই 'হায়! দেশে' রাষ্ট্রপতি, প্রধান বা ব্যবধান-মন্ত্রী, রাজ্যপালরা আছেন, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্টও আছে, অভাব শুধু যোগ্য নেতার। নেতাদের যে-সব ভাষণদূষণ সংবাদপত্রে লাফ দিয়ে ওঠে, তাকে অসার কোলাহল বললেও কিছুই বলা হয় না!

এই সব দেখে এবং শুনে রাজনীতিতে সাধারণ এবং বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহ ও স্পৃহা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। অথচ এই বোতামটেপা বিজ্ঞানবিনীত সময়ে, যখন এই পৃথিবী এক 'বিশ্বগ্রামে' পরিণত, তখন রাজনীতিকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। অথচ 'রাজ' শব্দটির পর 'নীতি' শব্দটি কি এখন কলম না কাঁপিয়ে লেখা চলে?

আসলে 'পলিটিক্স' শব্দটির বাংলা কোনো অর্থেই 'রাজনীতি' হওয়া উচিত ছিল না! বাংলা ভাষাবিদ্‌রা সম্ভবত তেমন তলিয়ে না ভেবেই এই নীতিহীন ব্যর্থ পরিভাষা মেনে নিয়েছিলেন। কেবল ভারতবর্ষ বা তার প্রদেশরাজ্যগুলি শুধু নয়, পৃথিবীর বেশ কিছু দেশেও পলিটিক্স এখন পলিট্রিক্স-এ পর্যবসিত। অথচ এই মালিন্য কাম্য ছিল না। অর্থনীতি, যা মানুষের মূল প্রয়োজনগুলির নিয়ন্ত্রক, সেখানেও চলেছে নিত্যনতুন কারচুপি। ছিদ্রগুলি বন্ধ না করে চৌবাচ্চায় জল ঢাললে যা হয়, অবস্থা তার চেয়েও সকরুণ। সাজানো হিসাব মানুষ এখন আর বিশ্বাস করছে না। এই বাক্যগুলি ঠিক অরণ্যরোদন নয়, কেন না চারিদিকে যখন ক্রমশই মিথ্যার অরণ্য গড়ে উঠছে, তখন

শুধু রোদনে কোনো লাভ নেই। কুঠারতীব্র প্রতিবাদই এখন মূল প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত প্রতিবাদ। সাহিত্যের ভূমিকাও সেখানে অপ্রধান থাকবে না।

অন্যান্যবারের বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যার মতো এবারের সুবৃহৎ সংখ্যাটিও পাঠকের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ও চিন্তাসঞ্চারী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সময়ের ফাঁক ভরাবার জন্য খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হল। ফলে, নিয়ন্ত্রণঅসাধ্য কারণে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যেতেই পারে। যদি থাকে, সে জন্য অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থনা জানিয়ে রাখছি।

এ সংখ্যার নির্মাণে সাহায্য করেছেন প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও পথিক চাকী। তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এক অভিনব পরিকল্পনায় বিভাবের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে আগামী বইমেলায়। সকলকে শরৎকালীন শুভেচ্ছা।

প্রধান সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিশেষ সম্পাদকীয় সংযোজন

বিশেষ 'টুকরো কথা' সংখ্যার সমাদরে আমরা অভিভূত। কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য ও গবেষণাধর্মী এই সংখ্যাটি প্রস্তুত করতে আমাদের প্রায় নয় মাস লেগে যায়। স্বভাবতই এই সময়ে আরো দুটি সংখ্যা যা আমাদের প্রকাশ করার কথা ছিল, তাও পিছিয়ে যায়। ফলে তিন মাসে একটি সংখ্যা প্রকাশ করার বদলে, ত্রৈমাসিকপ্রকাশ বজায় রাখার জন্য আমাদের ওপর প্রায় পর পর দু-মাসে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করার দায়িত্ব এসে পড়ে। বিগত প্রবন্ধ সংখ্যার পর এই আয়তনবান শারদীয় সংখ্যাটি প্রকাশ করার জন্য আমরা সময় পাই মাত্র এক মাস। ফলে আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যাবে। এর জন্য আমরা বরাবরের মতো পাঠকের প্রশ্রয় আশা করব।

কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী রত্না বসু, অভিজিৎ নাথ ও অভিজ্ঞান সেন-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনোভাবেই এই সংখ্যা সময়ে বেরোত না। তা ছাড়া বর্ণনা প্রকাশনী, যেখান থেকে আমাদের অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাঁদের ধন্যবাদ নয়, (কারণ তাঁরাও আমাদের সাফল্যের অংশীদার) প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আপনারা ভালো থাকুন।

সম্পাদক
রাহুল সেন

ভারতে মহাভারতে

ভারতের ঐক্য ও জাতিবিচার

অরুণ দাশগুপ্ত

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের সাধনাই ভারতের সাধনা — কথাটা বার-বার শুনে-শুনেও পুরনো হয়নি। ইতিহাসের পাঠ্যবই থেকে ইউনিটি ইন্ ডাইভার্সিটির প্রসঙ্গ তখনো বাদ পড়েনি। সকলেই মেনে নেয় যে সুপ্রাচীনকাল থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে একত্রে মেলাবার কাজ ভারত করে আসছে। শক হূন দল পাঠান মোগলদের কী পরিণতি হয়েছিল তা কে না জানে? শুধু রবীন্দ্রনাথকে এই মতের জন্য দায়ী করা যায় না। অরবিন্দ থেকে শুরু করে সংখ্যাহীন ভারত-তাত্ত্বিক একই সুরে কথা বলেছেন। ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত করে নেবার একটা বিশেষ ক্ষমতা ভারতের আছে, এই কথাটা বেশ জনপ্রিয়। কোনো একটি আবেগের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ এই ধারণার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন।

'পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে।' (প্রবন্ধ: ভারতবর্ষের ইতিহাস/ *ইতিহাস*, লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা, ১৩৬৮, পৃ:১০)

একই প্রবন্ধে লিখেছেন : '...পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।' (*ইতিহাস*, তদেব, ৮-৯)। নিঃসঙ্কোচে নিজের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে এত বড় প্রশংসাপত্র কেন লিখে দিলেন সেটা ভেবে দেখবার মতো। উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে ও পরে স্বাদেশিকতার জোয়ার এসেছিল। ইংরেজি স্কুলে ইংরেজের লেখা ভারতের ইতিহাসের প্রতিপক্ষে স্বদেশি ইতিহাসকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন ছিল। আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান ইতিহাস সচেতন লেখক। সে-তুলনায় রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষভাবে ইতিহাসমনস্ক ছিলেন তা নয়। তথাপি দেখা গেল স্বদেশি-ভাবে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ বিদেশির লেখা ভারতের ইতিহাসের সমালোচনা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ইউরোপে উদ্ভাবিত দলিল-ভিত্তিক ইতিহাসের পদ্ধতি মেনে নিয়েও স্বদেশি ইতিহাসের কাঠামো নির্মাণ করা যেত। অধুনা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রথম সারির ঐতিহাসিকেরা তো সেই কাজই করছেন বিপুল উদ্যমে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইতিহাস রচনার পাশ্চাত্য ধারার প্রতি আকৃষ্ট হননি। শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রাতত্ত্ব, পর্যটকদের বিবরণ, প্রাচীন নগর, প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু প্রভৃতি ইতিহাসের আকরবস্তু ব্যবহারের দিকে তাঁর মন ছিল না। সাহিত্য, পুরাণ, মহাকাব্যগুলির বিভিন্ন উপাখ্যানের মধ্যে অতীতকালের জীবনপ্রবাহের যে কাহিনী ঢাকা পড়ে আছে তাকেই পুনরুদ্ধার করে একটি নতুন গ্রন্থনার মধ্যে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারত ও ইউরোপের পণ্ডিতবর্গের কাছে পুরাণে বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের মর্যাদা পায় না। রবীন্দ্রনাথের কাছে হারানো কাহিনীগুলির মধ্যে লুকিয়ে

রাখা বিভিন্ন প্রতীক ও সঙ্কেতবাক্যের অর্থভেদ করার কাজ অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।

কেবলমাত্র ভারতে নয়, প্রাচীন যুগের অন্যান্য দেশের সভ্যতা গড়ে ওঠার মূলে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন একটি জাতিসংঘাত। বহু জাতি, বহু ধর্ম ও ভিন্ন-ভিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালীকে একত্রে বাঁধবার চেষ্টার ফলেই ঘটে জাতিসংঘাত। তেমনি আবার সংঘাতের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন জাতির মিলনের পথ তৈরি হয়। সৃষ্টি হয় এক-একটি বৃহত্তর জাতি। অধুনা আর্যদের ভারতে আগমন নিয়ে অনেক ছেঁড়া তর্ক উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়কার ঐতিহাসিক ধারণাগুলি মেনে নিয়েছিলেন। আর্যরা যে দলে-দলে কালে-কালে উত্তর ভারতে প্রবেশ করেছিল এই তত্ত্ব ভুল মনে করবার কোনো কারণ পাননি। আর্যদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার বিশাল অরণ্যভূমিকে বাসযোগ্য করে তোলা। এজন্যে অরণ্যবাসী অনার্যদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটেছিল অবধারিতভাবে। পেশাগত ইতিহাসের কালক্রমকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্রের সম্বন্ধ নিয়ে একটি ভাবগত ইতিহাস লিখেছেন। ক্ষত্রিয়-রাজা জনক একদিকে ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, অন্যদিকে তিনি ভারতে কৃষিবিদ্যার প্রবর্তক। জনক কন্যা সীতাকে বলা হয় হলকর্ষণ-রেখাসম্ভূত। দক্ষিণ ভারতের অনার্য দেবতা শিবের হরধনুভঙ্গ করা ছিল সীতার পাণিগ্রহণের পূর্বশর্ত। এই উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয়-ঋষি বিশ্বামিত্র ইক্ষাকু-বংশীয় রাজকুমার তরুণ রামচন্দ্রকে জনকের সভায় নিয়ে যান।

রাম হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন এবং দক্ষিণাঞ্চলে দ্রাবিড় দেশে কৃষিবিদ্যার প্রসার করেন। রামেরই পাদস্পর্শে অনুর্বরা পাষাণ-অহল্যাভূমি উর্বর হয়েছিল। রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য অভিযান একটি উদাহরণ যা থেকে বোঝা যায় যে আর্যাবর্তের বিশাল গাঙ্গেয় সমতলভূমি থেকে কৃষিবিদ্যা ক্রমশ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্রের কল্পিত যোগাযোগের কাহিনীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্মৃত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করেন। যদিও জানতেন : 'এই জনক বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী।' (ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা/*ইতিহাস*, পৃ: ১৬)

পৃথিবীর বৃহত্তম সমতলক্ষেত্র গাঙ্গেয়-উপত্যকা ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ। এরই মধ্যদেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর্যাবর্ত, দানা বেঁধেছিল আর্যসভ্যতা। বহিরাগত আর্যরা কি নৃতাত্ত্বিক বিচারে একটি Race যা প্রধানত ককেশিয়ান? দীর্ঘদেহ, শ্বেতকায়, তীক্ষ্ণ-নাসা আর্য-বংশধরদের অনেকেই খুঁজে পাবেন পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তর ভারতে। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোল্‌স্‌, ভারতে ককেশিয়ানদের আবিষ্কার করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। একসময়ে মনে করা হত আর্যরা একটি উন্নত জাতি যারা গ্রিস, ইরান ও ভারতে প্রবেশ করেছিল বাইরে থেকে এবং একটি নতুন সভ্যতা গড়বার প্রবর্তনা দিয়েছিল। এদের কাছেই ভারত পেয়েছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা, সংস্কৃত। আর্যরা আসলে কি একটি জাতিগোষ্ঠী না একটি ভাষাগোষ্ঠী, এই কূটকচালির মধ্যে না গিয়ে এ-কথা বলা যায় যে আর্যরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্রষ্টা যার মূল গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

ভারতের আর্যসভ্যতা একদিনে গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ভারতে

জাতিসংঘাতের বিভিন্ন ধরন নিয়ে। ভারতের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকউপজাতিদের সঙ্গে আর্যদের সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণ খুবই পরিচিত ঘটনা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' পড়ে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন দক্ষিণে যেমন ছিল অনার্য রাক্ষস তেমনি উত্তরে হিমালয়ের প্রান্তসীমায় ছিল অনার্য যক্ষ, কিরাত ও কিন্নর। দক্ষিণের অধিপতি রাবণ ছিলেন উত্তরের অধীশ্বর কুবেরের ভাই। অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত অনার্য-ভূমির উভয় অঞ্চলের মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিল। গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে আর্যদের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ ধরে অবিশ্রান্ত ধারায় যে-সব নতুন-নতুন জাতি-উপজাতি আর্যদের অনুবর্তী হয়ে ভারতে এসেছিল তাদের বলা হত ম্লেচ্ছ বা যবন। আর্যদের চারপাশ ঘিরে যে বিশাল অনার্য জনসমাজ ছিল তাদের অশ্বারোহী ও রণকুশলী আর্যরা যুদ্ধ করে সমূলে বিনাশ করতে পারেনি। করা সম্ভব ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের চোখে উত্তর-ভারতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারকারী আর্যদের প্রতিষ্ঠালাভ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেন না আর্যরাই হয়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি। অসংখ্য উপজাতি-অধ্যুষিত ভারত একটি আবদ্ধ জলাভূমির মতো গতিবেগহীন অবস্থায় অবরুদ্ধ ছিল। আর্য-ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরের মধ্যে গভীর পার্থক্য সত্ত্বেও যৌথভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় তারাই রচনা করেছিল নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠার মৌলিক রীতিনীতি। সংস্কৃত ভাষা ছিল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব-নব আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের ভাষা। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ভাষা। স্মরণ করুন ভারতই যোগবিদ্যার স্রষ্টা। ভারতেই রচিত হয়েছিল অর্থশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, শিল্পশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ভরতনাট্য ও মার্গসঙ্গীত। এ-সবই তো জানা কথা। যে-কথাটা আবার বলা দরকার তা হল আর্যরা একটি অবিভক্ত সুসমঞ্জস ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী ছিল না। একদিকে ছিল ছোট-বড় কৌলিক উপজাতি যাদের দিবোদাস এবং সুদাস যুদ্ধ করে একত্র করতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা শুধুমাত্র আর্য সমাজের গৃহযুদ্ধ ছিল না। উভয়পক্ষেই যোগ দিয়েছিল স্থানীয় অনার্য জাতিগোষ্ঠী। অন্যদিকে যে চতুর্বর্গে ব্রাহ্মণ্য সমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের মধ্যেও প্রবলাকার বিরোধ ছিল। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সুদীর্ঘ সংগ্রামের স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে। রামায়ণকাব্যে যে শুধু একটি আর্য-অনার্য সংঘাত দেখানো হয়েছে তা নয়। রামচন্দ্রের পক্ষে ছিল কয়েকটি অনার্য মিত্রদল। মহাভারতের যুদ্ধ তো দুটি ক্ষত্রিয় রাজবংশের মধ্যে প্রাধান্যের লড়াই। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ভারতসভ্যতার গড়ে উঠবার মূলে ছিল একটি বৃহৎ জাতিসংঘাত। দেখা গেল একটি এবং একপ্রকার নয়, অনেক ধরনের সংঘাতের মধ্য দিয়েই আর্যসমাজ স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। বহির্দ্বন্দ্বের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, আর্যের সঙ্গে অনার্যের। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে আমেরিকানরা যেভাবে রেড ইন্ডিয়ানদের উৎখাত করে, নির্বিচারে হত্যা করে নির্মূল করার চেষ্টা করেছিল, ভারতে বহিরাগত আর্যরা তা করতে পারেনি, বিরোধীপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার নীতি তারা নেয়নি। যুদ্ধের বিকল্প শান্তি, বিরোধের বিকল্প আপোস ও মিলন, এই তত্ত্ব মেনে নিতে তাদের দেরি হয়নি। ভারতে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ কখনোই বন্ধ হয়নি। সারা মহাদেশ অধিকার করে যে অসংখ্য বিচিত্র বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বাস করত, তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব কৌলিক দেবতা ছিল। জনসমাজকে মেলাতে হলে দেবতাদের মধ্যেও ঐক্য স্থাপন করতে

হয়। কী পদ্ধতি অনুসারে, কোন কৌশলে হিন্দু-সমাজ এই স্বতন্ত্র জাতিগুলিকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছিল তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। যে-উপায়েই হোক না কেন, এই মহামিলন যজ্ঞ যে ভারতেই সংঘটিত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক সার্থকতায় রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছিলেন।

২.

রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে কবিমনের কল্পনা এবং অনৈতিহাসিক বলা সম্ভব। পাঠককে মনে রাখতে হবে যে স্বদেশিভাবের প্রণোদনায় যা লিখেছেন তাতে ভারতের প্রাচীন কীর্তির কথা বলতে গিয়ে কিছুটা অত্যুক্তি এসে পড়তেই পারে। আধুনিক কালের একজন ইতিহাস-উৎসুক ব্যক্তির মনে নানা প্রশ্ন উঠবে।

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে যেখানে বহিরাগত জনগোষ্ঠী প্রবেশ করেনি? স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল সর্বত্র। শুধু তাই নয়, দেশের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক যে-সব সমাজ দানা বেঁধে থাকে, সেগুলিকেও বৃহত্তর জাতির অঙ্গীকৃত করার কাজ সহজ নয়। এই তো কিছুকাল আগে সুন ইয়াৎ সেন ১৯২৪-এ তাঁর *Three Principles* উপস্থাপনের সময় লিখেছিলেন যে চীনকে ভিতর থেকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে পাঁচটি জাতিকে এক হতে হবে। এরা হল মূল চীনা জাতি, মাঞ্চু, মঙ্গোল, তিব্বতি এবং মুসলিম। সবাই ধরে নেয় চীনের মতো বৃহৎ দেশে এমন একটি রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা ও শাসনতান্ত্রিক প্রবহমানতা আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। তবু তো দেশবরেণ্য নেতা সুন ইয়াৎ সেনকে বলতে হল যে পাঁচটি, খণ্ড-জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ এখনো বাকি আছে? এটাই বাস্তব সত্য। সম্পূর্ণ অঙ্গীকরণ করা সহজ নয়, সম্ভবও নয়। সারা পৃথিবীতে শুধু ভারতেরই ছিল সেই উদারতা যার গুণে সে অসংগতকে উপহাস করেনি, পর বলে কাউকে বহিষ্কৃত করেনি, সকলকে গ্রহণ করেছে এবং কিছুই বর্জন করেনি। ভারতের এই আশ্চর্য উদার-মনস্কতার কোনো ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কি? আমার মনে হয় এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি ধারণাকে মনে রাখি। সেই মত হল, যে ভারত সমাজ গড়বার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রগঠনের দিকে তার মন ছিল না। রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি ভারত ছিল উদাসীন। এই জন্যে ইউরোপীয়রা ভারতের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে হতাশ হন এবং বলেন 'যেখানে পলিটিক্স নেই সেখানে আবার হিস্ট্রি কীসের?' রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।' (*ইতিহাস*, পৃ: ৪)। অর্থাৎ ভারতের একটি চিত্তাকর্ষক সমাজ-ইতিহাস আছে, কোনো ধারাবাহিক রাষ্ট্রিক ইতিহাস নেই। ভারতবাসী শুধু সমাজে শৃঙ্খলাস্থাপনে ব্যাপৃত ছিল, রাষ্ট্রের ইতিহাসের উত্থান-পতনের দিকে সে মন দেয়নি, এই তত্ত্ব ইদানীং সমালোচিত হয়েছে। খেয়াল করুন সমাজে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার কাজ করার পাশাপাশি রাজ্যগঠন, রাষ্ট্রনির্মাণের কাজও চলছিল। রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশিকা গ্রন্থই ছিল অর্থশাস্ত্র। যুদ্ধ ও কূটনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ রাজপুরুষের অভাব ছিল না। রাষ্ট্রিক অর্থে ভারতে ইতিহাসের একক বা unit of study ছিল না। ভারত মহাদেশ জুড়ে ছিল সংখ্যাহীন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্য। ইতিহাসে মাত্র কয়েকবার গোটা ভারত জুড়ে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য সময়ে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। ভারতে পলিটিকস ছিল না

এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া যায় না। প্রতিবেশী শত্রুরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা বা বলপ্রয়োগে ভারতীয়দের কোনো অনীহা ছিল না।

১৯১০ সালে প্রকাশিত Ronald Inden-এর *Imagining India* বইতে অনেক নতুন কথা পাওয়া যায়। মূল আকরবস্তু বিশ্লেষণ করে ইন্ডেন, রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের ভিতরকার রাষ্ট্রিক বিন্যাসের একটি ছক তৈরি করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য হল যে, রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্র একটি সম্পূর্ণভাবে নির্মিত সৌধের মতো কোনো দূরবর্তী স্থাপত্যের নিদর্শন নয়। রাজ্য ছিল রাজা, সামন্তবর্গ, জনপদ, বিষয়-পরিষদ, নগর, গ্রাম প্রভৃতির মধ্যে একটি চলমান সম্পর্ক। রাষ্ট্র ও তার শাসনব্যবস্থা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয় যা জনজীবন থেকে অনধিগম্য দূরত্বে অবস্থিত। রাজত্ব একটি সম্পর্ক যা নির্মাণ এবং পুনর্নির্মান করতে হয়। আঞ্চলিক জনপদসভা, বিষয়-পরিষদ, পৌরসভা, গ্রামসভা, বৃত্তি বা অঞ্চলভিত্তিক জাতি প্রভৃতি যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির নেতৃবর্গের সঙ্গে উপরতলার রাজ-অমাত্য ও সামন্ত-অধিপতিদের যোগাযোগ ছিল। সকলেই ছিল রাজার Subject-citizen, অর্থাৎ একই সঙ্গে প্রজা এবং নাগরিক। একই ব্যক্তি পৌরসভা, জনপদসভা বা অন্যান্য সভার সভ্য হতে পারত। গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত এই সভা-পরম্পরা চক্রবর্তী রাজার অধীন এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। জনতার মতামত, পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত রাজ্য পরিচালনা সম্ভব ছিল না। এভাবে দেখলে বোঝা যায় যে ভারতীয় প্রজা — নাগরিক রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকত না, তারা রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সক্রিয় অংশীদার ছিল। রাজার সঙ্গে প্রজাবর্গের সম্পর্ক একবার স্থাপিত হলেই চিরস্থায়ী। রাজাকে নানা উপায়ে এই সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখতে হত। অভিষেক-অনুষ্ঠানে সামন্ত নৃপতিদের উপস্থিতি ছিল আবশ্যিক। রাজা পরিক্রমায় বেরোলে রাজ্যের ভিন্ন-ভিন্ন কেন্দ্রে রাজসভা বসত। সেখানে হাজির থাকতেন স্থানীয় সামন্তরা এবং জনপদ, বিষয়-পরিষদ, নগর ও গ্রামের প্রতিনিধিরা। স্থানীয় সভাগুলি, উপরতলার অমাত্যবর্গ এবং সামন্তরাজারা একটি ক্ষমতার শৃঙ্খলা রচনা করে সম্মিলিতভাবে রাজার প্রতি অনুগত ছিল এবং রাজা ছিলেন ঈশ্বরের অনুগত এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত। চীনদেশের রাজারা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে জানতেন Mandate of heaven বলে।

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার এই নতুন ব্যাখ্যায় যে-কথাটা স্পষ্ট হল না তা হল ভারতীয় সমাজে ও রাষ্ট্রে জাতিভেদ-প্রথার স্থান। বহুনিন্দিত জাতিভেদ-প্রথা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত কী ছিল? সুমিত সরকার বলতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক সিরাজগঞ্জ-দাঙ্গার পরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। জানি না এতটা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির মানসিক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা যায় কি না। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গল্প, কবিতা, নাটকে, হিন্দুসমাজের অমানবিক চেহারা তুলে ধরা আছে। যে জাতিভেদ-প্রথা মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে সমাজকে দুর্বল ও দূষিত করে, তার কঠোর সমালোচনা ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনায়। রবীন্দ্রনাথকে কোনো পর্বেই সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করা যায় না। তথাপি প্রাচীন ভারতে যখন জাতিভেদ-প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল তখনকার সমাজে এই ব্যবস্থার উপযোগিতা কী ছিল সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা সম্ভব।

উনিশ শতকে বিদেশি লেখকদের আলোচনা থেকে মনে হয় জাতিভেদ একটি সামাজিক

ও ধর্মীয় আচার। বংশানুক্রমিক বৃত্তি-অনুসারে সমাজকে ছোট-ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ করে যেন গোষ্ঠীগুলিকে সুসংরক্ষিত প্রকোষ্ঠে বন্দি করে দেওয়া হয়েছে। একটি জাতির প্রধান কর্তব্য হল তার জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। সেইজন্যে তারা অন্য জাতির সঙ্গে আহার করে না বা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। ব্যাপারটা এখানেই মেটে না। জাতিগুলি খাড়াখাড়ি vertical এবং আড়াআড়ি horizontal ভাবে সাজানো আছে। আহার এবং বিবাহ-বিষয়ে অনেক জটিল আচার-বিধি প্রচলিত আছে যা জাতিভেদ ব্যবস্থাকে দুর্বোধ্য করে তোলে।

পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যেখানে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত বা স্তরবিন্যস্ত নয়। কিন্তু একমাত্র ভারতের হিন্দুসমাজেই আছে জাতিভেদ-প্রথা। দেশি-বিদেশি পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন জাতিভেদ ব্যাপারটা ঠিক কি তা বুঝবার জন্যে। ইতিহাসের পাঠ্যবইতে বলা আছে হিন্দুসমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। জাতিভেদ-প্রথার অসংখ্য জাতিকে এই প্রধান চারটি বর্ণেরই ভগ্নাংশ বলে ধরতে হবে। আসলে বর্ণ ও জাতি দুটি আলাদা জিনিস। চতুর্বর্ণকে চতুর্বর্গ বলাই সমীচীন। সব সমাজেই এই ধরনের বর্গ বা order আছে। ইউরোপে ধর্মযাজক, রাজা বা নাইট, বণিক ও কৃষক এই চারটি সামাজিক ভাগ আছে। তা হলে জাতি বা caste কোথা থেকে এল? রবীন্দ্রনাথের মতে ভারত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে একত্রে মিলিয়েছিল। এই মিলন-সাধনার সঙ্গে বিভেদমূলক জাতিভেদ-প্রথাকে কী করে মেলানো যায়? এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি নিজস্ব তত্ত্ব দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের ঐক্যসাধন পদ্ধতি যে ইউরোপের থেকে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্ট, সে-কথাও বলেছেন। 'ভারতবর্ষ বিসদৃশকে সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথায় পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া, তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া।' (*ইতিহাস*, পৃ: ৭-৮)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ জানতেন মানুষের মধ্যে অনৈক্য অসাম্য আছে এবং তাকে স্বীকার করে সমাজগঠন করাই শ্রেয়। আধুনিককালের নৃতাত্ত্বিক ল্যুই দ্যুমোঁ দেখেছেন যে, ভারতবর্ষ মানুষের মধ্যে যে-অসাম্য বা inequality আছে তা মেনে নিয়েছিল। ইউরোপ সাম্যের উপর বেশি জোর দিয়ে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বহুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ যেন দ্যুমোঁর মনের কথাই বলেছিলেন। পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত। ফরাসী বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, এমন স্পর্ধা করিয়াছিল; কিন্তু ফল উল্‌টা হইয়াছে ... ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজ কলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল; নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম কর্ম গৃহ সমস্তকেই অবারিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্যনির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল। (*ইতিহাস*, পৃ: ৮)।

ইউরোপের সঙ্গে পার্থক্য টেনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। ...যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা হয়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।' (*ইতিহাস*, পৃ: ৯)

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠকের ধৈর্যের উপর চাপ দিতে চাই না। আজকের দিনে ভোটের রাজনীতির পাকচক্রে জাতিভেদ-প্রথার যে-ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রথাকে সমর্থন করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চেষ্টা করছিলেন যে, কোনো একদিন জাতিভদে-প্রথা যখন কার্যকরী ছিল, তখন ভারতীয় সমাজে তার স্থান কোথায় ছিল? দুঃখের বিষয় জাতিভেদ ভারত ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং আজো টিকে আছে। কিন্তু যে-অবস্থায় এই প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল তখন তার উপযোগিতা কী ছিল? সেই কথার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কতগুলি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা লক্ষ করবার মতো। যে প্রকৃতই পৃথক তাকে সমাজের শৃঙ্খলার খাতিরে একটি সুনির্দিষ্ট অধিকার-সীমার মধ্যে বেঁধে দিয়েছিল হিন্দুসমাজ। সেখানে খাদ্য, বিবাহ, ছোঁয়াছুঁয়ির কথা গৌণ, প্রত্যেকটি জাতির স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা নিয়ে দেশের সমাজে ও রাজনীতিতে সে কোন অবস্থানে আছে সেই কথাটাই মুখ্য। রোনাল্ড ইন্ডেন এই কথাটাই পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে caste বা জাতি একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী। শুধুমাত্র আচার-বিচারে আবৃত একটি ধর্মীয় বা সামাজিক উপদল নয়। জাতিভেদ-প্রথার বর্তমান বিকৃত চেহারা থেকে তার আদি এবং প্রাথমিক স্বরূপ ধরা যায় না। ইন্ডেনের কাছে একটি জাতি একই সঙ্গে প্রজা ও নাগরিক। জাতিগুলির নিজস্ব সভা ছিল এবং জাতির দলনেতার মতামত অন্যান্য রাষ্ট্রিক সভাগুলির কাছে গুরুত্ব পেত। রবীন্দ্রনাথ সমাজকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সচেতন ছিলেন না যে, যখন তিনি সমাজে শৃঙ্খলাস্থাপনের কথা বলছেন তখন তারই মধ্যে রাষ্ট্রে শৃঙ্খলারক্ষার কথা প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে। জাতি ছিল একাধারে প্রজা এবং নাগরিক, অর্থাৎ নাগরিকতা ব্যক্তিগত ছিল না, ছিল গোষ্ঠীগত। প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করতে হত। জাতি বা caste-এর যে একটি রাজনৈতিক আয়তনিকতা ছিল এই কথাটা জানা দরকার। এইবার আমার উত্থাপিত ভারতীয় উদারতার প্রসঙ্গ তুলতে পারি। ভারতে এত বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর ভিড় হয়েছিল যে গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রণের একটা সমস্যা ছিল। সেই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে ভারত সম্ভবত জাতিভেদপ্রথার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নিয়েছিল। জাতিভেদ সৃষ্টি ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রের ফল নয়। মনুর মানবধর্মশাস্ত্র রচনার আগে থেকেই ভারতীয় সমাজে জাতিতে-জাতিতে দলবদ্ধ হবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং শাস্ত্রকার, রাজার সঙ্গে একত্রে যৌথভাবে এই প্রথা ব্যবহার করেছিল এই রকমই মনে হয়। উদারতা নয়, এক ধরনের রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ ও বলপ্রয়োগের সাহায্যে ভারতের সংখ্যাহীন জনগোষ্ঠীগুলিকে জাতিগোষ্ঠীর খণ্ড খণ্ড প্রকরণে বিভক্ত করে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হয়েছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে এ-প্রশ্ন তুলে লাভ নেই যে ভারতেই কেন জাতি প্রথা

প্রবর্তিত হল? প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ-সূত্র গড়ে ওঠে। ভারতীয় বা Indic সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ গতিময়তা অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক হতেই পারে। যে-অবস্থান থেকে ভারতে জাতিভেদ -প্রথার উদ্ভব হয়েছে সেটা ভারতেরই নিজস্ব। এই ক্ষেত্রে ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা নিরর্থক।

৩.

'জাতি' শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আমাদের বিভ্রান্ত করে। জাতপাতের জাতি আর নেশন স্টেটের জাতি এক নয়। কোনো একসময়ে ইতিহাসের পাঠ্যবইতে ইউরোপের নেশনগুলিকে 'জাতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ভারতকেও একটি 'নেশন' বলবার প্রথা চালু হয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বই-এর নাম *A Nation in the Making* (1925)। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ (১৭৭৬-১৭৮৩) একটি নেশনের জন্ম দিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একই লক্ষ্য সামনে রেখে এগোচ্ছিল। বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষার দেশ কখনো এক হতে পারে? এই প্রশ্ন ইংরেজ প্রশাসকেরা বার বার তুলেছে। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় নেতারা জোরের সঙ্গে বলেছেন যে ভারতের একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। হতে পারে অতীতে হিন্দু সংস্কৃতি ভারতকে ঐক্য দিয়েছিল। ভারতের অসংখ্য তীর্থস্থান প্রধানত কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যে একধরনের চলাচল সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেকটি তীর্থস্থানে ছিল বহুভাষী পান্ডার দল। বারানসীতে একই সঙ্গে নেপালি, তিব্বতি ও দক্ষিণী পান্ডা পাওয়া যেত। সাধারণ মানুষ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারত সহজেই। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেনি। প্রাচীনকালের আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। মুসলমানরা ভারতে এসেছিল সমুদ্রপথে বণিক ও নাবিকের বেশে। পশ্চিম-উপকূলে গুজরাট থেকে মালাবার এবং দক্ষিণ করমণ্ডলের বন্দরগুলিতে শান্তিপ্রিয় আরব ও পারসিক বণিকেরা স্থানীয় রাজাদের আতিথ্য পেয়েছিল। পরে উত্তর-পশ্চিম থেকে তুর্ক-আফগান আক্রমণকারী মুসলিমরা প্রথমে উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতে যে মুসলিমসমাজ সৃষ্টি হল তার বিরাট অংশ ছিল ধর্মান্তরিত। সুলতানি ও মোগল-যুগে, হিন্দু ও মুসলিম-সংস্কৃতির আদান-প্রদান এবং সমন্বয়ের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। ভক্তি আন্দোলনের দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা। তথাকথিত মুসলিম-শাসনের যুগে ভারত একটি বিশুদ্ধ হিন্দু দেশ থাকতে পারেনি। ভারতীয় সংস্কৃতিকে বলা হয় Indo-Islamic। একইভাবে ইউরোপীয়রা ষোল শতকে ভারতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক উপাদানও আসতে লাগল। খুব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত— খ্রিষ্টধর্ম ও ছাপার যন্ত্র। ইউরোপের বাণিজ্য-বিপ্লবের যুগে অর্থাৎ সতেরো ও আঠারো শতকেই ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ অধিকার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত ভারতীয় সংস্কৃতির চেহারা বদলে দিল। আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, ভারত-ইউরোপের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে, ভারত একটি নতুন মিশ্র-সংস্কৃতির দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। অবাক হবার কিছু নেই যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাষা ছিল সর্বভারতীয় স্তরে ইংরেজি। তীর্থস্থানের পান্ডাদের কথা স্মরণ করুন। ভারতে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় চলাচলের ধারা বহুদিন ধরে প্রচলিত।

এ-কথা সত্যি যে মুষ্টিমেয় ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু করেছিল। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে স্থানীয় ভাষা-সংস্কৃতি ছিল সেখানেও কাজ চলছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আত্মসচেতনতার উন্মেষ প্রথম ঘটে আঞ্চলিক ভাষাগুলির স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠগুলিতে। বাংলা, মারাঠি, তামিল, গুজরাটি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যে, ছড়ায় ও গানে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এইখানে একটা বিরতি দিয়ে একটুখানি ইতিহাসে ফিরে যেতে চাই।

সুলতানি আমলে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক অঞ্চলে স্থানীয় দেশজ বা Vernacular সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। ভারতের এক-একটি অংশে উঠে আসছিল স্থানীয় ভাষাভিত্তিক এক ধরনের জাতীয়তা। শাসকেরা যে প্রধানত মুসলিম এবং তারা যে ফারসি, উর্দু ব্যবহার করে তাতে আঞ্চলিক সাহিত্যবিকাশে বিঘ্ন ঘটেনি। একসময়ে সংস্কৃত ছিল উচ্চশ্রেণির সার্বভৌম ভাষা কিন্তু নীচের তলায় পালি, প্রাকৃত, মাগধী ইত্যাদি বেঁচে ছিল ঠিকই। একই ঘটনা ঘটেছে যখন ফারসি হল রাজকীয় ভাষা। সময় দিলে ভারত ক্রমশ একটি বহুজাতিক দেশ হয়ে উঠতেও পারত। নেশন আর স্টেট সমার্থক নয়। রাষ্ট্র একধরনের সর্বেশ্বরতা দাবি করে। তা মেনে নিয়েও স্থানীয়-আঞ্চলিক সংস্কৃতি আত্মরক্ষা করতে পারে। মালাক্কা বা এডেনে ভারতের সমুদ্রবাণিজ্যের এলাকায় ভারতীয় বণিকদের পরিচয় ছিল, গুজরাটি, মালাবারি, তামিল, কলিঙ্গি বা ক্লিং এবং বাঙালি। হিন্দু বা মুসলমান নয়। এইভাবে মোগল শাসনের ছত্রতলে অনেকগুলি ভাষাভিত্তিক জাতি দানা বাঁধছিল। ব্রিটিশদের ভারত অধিকার এই ধারাকে বিঘ্নিত করে। বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে যখন ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন কতকগুলি Survey বা জরিপ করা হয়। জনগণনা বা আদমসুমারি, জাতি (Castes) এবং উপজাতি (Tribes), ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির এক ধরনের সংখ্যাতাত্ত্বিক ছবি তৈরি হয়। এরই পরে আসে নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তনের সুবিধার্থে ভোট দেবার অধিকারীদের অঞ্চল-নির্দেশ এবং শ্রেণি-বিভাজন। খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে, এই শাসনতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের ফলে ব্রিটিশ দলিলে ভারত হয়ে দাঁড়ায় একটি হিন্দু-মুসলমানদের দেশ। অথচ ইতিহাস ভারতকে ভিন্ন পথে চালনা করছিল। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় আমাদের আত্মপরিচয় চাপা পড়ে গেছে ঔপনিবেশিক শাসনের ফতোয়া মতো পুনর্গঠিত সমাজের দেওয়া নতুন নামকরণের তলায়। দুঃখের বিষয় জাতীয় নেতারা এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশ ব্রিটিশ শাসকদের আরোপিত আমাদের নতুন আত্মপরিচয় মেনে নিয়েছে। নতুন জমানায় আছে এক দল হিন্দু যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আরেক দল মুসলিম যারা সংখ্যালঘু। কংগ্রেস ও মুসলিম-লিগ এই সম্প্রদায়-চিহ্নিতকরণ এবং জনসমাজের এই বিভাজন মেনে নিয়েছে। এইজন্যেই মাঝে-মাঝে কথা উঠেছে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার। লক্ষ্ণৌ চুক্তি, চিত্তরঞ্জনের প্যাক্ট, সুরাবর্দি-শরৎ বসু প্রস্তাব, সবই এক ধরনের আপোস রফার চেষ্টা।

এত কথা বলে আবার প্রশ্ন তুলি বাঙালি কি একটি জাতি বা নেশন? বাঙালি কি একটি নেশনের ভগ্নাংশ, অর্থাৎ Sub-nation? বাঙালির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কি? আমরা কি ভারতীয় নেশনের নাগরিক নই? আমি মনে করি জাতীয় আত্মপরিচয়ের কথা দেশের নেতারা মীমাংসা না করেই স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সর্বভারতীয় সভাগুলিতে দলাদলি করত বেঙ্গল লবি, মহারাষ্ট্র লবি, পাঞ্জাব লবি প্রভৃতি। মিটিং-এ বক্তৃতা হত ইংরেজিতে।

প্রস্তাব ও বিবরণ লেখা হত ইংরেজিতে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা ছিল এবং নেতারা চোখ বুজে ছিলেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাঙালি এবং ভারতীয়। এক জন ভাষাতাত্ত্বিক বলেছেন Theregions are India, অর্থাৎ আঞ্চলিক সংস্কৃতির গভীর তলদেশেই পাওয়া যাবে ভারতীয় সংস্কৃতি। সব ক-টি আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে একত্র করে ভারত নামে যে রাষ্ট্র হয়েছে তাকে চলতে হবে। সেই ভারতীয় রাষ্ট্রের বাইরের আকৃতি কী হবে তা এখনো স্থির হয়নি। নতুন প্রকরণে জাতি শব্দের যে-অর্থ, সেই অনুসারে আঞ্চলিক জাতিগুলির মানুষেরা ভারতীয় স্টেটের নাগরিক। সারা ভারত জুড়ে কোনো একক নেশন এখনো গড়ে ওঠেনি। ভারতীয় জাতীয়তার বর্তমান আশ্রয়স্থল ক্রিকেট খেলা। এর বেশি আমরা এগোতে পারিনি।

চীনের ইতিহাসের সর্বজনস্বীকৃত মার্কিন পণ্ডিত চীন বিষয়ে বলেছেন যে প্রাক্-আধুনিক যুগে চীনের যে জাতীয় আত্মাভিমান ছিল সেটা নেশন-ভিত্তিক নয়, তার নিজের সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য। চীনের কালচার নিয়ে তার অহংকার ছিল যাকে বলা যেতে পারে Culturism। এই সংস্কৃতিকে বলা হয় Sinic culture, যার প্রভাব ছড়িয়েছিল ভিয়েতনাম, কোরিয়া ও জাপানে। আমরা জানি, ভারতেও তেমনি ছিল Indic culture, যার প্রভাব পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। কোনো দেশেই, চীন বা ভারতে, নেশন-স্টেটের খাঁচার ভিতরে Culturism-কে ঢোকানো যায়নি। চেষ্টা করাও অনুচিত। নেশন-স্টেট ইউরোপের তৈরি। সারা পৃথিবীতে গজিয়ে উঠছে নতুন-নতুন নেশন-স্টেট। আসলে তা রাষ্ট্র বা স্টেট। নেশন নয়। ভারতকে চলতে হবে নেশন-স্টেটের মুখোশ পরে। ভিতরে-ভিতরে আমরা থাকব ভারতীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে, কিন্তু সে-সংস্কৃতি হিন্দুত্ববাদী নয়। সে-সংস্কৃতি হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী, আর্য-অনার্যর মিশ্র সংস্কৃতি।

কলিযুগ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

কৌরব-পাণ্ডব-বংশের একমাত্র সন্তান-বীজ পরীক্ষিৎ-মহারাজ তখন সবে রাজা হয়েছেন। পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানিকে শেষ গতি লাভ করেছেন এবং ভগবত্তার স্বরূপে চিহ্নিত কৃষ্ণও তখন লীলা সংবরণ করেছেন। পাণ্ডবদের 'পরিক্ষীণ' রাজবংশের অপরিণত বংশধর হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষিৎ যে খুব খারাপ শাসন চালাচ্ছিলেন, তা নয়। বিশেষত তাঁর পিতৃ-পিতামহকুলের গৌরব তাঁর মনে সদা জাগ্রত থাকায় অন্যায়-অধর্ম প্রশমনের ব্যাপারে পরীক্ষিতের চেষ্টা ছিল যথেষ্ট। যাই হোক, তাঁর শাসন যখন চলছে, সেই সময় হঠাৎই পরীক্ষিতের কাছে এক অপ্রিয় বার্তা এসে পৌঁছাল। বার্তাবহ জানাল — তাঁর রাজ্যে 'কলি' প্রবেশ করেছে — কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্তিতে।

পরীক্ষিৎ রাজা বলে কথা — সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি — এই চতুর্যুগের স্বরূপ তিনি জানেন। তিনি জানেন যে, চলমান মানব-সভ্যতার পথ বড় পঙ্কিল, সময় বাহিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যায়, অধর্ম, অমানবিকতা আরো বেশি-বেশি গ্রাস করে এই পৃথিবীকে। কিন্তু তবু এই সময়ে, তিনি কেবল রাজা হয়েছেন, আর যুগাধম কলি এখনই এসে প্রবেশ করল তাঁর রাজ্যে। পরীক্ষিৎ এমনভাবেই প্রস্তুত হলেন যেন মহাশত্রুর নিপাত ঘটাতে হবে। আসলে সেই সময়ে পরীক্ষিৎ দিগ্‌বিজয় করতেও বেরিয়ে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁর কাছে খবর এসেছে, অতএব আর দেরি না করে তিনি যুদ্ধরথে উঠে পড়লেন কলি-দমনের অভিপ্রায়ে। পরীক্ষিতের রথের কালো ঘোড়া রথ ছুটিয়ে নিয়ে চলল, তাঁর হাতে ধনুর্বাণ, মনে দৃঢ় সংকল্প — কলিকে তিনি ভয়ংকর শাস্তি দেবেন — শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে।

পরীক্ষিতের তখনো তেমন মনোবুদ্ধির পরিণতি ঘটেনি। তিনি বোধহয় বুঝতে পারেননি যে, যুগক্ষয়ের করাল মূর্তিকে অত সহজে চেনা যায় না, সে রূপ ধারণ করে আসে না — সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে যুগসন্নদ্ধ অন্যায়-অধর্মের মধ্যেই যুগক্ষয় পরিণতি লাভ করতে থাকে। পরীক্ষিৎও, কলিকে সেই রূপকেই দেখতে পেলেন। কালো ঘোড়ার রথ ছুটিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎই পরীক্ষিতের চোখের সামনে এক অদ্ভুত অঘটন ঘটে গেল। তিনি দেখতে পেলেন — একটি লোক, সে রাজার পোশাক পরে আছে, সে-পোশাকে সোনার বর্ণ ঝলমল করছে, তার হাতে একটি চাবুক — দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্। লোকটি যে জাতিতে শূদ্র, সেটা তেমন বুঝতে পারেননি পরীক্ষিৎ। হয়তো সে যেমন কাজ করছিল সেই নিরিখেই তাঁর অমন ধারণা হয়েছিল।

পরীক্ষিৎ দেখলেন — রাজবেশী পুরুষের সামনে একটি বৃষ দাঁড়িয়ে আছে, তার তিনটে পা-ই ভাঙা। রাজবেশী তাকে চাবুক দিয়ে মারছে। পরীক্ষিৎ আরো দেখলেন — সেই বৃষের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটি গাভী, তার শরীর জীর্ণ মলিন, সে তৃণমুষ্টি চাইছে খাবার জন্য, আর রাজবেশী তাকে মাঝে-মাঝেই লাথি মারছে — গাঞ্চ ধর্মদুঘং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্। বৃষটি সাদা রঙের, মুনিঋষিদের সত্ত্ববৃত্তির মতো সে শুভ্র। এমন বৃষটির তিনটি পা ভেঙে গেছে শুধু তাই নয়, রাজবেশী লোকটির দণ্ডতাড়নের ভয়ে সে মূত্র ত্যাগ করে ফেলছে মাঝে-

মাঝেই। গাভীটির অবস্থাও তথৈবচ, বাছুরকে না দেখলে যেমন মা-গাভী কাঁদে, তেমনই কাঁদছে সে রাজবেশীর পদতাড়নায়।

যজ্ঞভাবিত ব্রহ্মাবর্তে বৃষ এবং গাভীর এমন অপমান-তাড়না দেখে পরীক্ষিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ধনুকে শরযোজনা করে প্রহরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই তিনি সেই সোনার পোশাক-পরা লোকটিকে বললেন — কে হে তুমি, বদমাশ কোথাকার! নাটুকে নটের মতো রাজার বেশ পরেছ বটে, কিন্তু তোমার কাজকর্ম তো একেবারে চণ্ডালের মতো — নরদেবো'সি বেশেন নটবৎ কর্মণা-অদ্বিজঃ। তুমি কী ভেবেছ? আমার রাজ্যে আমার আশ্রয়ে যারা শরণাগত হয়ে আছে, শুধু তুমি বলবান বলেই সেই দুর্বল প্রাণীকে এমন করে তাড়না করবে? সেটা হবে না। তুমি মনে কোরো না — আজ আমার পিতামহ অর্জুন অথবা লোকশ্রুত কৃষ্ণ এই ধরাধামে নেই বলে এমন নিরপরাধ প্রাণীকে তুমি শাস্তি দিতে পারো। তোমাকে আমি মেরেই ফেলব।

পরীক্ষিৎ রাজবেশীকে ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ রেখে এবারে সেই বৃষ এবং গাভীটির দিকে নজর দিলেন। বৃষটিকে সাধারণ কোনো ষাঁড় মনে হল না তাঁর। পরীক্ষিৎ তাঁর সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং অভয় দিয়ে বললেন — বলো, তোমার এই দশা কে করেছে, তোমার তিনটি পা ভেঙে দিয়ে আমার পাণ্ডব-পিতামহদের কীর্তি নষ্ট করেছে কে? বল তুমি, কে — আত্মবৈরূপ্যকর্তারং পার্থানাং কীর্তিদূষণম্?

পুরাণে বর্ণিত এই অসাধারণ কথোপকথন — যা শেষ হতে এখনো বাকি আছে — এ-কথোপকথনের মধ্যে একটি অসাধারণ রূপক আছে। রূপকে বিবৃত বৃষ হলেন ধর্মের স্বরূপ। বস্তুত অনেক প্রাচীন কাল থেকেই ধর্ম বা জ্ঞান বৃষের স্বরূপে চিহ্নিত। যাঁরা দেবদেব মহাদেবকে বৃষবাহন বলে জানেন, তাঁরা যেন ওই বৃষটিকে সাক্ষাৎ ষণ্ড না ভাবেন। কারণ মহাদেবের কাছে জ্ঞান বা ধর্মের শিক্ষা চাইতে হয় — জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ — সেইজন্যই তিনি বৃষবাহন। অন্যদিকে গাভীটি হলেন জননী বসুন্ধরার স্বরূপ এবং স্বরূপও কোনো অপরিচিত রূপক নয়। ভারতীয় সভ্যতার আরম্ভ থেকেই পৃথিবী-জননীকে গো-রূপে কল্পনা করা হয়। মহারাজ পৃথু, যাঁর নামে এই পৃথিবীর নাম পৃথ্বী, তিনি, নাকি গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন, সেই তিনিই পদতাড়িতা হচ্ছিলেন পরীক্ষিতের সামনে। পৃথিবীর রাজা হিসেবে পরীক্ষিৎ তাই যথার্থ ক্রুদ্ধ হয়েছেন রাজবেশী অন্যায়কারী মানুষটির ওপর।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে বৃষরূপী ধর্ম স্পষ্ট করে নিজের পরিচয় না দিলেও নিজের বুদ্ধি-ভাবনায় তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন এবং গাভীটিকেও চিনতে পারলেন বসুন্ধরা বলে। পরীক্ষিৎ পৌঁছবার আগেই ধর্মরূপী বৃষ এবং গোরূপা বসুন্ধরার সাক্ষাৎকার হয়েছে। তাঁরা দুজনেই দুজনকে পরস্পর দুঃখ নিবেদন করছিলেন — যুগক্ষয়ে ত্রিপাদভগ্ন ধর্ম এবং মলিনা কৃশা বসুন্ধরা যুগপাবনাবতার কৃষ্ণের কথা স্মরণ করে দুঃখ করছিলেন। বলছিলেন — কৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধর্ম এবং ধরা — কেউই তাঁদের ক্রমবর্ধমান বিপর্যয়টুকু বুঝতেই পারেননি — শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলংকৃতাঙ্গী। কিন্তু সে সুখ এখন গেছে, এখন তাঁরা মার খাচ্ছেন রাজবেশী পুরুষের হাতে।

ধর্ম এবং পৃথিবীকে চিনে ফেলার পর রাজবেশী পুরুষটিকেও পরীক্ষিৎ কলি বলে চিনতে পারলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ-গাভী-মিথুনকে অভয় দান করে তিনি খড়্গ নিয়ে ছুটলেন কলিকে হত্যা করতে — নিশাতমাদদে খড়্গং কলয়ে' ধর্মহেতবে। কলি যেই দেখল — রাজা

তাকে মারতে আসছেন, ওমনি সে আপন রাজবেশ ত্যাগ করে পরীক্ষিৎ-মহারাজের পায়ে পড়ল — তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্ভয়বিহ্বলঃ। আর এইভাবে শরণাগত হলে পাণ্ডব-বংশের জাতকেরা তাদের গায়ে হাত তোলেন না। পরীক্ষিৎ তাকে মারলেন না বটে, কিন্তু খুব কড়া গলায় বললেন — তুমি এই মুহূর্তে আমার রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। একবার তুমি এখানে আস্তানা গাড়লে যত অন্যায়-অধর্ম সব এখানে এসে ঢুকবে। তুমি ভেবেছটা কী? এই পুণ্যা সরস্বতী নদীর পূর্বতীরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, এই বহুশ্রুত ব্রহ্মাবর্ত-প্রদেশে যাজ্ঞিক বৈদিকেরা বিভিন্ন যজ্ঞ বিস্তার করে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করেন — ব্রহ্মাবর্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈঃ। যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞ-বিতানবিজ্ঞাঃ — আর তুমি কিনা সেইখানে এসে ঢুকেছ। বেরোও এখান থেকে। জেনে রেখো — ধর্ম এবং সত্য ছাড়া এই জায়গায় কারো স্থান হবে না।

পরীক্ষিতের কথা শুনে কলি খুব ভয়বিহ্বল একটা ভাব করল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দমে গেল না কিংবা হালও ছাড়ল না। বলল — আপনার এই উদ্যত খড়্গের সামনে আমি থাকব কেমন করে? তার চেয়ে বরং আপনিই একটা জায়গা বলে দিন যেখানে আমি সুস্থিরভাবে বাস করতে পারি। পরীক্ষিৎ ভাবলেন — কতগুলো খারাপ জায়গা তো এমনিই চিরকাল আছে, যেখানে অন্যায়-অধর্ম পূর্বচিহ্নিত, অতএব সেইখানেই কলি থাকুক। এই ভেবেই তিনি বললেন — ঠিক আছে, যেখানে জুয়োখেলা হয়, যেখানে মদ্যপানের আসর, যেখানে মাত্রাহীন স্ত্রী-সম্ভোগ এবং যেখানে অকারণ পশুবধ — এই চার জায়গায় থাকো তুমি। আর কোথাও নয়। অন্যায়-অধর্মের মূলাধার কলি অত্যন্ত পাটোয়ারি-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। সে ভাবল — অধর্মের এই স্থানগুলি তো চিরকালীন, এই অধর্ম তো সব যুগে, এমনকী সত্যযুগেও এ-গুলির নামত উপস্থিতি ছিল। কাজেই পরীক্ষিৎ আর নতুন কী দিলেন! মহাভারতে স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আপন স্ত্রী দ্রৌপদীকে পণ রেখে যে-অন্যায়ে মেতে ছিলেন, তাতে — দ্যূত, পান — এগুলি নিতান্ত পুরাতন অধর্মের জায়গা। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণপর্বে স্বয়ং বিকর্ণ পর্যন্ত অধর্মের স্থান চিহ্নিত করার সময় ওই চারটি জায়গাই বলেছিলেন — মৃগয়াং পানমক্ষাংশ্চ গ্রাম্যে চৈবাতিরক্ততাম্ — অর্থাৎ সেই মৃগয়া, পান, দ্যূতক্রীড়া এবং স্ত্রীলোকে অত্যাসক্তি। কাজেই কলির মন ভরল না।

হয়তো আরো একটা ভাবনা ছিল কলির। সে ভাবল — যে-ঘটনা ঘটে গেল এবং পরীক্ষিৎ যেমন রাজশাসন জারি করলেন তাতে জুয়োখেলা মদ্যপান — এ-সব দুর্ব্যসনে মেতে উঠতে লোকে ভয়ে পাবে। বরঞ্চ যেটা দরকার, সেটা হল — লোকের মনের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া, এবং এই সব অন্যায়ের জন্য রসদও চাই কিছু। অতএব কলি বায়না ধরলেন পরীক্ষিতের কাছে — শরণাগতের প্রতি এ আপনার কেমন কৃপণতা, প্রভু! এ-সব তো আমার আগেই ছিল। পরীক্ষিৎ বিগলিত হয়ে বললেন — ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে অর্থশক্তির জায়গাটাও দিলাম, তা না হলে লোকে দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপানাদি করবে কী করে! আর দিলাম — ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার — মিথ্যা, মদ্যপানজনিত মত্ততা, স্ত্রীসঙ্গ-এর অনুষঙ্গ কাম, অকারণ প্রাণিবধের উপযুক্ত গর্ব, হিংসা এবং একটা ফাউ — অকারণ শত্রুতা — ততো'নৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।

প্রবলবেগে আগত কলির আসন্ন প্রয়াস খানিকটা স্তব্ধ করে পরীক্ষিৎ নাকি ধর্মের ভাঙা পা তিনটিও ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং উপযুক্ত স্থিতাবস্থার আশ্বাস দিয়েছিলেন জননী বসুন্ধরাকেও — প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীঞ্চ সমবর্ধয়ৎ।

পৌরাণিক এই কাহিনীটুকু হয়তো না বললেও চলত। এমনও করা যেত — পণ্ডিত-সুজনদের প্রথামতো পুরাণের একটা 'রেফারেনস' দিয়ে আমরা পরের প্রসঙ্গে যেতে পারতাম। কিন্তু এমনটি যে করলাম না, তার একটা বড় কারণ হল — এই রূপক-কাহিনীর মধ্যে কলিযুগ ধারণার প্রধান উপাদানগুলি লুকিয়ে আছে। এই উপাদানের প্রধান হলেন মহারাজ পরীক্ষিৎ যাঁর সঙ্গে কলিযুগের পিঠোপিঠি পরম্পরা-সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয়ত, সেই-যে রাজবেশী কলিকে পরীক্ষিৎ বলেছিলেন — তোমাকে দেখতে রাজবেশী বটে, তবে নাটুকে নটেদের মতো রাজবেশে সেজেছ, নইলে তোমার কাজকর্ম অনেকটাই ব্রাহ্মণ্যবিরোধী ব্যক্তির মতো, বলা উচিত, শূদ্রদের মতো — নটবৎ কর্মণা অদ্বিজঃ — এই কথাটার মধ্যেও একটা ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ পূর্বে যে একটা সংস্কার ছিল যে ক্ষত্রিয়-জাতির মানুষেরাই শুধু রাজকর্ম করবেন, তা নয়; মহারাজ পরীক্ষিতের সময়েই শূদ্র-জনজাতি রাজকর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা রাজাও হচ্ছিলেন। পরীক্ষিৎ নিজেও কলিবধে উদ্‌যুক্ত হবার আগে ভগবতী পৃথিবীর উদ্দেশে বলেছিলেন — আহা! আজ এই পৃথিবীর কী অবস্থা হয়েছে। কৃষ্ণ যতদিন এই ধরাধামে ছিলেন ততদিন কোনো অমঙ্গল ঘটেনি, কিন্তু আজ তিনি লীলা-সংবরণ করার ফলে পৃথিবী আজ বিমনা হয়ে ভাবতে বসেছে যে, — হায়! এর পর থেকে রাজার বেশধারী ব্রাহ্মণ্যাচারহীন শূদ্ররা এই পৃথিবী ভোগ করবে — অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজা শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি।

এই কথা থেকে বোঝা যায় — ধরাধাম থেকে কৃষ্ণের চলে যাওয়াটা একটা যুগাবসানের ইঙ্গিত দেয় এবং শূদ্র-রাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটাও ঐতিহাসিক দিক থেকে একটা অন্য যুগের উপস্থিতি, অথবা বলা উচিত — একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করে। তৃতীয়ত, পরীক্ষিৎ যে ধর্মের তিনটি পা আবার সুস্থিত করে দিলেন — এর মধ্যে একটা পৌরাণিক অতিশয়োক্তি আছে। যুগত্রাসের ফলে মানুষের মধ্যে যে আচার এবং ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটছিল — সেটাকে আধুনিকতার প্রসার বলব নাকি জানি না, তবে চিরন্তনী দৃষ্টিতে হয়তো পুরাতন আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্মের উচ্ছেদ ঘটছিল, পরীক্ষিৎ হয়তো রাজশক্তি প্রয়োগ করে সেই সনাতনী ভাবনা আবারও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মের ত্রিপাদ-প্রতিসন্ধান হয়তো এই চেষ্টার সূচক।

চতুর্থত, অধর্মের চিরন্তন চারটি স্থান লাভ করার পরে পুনর্বার যাচমান কলিকে যে আরো পাঁচটি স্থান দিলেন পরীক্ষিৎ সেগুলিও মানুষের কোনো অর্বাচীন বৃত্তি নয় এবং প্রথম চারটি অধর্মস্থানের সঙ্গে সেগুলি অবিযুক্তও নয়। বরঞ্চ বলব — ওই পুনর্দত্ত বস্তুগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেটা বিশিষ্ট, সেটা হল — সুবর্ণ, পুরাণ যাকে বলেছে জাতরূপ — পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ। টীকাকারেরা অর্থ করেছেন — জাতরূপং সুবর্ণাদিকম্ — অর্থাৎ সোনা-রূপো ইত্যাদি। অধর্মের ইন্ধন হিসেবে অর্থ-সম্পত্তির জায়গাটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ — এই তথ্যটা যে এখানে খুব জরুরি, এটা বোঝানোর জন্য আমি খুব বিব্রত নই, কেন না ধর্মকার্যে, বিশেষত বৈদিক যজ্ঞাদিকর্মেও অর্থের ইন্ধন যথেষ্টই প্রয়োজন ছিল। কাজেই সেই দিক থেকে নয়, কলির সঙ্গে সুবর্ণ-রজতাদির যোগের ঘটনাটা আমাদের কাছে অতি-বিশিষ্ট এই কারণে যে, ঐতিহাসিকতার খাতিরেই বলতে পারি অতি-প্রাচীন কালে — যে-প্রাচীনত্বকে আমরা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের সংজ্ঞায় চিহ্নিত করতে পারি, — সেই কালে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে

মুদ্রার ব্যবহার চালু ছিল না, এমনকী সোনা-রুপো তখনো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল না।

অর্থনৈতিক বিকাশ এবং উৎপাদনের প্রাচুর্য — এ-দুটি যদি নিয়মিত ব্যবসায়িক লেনদেন তথা অন্তঃরাষ্ট্রীয় পারস্পরিকতা তৈরি করে, মুদ্রার প্রচলন ত্বরান্বিত করে, তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ঋগ্‌বেদের আমলেও আমাদের দেশে যথাযথ মুদ্রামান তৈরি হয়নি। 'কৃষ্ণল', 'শতমান' অথবা 'নিষ্ক' — এই ঋগ্‌বৈদিক শব্দগুলি যদিও মুদ্রানামের স্মরণ ঘটায়, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যেহেতু এক হাজার থেকে ছ-শো খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে সোনা-রুপো-তামা কোনো ধাতুরই কোনো চিহ্নিত মুদ্রা খুঁজে পাননি, অতএব তাঁরা মনে করেন যে, ভারতবর্ষে সভ্যতা তখনো এমন স্তরে পৌঁছায়নি যাতে করে তেমন কোনো উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক বিস্তার কল্পনা করা যায় এবং সেই কল্পনার সমগোত্রীয় মুদ্রা-বিনিময়ের কথা ভাবা যায়। আমরা যে চন্দ্র-সূর্য অথবা হাতি-ঘোড়ামার্কা 'পাঞ্চ-মার্কড কয়েন'-এর সন্ধান পাই, সেগুলোও কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রশক্তির পরিচায়ক মুদ্রা নয়, সেগুলো নেহাতই বেসরকারি উদ্যোগে সৃষ্ট এবং আপন ব্যবসায়িক সুবিধার্থে তৈরি করা এলোমেলো ধাতবখণ্ড — কিন্তু সেগুলিও খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার বছর আগের নয় বলেই প্রাচীন মুদ্রা-বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

তবে একটা প্রশ্ন এখানে থেকে যায় — চাক্ষুষভাবে কোনো মুদ্রার সন্ধান হয়তো এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে আমরা পাইনি; কিন্তু সাহিত্যের শব্দগুলোও তো একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বিশেষত 'নিষ্ক' শব্দটি, যা পরেও মুদ্রামান হিসেবে চিহ্নিত, অন্তত এই শব্দটির জন্যও আমাদের দু-বার ভেবে দেখার কারণ আছে। আরো একটা কথা। আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণেই জানি যে, খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার থেকে ছ-শো শতকের মধ্যেই কৌশাম্বী (এলাহাবাদের কাছে), কাশী অথবা মগধের মধ্যগাঙ্গেয় অঞ্চলে নগরায়ণ ঘটে গিয়েছিল। আর এটা তো সাধারণ কথা যে প্রান্তিক ভূমিক্ষেত্রগুলিতে উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য না মিললে সার্থক নগরায়ণ ঘটে না এবং নগরায়ণ যদি ঘটে থাকে সেখানে গ্রাম এবং নগরে ব্যবসায়িক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ব্যবহারও খানিকটা কল্পনা করে নিতেই হয়।

আমরা মুদ্রা-ব্যবহারের উদ্ভব নিয়ে এত কথা বলছি এইজন্য যে, আমাদের বিশেষ ধারণা — মুদ্রা-ব্যবহারের সঙ্গে কলিযুগের একটা বিশেষ যোগ আছে। পরীক্ষিৎ-মহারাজ যে বিনম্র যাচমান কলিকে 'জাতরূপ' অর্থাৎ সুবর্ণ-রজতের স্থানাধিকারটুকু ছেড়ে দিলেন — পৌরাণিকের এই রূপক-ব্যবহারের মধ্যে এক ধরনের ঘৃণা এবং বিস্ময় একসঙ্গে কাজ করছে। ঘৃণা এইজন্য যে, জুয়া, মদ্যপান, অবাধ স্ত্রী-সঙ্গ অথবা খুব 'অ্যাবস্ট্রাক্টলি' ভাবলে কাম, মদ(গর্ব), রজোগুণের আধিক্য এবং অকারণ বৈরিতার মধ্যে মুদ্রামান-সম্পন্ন সহজ এবং গতিশীল অর্থ-ব্যবহারের একটা প্রক্রিয়া পৌরাণিক লক্ষ করেছেন এবং ব্যাপারগুলি সহজ হয়ে গেছে বলেই তা কলির নতুন অধিকারের মধ্যে এসেছে। আর বিস্ময় এইজন্য যে, গ্রাম্য কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে নগরায়ণের রূপান্তর এবং নাগরিক সভ্যতায় উদ্বৃত্ত অর্থের যথা-তথা অপব্যবহার, বিশেষত পুরাতন অধর্ম স্থানগুলির সহজ উপযোগ — যা মুদ্রা-বিনিময়ে সহজতর হয়ে উঠেছিল — এই ঘৃণামিশ্রিত চমৎকারই পৌরাণিককে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে যে, সব গেল, ভালোর সময় শেষ, এখন কলিকাল এসে গেছে।

মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের পিতা-পিতামহরাও একই কথা বলতেন। বলতেন

— ঘোর কলি। যে-ঘরে অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে, সেখানে যেমন কলির প্রসঙ্গ আসত, তেমনই কাজের লোক মুখঝামটা দিয়ে যদি মনিবকে দুটো কথা শুনিয়ে কাজ ছেড়ে দিত, তাতেও কলির প্রসঙ্গ আসত। ছেলে যদি বাপের মুখের ওপর তর্ক করত, তাতে যেমন কলির উচ্চারণ শোনা যেত, তেমনই আমার বউদির বান্ধবী যেদিন 'স্লিভলেস ব্লাউজ' পরে আমার পিতাঠাকুরকে 'কাকু' বলে নমস্কার করেছিলেন, সেদিন তিনি আপন স্নিগ্ধতাবশত স্পষ্ট করে কিছু না বললেও পরে তত্ত্বগতভাবে 'কলির' জায়গায় 'কাল' শব্দটি ব্যবহার করে বলেছিলেন — কালের গতি এমন তো হবেই, পরিবর্তন তো আরো হতে থাকবে যা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠবে।

এই যে হা-হুতাশ, এই যে পরিবর্তনের স্রোতটাকে সহ্য করতে না পারা, প্রাচীনতা থেকে অর্বাচীন ব্যবহারের মধ্যে এই যে বিবর্তন — এরই মধ্যে আসলে কলিকালের খণ্ড-চরিত্রটুকু ধরা আছে। তবে হ্যাঁ, এটা শুধুই 'জেনারেশন গ্যাপ' বা শুধুমাত্র প্রাচীন ধারণার বিবর্তিত পরিবর্তন বলে পার পাওয়া যাবে না। কেন না প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যেও দেখা যাবে যে, আচার-ব্যবহার এবং পুরাতন ধারণার পরিবর্তনের মধ্যে কলিকালের আরোপ ঘটছে বহুকাল থেকে। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, পৌরাণিকেরা যখন কলিধর্মের বর্ণনা করছেন — যা অনেকটাই সামাজিক আচার, বিচার এবং ব্যবহারের পরিবর্তন সূচনা করছে, তেমনই, একই সঙ্গে তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র-পরিবর্তন, অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন এবং এমনকী বিশ্বাস পরিবর্তনের কথাও নির্দিষ্ট করে বলছে। এ কথা মানতে হবে যে, পুরাণগুলি সব এককালে এবং একই দেশে রচিত হয়নি। এতে আরো বেশি সুবিধে হয় এইজন্যে যে, এক-একটি পুরাণে তার সমসাময়িক এবং দেশজ-ভাবনার পরিবর্তনের কথাও কলিধর্মের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। অতএব পৌরাণিকেরা যে প্রত্যেকে প্রায় প্রথাগতভাবে সক্ষোভে কলিযুগের অধঃপতন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন সেটার মধ্যে ধর্মের অবক্ষয় ব্যাপারটা যত প্রণিধানযোগ্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সেটা সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক দলিল। এক কথায়, সেটা অতি প্রাচীন যুগের অবসানে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের আরম্ভ সূচনা করে।

কলিধর্মবর্ণনার সব চেয়ে প্রাচীন দলিলটি পাওয়া যাবে মহাভারতে। যদিও, তারও আগে, এই শব্দটার মধ্যে যে একটা নিন্দনীয় কদর্থ ছিল এবং সেই অর্থই যে পরবর্তীকালে পৌরাণিক কলিধর্মে প্রসারিত হয়েছে, তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। একটা বড় মাপের সময় হিসেবে যুগ কথাটা আমরা অন্তত ঋগ্‌বেদে পাইনি। তবে হ্যাঁ, 'ভবিষ্যতে বড় খারাপ সময় আসছে' — এই হা-হুতাশি কথাবার্তা, যেমনটি আমরা বুড়োরা বলে থাকি, সেই অর্থে যুগ কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে ঋগ্‌বেদের যম-যমী সংবাদে। সভ্যতার প্রাগ্‌ভাবনায় যম-যমী সংবাদে, যমী যে 'ইনসেসচুয়াস্ অ্যাটেমপ্ট' নিয়েছিলেন, যেখানে যম তাঁকে শান্ত করেও এমন আশঙ্কা করে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে বড় খারাপ সময় আসছে, যখন বোনেরা ঠিক আর বোনেদের ব্যবহারটুকু করবে না — আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র যাময়ঃ কৃণবন্নজামি। ঋগ্‌বেদের যুগধারণা এইটুকুই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-কলির কথা তাঁরা বলেননি। যুগ বলতে ওঁরা জানতেন — পুরাকাল, বর্তমান কাল আর ভবিষ্যৎ। লক্ষ-কোটি বৎসর-ব্যাপী চতুর্যুগের ধারণা ঋগ্‌বৈদিকের ছিল না। অথর্ববেদের মধ্যে অন্তত হাজার-হাজার বছর ধরে একটি যুগের কল্পনা এসেছে বটে, এমনি চতুর্যুগের একটা অস্পষ্ট ধারণাও কাজ করছে আথর্বণিকের মনে

— শতং তে স্যুতং হায়নান্ দ্বে যুগে ত্রীণি চত্বারি কৃণ্মঃ — কিন্তু সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির নামত কোনো স্পষ্ট ধারণা অথর্ববেদেও নেই। তবে হ্যাঁ, কৃত (মানে সত্যযুগ) এবং কলি-শব্দটা অথর্ববেদে শোনা যাচ্ছে, তবে এই দুটি শব্দই পাশার দান হিসেবে ব্যবহৃত হত। 'কৃত'-শব্দটা ঋগ্‌বেদেই ছিল এবং পাশাখেলায় সেটা সবচেয়ে ভালো দান হিসেবে গণ্য হত; অথর্ববেদে তার সঙ্গে কলি-শব্দও এসেছে এবং সেটা পাশাখেলার সবচেয়ে খারাপ দান।

পাশাখেলায় কলি-দান ভালো না খারাপ, তা নিয়ে পণ্ডিতদের, মধ্যে সামান্য মতভেদ আছে। যদি বা তা ভালো দানও হয়, তবুও তা ঘৃণ্য জুয়েখেলার সঙ্গে যুক্ত এবং সেই অর্থে কলির মধ্যে খারাপের যন্ত্রণাটুকু রয়েই গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার যে, একটি অতিব্যাপ্ত যুগ হিসেবে শুধু কলি কেন, সত্য(কৃত), ত্রেতা, দ্বাপর কোনোটাই কিন্তু কাল হিসেবে সদর্থক হয়ে ওঠেনি ঋগ্‌বেদ থেকে অথর্ববেদের কাল পর্যন্ত। এমনকী বেদের অব্যবহিত তথা পরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি — যেগুলি তত্ত্বগতভাবে বেদই অথবা বেদের সমগোত্রীয়, সেখানেও কিন্তু একটা কালসমষ্টি হিসেবে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর বা কলির উল্লেখ নেই। কিন্তু অতিপ্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা অসাধারণ একটা মন্ত্র শুনতে পাচ্ছি, যেখানে চতুর্যুগের নামগুলি তো আছেই, অপিচ সেই শ্লোকের মধ্যে এই ধারণাটুকু প্রথম পাওয়া যায় যে, যথাক্রমে কৃত, ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি — এই চতুর্যুগের মধ্যে পর পর এক ক্রমিক অবক্ষয়ের ব্যঞ্জনা আছে। ঐতরেয়-শ্লোকের ভাষা থেকে এটা যদিও স্পষ্ট নয় যে, চতুর্যুগের নামত উল্লেখ আদৌ কোনো কাল-সমষ্টি বোঝাচ্ছে অথবা বোঝাচ্ছে না, কিন্তু কলি থেকে কৃত(সত্য) পর্যন্ত ক্রমিক গুণগত উত্তরণ অথবা উলটো দিক থেকে ধরলে যে ক্রমিক অবক্ষয়ের সূচনা ঘটছে, তাতে মনে হয় সত্য থেকে কলির মধ্যে আমরা যে যুগক্ষয়ের ভাবনাটুকু পরবর্তীকালে ভেবেছি, তার একটা অস্পষ্ট উচ্চারণ এই ঐতরেয়-শ্লোকের মধ্যে আছে।

ঐতরেয়-এর গাথা-শ্লোক বলছে — যে কেবলই উদ্যোগহীনভাবে শুয়ে আছে, সেটাই কলি, যে শয্যালস্য ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করছে, সে হল দ্বাপর, যে সত্যিই উঠে দাঁড়াল, সে হল ত্রেতা, আর উঠে দাঁড়িয়ে যে নিরলসভাবে চলছে সে হচ্ছে কৃত — উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্। সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর থেকে চরম বোধদায়ক কোনো শ্লোক যে সেই প্রাচীনকালে উচ্চারিত হয়নি, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। সমৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য যে বিরামহীন উদ্যোগ লাগে কৃতযুগ তারই প্রতীক আর কলি হল অলস অবসাদগ্রস্ত এক চিরন্তনী মায়ানিদ্রা যা অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই গাথা-শ্লোকের মধ্যে অন্যতর যদি কোনো গূঢ়ার্থ থাকে, তবে তা পরে বিচার করব, এখন এইটুকু দিয়েই শুরু করতে চাই যে, কলি এখানে স্পষ্টত যুগ বা কালসমষ্টি হিসেবে নির্ধারিত নয় বটে, এমনকি পরবর্তীকালের মহাভারত এবং কিছু পুরাণও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট বিশেষার্থে কৃত-ত্রেতা-কলির ব্যবহার করেছে, কিন্তু সে একেবারেই বিশেষ অর্থ। বরঞ্চ বলা উচিত — কলি-শব্দটার মধ্যে যে-অবক্ষয় এবং অন্যায়ের সূচনা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যেও সূত্রিত থেকে গেছে, সেই অবক্ষয়ের চেতনাটাই বেশি করে পৌরাণিকদের মনে কাজ করেছে — আমরা যদিও সেই অবক্ষয়ের মধ্যেই সভ্যতার গতিপরিবর্তনের ইঙ্গিত পেয়েছি, সে-পরিবর্তন ভালো না মন্দ — সেটা অন্যতর বিচার, কিন্তু সেটা প্রাচীন মধ্য অথবা মধ্য থেকে আধুনিক যুগের আরম্ভ সূচনা করে।

৩.

মহাভারত এবং পুরাণগুলি কলিকালে যে-সব অন্যায়-অধর্ম ঘটবে বলে বলেছেন, তার একটা বিবরণ নিবদ্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে আমি আধুনিক ঐতিহাসিকের সমাজ-চেতনার অংশটুকুও এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। কলিকালের বৈশিষ্ট্য দেখাবার সময় মহাভারত এবং পুরাণগুলি যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে, তার মধ্যে বেশ কিছু তথ্য আছে, যেগুলি তৎকালীন বিশ্বাসের কথা। ভাবটা এই যেন — ভীষণ অন্যায় এবং অধর্মময় কলিকালে কতগুলি অদ্ভুত জিনিস ঘটবে। সমস্ত পুরাণ, এমনকী মহাভারতেও এগুলি এক ধরনের 'স্টক্‌' ভবিষ্যদ্‌বাণী — যেমন কলিকাল উপস্থিত হলে গোরুগুলির দুধ কমে যাবে, অর্থাৎ পেলে-পুষে গোরু বড় করলাম, কিন্তু সে দুধ দেবে কম — অল্পক্ষীরাস্তথা গাবো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে। এটা মহাভারতের শ্লোক, কিন্তু এই বিশ্বাসের কথাটাই বিষ্ণুপুরাণ ঘুরিয়ে বলেছে — কলিকালে ধানগুলো সব আকারে ছোট হয়ে আসবে, আর গোরু দুধ দেবে ছাগীর মতো — অণুপ্রায়াণি ধান্যানি, অজাপ্রায়ং তথা পয়ঃ। কথাটা প্রায় একই শব্দে ভাগবত পুরাণও বলেছে — ছোট্ট ছোট্ট ধান আর ছাগীর মতো গরুর দুধ দেওয়া। আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজে এই দুর্ভাবনা নিছকই ধর্মের আতঙ্কজাত। এই বিশ্বাসের কথাটুকু ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে আতঙ্কটুকু বোঝা যায়। পশুপালনধর্মী আর্যরা তথাকথিত অনার্যদের কাছ থেকে কৃষিকর্ম শিখে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এখানে সেই আতঙ্কটুকুই প্রকাশ পেয়েছে যখন কৃষিকর্ম বা গো-প্রজননকর্মের দুষ্প্রয়োগে ধান ছোট হয়েছে অথবা গোরুর দুধ কমেছে।

এমনিতর আতঙ্কের মধ্যে যা কিছু প্রাচীনেরা চোখে দেখে ভয় পেয়েছেন, প্রকৃতির যে কোনো বিপর্যয় তাঁদের বিপর্যস্ত করেছে, সেগুলি সব তাঁরা চাপিয়ে দিয়েছেন কলিকালের মাথায়। যেমন ধরুন, কলিকালের আকাশে মেঘ ডাকবে প্রচুর কিন্তু তাতে বৃষ্টির জল থাকবে কম, বিদ্যুৎ চমকাবে বেশি, প্রচুর কষ্ট করে বহু বীজ পুঁতে চাষ করা হলেও শস্য হবে কম। বছরের পর বছর অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ছয় ঋতুর নানান বিপরিবর্তন, ফল-ফুলের অভাব, পত্র-পুষ্পহীন শুষ্ক-রুক্ষ বৃক্ষসম্পদ, খাদ্যশস্যের অভাব, অতিরিক্ত রোগব্যাধি — এগুলি সবই সেই আরোপিত আতঙ্কজ কলিধর্ম, যা প্রাচীন পুরুষেরা দেখেছেন বা যে-সব বিপর্যয় থেকে তাঁরা কষ্ট পেয়েছেন। আসলে এ-সব একেবারে সাধারণ ভবিষ্যদ্‌বাণী, কিন্তু এই সামান্য বর্ণনার মধ্যেই একটি বিশেষ প্রাচীন পুরাণ যখন বলবে — কলিকালের দুর্ভিক্ষ, রাজকর আর ব্যাধি-পীড়ায় জর্জরিত হয়ে মানুষ সেই সব দেশে গিয়ে বাস করতে থাকবে, যেখানে খাবার-দাবার অধম প্রকৃতির এবং সেখানকার মানুষেরা 'গবেধুক' ধানের চাল খায় — গবেধুক-কদন্নাদ্যান্‌ দেশান্‌ যাস্যন্তি দুঃখিতা — তখন বুঝতে হবে — আর্যরা উত্তর-ভারতের ব্রহ্মাবর্তের গণ্ডী ছেড়ে এই সময়ে দক্ষিণ-ভারতে ঢুকে পড়েছেন, যেখানে খাদ্য চালের গুণমান ভালো নয়। অর্থাৎ বাংলায় যাকে গড়গড়া দে-ধান বলে সেই জাতীয় বড়-বড় গড়গড়া চালের ভাত হয় সেখানে। এই ভাত তাঁরা খেতে পছন্দ করেননি বলেই কলিকালের কপালে সেই ভাত জুটেছে।

সাধারণ এই সব প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবর্তন ছাড়াও আর একটা কথা খুব শোনা যাবে এবং সেটা হল — মানুষ সত্যযুগে অনেক লম্বা ছিল, কলিকালে সব বেঁটে হয়ে যাবে। লম্বা হওয়া অথবা বেঁটে হয়ে যাওয়াটা কালের গতির ওপর কতটা নির্ভর করে, এটা

তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করা খুব কঠিন, কিন্তু এটা যে ভয়ংকর একটা বিশ্বাস, সেটা খুব ভালো করে পাওয়া যাবে দুটি ঘটনার মধ্যে। প্রথম ঘটনা — কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামের বিবাহে। বলরাম-পত্নী রেবতীর পিতা রৈবত ককুদ্মী পূর্বকালে মেয়ের উপযুক্ত পাত্র খোঁজার জন্য ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মার পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন। সেখানে গন্ধর্বরা গান গাইছিল। গানের সুরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রৈবত-ককুদ্মীর চতুর্যুগ কেটে গেল। পৃথিবীতে নেমে এসে তিনি দেখলেন — মানুষগুলো সব কেমন বেঁটে হয়ে গেছে, তাদের তেজ-বীর্য-শক্তি আর আগের মতো নেই — দদর্শ হ্রস্বান্‌ পুরুষান্‌ অশেষান্‌/অল্পৌজসঃ স্বল্পবিবেকবীর্যান্‌। ঠিক একইরকম কথা আছে মুচুকুন্দ-রাজার মুখে। তিনি ত্রেতাযুগ থেকে ঘুমিয়ে উঠে নিজের নেত্রবহ্নিতে কালযবনকে সংহার করার পর দেখলেন — বেঁটেখাটো মানুষে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেছে, আগের মতো আর কিছু নেই।

'কালযবন' কথাটা শুনেই তো সাহেব-গবেষকরা এর মধ্যে বহুতর কূটতত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছেন। হিল্‌টেবেইটল নামে এক প্রসিদ্ধ গবেষক তো বলে দিয়েছেন — কৃষ্ণের সঙ্গে কালযবনের সংগ্রাম আসলে 'a confrontation of cosmologies'.

আমরা এত বড় কথা বলি না। আমরা বুঝি — সভ্যতার মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। কৃষি, কর্মান্ত, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র — সর্বত্র এমন একটা পরিবর্তন আছড়ে পড়েছিল সেই পূর্বকালে যাতে স্থবির-বৃদ্ধ রৈবত-ককুদ্মী অথবা ত্রেতা-যুগ থেকে ঘুমিয়ে থাকা মুচুকুন্দ হঠাৎ এই তরুণী পৃথিবীকে দেখে আমাদের বৃদ্ধকুলের মতোই বলে ফেলেছিলেন — কোনো কিছু আর আগের মতো নেই — সেই উৎসাহ, সেই শক্তি, যা আমাদের কালে ছিল, সে-সব এখন কোথায়! একই কথা মহাভারতের কলিধর্ম-বর্ণনাতেও — মানুষের আয়ু অল্প, শক্তি অল্প, শরীর হ্রস্ব এবং তাদের উৎসাহ-উদ্যোগ-প্রাণশক্তিও অল্প — অল্পসারা অল্পদেহাশ্চ... স্বল্পবীর্যপরাক্রমাঃ। আসলে এ হল সেই স্থবির বৃদ্ধ পুরাকাল-পুরুষ, যে সবসময় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পুরুষের শক্তি, প্রাণ এবং প্রেমে সন্দেহ করেছে —

পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিল, নেই; — বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায়; মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায়; তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়!
আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চলেছি!

মহাভারতের ক্রান্তদর্শী কবি বরং যে-কথাটা জননী সত্যবতীকে বলেছিলেন — সুখের সময় চলে গেছে, মা — অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ — সামনে বড় খারাপ সময় আসছে। পৃথিবী তার যৌবন হারিয়েছে আমাদের কাছে —ঋঃ ঋঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ...পৃথিবী গতযৌবনা — আমাদের ধারণা — স্থবিরজনের কাছে এই পাপিষ্ঠ ভবিষ্যদ্‌-ভাবনাই কলিকালের মানুষের ওপর বর্তেছে — তার প্রাণশক্তি কম, আয়ু কম, শক্তি কম — এত সব অভিশাপ।

এই সাধারণ দুর্ভাবনাগুলি বাদ দিলে আর যত আরোপ এবং অধ্যাক্ষেপ আছে কলিকালের ওপর, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সামাজিক, পারিবারিক, নৈতিক এমনকি বৈশিক পরিবর্তনও ঘটছে — প্রাচীনযুগের অবসানে এবং প্রাচীনের তুলনায় ইতিহাস নতুন যুগে প্রবেশ করছে। নতুন যুগ অথবা মধ্যযুগ কথাটা খুব

অস্পষ্ট। আরো স্পষ্ট করতে হলে আগে জানা দরকার, এই নতুন যুগটা অর্থাৎ কলিযুগটা পড়ছে কখন? সেটা স্পষ্ট হলে রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের সময়টাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমরা প্রথমে যে-উপাখ্যান দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পাণ্ডব-পিতামহদের নাতি পরীক্ষিৎ যখন সিংহাসনে বসেছেন, তখনই কলির প্রবেশ ঘটছে। কিন্তু এ-বিষয়েও পৌরাণিক পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। পণ্ডিতদের একাংশ, পৌরাণিকদের মত মেনে বলেছেন — ভগবান কৃষ্ণ যেদিন ধরাধাম ছেড়ে চলে গেলেন, ঠিক সেইদিন থেকেই কলিযুগের আরম্ভ — যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাত স্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগং...।। অন্য পণ্ডিতেরা আবার বলেছেন যে, মহাভারতের সেই ভয়ংকর যুদ্ধ থেকেই কলিযুগেরই প্রবৃত্তি ঘটেছে, কারণ ওই যুদ্ধটাই হয়েছিল কলি আর দ্বাপরের সন্ধিলগ্নে — অন্তরে চৈব সংপ্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ। সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং... । যুগপুরাণ মন্তব্য করেছে — মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী যেদিন শরীর এলিয়ে নুয়ে পড়লেন মরণের কোলে, সেদিন থেকে কলিযুগের শুরু। এই সব তথ্যের ওপরে আছে আর্যভট্ট এবং বরাহমিহিরের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বদের অঙ্ক-গণনা।

আমরা যা বুঝি — একেবারে সঠিক করে কলিযুগের আরম্ভকাল নির্ণয় করা খুব কঠিন। কারো মতে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০১২ শতকে কলিযুগ আরম্ভ, কারো মতে খ্রিষ্টজন্মের ২৫০০ বছর আগে এবং কারো মতে খ্রিষ্টপূর্ব উনিশ শতকে কলিযুগের আরম্ভ। ঐতিহাসিকেরা বেশির ভাগই বিভিন্ন পুরাণের সেই ঐতিহাসিক উক্তি মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ পাণ্ডব-বংশধর পরীক্ষিৎ এবং খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মহাপদ্ম নন্দ — এই দুই জনের সময়ের ফারাক হল ১৫০০ বছর — জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্। তার মানে যে কোনো একটা বৃহৎ বিপর্যয়ই যদি কলির আরম্ভ সূচনা করে থাকে — সে মহাভারতের যুদ্ধই হোক, কৃষ্ণের লীলা-সংবরণ-কালই হোক অথবা দ্রৌপদীর পতন — তা কোনোভাবেই খ্রিষ্টপূর্ব উনিশ শতকের খুব আগে যাবে না, বড়জোর খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বছর। সময়টা এইভাবে যদি মোটামুটি স্থির করে নেওয়া যায় এবং তার পরে মহাভারত এবং পুরাণগুলির সময়কাল ভেবে নিয়ে সেখানে বলা কলিধর্মের বিচার করা যায়, তা হলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে আমরা ইতিহাসের দৃষ্টিতে যে-সময়টাকে প্রাচীন যুগ বলছি, পুরাণগুলি সেই যুগারম্ভের ওপরেই কলিধর্ম চাপিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমেই যদি রাষ্ট্র এবং রাজা-রাজড়ার কথায় আসি, তা হলে মহাভারতের কথাই আগে বলতে হয়। মহাভারত বলছে — কলিযুগে বহু জায়গাতেই ম্লেচ্ছদের রাজা হতে দেখা যাবে — বহবো ম্লেচ্ছরাজানঃ পৃথিব্যাং মনুজাধিপ। মহাভারতকার এই ম্লেচ্ছ রাজাদের জাতিনাম কীর্তন করেছেন — এঁরা নাকি আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিক, শূর এবং আভীর। লক্ষণীয় বিষয় হল — মহাভারত কলিযুগের রাজা হিসেবে যে জাতি-নামগুলি করেছেন, এইসব জনজাতি বা গোষ্ঠী মহাভারতের আমলেই ছিল, বড়জোর বলা যেতে পারে, আর্যভূখণ্ডের হৃদয়ভূমি ব্রহ্মাবর্ত থেকে হস্তিনাপুর পর্যন্ত যার ভৌগোলিক অবস্থান, সেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বিপর্যয়ের পর পরীক্ষিৎ রাজা হয়েও পুরাতন প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রভাব তেমন বিস্তার করতে পারেননি। ফলে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত দেশগুলিতে — সেটা দক্ষিণ-দেশেই হোক অথবা

পশ্চিমে, অথবা সুদূর উত্তর-পশ্চিমে — যে-সব জনগোষ্ঠী ছিল তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ছিল।

আন্ধ্র জন-জাতির কথাই ধরা যাক। এরা মহাভারতে নতুন কোনো জনগোষ্ঠী নয় যে কলিযুগে আলাদা করে তাদের জন্মাতে হবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যা নাকি খোদ বেদগ্রন্থের অব্যবহিত পরে লেখা এবং মহাভারতের চাইতে যা নাকি অনেক আগে লেখা, সেখানে পর্যন্ত দস্যুভাবে আন্ধ্রদের উল্লেখ আছে। মহাভারত অন্যত্র এই জনজাতিকে দক্ষিণদেশের অসভ্য অনাচারী বর্বর জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখ করেছে এবং ওই আন্ধ্রদের সগোত্রীয় দক্ষিণদেশী অন্য জনজাতিরা হল — পুলিন্দ, শবর, গুহ, চুচুক, মদ্রক। তথাকথিত আর্যভূমির বাইরে বিন্ধ্যপর্বতের আশেপাশে পুলিন্দদের বাস ছিল। মধ্যম পাণ্ডব ভীম পুলিন্দদের দিগ্‌বিজয়ের সময় হারিয়ে দিলেও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বসতিস্থান পুলিন্দনগরের খবর পাচ্ছি আমরা। সবচেয়ে বড় কথা — সেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুলিন্দ জন-জাতিরও উল্লেখ পাচ্ছি এবং তারা মহাভারতের যুদ্ধে দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীতে স্থানও করে নিয়েছিল, ঠিক যেমন আন্ধ্র-জনজাতিও ছিল দুর্যোধনের অনুকূলেই। অতএব এরা আর নতুন করে কলিযুগের উপদ্রব হবে কী করে?

এরা ছাড়াও কলিযুগের রাজাদের মধ্যে যে-সব যবন, শক, বাহ্লিক, কাম্বোজদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অনেকেরই বসতি ছিল বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। এখনকার আফগানিস্তান, ইরান-পাকিস্তানের সীমান্তদেশ, উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়া এবং গ্রিস-এর নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে আসা শক-হূন-যবনদের প্রতিপত্তির কথাও কিছু কম নেই মহাভারতে। এই উপজাতীয় গোষ্ঠীর নায়কেরা অনেকেই মহাভারতের বিরাট যুদ্ধের সময় কৌরব-পক্ষে দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। 'মার্সেনারি' সৈন্য বলতে যা বোঝায় — তেমনটা এই সব উপজাতীয় গোষ্ঠীর কাছে খুব সহজলভ্য ছিল। মহাভারতের প্রধান পুরুবংশের শাসন-অধিকার চলবার সময় তাঁদের দাপটে ভারতবর্ষের প্রত্যন্তদেশীয় উপজাতিগুলি স্বাভাবিক কারণেই প্রশমিত এবং দমিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষিৎ এবং তাঁর ছেলে জনমেজয়ের স্বর্গারোহণের পর সরস্বতী-নদীর তীর থেকে গঙ্গাতীরবর্তী যে-ভূমিখণ্ড প্রসিদ্ধ কৌরব-পাণ্ডবের অধিকারে ছিল, তার একতা নষ্ট হয়ে যায়। উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথের ছোট্ট-ছোট্ট সামন্ত রাজারা — যাঁদের অনেক সময়েই অনার্য-সংস্কৃতির প্রতিভূ মনে করা হয়, তাঁদের পরস্পর-বিশ্লিষ্ট উত্থান ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে।

আমরা জানি — বিম্বিসার-অশোকের দেশে রাজনৈতিক একতার একটা সূত্র তৈরি হয়েছিল অবশ্যই — যা পরে সুপ্রসিদ্ধ নন্দ রাজাদের আমলে এবং বিশেষত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে অনেকটাই দৃঢ় হয়ে ওঠে, যদিও সেই একতা গড়ে উঠেছিল প্রধানত পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ম্যাসিডনের রাজপুত্র আলেকজান্ডারের সময়ে উত্তর-ভারতে আমরা যে-রাজনৈতিক খণ্ডতা দেখেছি, এই খণ্ড রাজনীতি চলছিল বহুদিন ধরে এবং দক্ষিণাপথে আন্ধ্র তথা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর যে প্রতাপ-প্রভাব বেড়েছিল, তাও ইতিহাসের প্রমাণেই স্বীকৃত। মহাভারতে কলিধর্ম-বর্ণনায় ম্লেচ্ছরাজা বলে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হয়তো চিরন্তন-ঘৃণাকলুষিত জাতি-নাম, কিন্তু তাঁরা যে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই জায়গাতেই প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে-কথা মহাভারতেই অন্যত্র আছে। শক্তিশালী এবং প্রসিদ্ধ রাজাদের আমলে প্রত্যন্তদেশীয় এই-সব জনগোষ্ঠী যে দমিত এবং প্রশমিত ছিল সে-কথা বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে লেখা হয়েছে সর্বভূতোৎপত্তি-কথনের প্রসঙ্গে।

যে-কোনো ক্ষুদ্র রাজশক্তিও একদিনে বেড়ে ওঠে না, সেটাই স্বাভাবিক এবং সে-কথা মাথায় রেখেই মহাভারত বলেছে — ত্রেতাযুগ থেকেই এই-সব প্রত্যন্ত ম্লেচ্ছরাজারা শক্তিসঞ্চয় করছিল — ত্রেতা প্রভৃতি বর্ধন্তে তে জনা ভরতর্ষভ। 'তে জনা' মানে সেই সব রাজারা। তাঁরা কারা? তার মধ্যে দক্ষিণাপথজন্মা আন্ধ্রক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক এবং মদ্রকেরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন উত্তরাপথের অনার্যনামাঙ্কিত জনগোষ্ঠী—যৌন-কাম্বোজ-গান্ধারাঃ কিরাতা বর্বরৈ সহ। লক্ষণীয়, যে-গান্ধারে ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী জন্মেছিলেন, সেই গান্ধারও ম্লেচ্ছ-বর্বরদের সঙ্গে একত্রে কীর্তিত হয়েছে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রাচীন ইতিহাসচর্চার প্রমাণে বলা যায় যে, ৭৭৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫৪৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত গান্ধারে যে ভাব-ভাবনা কাজ করেছে, তা ব্রাহ্মণ্য-ভাবধারার বিরোধী ছিল এবং ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি পুক্কুসাতি নামে যে রাজা ছিলেন, তাঁর সঙ্গে মাগধ নৃপতি বিম্বিসারের চিঠি চালাচালি হয়েছিল বটে একবার, কিন্তু তিনি অবন্তীরাজ্যের রাজা প্রদ্যোতকে হারিয়ে দিয়েছিলেন।

তৎকালীন গান্ধার রাজ্যের মধ্যে আমাদের কাশ্মীর উপত্যকা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তার মধ্যে তক্ষশিলা নগরীও ছিল অন্যতম জনপদ। কাম্বোজ ছিল একেবারেই লাগোয়া জনপদ। পাণ্ডব-বংশধর পারীক্ষিত জনমেজয়, তক্ষশিলা-আসন্দীবতী নগরীতে তাঁর ভদ্রাসন স্থাপন করেছিলেন — মহাভারতে তার প্রমাণ আছে এবং ওই যে পুক্কুসাতির কথা বললাম, তিনি বিম্বিসারের সমসাময়িক হলেও 'পাণ্ডব' নামে কোনো পাণ্ডব-ধুরন্ধর তখনো পাঞ্জাব-কাশ্মীর অঞ্চলে শক্তিমান ছিলেন এবং পুক্কুসাতি সেই পাণ্ডবের কাছে যে নিজের রাজ্যেই পরাভূত হয়েছিলেন — সে-কথা বলেছেন টলেমি। হয়তো তখনো রাজা জনমেজয়ের বংশবীজ কিছু ছিল পাঞ্জাব-কাশ্মীরের ভূখণ্ডে, কিন্তু সে-সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষেই পারস্য নৃপতি দারায়ুসের উত্থান ঘটে গান্ধারে এবং তাঁর বহিস্তান শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর আগেও গান্ধার ভারতবর্ষীয় আর্যগোষ্ঠীর অধিকার অতিক্রম করেছিল।

গান্ধারের কথা এইজন্য বেশি করে বললাম যাতে ইতিহাসের প্রমাণটা বোঝা যায়। যাতে বোঝা যায় — মহাভারতে কলিকালের নৃপতি বলতে যাঁদের বোঝানো হয়েছে, তাঁরা কেউ ইতিহাস-বহির্ভূত নন। উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথের আর্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির নাম করে মহাভারত বলেছে — এই সমস্ত পাপী লোকেরাই — সত্যযুগে যাদের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না — তারাই কলিযুগে চড়ে বেড়াবে পৃথিবীর সব জায়গায় — এতে পাপকৃতস্তাত চরন্তি পৃথিবীমিমাম্। লক্ষণীয় ব্যাপার হল — মহাভারতের কবি শাসক-দলের কথায় আন্ধ্র-পুলিন্দ, গান্ধার-কাম্বোজীয়দের শাসক হিসেবে উত্থানের কথা বললেও শূদ্রদের রাজকীয় শাসন এবং প্রতিপত্তির কথা তেমন করে বলেননি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র —এই বর্ণ-ব্যবস্থায় একটা প্রতিকূল বিপরিবর্তনের কথা মহাভারতের কলিধর্মে বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু শূদ্ররা রাজ্যশাসন করছেন, এ-কথা স্পষ্ট করে বলছে না মহাভারত।

ভাষায় এই ভাব-ভঙ্গি থেকে বুঝি — মহাভারতের অন্তর্গত কলিধর্ম যখন লেখা হয়েছে, তখনো হয়তো ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে কোনো শূদ্র রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়নি, তখনো হয়তো বিভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজবংশের তেমন অবলুপ্তি ঘটেনি, শুধু ভারতবর্ষের প্রত্যন্তপ্রদেশে তথাকথিত অনার্য জনজাতির প্রভাব বাড়ছিল। কিন্তু মহাভারতের এই জায়গা থেকে বায়ুপুরাণের কালিক অবস্থানে নেমে আসুন, দেখবেন, অসাধারণ একটি ঐতিহাসিক সংবাদ

পাওয়া যাচ্ছে। বলা হচ্ছে — কলিকালে শূদ্ররাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজা হবে — রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠাঃ পাষণ্ডানাং প্রবর্তকাঃ অর্থাৎ কলিকালে শূদ্র রাজাদের রমরমা বাড়বে, তাই শুধু নয়, তাঁরা পাষণ্ড-মতের সমর্থক হবেন।

ঐতিহ্যধারী ব্রাহ্মণতন্ত্র, বৌদ্ধ-জৈনদের ধর্মমতকে চিরকাল পাষণ্ডদের মত বলে চিহ্নিত করেছে। বহু জায়গায় বৌদ্ধদের কথা বলতে গিয়ে 'পাষণ্ড' অথবা 'পাষণ্ডী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এবং দর্শনগ্রন্থে। পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিকদের সমস্ত প্রমাণ একত্র করলে দেখা যাবে যে, নৃপতি বিম্বিসার যদিও শৈশুনাগ বংশের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা, তবুও তিনি যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা মনে হয় না। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি পিতা কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপাধির প্রসঙ্গে তাঁর জাতি প্রমাণ হয়। তিনি নিজেকে শ্রেণিক (বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে 'সেনীয়'=শ্রেণিক) বলে পরিচয় দিয়েছেন বলে আমাদের ধারণা, তিনি বৈশ্যজাতীয় ছিলেন। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের রাজপরম্পরা সেই আমলেই লুপ্ত হয়ে গেছে। তাতেও বোধহয় কিছু আসত-যেত না, কিন্তু তিনি নিজে বুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক ছিলেন বলেই পৌরাণিকেরা যেমন বিম্বিসারকে কলিযুগীয় নৃপতিদের মধ্যে চিহ্নিত করেছেন, তেমনই বিম্বিসার থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কালে মহারাজ অশোকও বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজপোষণ অবাধে উন্মুক্ত করায় পুরাণ সামগ্রিকভাবে বলেছে, কলিকালের রাজারা পাষণ্ডমতের (বৌদ্ধমতের) প্রবর্তক হবেন — পাষণ্ডানাং প্রবর্তকাঃ।

বিম্বিসারের পর শৈশুনাগ বংশের শাসন আরো কিছুদিন চলেছিল বটে, কিন্তু সে-বংশ মহাপদ্ম নন্দের আমলে উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পৌরাণিকেরা শৈশুনাগ বংশের রাজাদের 'ক্ষত্রবন্ধু' বলেছেন। ক্ষত্রবন্ধু মানে ক্ষত্রিয়ের জাতটুকু আছে, আচার নেই। এদেরই শেষ বংশধরের শূদ্রা স্ত্রী যিনি ছিলেন, গ্রিক ঐতিহাসিক কার্টিয়াস বলেছেন — সেই রানির সঙ্গে প্রণয় হয় এক নাপিতের এবং সেই নাপিতের ঔরসে রানির গর্ভে জন্মান মহাপদ্ম নন্দ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারক-বাহক পুরাণগুলি মহাপদ্ম নন্দের মতো শূদ্র নৃপতির উত্থানে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তার ফলে সমস্ত কলিকালের হলাহল নিক্ষেপ করেছেন নন্দ-রাজার ওপরে। তাঁরা বলেছেন — শূদ্রার গর্ভজাত মহাপদ্ম এর পরে রাজা হবেন এবং তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশ উচ্ছেদ করে দেবেন ক্ষত্রান্তক পরশুরামের মতো। তিনি অতি লোভী রাজা — শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো' অতিলুব্ধো মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরো' অখিল-ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা।

এই যে নন্দরাজবংশ শুরু হল, এই সময় থেকেই শূদ্ররাই সব রাজা হবেন, যত দিন না ব্রাহ্মণ কৌটিল্য এসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সিংহাসনে বসাচ্ছেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও যে খুব এক জন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন তা নয়, কিন্তু তবু ব্রাহ্মণ কৌটিল্য যেহেতু রাজকর্তা হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন জারি করেছিলেন, তাই তাঁর ওপরে কিছু দুর্বলতা আছে পৌরাণিকদের। বিশেষ দু-একটি পুরাণ শূদ্র নন্দরাজবংশের সমসাময়িক অন্ধ্র, পুলিন্দ, যবন, শকদের রাজবংশের বর্ণনা করে সক্ষোভে বলেছেন — এই চলবে কলিকালে। এই সব ব্রাত্য শূদ্র, ম্লেচ্ছ, যবনেরাই পৃথিবীর শাসক হবে এই সময়ে — এতে চ তুল্যকালাঃ সর্বে পৃথিব্যাং ভূভৃতো ভবিষ্যন্তি।

পুরাণকারেরা এবং মহাভারত যেভাবে কলিকালের রাজকুল এবং কলিধর্মের বিবরণ দিয়েছেন, তাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মোটামুটি পরীক্ষিৎ-জনমেজয়ের পর থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণে এবং পশ্চিম-উত্তরে তথাকথিত অনার্য জনজাতির প্রত্যুত্থান এবং তার

পরে নন্দরাজবংশের রাজত্বকালে উত্তর-পূর্ব ভূখণ্ডে শূদ্র নরপতিদের সার্বভৌম শক্তিই কলিকালের প্রথম সূচক হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষত রাজশক্তি শূদ্র রাজাদের করতলগত হওয়ায় সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থার বিপুল ব্যতিক্রম এবং মিশ্রণ তৈরি হয়েছিল। রাজশক্তি শূদ্রের হাতে থাকায় সমাজে শূদ্র জনজাতিরও প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি বাড়ছিল। শূদ্রদের এই প্রতিপত্তি কতটা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, সে-কথা মহাভারতে এবং পুরাণের ক্রমিক কলিধর্ম-বিচারেও প্রমাণিত হবে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের অন্ত্যবর্ণের মানসিকতা কীভাবে পালটে যায়, মহাভারত তার সূত্র-মাত্র করেছে — কিন্তু শূদ্র জনজাতির কেউ তখনো বোধহয় রাজা হিসেবে আসেননি।

মহাভারতে যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে, শূদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকের হাতেই টাকা-পয়সা আসছিল। ইতঃপূর্বে যাঁদের তিন বর্ণের সেবায় দিন কাটাতে হয়েছে, 'দাস' শব্দটি যাঁদের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত ছিল, তাঁরা অনেকেই বৈশ্য-বণিকের কর্ম গ্রহণ করায় তাঁদের হাতে টাকা আসছিল। মহাভারত বলেছে — ব্রাহ্মণরা সব শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করবে কলিকালে আর শূদ্রেরা সব টাকা উপায় করবে — ব্রাহ্মণা শূদ্রকর্মানন্তথা শূদ্রা ধনার্জকাঃ। আমাদের ধারণা — এর থেকেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক আছে মহাভারতে এবং সেই শ্লোকটি, সব সংস্করণে দেখিনি, তবে পুণা থেকে বেরোনো 'ক্রিটিকাল এডিশনে' এই শ্লোক থাকায় সমাজের ভাঙন বোঝাতে এই শ্লোকের গুরুত্ব বাড়ে।

বস্তুত ব্রাহ্মণতন্ত্রে এতকাল যে-রাজারা পুষ্ট হতেন, তাঁরা সেকালের সমাজের বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাটা অটুট রাখার চেষ্টা করতেন। স্বয়ং মনু, ক্ষত্রিয় রাজাকে বর্ণ এবং আশ্রমধর্মের শৃঙ্খলার প্রতিভূ হিসেবে দেখেছেন — বর্ণানাম্ আশ্রমানাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ। কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রতাপ এবং তথাকথিত সার্বভৌম ভাবনা ভেঙে যেতেই সমাজের বর্ণব্যবস্থারও বিপর্যয় ঘটেছে। মনু যাকে বলেছিলেন — প্রবর্তেত অধরোত্তরম্ — অর্থাৎ নীচের লোকেরা ওপরে উঠবে, ওপরের লোকেরা নীচে যাবে, মহাভারতের ওই শ্লোকে সেটাই আরো স্পষ্ট হয়ে এই রকম দাঁড়িয়েছে — অন্ত্যা মধ্যা ভবিষ্যন্তি মধ্যাশ্চান্ত্যাবসায়িনঃ। অর্থাৎ যাঁরা একেবারে নিম্নবর্ণের মানুষ ছিলেন, তাঁরা মধ্য অবস্থায় এলেন আর যাঁরা মধ্য অবস্থায় ছিলেন তাঁরা অন্ত্যবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করলেন। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, সমাজের অন্ত্য অথবা শেষ বর্ণ শূদ্রেরা বৈশ্যের কাজকর্ম আরম্ভ করলেন আর বৈশ্যেরা শূদ্রের কাজকর্ম ধরে নিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে এই বিপর্যয়টা আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বৈশ্যরা কৃষি-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে 'আটিজ্যান' শূদ্রদের শিল্পকর্মের দিকে ঝুঁকছিল — শূদ্রবৃত্ত্যা প্রবৎস্যন্তি কারুকর্মোপজীবিনঃ। ঘটনা হচ্ছে — আর্য রাষ্ট্রগুলির একতা ভেঙে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য করার চাহিতে আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ করার দিকে নজর পড়ছিল বেশি। তাই কারুকর্ম বা শিল্পকর্ম নয়, বৈশ্যরা প্রধানত স্ব-স্ব-রাষ্ট্রে, হীন ব্যবসাগুলিও আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করেছিলেন। কেন না তাঁরা পয়সা বোঝেন, নিজের ঘরে পয়সা পেলে পররাষ্ট্রে দৌড়বেন কেন! স্কন্দপুরাণের কলিধর্মে বলা হচ্ছে — বৈশ্যরা তাঁদের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়ে — তেলের ঘানি করবে আর ধান-মাড়াই করবে। 'তৈলকার' অথবা 'তণ্ডুলকার' — এগুলি বড় ব্যবসা নয় বটে এবং সমাজে তা ঘৃণ্যও ছিল খানিকটা। কিন্তু অন্ত্য চাষিদের কাছ থেকে তিল অথবা সরষে একত্রে কিনে নিয়ে এবং অবশ্যই পাকা ধান এক লপ্তে কিনে নিয়ে সেগুলিকে

'প্রসেসিং' করাটা পুরাতন বণিকেরা মর্যাদা দিতেন না বলেই এই নতুন ভাবনা কিন্তু কলিযুগের বিপর্যয়ের মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু রাজশক্তির ডিজ-ইনটিগ্রেশন-এর সঙ্গে-সঙ্গে এই ধরনের আঞ্চলিক ভিত্তিতে ব্যবসা করাটা যে বৈশ্যজাতির পরিবর্তনশীল মানসের পরিচয় দেয়, সে-কথা পৌরাণিকেরা তেমন অনুধাবন করেননি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শূদ্রদের রাজবংশের পরম্পরা নেমে আসলে চরম অবস্থা হয় ব্রাহ্মণদের। এতদিন যাঁরা রাজার কাছে সম্মান পেয়ে এসেছেন, যাগ-যজ্ঞ, শ্রৌত-বৈতানিক কর্মে যাঁদের সম্মান এবং দক্ষিণা বাঁধা ছিল, সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থা বিকল হয়ে যাবার ফলে তাঁদের মধ্যে তো পরিবর্তন আসবেই। বিশেষত নিম্নতর বর্ণের হাতে তখন টাকা-পয়সা আসছে। এই মুহূর্তে বিভূতিভূষণের ইছামতী উপন্যাসে নালু পালের চরিত্র এবং তাঁর ব্যবহার-বিবরণ স্মরণ করলেই পৌরাণিকদের কলিযুগীয় দুর্ভাবনাটুকু বুঝতে পারবেন। কথা হচ্ছে — নালু পাল যেভাবে সমাজে আপন ধনসম্পত্তির জোরে জায়গা করে নিচ্ছে, তার প্রক্রিয়াটা সেইকালেই শুরু হয়েছে। মহাভারত এই প্রক্রিয়ার সূচনা করে বলেছে — কলিযুগে ধন-সম্পত্তির মালিক শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে তাচ্ছিল্যের সম্বোধনে ডেকে বলবে — আরে, আমি এসে গেছি, এই যে বামুন, দুটো কথা আছে তোমার সঙ্গে। প্রত্যুত্তরে বামুন বলবে — বলুন বাবু! কী কথা — ভোবাদিনস্তথা শূদ্রা ব্রাহ্মণাশ্চার্যবাদিনঃ।

পুরাণগুলির মধ্যে বায়ুপুরাণও সূত্রাকারে মহাভারতের শব্দ পুনরাবৃত্তি করে বলেছে যে, ব্রাহ্মণেরা, যিনি যে-অবস্থানেই থাকুন, তাঁরা সকলেই কলিকালে শূদ্রদের মর্যাদা-সম্বোধনে আহ্বান করবেন — শূদ্রাভিবাদিনঃ সর্বে যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ। যদি বা এই কথাটা অতিশয়োক্তিও হয়ে থাকে, তবু শূদ্র জন-জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা যে ওঠা-বসা, মেলা-মেশা অথবা খাওয়া-দাওয়া করবেন — এ আশঙ্কায় মৎস্যপুরাণ এবং বায়ুপুরাণ এক সুরে বলেছে — শূদ্রানামন্ত্যযোনেস্তু সম্বন্ধা ব্রাহ্মণৈঃ সহ। ভবন্তীহ কলৌ তস্মিন্ শয়নাসনভোজনৈঃ।। শূদ্রবর্ণের আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়াল এমনটি হওয়ারই কথা, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু নন্দাদি তথাকথিত শূদ্রেরা রাজপদে অধিষ্ঠিত হলে কী হওয়া সম্ভব, তার একটা সার্থক চিত্র আছে কূর্মপুরাণে এবং তা থেকে বোঝা যায় কূর্মপুরাণের কথক-ঠাকুর শূদ্র রাজাদের অধিষ্ঠান-সময়টাকেই কলিকাল বলে বুঝেছেন।

ব্রাহ্মণেরা ততদিনে বেদ পড়িয়ে অর্থ উপার্জন করার সহজ পন্থা পেয়ে গেছেন অথবা তীর্থক্ষেত্রে নিজেদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে পান্ডার কাজ করতে আরম্ভ করেছেন — বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে তীর্থবিক্রয়িণঃ পরে — এটা হয়তো আরো কিছু পরবর্তী সময়ের ব্রাহ্মণ্য সংকট, কিন্তু শূদ্র রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণদের অবস্থাটা কী, তার সার্থক কলিচিত্র দিয়েছে কূর্মপুরাণ। এই পুরাণ বলেছে — এই কালে অল্পবুদ্ধি সাধারণ লোকেরা যদি ব্রাহ্মণদের উৎকৃষ্ট আসনে বসে গম্ভীর চালে ধর্মোপদেশকের ভূমিকায় দেখত, তবে তারা কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তি ছুড়ে দিত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে — আসনস্থান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা চালয়ন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ। যে-সব শূদ্রেরা রাজার ঘরে কাজ করে তারা রাজশক্তিতে বলবান হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেরও তাড়না করতে ছাড়ে না। এই কলিকালে বিভিন্ন উচ্চাসনে বসবেন শূদ্ররাই এবং ব্রাহ্মণেরা সেখানে চারপাশে সাধারণ আসনে বসে থাকবেন — উচ্চাসনস্থাঃ শূদ্রাশ্চ কলৌ কালবলেন তু। আর এরকম হবেন নাই বা কেন — কূর্মপুরাণ কারণ দেখিয়েই মন্তব্য করছে — কালের গতি এমনই যে, কলিকালে রাজাও তো ব্রাহ্মণদ্বেষী শূদ্র।

অনেকেই মনে করেন — পুরাণগুলির এত সব কলিধর্মবর্ণনা অনেক পরে লেখা হয়েছে, তাই এগুলিকে ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে না দেখাই ভালো। আমরা বলব — পুরাণগুলিও তো সব এককালে লেখা হয়নি, বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে। ফলে পুরাণগুলির সময়ের হিসেব পাওয়া গেলে বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত কলিধর্ম বর্ণনা থেকে সমাজের সার্থক শূদ্রায়ণ এবং ব্রাহ্মণ্যের অবনতি ক্রমিকভাবে ধরা যায়। কূর্মপুরাণের বর্ণনা থেকে বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় — শূদ্রদের ওপরে যে-বাচিক, বৈষয়িক এবং সামাজিক তাড়ন-পীড়ন ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে ঘটত, ব্রাহ্মণরা যেন ঠিক তার উলটো প্রতিক্রিয়াগুলি বর্ণনা করেই তাঁদের কলিধর্মের ব্যবহারগুলি বিবৃত করেছেন। কিন্তু সত্যদৃষ্টি অথবা কবির ক্রান্তদর্শিতা দিয়েই যে পৌরাণিক এমন কলিধর্মের ভবিষ্যৎ বিবরণ লিখেছেন, তা মনে হয় না। তাঁরা যদি সমাজে এই বিপ্রতীপ চিত্র এতটুকুও না দেখে থাকেন, তবে শূদ্রায়ণের 'ব্যুমেরাং'টা এমন সার্থকভাবে দেখানো সম্ভবই হত না। কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত সগন্ধ স্বজাতির এমন অধঃপতন বাস্তব দৃষ্টি ছাড়া লিখতে পারে?

ব্রাহ্মণদের স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন এবং মর্যাদা আস্তে-আস্তে যে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, বহু জায়গা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, কিন্তু রাজশক্তির পরিবর্তনে তাঁদের মধ্যে যে-স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তার চিত্রায়ণটি অসাধারণ ওই ভাবী কলিযুগের বর্ণনায়। বলা হচ্ছে — যাদের বেদবিদ্যার জোর তেমন নেই, এমন হতভাগ্য অল্পশ্রুত ব্রাহ্মণেরা তখন ফুল-মালা, বসন-ভূষণ, আরো নানাবিধ মঙ্গলদ্রব্যে শূদ্রদের পরিচর্যা করবে। এর পরেই সেই দারুণ পঙ্‌ক্তিটি — পুরাতন দুর্ব্যবহার কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দেবার প্রসঙ্গ। পুরাণ বলছে — এত ফুল-চন্দন-মাঙ্গলিকে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের আরাধনা করলেও রাজবৎ সমাগত শূদ্র সেই ব্রাহ্মণদের দিকে ফিরেও তাকাবে না — ন প্রেক্ষন্তে অর্চিতাশ্চাপি শূদ্রা দ্বিজবরান্ নৃপ। তবুও ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকুলের মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁদের সেবা করার সুযোগ খোঁজেন। শূদ্র অভিজাত পুরুষকে গজ-বাজীর বাহনে যেতে দেখলে ঘিরে ধরেন ব্রাহ্মণেরা, তাঁর কাছে স্তুতি-নতি প্রকাশ করেন — বাহনস্থান্ সমাবৃত্য শূদ্রান্ শূদ্রোপজীবিনঃ।

আসলে এই বিপরীত ব্যবহার খুব অচেনা হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যায় — যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অথবা দান-প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণের আর বৃত্তিলাভ সম্পন্ন হচ্ছিল না, এবং শুধু মগধ নয়, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রেই ব্রাহ্মণ্যবিরোধী ক্ষত্রিয়েতর রাজগোষ্ঠী প্রতিস্থাপিত হওয়ায় তাঁদের জীবনে দুর্দশা কিছু নেমে এসেছিলই। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত নিম্নতর জাতির আত্মলাভও প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণ্যের সুব্যবস্থার অবনতি ডেকে এনেছে এবং এই অবনতিই কলিকাল বলে চিহ্নিত হয়েছে পুরাণে-পুরাণে। পুরাণকারেরা একটা কথা বার-বার বলেছেন যে, বেশ খানিকটা ধনৈশ্বর্য এবং বড় খানিকটা জমি পেলেই সেটা আভিজাত্যের হেতু হয়ে ওঠে কলিকালে। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে — আলেকজান্ডারের আক্রমণকালের আগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমল বাদ দিলে গুপ্তরাজাদের রাজনৈতিক সমৃদ্ধির সময়টুকু কোনোভাবে ধরা যাবে রাজনৈতিক একতার চিহ্ন হিসেবে। তা নইলে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং সামন্ত রাজাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আধিপত্য — সেকালের পরিচিত চেহারা।

এই রাজনৈতিক অবস্থানের নিরিখে যদি সমাজের বিচার করা যায়, তাহলে দেখব, সমাজেও তখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের খানিকটা শিথিলতা এসেছে। বর্ণব্যবস্থায় বর্ণসংকর তো ঘটছিলই, অন্যদিকে

রাস্তাঘাটের উন্নতি এবং টাকা-কড়ির লেন-দেন ভালোভাবে শুরু হওয়ায় নগরায়ণের পথ প্রশস্ত হচ্ছিল।

পৌরাণিকেরা কলিধর্মের বর্ণনায় আরো যে-সব বর্ণনা দিয়েছেন তা বিচার করলে দেখা যাবে সমাজে এমন এক ধরনের আধুনিকতার আবরণ তৈরি হচ্ছিল, যা প্রাচীন ধারণার বাহক এবং ধারক পৌরাণিকদের ভাল লাগেনি। সেই দুর্ভাবনার সব কিছু যে খুব সদর্থকভাবে প্রমাণ করা যায়, তা নয়। তবে আমার অন্তত বেশ মনে হয় — সে-সব ঘটনা পৌরাণিকদের নিজের আমলেই ঘটছিল এবং সেগুলি তাঁরা খুব ভাল চোখে দেখছেন না বলেই কলিধর্মের আরোপ এসেছে সেখানে। তবু বলতে হবে — কোনো সমাজেই শিথিলতা একদিনে আসে না, সমাজ আপন প্রক্রিয়াতেই সে-শিথিলতা তৈরি করে এবং সে-শিথিলতা যদি তৎকালের নায়ক-নেতাদের পছন্দ না হয় তবে তারই মধ্যে নতুন প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়, সমাজ তাতে আবার নতুন বাঁধনে বাঁধা পড়ে। আবারও আসে উদারীকরণ, পুনরায় আবার বন্ধন — এইভাবেই সমাজ চলে। কিন্তু আমি যা দেখেছি, সেই বৈদিক সমাজ থেকে শুরু করে মহাভারতের সমাজ পর্যন্তও যে-উদারতা ছিল, সেই উদারতা শিথিল হতে থাকে শ্রৌত-স্মার্ত-গৃহ্য নিয়মের সংকীর্ণতায়। কিন্তু নন্দ রাজাদের আমলে শূদ্ররাজ সৃষ্টি হবার পর গুপ্ত রাজাদের শাসন পর্যন্ত যে-অন্তবর্তী সময় চলেছে তার যেমন ছায়া পড়েছে মহাভারত এবং প্রাচীন পুরাণগুলির বর্ণনায়, তেমনই পরবর্তী ৯ম, ১০ম কিংবা ১১শ খ্রিষ্টাব্দে রচিত পুরাণগুলির কলিধর্ম বর্ণনায় কলিকালের চেহারা সেই পুরাণের সময় অনুসারেই লিখিত। এর পরে আমরা আর কঠিন কোনো আলোচনায় যাব না, শুধু পুরাণগুলিতে বর্ণিত কলিধর্মের নিরিখে দেখব যে, কলিকালের ধর্মশিথিল প্রক্রিয়া কবে থেকে শুরু হয়েছে।

৪.

পরাশর উবাচ — কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ষের পুরুষের সহবাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তমবর্ষীয়া বালিকারা সন্তানবতী হইবে। কথাটা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি কথা। কেন না প্রথম শ্রেণীতে-পড়া একটি মেয়ের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে-পড়া একটি ছেলের বিবাহ-ঘটনায় পরাশর যে-সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন অলৌকিক বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ছাড়া তা অসম্ভব। মহাভারত বয়সটা একটু বাড়িয়ে সাত/আট বছরের মেয়েদের সঙ্গে দশ/বারো বছরের পুরুষের সংযোগ ঘটিয়ে বদান্যতা দেখালেও টীকাকার নীলকণ্ঠ মূল কথাটি বলে দিয়েছেন — ইঙ্গিতজ্ঞ পণ্ডিতের মতো। তিনি বলেছেন — কলিকালের দিন যত পরিণত হবে, স্ত্রী-পুরুষ তত বেশি জৈব কামনার দাস হয়ে উঠবে — অতিকামাতুরা ইত্যর্থঃ। আসলে সমাজের ব্রাহ্মণ্য-গ্রন্থি যত শিথিল হবে, স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশাও তত বাড়বে আর এই বাড়াবাড়িটা পৌরাণিক সংযমীর পছন্দ হয়নি ইত্যর্থঃ।

উল্লিখিত শ্লোকটি দেখে অনেকেই হয়তো মনে করবেন — ঋষিরা এইরকমই উল্কট কথা বলেছেন বেশি। কিন্তু সত্যি বলব কী, অনেক কথা তাঁদের খেটেও গেছে। যেগুলো খেটেছে, সেগুলো বেশির ভাগই অবশ্য নদী-নালা কিংবা জীবজন্তু বিষয়ক। নদী-নালা শুকিয়ে যাওয়া, কিংবা গোরুর পক্ষে ছাগলের মতো দুধ দেওয়া, প্রজানুরঞ্জনের নামে তথাকথিত রাজাদের প্রজাশোষণ, কিংবা সাধু-সন্তের ভণ্ডামি — এগুলোর মধ্যে কালের প্রভাব পড়েছে সন্দেহ

নেই, কিন্তু নদী আর গোরুর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে আমরা যদি মনে করি মানুষের ক্ষেত্রেও সব মিলে গেছে, তা হলে বিপদ বাড়বে।

পরাশরের মতো এত নিষ্ঠুর বাল্যমিলনে বিশ্বাসী না হলেও মনু মহারাজ তাঁর পুরুষতান্ত্রিকতায় চব্বিশ বছরের ছেলের সঙ্গে আট বছরের মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছেন, অভিজাত পাত্র পেলে ছ-বছরের মেয়েকেও বিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের তো তা হলে বলতে হয় — মনু মহারাজই কলিধর্ম কার্যে পরিণত করেছেন, কারণ কলিকালেই এই রকম গর্ভধরা রমণীর সন্ধান পাওয়া যাবে বলে পুরাণ-মহাভারত জানিয়েছে। কিন্তু বেদ-ব্রাহ্মণ্যের যখন সোনার দিন ছিল, তখন কিন্তু এমন দুর্বিষহ ভাবনা চালু ছিল না। প্রেমে পড়ে বা না পড়ে একশো বছর যার সঙ্গে কাল কাটানোর বাসনা — জীবেমঃ শরদঃ শতম্, পশ্যেমঃ শরদঃ শতম্ — তাঁর চেহারাটি বেশ উচ্চাবচ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা। শতপথ ব্রাহ্মণ তো কোনো ইতস্তত না করে সোজাসুজি বলেছে — মেয়েদের পক্ষে সব চেয়ে প্রশংসনীয় চেহারা হল — পৃথুশ্রোণী, ক্ষীণমধ্যা এবং পীনোন্নত পয়োধরা।

এই চেহারা আমাদের কলিযুগের লোকেদের চেনা, বরঞ্চ সপ্তম-অষ্টম অথবা নবম-দশম বর্ষের যে মুকুলিকা বালিকার বৈবাহিক সম্বন্ধ — যা কলিযুগের অভিশাপ অথচ বিধানদাতা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যদের অভিমত বিবাহ, তাতে মনে হয়, খ্রিষ্টীয় ২/৩ শতক থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় পর্যন্তই কলিকাল চলেছে, আমরা পুনরায় অন্তত ত্রেতাযুগে ঢুকে পড়েছি, কেন না ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিক্রিয়ার চরম সময়েই নিশ্চয়ই শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রশস্ততরা রমণীর বৈবাহিক রূপ কল্পনা করেছে আমাদেরই মতো উচ্চাবচ দৃষ্টিতে। তবে কিনা, বলতে পারেন, — রমণী শরীরের প্রত্যঙ্গ-বন্ধুর এই বিবরণ নিয়ে শতপথ ব্রাহ্মণ আর কলির জীবের বিসংবাদ না থাকলেও বিসংবাদ কি স্ত্রীলোকের আচরণ নিয়েই আছে? কলিধর্মের ঋষি বলেছিলেন — কলিকালে স্ত্রীলোকমাত্রেই সাধারণত স্বেচ্ছাচারিণী হবে, ধর্মের নিয়মে তাদের বিবাহ হবে না এবং দাম্পত্য সম্বন্ধও হবে বিপরীত। স্বেচ্ছাচারিণী মানে নিশ্চয়ই মেয়েরা নিজের ইচ্ছেমতো চলবে। ধর্মের নিয়মে বিবাহ হবে না — মানে, নিশ্চয়ই সেই অসবর্ণ বিবাহ এবং বিপরীত দাম্পত্য — মানে, নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের পৌরুষেয় আচরণ অথবা পুরুষের মাথায় চড়ে বসা।

কলিকালের এই অসবর্ণ তথা অসামাজিক বিয়ে নিয়ে বেশি কথা কী বলব — এর ঐতিহ্য এত পুরনো এবং উদাহরণ এতই বেশি যে, ঋষিরা যাঁরা কলিধর্ম নিরূপণ করেছেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটু আত্মস্থ হলেই আমাদের এই কলি-কলুষ দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনই থাকবে না। স্বেচ্ছাচারিতা এবং তাও আবার মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলেই অসামাজিক অসবর্ণ বিয়ে হয় — এ ধারণাটাও তো নিতান্তই একপেশে। এমনকী ভগবদ্গীতায় কৃপাবিষ্ট অর্জুন পর্যন্ত একই ধারণায় কথা বলেছেন — স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ — অর্থাৎ স্ত্রীলোক যদি দুষ্ট হয়ে ওঠে তবে সমাজে বর্ণসংকর সৃষ্টি হবে। আমরা বুঝি — মেয়েদের মধ্যে যাঁরা একটু স্বাধীনচেতা এবং যাঁরা কিঞ্চিৎ মধুর হাসে মধুর বাসে সরসতা বিতরণ করেন, পৌরাণিকের কলিকালের ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁদেরই ওপর গিয়ে চেপেছে। কিন্তু আমাদের ব্যাসপিতা পরাশর মুনি কি দ্বাপর যুগের মানুষ ছিলেন, নাকি কলিকালের? যে-কালেই হোক সেই প্রাচীনকালে যমুনা পার হবার সময় নৌকার ওপর সত্যবতীর অতুল রূপ দেখে তাঁর যে-অবস্থা হয়েছিল, মহাভারত তার বর্ণনা দিতে গিয়ে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছে, তার অর্থ

করলে সোজাসুজি বোঝা যাবে, পরাশর মুনির মাথা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। আমার ভয় হয় — আজকের এই নরম কলিতে মহর্ষিকে যদি যমুনার বদলে গড়িয়াহাটের মোড় পার হতে হত, তা হলে আধুনিক সাজে সজ্জিতা কোনো পৌর-নাগরিকার অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তিনি খড়ম পিছলে পড়ে যেতেন, দ্বিতীয় দফায় বিষ্ণুপুরাণের 'কলিধর্মনিরূপণ' অধ্যায়টি ছিঁড়ে নিয়ে সেই ললনার পায়ে তিলাঞ্জলি রচনা করে কালিদাসের শিবের মতো বলতেন — অদ্য প্রভৃত্যেবাবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ।

অবশ্য আধুনিক স্বেচ্ছাচারিণীরা মহর্ষিকে কতদূর সহ্য করতেন, তাই নিয়ে একটা সন্দেহ করা চলে, কারণ এঁরা তো তপস্যার প্রভাব জানেন না, আর অভিশাপের ভয়ও তেমন নেই। মহাভারতে দেখছি — সত্যবতী নাকি মুনির বাচিক তাড়নায় পিতার অনুমতি পর্যন্ত নেবার সময় পাননি। শেষপর্যন্ত মৎস-গন্ধের খোলস ছেড়ে যোজনগন্ধা সত্যবতী মুনির প্রভাবে তাৎক্ষণিক গর্ভমোচন করে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু আমাদের সর্বকালের অভিভাবক মনু-মহারাজ পড়লেন মহাফাঁপরে। তিনি বলেছিলেন — যে-ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধর-রস পান করিয়াছে এবং শয্যায় তাহার নিঃশ্বাস গায়ে লইয়াছে এবং তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছে, তাহার ওই কর্মের নিষ্কৃতি অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান নাই। অর্থাৎ সারা জীবনের মতো তিনি শেষ — মিটে গেল এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেম-তৃষা।

মনু অবশ্য মুনি-ঋষিদের চিরতৃষ্ণার্ত অবস্থা বুঝে সমগ্র ব্রাহ্মণ-জাতিকেই কিছু সুবিধে দিয়েছেন এবং সেটা বেশ একটা ফিকির অথবা কৌশলই বলা চলে। মনু বলেছেন যে, ব্রাহ্মণেরা প্রথমে একটি সবর্ণা ব্রাহ্মণী বিয়ে করে নেবেন, পরে কামবশত যদি আবারও বিয়ে করার ইচ্ছে হয়, তবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র — সব মেয়েই চলবে। মহাভারতের কবি এ-কথা স্পষ্ট করে বলেননি একবারও যে, পিতা পরাশর পূর্বে কোনো ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কলস্বনা যমুনার ওপর কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে নৌকাবিলাসের সময় মৎস্যগন্ধার আতপ্ত নিঃশ্বাস যদি মহর্ষির গায়ে লেগে থাকে, তবু সেটা আমাদের কাছে বড় ভাগ্য, বড় অভ্যুদয় — কেন না মহাভারতের কবি জন্মেছেন। জিজ্ঞাসা হয় — ব্যাস কী কলিকালের গন্ধ গায়ে মেখেই জন্মেছিলেন!

যে-ঘটনা সেদিন ঘটেছিল, সে কি স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতায় ঘটেছিল, নাকি পরাশর মুনির মতো স্বেচ্ছাচারী স্বচ্ছন্দবিহারী পুরুষের পৌরুষেয়তায়? ভাগবত পুরাণ আমাদের মতো কলির জীবদের সচকিত করে বলেছে — ঈশ্বরস্বভাব তেজস্বী পুরুষের কাছে কোনো কিছুই দোষের নয়, আগুনের মতো তাঁরা সমস্ত দোষ ভস্মসাৎ এবং আত্মসাৎ করতে পারেন — তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা। ভাগবত সাবধান করে দিয়ে বলেছে — তাই বলে যেন সাধারণ মানুষ, তুমি-আমি এ-সব করতে না যাই। যদি করি, তা হলে শিব ছাড়া অন্য মানুষ বিষ খেলে যে-গতি হবে, সাধারণেরও সেই অবস্থা হবে। জীবন তবু বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না। সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছাচারে বিপন্ন হয়, কিন্তু তেজস্বী পরাশর, জেলের মেয়ে সত্যবতীর জালে ধরা পড়েন, আর তৎপুত্র ব্যাস নিয়োগের প্রযুক্তিতে রাজরাণী অম্বিকা, অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর জন্ম দিলেন — এটাও তেজস্বী মানুষের কথা। তা হলে কলির ধর্মে বৈবাহিক অথবা দাম্পত্য ব্যবহারে আমরা কী করি!

স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্নে কলিকালের রমণীর কথা এসেছে, কিন্তু সেও তো বুঝি পুরুষেরই

চিরায়ত, এখনো, তখনো। পরাশর মুনি বিষ্ণুপুরাণে নিজের দৃষ্টান্তে পুরুষদের ক্ষমা করে দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার সমস্ত দায় চাপিয়ে গেছেন কলিযুগের মেয়েদের ওপর। কিন্তু সরল সাদাসিধে বৈদিক ঋষিরা, যাঁরা পরাশর-মনু — এঁদেরও অনেক আগের যুগের লোক তাঁরা নির্মল হাস্যে, মেয়েদের মৃদুল-গমনের ছন্দটি মরমী মানুষের মতো ধরে রেখেছেন বৈদিক ছন্দে। 'যুবতী মেয়ের পেছন পেছন যেমন যুবকেরা ঘোরাফেরা করে' — এই ধরনের উপমা যে ঋগ্‌বেদে কত বার আছে, তার ঠিক নেই। এতে সেই যুবতীদের ওপর স্বেচ্ছাচারিতার দায় আসে কি না জানি না, তবে এতগুলি যুবকের পশ্চাৎ-পদচারণার ফলে সেই রমণীদের মনে কোনো আকুল আত্মতৃপ্তিও কি হত না? এখনকার কলিকালের মতোই? যে-সমাজের যুবকদের মনে এত গান, সেখানে যুবতীদের মনেও কি গুনগুন ছিল না কোনো — সমাস্তরাল? দশাঙ্গুলির নিষ্পেষণে সংশোধিত হচ্ছে সোমরস — সেখানে উপমাটি হল — দশটি যুবতী একই সঙ্গে যেমন একটি যুবককে আহ্বান করে। বিশ্বামিত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে নদীগুলি, ঠিক যেমন পুরুষদের দিকে ধাবিত হয় আসঙ্গলিপ্সায়।

এই যে সব ঋক্-মন্ত্র, যেখানে যজ্ঞীয় সোমরস নিষ্পেষণে রমণী-শরীরের উপমা, নদীর স্রোতোগতির মধ্যে যেখানে রমণীয় অভিসারের কথা — এগুলোকে কি স্বেচ্ছাচারিতা বলব, না কি দুই হাতে তালির সেই বিখ্যাত প্রবাদ — যা বড় স্বাভাবিক, এ-কালেও ও-কালেও। আর একটি শব্দ আছে 'সমন'। শব্দটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর বিবাদ আছে, তবু সাধারণ অর্থে এটি এক ধরনের উৎসব, যেখানে সর্বার্থে মেয়েদের আশাপূরণের ইঙ্গিত আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ পিসেলের (Pischel) মতে, সমন একটি জনপ্রিয় সার্বজনীন উৎসব, যেখানে মেয়েরা আসত মনের মানুষ খুঁজতে, যশঃপ্রার্থী কবিরা আসতেন স্বরচিত কবিতা পাঠ করে প্রশংসা কুড়োতে, আর ধনুর্বিদেরা আসতেন লক্ষ্য বিদ্ধ করে পুরস্কার জিততে। এই উৎসবের মেয়াদ থাকত সারা রাত। বায়ুর গতির দ্রুততা বোঝাতে বেদের ঋষি উপমা দিয়েছেন — সমনং ন যোষাঃ — অর্থাৎ যে-গতিতে, যে-দ্রুততায় মেয়েরা সমনে যোগ দিতে যায়। মেয়েদের এইসব তিমিরাভিসারে বৈদিক মায়েদের মদতও কম ছিল না। তাঁরা মোহন সাজে সাজিয়ে দিতেন মেয়েদের, যাতে তারা অভিজাত যুবককে আকর্ষণ করতে পারে।

বৈদিক যুগে এমন আধুনিক চর্চা দেখে তো বেশ মনে হয়, বুঝি তখনই কলিযুগের আরম্ভ হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি পুরাণই বলেছে — কলিযুগে যে-মেয়েদের সোনা-দানা-মণিরত্ন অথবা বস্ত্রালংকার নেই, সেই মেয়েও শুধু তার কেশগুচ্ছে বাহার তুলে নিজেকে অলংকৃত দেখানোর চেষ্টা করবে। কথাটা বোধ হয় পুরাণের থেকেও পুরনো, কেন না মহাভারতও বলেছে — কেশশূলাঃ স্ত্রিয়ো রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে। স্ত্রীলোকের কেশ ব্যাপারটাকে এখানে লজ্জাহীন আকর্ষণী শক্তি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন টীকাকার নীলকণ্ঠ। কিন্তু পুরাণ এবং মহাভারতে এই কেশসজ্জার পারিপাট্যের মধ্যে আমরা কিছু বাস্তব ইতিহাসের গন্ধ পাই। একটা কথা খেয়াল করতে হবে — রমণীর পারিপাট্যের ঘটনাটা কলিযুগের কোনো নতুন বৈশিষ্ট্য নয়, রামায়ণে রামচন্দ্রের মতো সরল ধীর-গম্ভীর নায়ককে পর্যন্ত 'কাকপক্ষ' (জুলফি) ধারণ করে ঘুরতে দেখেছি — কাকপক্ষধরো ধন্বী — সেখানে রমণীরা বিচিত্র কেশসজ্জা করবেন না, এ কেমন কথা!

সত্যি কথা সংক্ষেপে বলি — অতিপ্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে বহুতর কায়দায় রমণীরা

চুলের খোপা বাঁধতেন এবং আমাদের ধারণা, আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর গ্রিকদেশীয় কেশসজ্জাও আমাদের দেশে আমদানি হয়। গান্ধার শিল্পের নরনারীমূর্তিতে যে চুলের বাহার আছে, দিনে-দিনে তা বাস্তবভাবেই রমণীর মস্তকে প্রযুক্ত হতে-হতে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে, সে-কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। আর এটাও ঠিক, যার কিছু নেই, শাড়ি-গয়না, রত্ন-অলঙ্কার কিছুই নেই, সেই রমণী যদি চুলের কায়দা করে কিঞ্চিৎ সম্মোহন তৈরি করে, সে কি কলিকালের দোষ? কালিদাসের পার্বতী যখন — মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং — মুক্তো-সিন্ধুবারে কেশকলাপ সজ্জিত করে শিবের পায়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর মাথা নোয়ানোর আগে তাঁর চুলে গোঁজা কর্ণিকার ফুল, আর কানের পাশে গোঁজা বৃক্ষপল্লব চ্যুত হয়ে পড়েছিল শিবের পায়ে — উমাপি নীলালকমধ্যশোভি/ বিভ্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্/চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন ...

কেশবন্ধন, কেশসজ্জা, এবং কেশ অলংকরণের বিচিত্র উপকরণ নিয়ে যে 'ইন্ডিয়ান কইফিওর' — সেটা শুধু আলেকজান্ডারের সময়ের পরের সমৃদ্ধি, তা ভাবলে ভুল হবে। মহাভারত, রামায়ণ, বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি এবং অবশ্যই অসংখ্য ভাস্কর্য এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেবে, চুলের কায়দা-কেতা এবং পারিপাট্য কলিকালের কোনো আবিষ্কার নয়, এ আমাদের বহু প্রাচীনকালের মন্ত্রণা, এই সাজ প্রায় রমণীর মনের সমবয়সী। কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামাকে মনে আছে তো! তিনি অতিশয় মানিনী ছিলেন। দেবর্ষি নারদ একবার নন্দনের মন্দারমঞ্জরী পারিজাতের একটি গুচ্ছ এনে দিয়েছিলেন কৃষ্ণের পত্নীজ্যেষ্ঠা রুক্মিণীর হাতে। এই পুষ্পস্তবক কৃষ্ণের জীবনে এমনই বিপন্নতা ডেকে এনেছিল, যা বলবার মতো নয়। সত্যভামা এই পারিজাত-গুচ্ছের জন্য প্রায় মরণপণ করেছিলেন। তবে সেখানে উদ্দেশ্য ছিল একটাই, রুক্মিণীকে কৃষ্ণের চোখে খাটো করে দেওয়া। কিন্তু তার জন্য যে উপায় ব্যবহৃত হয়েছিল, তা নিজমুখে বলেছেন সত্যভামা। বলেছিলেন — স্বর্গের নন্দনকানন থেকে ওই পারিজাতের গাছটাই উচ্ছিন্ন করে এনে পুঁতে দিতে হবে দ্বারকায়। আমি ওই পারিজাত ফুল খোপায় গুঁজে আমার সতীনদের মধ্যে ইতিউতি ঘুরে বেড়াতে চাই — বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্।

যুক্তি একটা আছে বটে। যুক্তি আছে — কৃষ্ণ আমাদের মতো কলির জীব না হলেও কলিকালেরই অবতার বটে। যে যতই বলুন — দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণ লীলাসম্বরণ করলেই তবে কলির আগমন ঘটেছে, আমরা তা মানি না। তিনি কলিতে এসেছিলেন বলেই কলির আচরণ নিজের জীবনে খানিকটা টের পেয়ে গেছেন। এই যে প্রেয়সী সত্যভামার পারিজাতের বায়না হল, তা যেমন কলিসুলভ কেশ-পারিপাট্যের জন্য, তেমনই অন্যদিকে তা কৃষ্ণকেও একেবারে নাকানিচোবানি খাইয়ে দিয়েছিল। পৌরাণিক কলিধর্মে বলা হয়েছে — কলিকালে স্ত্রীগণ উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক চুলকাইতে-চুলকাইতে অনায়াসে স্বামীর বাক্য অবহেলা করিবে — উভাভ্যামেব পাণিভ্যাং শিরঃ কণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ। আমাদের বক্তব্য — ত্রেতাযুগে মহারাজ দশরথের প্রিয়তমা স্ত্রী কৈকেয়ী কী করেছিলেন? তাঁর অবহেলা এবং দশরথের অনুনয়-বিনয় নিয়ে রামায়ণে অন্তত সাতটি সর্গ রচিত হয়েছে। আর এই যে সত্যভামার কথা বললাম, তাঁর বায়না রাখবার জন্য ভগবান কৃষ্ণকে স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত সেই পারিজাত-বৃক্ষ এনে রোপণ করতে হয়েছিল দ্বারকায়। এই আচরণকেই বা কী বলবেন — তেজস্বী ঈশ্বর-স্বভাব পুরুষের আচরণে দোষ নেই কোনো?

আমরা তাই প্রথম থেকেই বলে আসছি — কলিযুগ বলে পৌরাণিকেরা যে-ভাবীকালের বিবরণ দিয়েছেন, তা তেমন কোনো সুদূর ভবিষ্যৎ ছিল না তাঁদের কাছে। তাঁদের কাছে যেটা বর্তমান ছিল এবং সেই বর্তমান যতটুকু ভবিষ্যতের রূপ দেখতে পেয়েছিল তারই সামান্য অনুমান আছে মহাভারত-পুরাণে কলিধর্মের বর্ণনায়। বরঞ্চ বলব — কলিধর্ম ছিল প্রত্যেক বৃদ্ধ পৌরাণিকের কাছে এক রূঢ় বাস্তব, যা সহ্য করতে পারছিলেন না তাঁরা। সমাজে যে আধুনিকতার আমদানি হচ্ছিল, গ্রাম-সমাজ যত নগরায়ণের পথে হাঁটছিল, সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত মর্যাদা যত বাড়ছিল, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীরা যত স্বনির্ভর হচ্ছিল, কলির প্রভাব তথাকথিতভাবে তত বাড়ছিল। এমনকী সমাজে যদি তেমন কোনো উদার মহান বিপ্লবও আসে যা শত-শত, লক্ষ-লক্ষ মানুষের মুক্তি ঘটায়, সেখানেও যে-অনুদার সংরক্ষণশীল মানুষ কলির প্রভাব দেখতে পান, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি মধ্যযুগের চৈতন্যের সমসাময়িক একটি শ্লোকে। যে, চৈতন্য-নিত্যানন্দকে কলিযুগের পবন-অবতার বলা হয়, তাঁদের উদার বিপ্লবকেও বিরুদ্ধ সংরক্ষণশীলতায় মানুষ বলেছে — ওরে মন! মন রে আমার! তুমি যেন এই ঘূর্ণিপাকে বাঁধা পোড়ো না, কলির পরাক্রম অধুনা বড় বেড়ে গেছে — বলী কলিপরাক্রমো বিরম বিভ্রমেভ্যো মনঃ। তার মানে, 'কলিযুগ' প্রাচীনকাল থেকেমধ্যযুগ পর্যন্ত এমনই একটা 'কনসেপ্ট্', যাকে যে-কোনো নতুনত্ব এবং আধুনিকত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করা যায়।

পুরাণে ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী

দিলীপকুমার ভারতী

কংস যদি স্বাভাবিক নিয়মে বা কোনো দৈব-দুর্ঘটনাবশত মারা যেতেন তা হলে মথুরার সিংহাসনের অধিকারই শুধু নয়, মথুরামণ্ডলের আধিপত্য নিয়ে যদুবংশীয়দের মধ্যে টানাপোড়েন চলত, গৃহযুদ্ধও হতে পারত। সেই গৃহযুদ্ধে কৃষ্ণেরও একটা ভূমিকা থাকত এবং হয়তো তিনি কংসের ভ্রাতাদের বশীভূত বা পরাজিত করে মথুরার সিংহাসনে বসতেন। কিন্তু কংসকে যুদ্ধে নিহত করার পর তিনি সিংহাসনে বসলেন না — কংস-পিতা উগ্রসেনকেই বসালেন। পিতাকে (উগ্রসেনকে) সিংহাসনচ্যুত করে কংস মথুরার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। যদুবংশীয়রা নিশ্চয়ই সকলে(বেশির ভাগ) কংসের এ-কাজ মেনে নেয়নি। কিন্তু তারা কংসকে নিবারিত করতেও পারেনি। কারণটা ছিল, কংসের শ্বশুর অখণ্ডপ্রতাপ জরাসন্ধের ভয়। বস্তুত জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর না হলে কংস এ কাজে সাহসী হতেন না।

কৃষ্ণ কংসকে নিহত করার পরও গৃহযুদ্ধের আশংকা ছিল। কিন্তু সে-সম্ভাবনার মূলে কৃষ্ণ কুঠারাঘাত করেছিলেন কংসের মৃত্যুর পরই কংসের আট ভ্রাতাকে বধ করে। এই আট জন জীবিত থাকলে জরাসন্ধ তাদের কাউকে না কাউকে সমর্থন করতেন এবং সিংহাসনে বসিয়ে দিতেন। কিন্তু ২১ বছরের কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা লক্ষণীয়। তিনি কালবিলম্ব না করে বৃদ্ধ উগ্রসেনকেই সিংহাসনে বসালেন। এতে মথুরা ও মথুরামণ্ডলের সমস্ত যদুবংশীয়রা এক হয়ে গেল। অনেকে কংসের অত্যাচারে মথুরা ত্যাগ করে অন্য দেশে বাস করছিলেন। তাঁরাও ফিরে এলেন। কিন্তু কৃষ্ণ নিজে সিংহাসনে বসতে চাইলে তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাত। তার মস্ত বড় কারণ হল, কৃষ্ণের অতি অল্প বয়স।

যদি কৃষ্ণ উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসাতে কিছু দেরি করতেন তা হলে জরাসন্ধ মথুরার রাজনীতির জল ঘোলা করার সুযোগ পেয়ে যেতেন। তাঁর দুই মেয়েই (কংসের দুই পত্নী — সদ্য বিধবা) তাঁদের পিতার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করতেন। সেই প্রার্থনা তাঁরা উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেকের পরেও করেছেন। যে-কারণে জরাসন্ধ বার-বার মথুরা আক্রমণ করেছেন কিন্তু তখন তো মথুরার কর্তৃত্ব কৃষ্ণের দখলে। উগ্রসেন ছিলেন নামে রাজা — সত্যিকারের রাজা হয়েছিলেন কৃষ্ণ! জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণের লক্ষ্য ছিল তাই কৃষ্ণ-নিধন। অন্য কিছু নয় — জামাতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ। তাঁর মেয়েরাও বাবার কাছে তাই-ই চেয়েছিলেন।

জরাসন্ধের সামরিক শক্তি কতটা উৎকর্ষে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ তো মেলে রাজসূয় যজ্ঞ অভিলাষী যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণের পরামর্শের মধ্যে। কৃষ্ণ পরিষ্কার বলেছিলেন, জরাসন্ধ বেঁচে থাকতে যুধিষ্ঠির কখনোই রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। সুতরাং রাজসূয় যজ্ঞের আগে জরাসন্ধ-বধ অবশ্য কর্তব্য। জরাসন্ধ আঠারো বার মথুরা আক্রমণ করেছেন। কৃষ্ণ স্বপ্নেও একবারও স-সৈন্য মগধ আক্রমণের কথা ভাবেননি। শুধু প্রতিরোধ করে গেছেন। আক্রমণের জন্য অনেক বেশি সামরিক শক্তির প্রয়োজন হয়। যুধিষ্ঠিরকেও কৃষ্ণ মগধ আক্রমণের পরামর্শ দেননি। জরাসন্ধের বল-বিক্রমের কথা তিনি ভালো করেই জানতেন। তিনি ছাড়া আর কে-ই বা জানতেন! ধার্মিক, সত্যসন্ধ জরাসন্ধকে তিনি ভীমের সাহায্যে কৌশলে বধ করেছেন তাঁর ৪৭ বছর বয়সে।

কৃষ্ণ জরাসন্ধের উপর্যুপরি মথুরা আক্রমণ যে-প্রতিহত করতে পেরেছিলেন তার জন্য তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই সাধুবাদ পেতে পারে। উগ্রসেনকে রাজপদে বসিয়ে তিনি সমগ্র যাদবশক্তিকে সংহত করতে পেরেছিলেন। সেই সংহতি-তূরঙ্গের রশ্মি-বিকিরণ কিন্তু ঘটেছিল তাঁরই হাতে। এর মধ্যে কোনো দৈবী-মায়া নেই — ইতিহাসপুরুষ কৃষ্ণ তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভাবলেই এ-কাজ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুরাণগুলিতে (বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত ইত্যাদি) যে-ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা এ-রকম : এ-সব কিছুই ভগবান কৃষ্ণের লীলার অঙ্গ। বাঘ যেমন শিকারকে খেলিয়ে-খেলিয়ে বধ করে, তিনিও জরাসন্ধের ক্ষেত্রে তাই-ই করেছিলেন। আমাদেরও তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে আমরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর নয় — মানুষ ধরেই তাঁর লোকোত্তর কার্যাবলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করব।

কৃষ্ণ-চরিত্রের পুনর্নির্মাণের কারণে কাহিনীগুলিকেও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে, যে-কারণে পুরাণগুলিতে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সেই বিভিন্নতাগুলি বিশ্লেষণ (Scan) করলে ঐতিহাসিক উপাদানগুলি ধরা পড়ে। এ-ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছে। একটা প্রশ্ন! ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, জরাসন্ধ আঠারো বার মথুরা আক্রমণ করেও মথুরাবিজয় করতে পারেননি — পরাজিত হয়ে প্রত্যেকবার মগধে পলায়ন করেছেন। তার পর উগ্রসেন সহ যাদবেরা কৃষ্ণকে নিয়ে পরামর্শে বসেন। কী করা উচিত, তা নির্ণয়ের ভার দেওয়া হয় কৃষ্ণের উপর। কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত নেন এই বলে যে, আমরা এমন এক দুর্গনিগরীতে বাস করব যেখান থেকে স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করতে পারে। তা হলে আর জরাসন্ধের ভয় আমাদের থাকবে না। তার পর কুশস্থলীতে দুর্গ-নির্মাণ ও সংস্কার ইত্যাদি করে মথুরা থেকে সকলকে নিয়ে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

তা হলে সে-সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য আঠারো বার জরাসন্ধের আক্রমণ সহ্য করার প্রয়োজন হয়নি যাদবদের। প্রথম বার কিংবা বড়জোর দ্বিতীয় বারের পরই সে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এটাই তো যুক্তিসম্মত এবং বাস্তবতাসম্মত। তা হলে আঠারো বার কেন? এর উত্তর: এ-টুকু না করলে কৃষ্ণকে দৈবী-সত্তায় উন্নীত করা যাবে না বলে মনে করেছেন ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের পুরাণকারেরা। দ্বিতীয় প্রশ্ন : আঠারো বার আক্রমণ প্রতিহত করার পর মথুরার দুর্গনিগরীর কিছু কি অবশিষ্ট ছিল? অধিবাসীদের ক-জনই বা জীবিত থাকে যে তাদের জন্য অন্য এক নিরাপদ দুর্গনিগরীর প্রয়োজন হবে? এর ভাগবত-ব্যাখ্যা : সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কৃষ্ণের মহিমা! কোনো সন্দেহ নেই তার, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণজাত ব্যাখ্যা কিন্তু অন্যরকম।

মহাভারতও পুরাণ। তাতে কিন্তু অন্য কথা লেখা হয়েছে, যা বাস্তবতার সযুজ। সেখানে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যে-তথ্য দিচ্ছেন তা এ-রকম :

আমি ...জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র-সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে (কংসভ্রাতা) সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল বটে কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্রদ্বারা তিনশত বৎসর অবিশ্রাম জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না।' (সভাপর্ব/১৩ অধ্যায়)

জরাসন্ধের বল-বীর্যের অতি বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে সভাপর্বের এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। সে-সবের উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন যে হংস এবং ডিম্বক নামক তাঁর প্রধান দুই সেনাপতি ছিলেন যাঁদের শক্তির উপর জরাসন্ধ খুবই নির্ভর করতেন।

সভাপর্বের এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, কৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিহত হলে তাঁর পত্নীদ্বয় পিতার নিকট গিয়ে বারংবার অনুরোধ করেন 'আমার পতিহন্তাকে সংহার কর' বলে। কংস মথুরা অভিযান করেওছিলেন। তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার কথা হংস ও ডিম্বকের, কিন্তু তারা দৈব-দুর্ঘটনায় মারা যায়। এখানে কৃষ্ণ বলেছেন যুধিষ্ঠিরকে :

জরাসন্ধ ওই দুই বীরপুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরম আহ্লাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম। [সভাপর্ব/১৩ অধ্যায়]

কিন্তু জরাসন্ধ-কন্যারা পিতার উপর চাপ দিয়েই যাচ্ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ জ্ঞাতিবান্ধবদের সাথে পরামর্শ করে যা স্থির করলেন :

আমরা পূর্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া সকলে কিছু-কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান (অর্থাৎ মথুরা) পরিত্যাগপূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ওই পশ্চিমদেশে রৈবতক-শোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলী নাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি।

তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথীগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ওই নগরীমধ্যে বাস করিতেছি।... আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রব ভয়ে পর্বত আশ্রয় করিয়াছি।

এই বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মথুরাবাসীর সঙ্গে জরাসন্ধের সরাসরি যুদ্ধ একবারও হয়নি। একবারই জরাসন্ধ স-সৈন্য মথুরা অবরোধ করেছিলেন। কিছু ক্ষতিও করে থাকতে পারেন। কিন্তু হংস ও ডিম্বকের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হয়ে নিজ রাজধানীতে ফিরে যান। দ্বিতীয় বার যুদ্ধ-সূচনা হতেই যাদবদের নিয়ে কৃষ্ণ কুশস্থলীতে পালিয়ে যান। সেখানে রৈবতক পর্বতকে আশ্রয় করে অস্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। সেটি ছিল তাঁদের সুরক্ষিত দুর্গস্বরূপ। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন :

ওই পর্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক-এক যোজনের পর শত-শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণসকল আছে। যুদ্ধদুর্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্বদা বাস করিতেছেন।

রৈবতকের পশ্চিমে সমুদ্রতীরবর্তী কুশস্থলী নগরী। তখন এর রাজা ছিলেন রৈবত। তাঁর কন্যা রেবতীর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়। সেই সূত্রে কৃষ্ণ মথুরার যাদবদের এখানে স্থানান্তরিত করতে পেরেছিলেন। বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রৈবতক পর্বতকে কুশস্থলীর রাজারা দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করতেন। কৃষ্ণ সেই দুর্গকেই সংস্কারের কথা বলেছেন। জরাসন্ধের ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার পর ধীরে-ধীরে কৃষ্ণ সকলের বসবাসের জন্য, মথুরার বিকল্প নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন রৈবতক পর্বত দুর্গের পশ্চিমে। কিন্তু নগরী নির্মাণে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বেলাভূমিকে পাথর-নির্মিত দেওয়ালের দ্বারা বেঁধে, সমুদ্রজল পর্যন্ত নগর বিস্তৃত করেন। এ-ছাড়া স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না।

নগরী নির্মাণ যখন সম্পন্ন হল তখন তার নাম দিলেন দ্বারবতী (পরে নাম হল — দ্বারকা)। এমন নামকরণের অর্থ, এই নগরী ছিল অনেকগুলি দ্বারযুক্ত। তবে দুর্গনগরী বললে

দুটো অংশকে বুঝতে হবে — (১) রৈবতক দুর্গ (সু-সংস্কৃত) (২) নতুন নগর (New Township)। তাই নানা রকমভাবে উল্লেখ করা হত, যথা — দ্বারবতী, দ্বারকা, কুশস্থলী, দ্বারবতী, দুর্গনগরী ইত্যাদি। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তাই শেষে বলেছেন

আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্বক দ্বারবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি। [সভাপর্ব/১৩ অধ্যায়]

কিন্তু ভাগবতে কী লেখা হয়েছে দেখুন : কৃষ্ণ দ্বারকায় ধনসম্পদ এবং মথুরাবাসীদের বলদের পিঠে স্থাপন করে পাঠাচ্ছেন, এমন সময় জরাসন্ধ হঠাৎ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে আবার যুদ্ধের জন্য সেখানে (মথুরাতে) উপস্থিত হলেন। শত্রুসৈন্যের প্রচণ্ড যুদ্ধোদ্যম ও বেগ দেখে মানবলীলায় অবতীর্ণ মহামনা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যেন সাধারণ মানুষের মতোই ভয় পেয়েছেন, এরকম ভাব দেখিয়ে, দ্রুত পালিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা নির্ভয় হয়েও ভীরুর ন্যায় প্রচুর ধন পরিত্যাগ করে পদ্মপলাশের মত কোমল চরণে বহুযোজন পথ অতিক্রম করে চললেন। [ভাগবত/৫২ অধ্যায়]

আর বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে :

অতিশয় অহঙ্কারী মগধদেশাধিপতি রাজা জরাসন্ধ এই প্রকারে অষ্টাদশবার ['দশ চাষ্টৌ চ'— বিষ্ণু ৫/২২/১১] কৃষ্ণপ্রমুখ বহু যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সেই সমস্ত যুদ্ধেই অধিক-সৈন্য পরিবৃত জরাসন্ধ, অল্প-সৈন্য-যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

যাদবদের এই সাফল্যের হেতুও বিবৃত রয়েছে বিষ্ণুপুরাণে :

যাদবগণের যে বহুপ্রকারে সেই প্রকার বল অর্জিত হইয়াছিল, তাহা কেবল সুদর্শনচক্রধারী বিষ্ণুর অংশাবতারের সন্নিধিমাহাত্ম্যেরই প্রভাবে। [তদ্ বলং যাদবানাং তৈঃ-অর্জিতং যৎ-অনেকশঃ। তত্ত্ব সন্নিধিমাহাত্ম্যং বিষ্ণো-অংশস্য চক্রিনঃ।। — বিষ্ণুপুরাণ - ৫/২২ /১৩]

অধিক মন্তব্য ও বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণের দ্বারবতীতে পলায়নের লৌকিক ব্যাখ্যা হল : কৃষ্ণ ভীত হয়েছিলেন। তিনি আহাম্মক ছিলেন না — অসম যুদ্ধের হঠকারিতার পথে যাননি। সুযোগ খুঁজেছেন জরাসন্ধ-বিনাশের। তার আগে নিজেদের শঙ্কাহীন দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা। এমন দুর্গনিগরী তিনি গড়তে চেয়েছিলেন এবং পেরেছিলেনও যার মধ্যে থেকে যাদব মহিলারাই জরাসন্ধ-বাহিনীকে হঠিয়ে দিতে পারে। এ কথা মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণ - দুয়েতেই বলা হয়েছে।

মথুরা নগরীতে বাস করে যে জরাসন্ধের মতো প্রবল শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকা সম্ভব হবে না, তার অতি বাস্তবসম্মত কারণও ছিল যা হরিবংশে বলা হয়েছে। সেটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা। হরিবংশ-মতে কৃষ্ণের অধিনায়কত্বে মথুরাবাসীরা সপ্তদশ বার জরাসন্ধের আক্রমণ প্রতিহত করেছে। তার পর রাজা উগ্রসেন কৃষ্ণসহ যাদবপ্রধানদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন এবং বললেন —

আমরা সাতিশয় দুর্বল, এমনকী আর একদিনও আমাদের এ পুরী অবরোধ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। এ পুরী মধ্যে অন্নকাষ্ঠের হ্রাসতা হইয়াছে, দুর্গের-দৃঢ়তা নাই। পরিখা অসংস্কৃত, দ্বার নাই, যন্ত্র (Pulley) নাই। চতুর্দিকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রাচীর প্রস্তুত করিতে হইবে। অস্ত্রাগারের ইষ্টক সংস্কার আবশ্যক। পূর্বে এ নগর কংসের প্রতাপে রক্ষিত হইত বলিয়াই সংস্করণের প্রয়োজন হয় নাই। তাহার

পরেই কংস হঠাৎ নিহত হইলে রাজ্য আমাদিগের হস্তগত হইল। সুতরাং সমস্তই প্রায় তদবস্থায় রহিয়াছে।...শত্রুপক্ষ (জরাসন্ধ) আক্রমণ করিলেই নিশ্চয়ই এ রাজ্য সবলে বিনষ্ট হইবে।

উগ্রসেন এই বাস্তব চিত্র তুলে ধরে শেষে কৃষ্ণকে বললেন —

এখন যাহা কর্তব্য তাহা বিবেচনাপূর্বক স্থির কর। তুমি আমাদিগের সেনানায়ক। আমরা তোমার আদেশে চলিব মাত্র। বিশেষ তুমিই এ বিরোধের মূল। এক্ষণে যাহাতে তুমি রক্ষা পাও এবং আমরাও রক্ষিত হইতে পারি, তাহার উপায় কর। [হরিবংশ /৯৪ অধ্যায়]

রাজধানী-নগরী মথুরার প্রাচীরের দুরবস্থাটা কংসের আমলেই ছিল; দ্বার(Gate) পর্যন্ত ছিল না বা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত ছিল। তাতে কংসের কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ জীবন্ত চতুঃসীমানার প্রাচীর ছিল তাঁর শ্বশুর — জরাসন্ধ। কোনো শত্রুর কংসের কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস ছিল না। কৃষ্ণই সে-সাহস বা সে-ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। সেজন্যই উগ্রসেন বলছেন কৃষ্ণকে — 'বিশেষ তুমিই এ-বিরোধের মূল।'

উগ্রসেন কেন বললেন, — 'এ পুরীমধ্যে অন্নকাষ্ঠের হ্রাসতা হইয়াছে?' আমাদের মনে হয় যে-সব যদুবংশীয় রাজা, বীর ও প্রধানেরা কংসের অধীনতা না স্বীকার করে অন্যান্য দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা কংস নিহত হওয়ার পর স্বদেশে — মথুরায় প্রত্যার্বতন করেছিলেন। সুতরাং লোকসংখ্যা, যোদ্ধসংখ্যা, বাহনাদির সংখ্যা সহসা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষ্ণের কথায় তা আরো পরিষ্কার হয়েছে। কৃষ্ণ উগ্রসেনকে বললেন :

আমাদিগের এই মথুরাপুরী অবশ্যই মঙ্গলদায়িনী। আমরা এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি কিন্তু ব্রজে গিয়া পরিবর্ধিত হইয়াছি। এখন আমাদের আর সে-দুঃখ নাই, এখন আমরা শত্রুপরাজয় করিয়াছি।** কিন্তু রাজমণ্ডলীতে, বিশেষত জরাসন্ধের সহিত আমাদিগের বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের অশ্বাদি-বাহন, অসংখ্য পদাতি-সৈন্য, বিবিধ রত্ন ও বহুতর বন্ধুবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এ মথুরাপুরী অতি অল্প পরিসর স্থান।...এখানে আমাদিগের যে-পদাতিসৈন্য আছে, তাহাদিগেরই বাস

** কৃষ্ণের ব্রজ-বিমুখতা

কৃষ্ণ বললেন, 'আমরা এখানে (মথুরায়) জন্মগ্রহণ করিয়াছি কিন্তু ব্রজে গিয়া পরিবর্ধিত হইয়াছি।' মনে হতে পারে, 'আমরা' বলতে কৃষ্ণ বলরামকে ধরে নিয়েই বলছেন, অর্থাৎ 'আমরা দুজন।' কিন্তু ঘটনা হল, কৃষ্ণের জন্ম মথুরায় কংসের কারাগারে হলেও বলরামের জন্ম ব্রজে। ভাগবতে বলা হয়েছে — 'বসুদেব-গৃহিণী রোহিণী গোকুলে নন্দের গৃহে বাস করেছেন। শুধু তিনিই নন, বসুদেবের অন্যান্য স্ত্রীরাও কংসের ভয়ে ভীত হয়ে অলক্ষ্যস্থানে বাস করছেন।' [ভাগবত/১০।২ অধ্যায়]

তার অর্থ কংস বসুদেব এবং নিজ ভগিনী দেবকীকেই শুধু কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। রোহিণী বলরামকে প্রসব করেন নন্দালয়ে। ভাগবতে আরো বলা হয়েছে — কংস দেবকী-গর্ভজাত ছয়-সন্তানকে বধ করেন। সপ্তম বার দেবকী গর্ভবতী হলে ভগবানের আদেশে যোগমায়া দেবকীর সেই গর্ভ রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করেন। ফলে দেবকীর গর্ভপাত হল ভেবে পুরবাসীরা বিলাপ করে। রোহিণীর সেই গর্ভজাত সন্তানই বলরাম। [ভাগবত/১০।২ অধ্যায়]

কাহিনীর এ-রকম বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয়, বসুদেব এবং দেবকী কারাগারে ছিলেন না, — গৃহবন্দি ও নজরবন্দি ছিলেন, মথুরার বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। বিশেষত দেবকীর তো নয়ই। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, দেবকী ছিলেন উগ্রসেনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবকের সপ্তম কন্যা; সুতরাং দেবকী

করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমার বোধ হয়, এখন এ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করাই বিধেয়। [হরিবংশ/১১৩ অধ্যায়]

এ ছাড়া পদাতিক সৈন্যসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির আর এক কারণ : কংসকে কৃষ্ণ রীতিমতো সেনাদল সহ আক্রমণ করে নিহত করেন এবং তার পর, তার ভাই সুনামাকেও। এই সেনাদল কৃষ্ণ মথুরার বাইরে তৈরি করেছিলেন। সেই সেনারাও কংসবধের পর মথুরাপুরীতে অবস্থান করছিল। সব মিলিয়ে লোকবৃদ্ধি এবং তৎকারণেই স্থানাভাবের ব্যাপারটি ঘটেছিল। কৃষ্ণ কুশস্থলীতে গিয়েও এই সমস্যায় পড়েছিলেন। সেখানে যে দ্বারবতী নগরী তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তার আয়তনও সীমিত ছিল। বলতে গেলে তার তিন দিকে সমুদ্র, এক দিকে পর্বত। সেজন্য কৃষ্ণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে নগর বিস্তৃত করছিলেন আর সে-কারণেই সমুদ্রজল নগরীমধ্যে যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার প্রতিবন্ধকস্বরূপ প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীর তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার কাব্যরূপই পুরাণগুলিতে আমরা দেখি : কৃষ্ণ সমুদ্রের কাছে ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন যা সমুদ্র দান করেছিলেন নিজে সরে গিয়ে।

ছিলেন কংসের জেঠতুতো ভগিনী। আর কংস উগ্রসেনের ঔরস-পুত্র ছিলেন না। ক্রমিল নামক এক দৈত্য কংস-জননীকে ধর্ষণ করে। কংস সেই ধর্ষণজাত সন্তান — উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র বলে পরিচিত ছিলেন। [দ্র: হরিবংশ/৮৪ অধ্যায়]। উগ্রসেনের ৮ জন ঔরসপুত্র, যার প্রথম হলেন সুনামা। তিনি বয়সে কংসের চেয়ে অবশ্য ছোট ছিলেন। অতএব স্বাভাবিক নিয়মে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কংস ছিলেন না — ছিলেন সুনামা।

উগ্রসেন মনে হয় তাঁর রাজ্যের কিছুটা দেন সুনামাকে আর কিছুটা বসুদেবকে। সম্পর্কে বসুদেব উগ্রসেনের জামাতাই হন। কংস তখন জরাসন্ধের সহায়তায় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হন, তার পর বসুদেব ও দেবকীকে নজরবন্দি করেন। পরে দেবকীর সন্তান যাতে সিংহাসনের দিকে হাত না বাড়াতে পারে, তাই কংস দেবকীর সন্তানদের মেরে ফেলতে থাকেন। বসুদেবের গতিবিধির উপর কংস বোধ হয় ততখানি বিধিনিষেধ আরোপ করেননি, যতখানি করেছিলেন দেবকীর উপর। বসুদেব আশঙ্কা করেছিলেন কংস তাঁর অপরাপর পত্নীদের গর্ভজাত সন্তানদেরও মেরে ফেলতে পারেন। তাই তাদের সরিয়ে দিয়েছিলেন। কংসের তাতে আপত্তি না হওয়াই সম্ভব। বসুদেব তাঁদের সাথে মিলিত হতে পারতেন বা তাঁরাও স্বামীর সাথে মথুরায় এসে মিলিত হতে পারতেন। এভাবে নন্দালয়ে বসুদেব রোহিণীর সাথে মিলিত হয়ে বলরামকে উৎপন্ন করে থাকতে পারেন।

ভাগবতমতে বসুদেবের ১৩ জন পত্নী, কিন্তু মহাভারতের মৌসলপর্ব মতে বসুদেবের পত্নী মাত্র ৪ জন। কৃষ্ণের উক্তিতে মনে হয় বসুদেবের অন্য আরো কয়েকজন পত্নী ব্রজে কংসভয়ে স্বেচ্ছানির্বাসিতা ছিলেন। তাঁরাও সন্তানদের সেখানে প্রসব করেন। কৃষ্ণকথিত 'আমরা'-র মধ্যে এমন কয়েকজন তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, যাঁদের জন্ম মথুরায় কিন্তু পরে ব্রজে পরিবর্ধিত। প্রসঙ্গত বলা যায়, ভাগবতে বসুদেবের ৬৪ জন সন্তানের নাম রয়েছে, যাঁরা তাঁর তেরো জন পত্নীর গর্ভজাত।

কৃষ্ণের উপরোক্ত উক্তি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, ব্রজে পরিবর্ধিত হওয়ায় (মথুরায় না হয়ে) কৃষ্ণের মনে একটা দুঃখবোধ জাগরূক ছিল। না হলে কংসবধের পর তিনি বলতেন না — 'এখন আমাদের আর সে-দুঃখ নাই।' ব্রজভূমি ক্রীড়াভূমি হলেও চিরবাসস্থান হোক এরকম কামনা কৃষ্ণের মনে ছিল না বলে মনে হয়। এ-কারণেই মথুরায় এসে রাজ্যাধিকার পেয়ে ব্রজভূমিকে ভুলে যাওয়া না হলেও সশরীরে আর ফিরে না যাওয়াটা আদৌ সম্ভব হয়েছে।

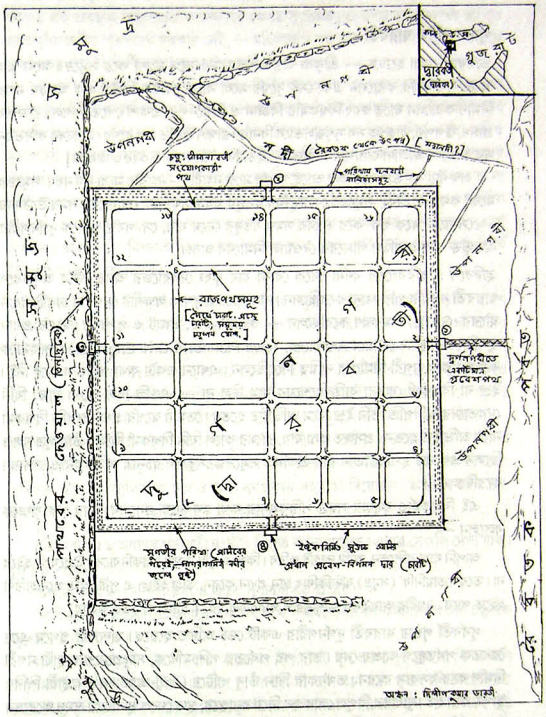

কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী/দুর্গনগরী — দ্বারবতী

এই সব কিছুর কারণেই কৃষ্ণ কুশস্থলীতে নগরীস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এবার দেখা যাক পুরাণগুলিতে বর্ণিত সেই দুর্গনগরীর সামগ্রিক ছবিটা।

পুরাণ-বর্ণিত দ্বারবতী

ভাগবত : বলা হয়েছে — শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সঙ্গে মন্ত্রণা করে সমুদ্রের মধ্যে এক অদ্ভুত দুর্গ তৈরি করালেন এবং সেই দুর্গের মধ্যে বারো যোজন বিস্তীর্ণ এক আশ্চর্য নগর নির্মাণ করালেন যাতে স্বয়ং বিশ্বকর্মার বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পেতে লাগল। রাজপথ প্রাঙ্গণ, উপপথ, বাস্তুগৃহ সব সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের লোকদের বাসভবন সব আলাদা-আলাদা জায়গায় নির্মিত — ইত্যাদি। [ভাগবত/১০।৫০ অধ্যায়]

লক্ষণীয় — ভাগবতে বলা আছে, দুর্গের মধ্যে নগরী — নগরীর মধ্যে দুর্গ নয়। 'সমুদ্রের মধ্যে' কথাটি প্রতীকী। সমুদ্রের বেলাভূমির যতদূর পর্যন্ত সমুদ্রজল জোয়ারের সময় উঠে যায় — সেখানে থেকে শুরু করে ভাটার সময় যতদূর নেমে যায়, সে-পর্যন্ত স্থানকে দুর্গনগরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল পাথরের দেওয়াল নির্মাণের দ্বারা।

হরিবংশ : হরিবংশের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কৃষ্ণ দেবরাজের অমরাবতীর অনুকরণে দ্বারবতী নগরীর পরিকল্পনা করেছিলেন। নামকরণে সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। নগরীর চারটি প্রধান দ্বারের (GATE) নামকরণ করেছিলেন — শুদ্ধাক্ষ, ঐন্দ্র, ভল্লাট ও পুষ্পদন্ত। স্বর্গের প্রধান স্থপতি ও বাস্তুবিদ (Chief Architect, Town Planner & Civil Engineer) বিশ্বকর্মাকে আমন্ত্রণ করে নগরী নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নিই। ইন্দ্র বা বিশ্বকর্মা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না — এগুলি ছিল পদের নাম। যিনি দেবতাদের অধিপতি তিনি ইন্দ্র নামে অভিহিত হতেন। তেমনি স্বর্গের প্রধান স্থপতি বিশ্বকর্মা নামে অভিহিত হতেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, রামের কালে যিনি বিশ্বকর্মা ছিলেন তাঁর পুত্র নলও ছিলেন এক বড় স্থপতি। তিনি রাম-প্রকল্পিত সমুদ্রের সেতুপথ রচনার পরিকল্পনাও রূপায়ণ করেছিলেন।

এই বিশ্বকর্মাও কৃষ্ণের সমগ্র পরিকল্পনার কথা মন দিয়ে শুনলেন। তার পর কৃষ্ণকে বললেন —

আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিব। কিন্তু এ পুরী, সমস্ত লোকনিবাসের উপযোগী হইবে না। তবে 'তোয়নিধি' (সমুদ্র) যদি কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে এ পুরী, অতি মনোহারিণী হইতে পারে। নগরীর আয়তনও আশানুরূপ পরিবর্ধিত হয়। [হরিবংশ/১১৫ অধ্যায়]

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দ্বারবতী দুর্গনগরীর একটি স্কেচ অঙ্কিত হয়েছে। যাদবেরা প্রথমে এসে রৈবতক পর্বতদুর্গে আশ্রয় নেয়। তার পর পর্বতের পশ্চিমদিকে, সানুপ্রদেশে অস্থায়ী নগরী নির্মাণ করে বসবাস করেন। তখনকার দিনে তাঁবু খাটিয়ে ('পট্ট-আচ্ছাদন') অস্থায়ী শিবির স্থাপন করা হত। যুধিষ্ঠির বিপুল লোকজন নিয়ে বনান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করেছেন — সর্বত্রই এ-রকম অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিয়েছেন। যাদবেরাও প্রথম দিকে তাই-ই করেছেন। তার পর স্থানীয় নির্মাণসামগ্রী দিয়ে অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করেছেন। মথুরা থেকে

তো সকলে একইসঙ্গে চলে আসেননি — দফায় দফায় এসেছেন। এভাবে রৈবতক পর্বত ও সাগরের বেলাভূমি সন্নিহিত অঞ্চলে (offings) অস্থায়ী নগরী নির্মিত হয়েছে। কৃষ্ণ দেখলেন তাঁদের এই অবস্থান বহিঃশত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত। এ-রকম স্থানে নগরী স্থাপিত হলে বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষদের দরকার নেই — মহিলারাও যুদ্ধ করতে পারবেন। সে-ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় হয়ে তিনি বিশ্বকর্মাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আমাদের মনে হয়, কোথাও খুলে লেখা নেই, রৈবতকের দুর্গকে সুসংস্কৃত করে তাকে এক উন্নত দুর্গে উন্নীত করেছিলেন কৃষ্ণ। তার পশ্চিম পাদদেশেই তিনি আধুনিক নগরীর পরিকল্পনা করেছিলেন। স্থান-নির্বাচন এমনই যে প্রায় তিন দিকে সমুদ্র, এক দিকে সুদীর্ঘ পর্বত। যদিও দৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরের দ্বারা সমুদ্র থেকে নগরী বিচ্ছিন্ন ছিল তথাপি জলপথে সমুদ্র-দস্যুদের আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেননি কৃষ্ণ — এমনটা হতেই পারে না। তা না হলে সমুদ্রের দিকে — প্রাচীরের পরেই গভীর পরিখা রাখার কী অর্থ? অতএব নগরীর সামনের দিক (অর্থাৎ রৈবতক পর্বতের দিক — পূর্বদিক) বাদে অন্য তিন দিকে সুরক্ষা বিধানের জন্য সৈন্য নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাদের জন্য ছোট ছোট দুর্গও ছিল। আর পূর্বে রৈবতক মহাদুর্গ তো ছিলই।

হরিবংশের বর্ণনা : বিশ্বকর্মার পরামর্শমতো কৃষ্ণ সমুদ্রের কাছে প্রয়োজনীয় ভূমি (দ্বাদশ যোজন) চাইলেন। নদ-নদী-পতি সমুদ্র কৃষ্ণের কথায় সরে গেলেন। এর সহজ অর্থ, প্রাচীর নির্মাণের দ্বারা সমুদ্রজল-বিভাজিকা রচিত হল — রচনা করলেন বিশ্বকর্মাই। এ-ছাড়া স্থান তো পাওয়া যাচ্ছিল না। হল্যান্ড এবং জাপানে তো এমন নগরী নির্মিত হয়েছে। সে-কালেও এই কৌশল অধিগত ছিল নির্মাণকারীদের। এবার বিশ্বকর্মা মূল নগরী নির্মাণে হয়েছে। সেকালেও এই কৌশল অধিগত ছিল নির্মানগরীদের। এবার বিশ্বকর্মা মূল নগরী নির্মাণে হাত দিলেন — রাস্তাঘাট, দিঘি, বিভিন্ন অট্টালিকা, সভাগৃহ, পরিখা, সীমানা প্রাচীর, সভাগৃহ ইত্যাদি। অর্থের অভাব হয়নি কারণ মথুরার সমস্ত ধনদৌলত তো যাদবেরা এনেছিলেন। বলরামের শ্বশুর রৈবতও নিশ্চয়ই আর্থিক না হলেও অন্য সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছেন। অতএব অতি দ্রুত নগরী নির্মিত হয়েছিল। [হরিবংশ/১১৫ অধ্যায়]

হরিবংশ ১৫৬ অধ্যায়ে দ্বারবতী নগরীর বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এবার সেগুলি দেখা যাক। [দ্রষ্টব্য - স্কেচ]

'চতুর্দিকে অতলস্পর্শ পরিখা ও উন্নত সুধাধবলিত প্রাচীর।'

'পবিত্রতোয়া মহানদী একেবারে পঞ্চাশৎ মুখে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারকার চতুর্দিক সুশোভিত করিয়াছে।'

নদীর নাম 'মহানদী' কি না বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। তবে নদীটি রৈবতক থেকে উৎপন্ন এবং সাগরগামিনী বলে মনে হয়। সুধাধবলিত প্রাচীরের পরে কিছু ভূমির বিস্তার। তার পরেই চতুঃসীমানায় পরিখা। পরিখার জল সাগরজলে পুষ্ট হতে পারে না। সে-ক্ষেত্রে জোয়ারের জলে নগর প্লাবিত ও ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং পরিখা, সাগরগামিনী মহানদীর জলে পুষ্ট ছিল বলে মনে হয়। প্রাচীরের স্থানে-স্থানে

মিশছে, সেখানেও এ-রকম প্রবেশ ও নির্গমনদ্বার থাকা সম্ভব যাতে সমুদ্রজল নগরে প্রবেশ করতে না পারে।

'নগরীর পূর্বদিকে মণি ও কাঞ্চন-তোরণময় রমণীয় সানু ও উপত্যকা বিরাজিত অতি সুশোভন রৈবতক পর্বত।'

'রৈবতকের উপরিভাগে বিচিত্র পঞ্চবর্ণ বন, পঞ্চজন দৈত্যের বিস্তীর্ণ উপবন এবং সর্বঋতুজাত নানাবিধ বৃক্ষবন সকল বিরাজিত রহিয়াছে।'

'রৈবতকের গুহামধ্যে কেশবের হিতৈষী কত শত দেব ও গন্ধর্বগণ বাস করিতেছেন।'

বস্তুত কৃষ্ণ যে-স্থানে দ্বারবতী নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন সেটি আনর্ত দেশ। কৃষ্ণ নিজে অনেকসময় দ্বারকা না বলে 'আনর্ত দেশ' বলে উল্লেখ করতেন। [দ্রষ্টব্য, মহাভারত /বনপর্ব/১৩শ অধ্যায়] । রাজা আনর্তের নামানুসারে আনর্তদেশ। ভাগবতের ৯/৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে — আনর্তের পুত্র রৈবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করে আনর্তনামে দেশ পালন করতেন।

আনর্তের বংশপরিচয় এরকম : বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র — জ্যেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু এবং তৃতীয় হলেন শর্যাতি। শর্যাতির মধ্যম পুত্র আনর্ত। আনর্তের নামেই আনর্ত দেশ। আনর্তের পুত্র রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। [ভাগবত //৯/৩ অধ্যায়] ।

এই কুশস্থলী নগর অবস্থিত ছিল রৈবতকের পশ্চিমে সমুদ্রতীরে যেখানে সম্ভবত শুধু কুশবন ছিল ।

মহাভারতের সভাপর্বে, কৃষ্ণ যেখানে যুধিষ্ঠিরকে ইতিবৃত্ত শোনাচ্ছেন, কেন তিনি মথুরা ত্যাগ করে দ্বারবতী নির্মাণ করলেন জরাসন্ধের ভয়ে, সেখানে কৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন — 'ওই পশ্চিমদেশে রৈবতকপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি।' [ব.প./১৩ অধ্যায়]

সুতরাং কৃষ্ণ যেখানে দ্বারবতী নির্মাণ করলেন সেখানে প্রাচীন নগর ছিল একটি। তবে কৃষ্ণ তাকে নবজন্ম দান করেছিলেন। এই রেবতের পুত্র ছিলেন কুকুদ্মী (বা রৈবত)। এই রৈবতের নাম অনুসারে রৈবত বা রৈবতক পর্বত বলে মনে হয় এবং এখানে একটি পার্বত্য দুর্গ ছিল। রৈবতের কন্যা রেবতী। বলরাম রেবতীকে বিবাহ করেন। [ভাগবত // ৯/৩ অধ্যায়] সেই সূত্রে কৃষ্ণ, বলরাম এখানে প্রবেশাধিকার পান।

হরিবংশ-এর ১১৩ অধ্যায় পাঠ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয় : কৃষ্ণ দুর্গনগরী নির্মাণের স্থান

** প্রাচীনকালে নদীশাসন প্রকৌশল*

ঋগ্বেদে ভারত প্রভৃতি দশ জাতির সাথে (ভারত, অনু, মৎস্য, দ্রুহ্য প্রভৃতি) পিজবন পুত্র সুদাস রাজার যুদ্ধের কথা রয়েছে। ওই দশ জাতি 'অদীনা' নদীর বাঁধ ভেঙ্গে সুদাসের দেশ প্লাবিত করেছিল। তাতে অবশ্য সুদাসকে তারা পরাজিত করতে পারেনি। 'অদীনা' সম্ভবত ছোট নদী। তাতে বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হত, সম্ভত কৃষিকার্যের সুবিধার্থে। সেই বাঁধে অবশ্যই জলের নির্গমন দ্বার ছিল (আধুনিক বাঁধে যাকে Spillway বলা হয়। তা Sluice এর মতোই। কপাট বন্ধ করলে জল রুদ্ধ হয়। তুললে জল নদীর নিম্নভাগে প্রবাহিত হয়)। অতএব ভারতবর্ষে এই প্রকৌশল ঋগ্বেদের কাল থেকেই জানা ছিল। [দ্র: ঋগ্বেদ ৭/৩৩, ৭/৮৩, ৩/৩৩ এবং ১/৪৭]

নির্বাচনের জন্য মথুরা থেকে সৈন্যদল নিয়ে পশ্চিমদিকে এই স্থানে এলেন। বর্ণনা এরকম: ওই সময় শত্রুনাশন কৃষ্ণ বাসস্থান অন্বেষণ করিতে-করিতে দেখিলেন সাগর ও জলাশয়ভূষিত সেই সিকতাময় তাম্রমৃত্তিক অতিবিস্তীর্ণ সিন্ধুরাজপ্রদেশ বাহনদিগের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ও সমুদয় পুরলক্ষণ সম্পন্ন। ...তথায় সাগরের সজল অনিল সতত প্রবাহিত হইতেছে। তাহার অনতিদূরে রৈবতক নামা বিস্তীর্ণ পর্বত।...ঐ স্থান একলব্যের আবাসভূমি। আচার্য দ্রোণও তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। তথায় মানব সংখ্যার ইয়ত্তা নাই।... সিন্ধুরাজ ঐ স্থানে দ্বারবতী নামে শারিকাফলকের ন্যায় অষ্টকোণ এক বিহারভূমি নির্মাণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা কেশবও সেই স্থান দর্শনে স্বীয় পুরী নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। [হরিবংশ/১১৩ অধ্যায়]

অতএব রৈবতক পর্বত বহুজন অধ্যুষিত ছিল। এখানে যে আনর্তবংশীয়দের দুর্গনগরী ছিল তা আগে বলা হয়েছে। সম্ভবত ধনুর্বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল রৈবতক। তাই একলব্য বাস করতেন এবং দ্রোণও বহুকাল ছিলেন। সিন্ধুনদীর অববাহিকা অঞ্চল-সন্নিহিত এই পর্বত। জানা গেল এখানে সিন্ধুরাজের (জয়দ্রথ?) একটি বিহারভূমিও ছিল। কৃষ্ণ-প্রকল্পিত নগরীর পূর্বে রৈবতক পর্বত। সেই পর্বতের মণি ও কাঞ্চন-তোরণময় সানু ও উপত্যকা। শুধু তাই-ই নয় রৈবতকে পঞ্চজন দৈত্যের বিস্তীর্ণ উপবন (ক্রীড়া-কাননও ছিল)।

কে এই পঞ্চজন দৈত্য? ভাগবতের ১০/৪৫ অধ্যায়ে রয়েছে এর কথা। সান্দীপনি মুনির কাছে কৃষ্ণ বলরামের শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরু সান্দীপনি তাঁদের কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁর মৃত পুত্রকে চাইলেন। গুরুর পুত্র প্রভাসতীর্থে সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে সমুদ্রের তরঙ্গগ্রামে নিহত/অদৃশ্য হন। গুরু সেই পুত্রকে চাইলেন। কৃষ্ণ বলরাম প্রভাসে গিয়ে জানলেন, গুরুপুত্র শঙ্খরূপী পঞ্চজন নামক জলে বিচরণকারী দৈত্য কর্তৃক অপহৃত হয়েছেন — সমুদ্রের গ্রাসে নিহত হননি। এর পর তাঁরা সমুদ্রে ঢুকে পঞ্চজনকে সংহার করে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন এবং পঞ্চজন দৈত্যের মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য অধিকার করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় কৃষ্ণ খাণ্ডবদাহনের কালে অগ্নির কাছ থেকে সুদর্শন চক্র এবং কৌমোদকী নাম্নী গদা লাভ করেন। শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ, চক্র এবং গদা এ-ভাবেই লাভ হয়েছিল।

খাণ্ডবদাহনের সময় অর্জুন অগ্নির কাছ থেকে লাভ করেছিলেন গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং কপিলক্ষ্ম (রথের ধ্বজা বানরচিহ্নলাঞ্ছিত) রথ। পরে এগুলি হয় অর্জুনের প্রতীক — অর্জুন হন গাণ্ডীবধন্বা এবং কপিধ্বজ। আদিপর্বের কাহিনীতে রয়েছে — জলেশ্বর বরুণই গাণ্ডীব, তূনীরদ্বয়, কপিলক্ষণ রথ, এই তিনটি অর্জুনকে দেন — অগ্নির আদেশে। বলা হয়েছে, বরুণ এগুলি সোমরাজের (সোমবংশীয় কোনো রাজা) কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু চক্র ও কৌমোদকী গদা অগ্নিই কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। [দ্র: মহাভারত/আদিপর্ব/২২৪ এবং ২২৫ অধ্যায়]

আমাদের এখানে ইতিহাসের দৃষ্টি ফেলে দেখতে হবে যে এই অগ্নি, বরুণ (জলেশ্বর সমুদ্র) এঁরা এক-একজন রক্তমাংসের যোদ্ধাপুরুষ। অগ্নি এবং সমুদ্রের প্রতীক ধারণ করতেন এবং সেই প্রতীকনামেই তাঁরা অভিহিত হতেন। তা হলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সমুদ্র বা বরুণ জলভাগের উপরই রাজত্ব করতেন — সাক্ষাৎ সমুদ্র ছিলেন না। আর পঞ্চজন দৈত্য

কোনো বিশেষ দৈত্যের নাম নয় — পাঁচজন দৈত্য মিলে পঞ্চজন সংস্থা করেছিল — স্রেফ জলদস্যুবৃত্তি করার জন্য। সান্দীপনি মুনির পুত্রকে এরা বস্তুত পণবন্দি করেছিল। মুণি কিছু করতে পারেননি। বিশেষ কারণ হল 'পঞ্চজন' সংস্থা ছিল বরুণ নামক জলভাগাধিপতির আশ্রিত। কৃষ্ণ-বলরাম সসৈন্য প্রভাসে উপস্থিত হওয়ায় বরুণ তাঁকে বাধা দেন না। তখন কৃষ্ণ-বলরাম বরুণের অধিকৃত জলভাগপ্রদেশে প্রবেশ করে পঞ্চজনকে সংহার করে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন।*

পুরাণগুলিতে মথুরার যে-ইতিবৃত্ত কথিত তাতে দেখা যায় মথুরার অধিপতি ছিলেন মধুদৈত্য। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হর্যশ্বের শ্বশুর ছিলেন মধু। মধু জামাতাকে আনর্তদেশ প্রদান করেন। তাঁর রাজত্বকালে ওই দেশ গোধন ও শস্য সম্পদে পরিপূর্ণ হয়। তিনি এখানে রথ-দুর্গাদি নির্মাণ করেন [হরিবংশ/৯৩ অধ্যায়]। অতএব কৃষ্ণের কালেরও বহুযুগ আগেই সমুদ্রতীরবর্তী আনর্ত দেশে একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সমুদ্রতীরবর্তী বলে সমুদ্রসভ্যতাও গড়ে উঠেছিল। সমুদ্রসভ্যতার অবদান মৎস্যসম্পদ, রতন আহরণ, নৌসেনাবাহিনী আর অপদান হল জলদস্যুতা। সেই চিত্রই রয়েছে রূপকের আড়ালে। তাই কৃষ্ণের দ্বারবতী নির্মাণের কালে জলদস্যুরা ছিল। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তাদের নগরীতে প্রবেশের আশঙ্কাও ছিল। তার মস্ত প্রতিবন্ধক ছিল চতুঃসীমানায় গভীর প্রাচীর ও পরিখা। শুধু তাই-ই নয়, পরিখার দুই পারে সৈন্যবাহিনী অবশ্যই ছিল স্থানে-স্থানে। অস্যার্থ, নগরীর মধ্যেও স্থানে-স্থানে 'মিনি' দুর্গ ছিল। ছিল যে তার পরোক্ষ প্রমাণ, বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র স্থাপনের উল্লেখে, যথা :

'(নগরীর) স্থানে-স্থানে সুতীক্ষ্ণ যন্ত্র, শতঘ্নী ও লৌহনির্মিত চক্র সকল বিরাজমান রহিয়াছে। ...স্বর্গের (অমরাবতী স্বর্গ) ন্যায় উহার মধ্যেও স্থানে-স্থানে উন্নত পতাকা পরিশোভিত কিঙ্কিণীযুক্ত (ছোট-ছোট ঘণ্টাকে এখানে বলা হচ্ছে কিঙ্কিণী — ঘুঙুরের মতো ক্ষুদ্র ঘণ্টা) আট সহস্র রথ।'

এই আট হাজার রথ এবং অস্ত্রশস্ত্র তো রাস্তায় যত্রতত্র ছড়ানো-ছিটানো ছিল না। স্থানে স্থানে নির্মিত দুর্গে স্থাপিত ছিল। এবার নগরীর কিছু বর্ণনা : — 'উহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ এবং প্রশস্তা পরিমাপ আট যোজন। উপনগরের সহিত দৈর্ঘ্য গণনা করিলে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। উহার দৈর্ঘ্যে চারিটি ও পরিসরেও চারিটি রাজপথ। সুতরাং সমুদয় চতুষ্পথ (Crossings of two roads) ষোড়শ।'

মূল নগরী আয়তাকার। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৩:২। পূর্বে স্কেচে রাস্তাগুলির পরস্পর ষোলটি ছেদবিন্দু দেখানো হয়েছে।

'বিশেষ পুরনির্মাণ-বিশারদ শুক্রাচার্যের বুদ্ধিকৌশলে ওই সমস্ত পথই এক মূলপথে মিলিত হইয়াছে।'

সেই বুদ্ধিকৌশলটি জানা না গেলেও কীভাবে তা হতে পারে, তা স্কেচে দেখানো হয়েছে।

* মহাভারতেও কৃষ্ণের পঞ্চজন দৈত্য সংহারের উল্লেখ রয়েছে, যথা : — 'তিনি (কৃষ্ণ) জলজন্তু সমাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সেই হৃষিকেশ যুদ্ধে পাতালতলবাসী পঞ্চজনকে সংহার করিয়া পাঞ্চজন্য দিব্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছেন।'

[সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি — মহাভারত/ দ্রোণ পর্ব/১১শ অধ্যায়]

লক্ষণীয়, চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করে পরিখার পরেই রাজপথ। ভিতরের আটটি পথের ১৬-টি মুখই পরিখা সন্নিহিত পথে মিশেছে। ১-সংখ্যক বিন্দুতে পরিখার উপর সেতু, যা নগরীতে বাইরে থেকে প্রবেশের একমাত্র পথ, তথা দ্বার (পূর্বদিকে অবস্থিত)।

অবশ্য গুপ্তপথ বা সড়ঙ্গপথও ছিল নগরীতে প্রবেশ ও নির্গমণের। সে-কথাও বলা হয়েছে — 'মহারথ বৃষ্ণিগণের কথা দূরে থাক, দ্বারকাবাসী স্ত্রীজনেরাও যুদ্ধ করিতে বিমুখ নহেন। উহার সাতটি ব্যূহপথ বিশ্বকর্মার স্বহস্ত বিনির্মিত।' [হরিবংশ/১৫৬ অধ্যায়]

কৃষ্ণের দ্বারকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

দ্বারকার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য অনেক কাল ধরেই চলেছে। মোটামুটি একটি সুপ্রাচীন সামুদ্রিক সভ্যতার অস্তিত্বের সন্ধান এখানে পাওয়া গেছে। সে-ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক প্রাপ্ত তথ্যগুলি এ-রকম :

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ এইচ.ডি.সাংকলাই বোধ হয় প্রথম যিনি বর্তমান দ্বারকার স্থলভাগে উৎখনন শুরু করেছিলেন। প্রাপ্ত বস্তুর বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, দ্বারকা খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দের বেশি পুরনো নয়।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হীরানন্দ শাস্ত্রী মূল দ্বারকায় খননকার্য করেছিলেন। প্রাপ্ত বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ অব্দের আগে এখানে কোনো সভ্যতা গড়ে ওঠেনি।

১৯৭৯ সালে এস.আর. রাও দ্বারকায় জগন্নাথমন্দিরের উত্তর দিকে খনন করে মাটির তলা থেকে পান একটি চিনামাটির পাত্র। টি.এল. ডেটিং* করে পাত্রটির বয়স স্থির করেন খ্রি:পূ: ১৩০০ বছর আগের। মোটামুটি তা মহাভারত-যুগের কাছাকাছি বলা যায়। এই সময় দ্বারকাধীশ-মন্দিরের চত্বরে একটি আধুনিক বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন শুরু করেন। প্রথমে এখানে মাটির নীচে নবম শতাব্দীর এক বিষ্ণুমন্দির পাওয়া গেছে।

তার নীচে ১০ মিটার (গভীরতা) খনন করে দুটি মন্দির পাওয়া গেছে — একটি খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর, অপরটি খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর। এবং তার নীচে এক জনবসতি। এই স্তর থেকে লাল চকচকে কিছু বাসনপত্র পাওয়া গেছে। বাসনপত্রগুলির নীচে জমে রয়েছে বালি ও পলি মাটি। একদা এই গভীরতায় এখানে সমুদ্র বিরাজমান ছিল, — বালি আর পলি তারই ইঙ্গিতবাহী। সমুদ্র পরে সরে গেছে।

১৯৮১ সালে গোয়া-র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি (NIO) একটি সামুদ্রিক প্রত্নতত্ত্বীয় বিভাগ চালু করেছে। এঁরা প্রত্যেক বছর দ্বারকায় সমুদ্রগর্ভে শীতকালে খননকার্য চালিয়ে আসছেন। এঁরা একটা পাথরের নোঙর পেয়েছেন যার বয়স খ্রি: পূ: ১৪০০-১২০০ বছর। এ-ধরনের নোঙর পাওয়া গেছে সিরিয়া ও সাইপ্রাসে। এ-ছাড়া দ্বারকায় পাওয়া গেছে তিন মাথাওয়ালা জন্তুর ছাপ মারা শিলমোহর। তিন পশু হল — ছোট শিংওয়ালা ষাঁড়, এক শৃঙ্গ ঘোড়া ও ছাগল। একটি শাঁখের গায়েই এ-রকম শিলমোহরের ছাপ মিলেছে। এ-ছাড়া

*T.L.Dating = 'Thermo-Luminescence Dating' চিনেমাটি বা অজৈব পদার্থের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে। প্রাচীন জৈব পদার্থের (Organic) বয়স জানা যায় Carbon dating-এর সাহায্যে।

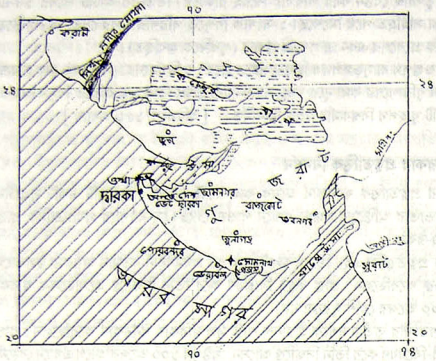

দ্বারকা, প্রভাস ও আনর্ত দেশ

আনর্ত দেশ

মিলেছে তামার লোটা ও পিরিচ। বাহরিনে এ-রকম নিদর্শন মিলেছে। বোঝা যায় দ্বারকা ও বাহরিনের মধ্যে বহির্বাণিজ্য চলত এক-কালে।

দ্বারকা, প্রভাস ও আনর্ত দেশ

ওখা থেকে ২ কি.মি. এবং দ্বারকা থেকে ৩০ কি.মি. দূরে ভেট (বৈঠ্ দ্বারকা : বৈঠ-এর কথ্যরূপ ভেট) দ্বারকা। কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, দ্বারকা বা দ্বারবতী নগরী বর্তমান দ্বারকার দক্ষিণের কিছু দূর থেকে, ভেট-দ্বারকা ছাড়িয়ে আরো উত্তরে বা উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে কিছু অংশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে কিন্তু একটি ছোট্ট দ্বীপের মতো অংশ রক্ষা পেয়েছে। সেটি এখন বিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রগর্ভে বিরাজ করছে। সেটিও দ্বারকারই অংশ। তাই লোকে সেই বিচ্ছিন্নভাবে অংশের নাম দিয়েছে ভেট-দ্বারকা।

কিন্তু কোথায় গেল সেই রৈবতক পর্বত? তার চিহ্ন ১৯৯০ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে মেলেনি। অথচ সব ক-টি কৃষ্ণ-বিষয়ক পুরাণে এই রমণীয় পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে, যা ছিল দ্বারকার পূর্বদিকে। এই রৈবতক পর্বত থেকে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন। সুতরাং এটি কোনো কাল্পনিক পর্বত নয়। হরিবংশে (১৫৬ অধ্যায়) এবং মহাভারতে (সভা/১৩ অধ্যায়) রৈবতকের যে-বর্ণনা রয়েছে তাতে রৈবতককে খুব উন্নত (উঁচু) পর্বত বলা হয়নি। বিষ্ণু পুরাণে এর কোনো উল্লেখ নেই। হরিবংশে বলা হয়েছে, রৈবতকের চূড়াগুলি মন্দর পর্বতের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ। অতএব বরফ জমে না। আর মহাভারতে বলা হয়েছে এর দৈর্ঘ্য তিন যোজন, প্রস্থ এক যোজনেরও বেশি এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। এর থেকে বোঝা যায়, পর্বতটি টিলার মতো উচ্চতাবিশিষ্ট। তার মধ্যে শৃঙ্গযুক্ত অংশ কিছু বেশি উচ্চতাসম্পন্ন। অতএব অনুমান করা খুব অসঙ্গত বা যুক্তিহীন হবে না যে, একদা এই পর্বত ছিল দ্বারকা ও ভেট-দ্বারকা ছাড়িয়ে দু-দিকে — যথাক্রমে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পূর্বে/উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে (আনর্তদেশ) মোটামুটি সে-রকম এক কাল্পনিক নয়, কল্পনা-প্রসূত বিস্তার দেখানো হয়েছে রৈবতক পর্বতের, যা অধুনা অদৃশ্য। যে-প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় ভেট-দ্বারকা বিচ্ছিন্ন হতে পারে দ্বারকা থেকে, সেই একই কারণে রৈবতক পর্বতও অদৃশ্য হতে পারে।

প্রাচীন দ্বারবতীর নিদর্শন

বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে হীরানন্দ শাস্ত্রী ভেট-দ্বারকার শঙ্করনারায়ণ ও ধীঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দিরের কাছাকাছিও খননকার্য চালিয়েছিলেন। তাতে তিনি খ্রি:পূর্ব: তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের জনবসতির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। আটের দশকে মূল দ্বারকায় যে-সব জিনিসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, তার সাথে ত্রিশের দশকে ভেট-দ্বারকায় প্রাপ্ত জিনিসের প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষ করা গেছে।

ভাটার সময় এখানকার (ভেট দ্বারকার) পাহাড় থেকে ১৮০ মিটার দূরে সমুদ্রের দিকের দেওয়াল দেখা যায় যা বিরাট-বিরাট পাথর দিয়ে তৈরি। পাথরের গড় মাপ ১.০x০.৬x০.৫ মিটার। দেওয়ালের আশে পাশে একই আকারের বহু পাথর অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো। ওগুলি যে সমুদ্র-দেওয়ালের অংশই ছিল, তা বোঝাই যায়। পাথরগুলির এক-একটির ওজন ৪

কুইন্টাল/আধ টন। ঢেউ বা স্রোতের টানে এগুলিকে স্থানচ্যুত করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। তরঙ্গাঘাতে দেওয়াল অবশ্য ভেঙে যেতে পারে। তাই-ই হয়েছে।

উৎখননে প্রাপ্ত শিলমোহরগুলি আমাদের ভাবিত করে, — এগুলি কী প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত? কৃষ্ণের দ্বারকার সকল নাগরিকের হয়তো পরিচয়পত্র ছিল। পরিচয়পত্রে শিলমোহরের ছাপ ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ নগরীতে প্রবেশ করতে পারত না — এমন তথ্য রয়েছে হরিবংশে। অনিরুদ্ধ-উষার প্রণয়কাহিনীতে পাই সে কথা।

বানপুত্রী উষা, প্রদ্যুম্ন-পুত্র (কৃষ্ণ-রুক্মিণীর সন্তান) অনিরুদ্ধকে পতিত্বে বরণে অভিলাষিণী হয়ে সখী চিত্রলেখাকে দ্বারবতী যেতে অনুরোধ করছেন, অনিরুদ্ধকে সানুনয়-বার্তা নিবেদনের জন্য। চিত্রলেখা উষাকে দ্বারবতী নগরীতে প্রবেশের দুর্ভেদ্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন — 'দ্বারকার দ্বার লৌহকীলকে আচ্ছন্ন এবং রক্ষিগণে পরিরক্ষিত। দ্বারকাবাসী বৃষ্ণিকুমারগণ নগরীর চতুর্দিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। বিশেষত তাহার প্রান্তভাগে সমুদ্র, তাহার পরে প্রথমে শৈলময় প্রাচীর এবং পরিখা, দুর্গমার্গ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরেই বিবিধ ঋতুমণ্ডিত পর্বতদ্বারা সাতপ্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছে। অপরিচিত ব্যক্তিরা কোনোক্রমেই তথায় প্রবেশ করিতে পারে না'[হরিবংশ/১৭৬ অধ্যায়]। পরিচিত-অপরিচিত নির্দিষ্টকরণের জন্যই শিলমোহর।

প্রত্যেক বছর শীতকালে যখন সমুদ্রজল তটভাগ থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং ঢেউ-এর তীব্রতা থাকে না তখন সমুদ্রগর্ভে উৎখনন চলে। দ্বারকার যুগসঞ্চিত কিংবদন্তি অবসানের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ইউনেসকো এবং ব্রিটেন সহ আরো কয়েকটি রাষ্ট্র। প্রত্যেক বছরই কিছু-না-কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি হল আরব সাগরের তলদেশে এক বৃহৎ নগরীর সন্ধান মিলেছে/মিলছে। এবং বোঝা যাচ্ছে পুরাণে বর্ণিত দ্বারবতী নগরীর দৈর্ঘ্যটা (১২ যোজন) খুব একটা কল্পকথা নয়।

মহাভারতে বর্ণিত দ্বারকাপুরীর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন

মহাভারতের মৌসলপর্বের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই যদুবংশীয়গণ পরস্পরের মধ্যে গৃহযুদ্ধে বিনষ্ট হয়েছেন — কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণে নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৬ বছর কাল জীবিত ছিলেন কৃষ্ণ। মহাভারতে এই সময়কালের মধ্যে কোনো যুদ্ধঘটনা বর্ণিত হয়নি। আর দ্বারকা আক্রমণ করার সামর্থ্যই বা কার ছিল? একমাত্র পাণ্ডবদেরই ছিল, কিন্তু তাঁরা তো পরম-আত্মীয়। কৃষ্ণের উত্তরোত্তর বয়স বৃদ্ধির কারণে বৃষ্ণি-যাদবদের উপর তাঁর পূর্বেকার প্রভাব ছিল না — ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তিনি প্রায় শতবর্ষ জীবিত ছিলেন, এ কথা মনে রাখলে আমাদের তা বুঝতে অসুবিধা হবে না।

সুতরাং বহুবর্ষ (কয়েক দশক) যাবত সমুদ্র-প্রাচীরের যথাযথ রক্ষণব্যবস্থা যে উপেক্ষিত হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা নেই। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না, তাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও উপেক্ষিত হয়েছে। ঠিক যে অবস্থা হয়েছিল কংস-শাসিত মথুরানগরীর। স্বয়ং জরাসন্ধই ছিলেন মথুরার প্রাচীর-স্বরূপ। তাই নগরীর প্রাচীরের যথাযথ রক্ষণ কংস উপেক্ষা করেছেন। কংসবধের পর সেই দুর্দশাগ্রস্ত প্রাকারের জন্য কৃষ্ণ ও যাদবেরা জরাসন্ধের আক্রমণে খুবই বিপদাপন্ন হয়েছিলেন। এখানেও সেই ব্যাপার। জরাসন্ধ-ভীতির কারণেই দ্বারবতী দুর্গ-নগরী। তাই

জরাসন্ধ-বধের পর নগরীর রক্ষণ ব্যবস্থা ধীরে-ধীরে শিথিল হয়েছে। এবার সময়ের হিসাবটি করা যাক।

কৃষ্ণ দ্বারবতীতে প্রস্থান করেন তাঁর ২২ বছর বয়সে। মনে করার কোনো কারণ নেই যে সেই সময়ই মথুরাবাসী যাদবদের সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকায়। তা হয়েছে পর্যায়ক্রমে। পর্যায়ক্রমে নগরীর আয়তন বৃদ্ধি ঘটেছে— ঘটেছে সমুদ্রপ্রাচীরের নির্মাণ। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। কৃষ্ণ ভীমার্জুনের সহায়তায় জরাসন্ধ-বিনাশ করেন যখন তাঁর (কৃষ্ণের) বয়স ৪৭। অতএব দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ১২ যোজন (?) দীর্ঘ সমুদ্রপ্রাচীর তিনি গড়ে তুলেছিলেন। এটাই ঐতিহাসিক সত্য। আর তার পরও বেঁচেছিলেন ৫৩ বছর। ৫৩ বছর ধরেই প্রাচীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। প্রথম দিকে কিছু মেরামত হয়ে থাকলেও, পরের দিকে তা উপেক্ষিত হয়েছে, যেহেতু যাদবদের শিরঃপীড়ার তেমন কিছু কারণ ছিল না।

অতএব মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখেছিলেন প্রাচীরের ভগ্ন থেকে ভগ্নতর দশা। তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন এত দীর্ঘ প্রাচীর ভেঙে যাবে। সমুদ্রের জল যাতে নগরে না ঢুকে পড়ে, শুধু সেটুকু রক্ষণাবেক্ষণ, যা তিনি অতি বার্ধক্যে করছেন, তাও কেউ করবে না তাঁর মৃত্যুর পর। অতএব মহাপ্রয়াণের কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি পাণ্ডবদের — যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের সাথে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন যাদবদের দ্বারকা থেকে সরাবার জন্য, যাতে নগরী সমুদ্রগর্ভে কোনোদিন চলে গেলেও নাগরিকেরা প্রাণে বাঁচেন। বস্তুতপক্ষে প্রাচীরের জন্যই সমুদ্রের জোয়ারের জল নগরে প্রবেশ করতে পারত না। প্রাচীর স্থানে-স্থানে ভগ্ন হলে সমুদ্রের জলে দ্বারবতী সমুদ্রজল-প্লাবিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা কৃষ্ণ অবশ্যই ভেবেছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে এ-বিষয়ে পূর্বেই অবহিত করে রেখেছিলেন।

প্রভাসে আত্মকলহে যদুবংশীয় বীরগণ প্রায় সকলেই নিহত হলে কৃষ্ণ বুঝলেন তাঁরও প্রস্থানমুহূর্ত সমাগত। দ্বারকায় অবশিষ্ট জীবিত রয়েছেন বস্তুত পক্ষে বালক-বালিকা, কামিনীগণ, বসুদেব এবং তাঁর পত্নীগণ। কৃষ্ণ বুঝলেন বিলম্বণ যে, এর পর অবশিষ্ট দ্বারকাবাসীকে সমুদ্রের জলপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হতে হবে, কেউ রক্ষা করতে পারবে না — সেটা শীঘ্রই হোক, আর কিছু বিলম্বে হোক। তাই তিনি সারথি দারুককে হস্তিনাপুরে পাঠালেন অর্জুনের কাছে — তিনি যেন দ্বারকাবাসীদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণ, পিতা বসুদেবকে বললেন অর্জুনের আগমন কাল পর্যন্ত অন্তঃপুরস্থ কামিনীদের যেন রক্ষা করেন সযত্নে।

এর পর কৃষ্ণ যোগমার্গে প্রাণবায়ু বিসর্জন দিলেন। জরাব্যাধের হাতে মৃত্যু হয়নি তাঁর। জরা প্রতীকী। ব্যাধ যেমন পাখিদের প্রাণহরণ করে, জরাকাল তেমনি মানুষের। অর্জুনও অতি প্রবৃদ্ধ পুরুষ, গাণ্ডীবে গুণ সংযোজনের ক্ষমতা নেই শতবর্ষী অর্জুনের। তিনি সকলকে নিয়ে চললেন হস্তিনাপুরের পথে। পথিমধ্যে শ্রেষ্ঠ যাদবরমণীদের লগুড়ধারী দস্যুরা নিয়ে গেল। অর্জুন কিছু করতে পারলেন না। সাত্যকিপুত্র ও ভোজ-কামিনীদের তিনি মার্তিকাবত নগরে সন্নিবেশিত করলেন। বাকিদের নিয়ে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে (খাণ্ডবপ্রস্থে)। ইন্দ্রপস্থের শাসনভার কৃষ্ণের প্র-পৌত্র বজ্রকে দিলেন। এই ব্যবস্থাগুলি যুধিষ্ঠিরের আদেশ ও অনুমোদন ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই হয়নি।

এগুলি কোনোটিই তাৎক্ষণিক চিন্তাপ্রসূত নয়, যুধিষ্ঠিরের পূর্বচিন্তিত। মনে হয় কৃষ্ণ এবং তাঁর মধ্যে পূর্বেই বোঝাপড়া হয়েছিল। দারুক যখন হস্তিনাপুরে যাত্রা করেন তখন কৃষ্ণ জীবিত।

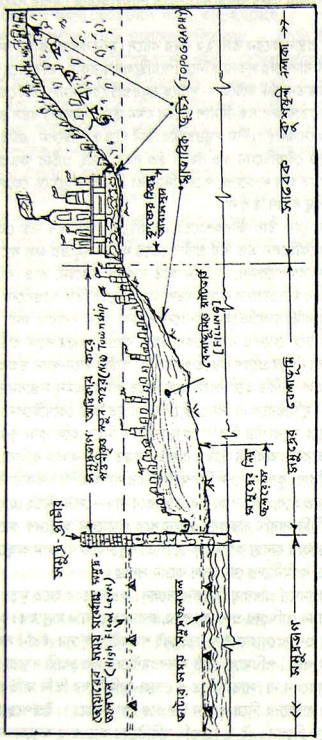

সমুদ্রভাগে ও সমুদ্রগ্রাসে দ্বারকার একাংশ

অর্জুন যখন দ্বারকায় এলেন, তার আগেই কৃষ্ণ স্বধামে প্রস্থিত। অতএব অর্জুন হস্তিনাপুরে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরের কাছে কৃষ্ণের মৃত্যুবার্তা দিলেন। যুধিষ্ঠির তারপর মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রার চিন্তা করলেন।

ওদিকে, অর্জুন দ্বারকাবাসী সকলকে দিয়ে দ্বারবতী নগরীর 'যে-যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই-সেই অংশ অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল।' [মৌসলপর্ব/৭ম অধ্যায়]। হরিবংশে বলা হয়েছে — 'এদিকে সমুদ্র, শূন্য-দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিল। সাগর কেবল একমাত্র কৃষ্ণের গৃহ প্লাবিত করিল না'। ['প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ — বিষ্ণু - ৫/৩৮/৯]। মহাভারত এবং হরিবংশের বর্ণনাগুলি বিশ্লেষণযোগ্য।

হরিবংশে দ্বারকাপুরীর যে-আয়তনের কথা বলা হয়েছে, তা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১২ যোজন এবং ৮ যোজন। উপনগরের সাথে দৈর্ঘ্য গণনা করলে দ্বিগুণ হবে। অস্যার্থ উপনগরসহ দ্বারবতীর আয়তন ২৪ যোজন x ৮ যোজন = ১৯২ বর্গযোজন। কৃষ্ণের বাসভবন বলে যে চিহ্নিত অংশ তার বিবরণ : 'পুরীর মধ্যভাগে বাসুদেবের গৃহ, চার যোজন আয়ত এবং চার যোজন বিস্তীর্ণ, অর্থাৎ ৪x৪ = ১৬ বর্গযোজন। তার অর্থ সমগ্র দ্বারবতী নগরীর আয়তনের $^{১}/_{১২}$ অংশ (১৬/১৯২) ছিল কৃষ্ণের নিজস্ব এলাকা। এর মধ্যে ছিল ক্রীড়াপর্বত ও ছয় জন কৃষ্ণ-মহিষীর অট্টালিকা। এ-ছাড়া ছিল 'বিরজা' নামে মধ্যস্থলে এক সভাগৃহ — উপাসনাদির জন্য যার বিস্তার এক যোজন। [দ্রষ্টব্য হরিবংশ/১৫৬ অধ্যায়]

কৃষ্ণের এই নিজস্ব এলাকা ছিল নগরীর 'পশ্' এলাকা — সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অবস্থানে। আমাদের কোনো সন্দেহ নেই — এ-স্থান ছিল সমুদ্রজলসীমা থেকে অনেক দূরে, রৈবতক পর্বত সন্নিহিত এবং সাবেক কুশস্থলী নগরীর অন্তঃস্থলে। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে সমুদ্র-প্রাচীর নির্মাণের পূর্বে এই স্থানে কোনোদিন জল পৌঁছত না। সমুদ্র-প্রাচীর নির্মাণের দ্বারা জোয়ারের সময় সমুদ্রজলের যে-বিস্তৃতি ছিল, তাকে শাসিত করা হয়েছিল মাত্র। প্রাচীরের ভগ্নদ্বার দিয়ে সমুদ্রজল প্রবেশের সুযোগ পেলে তা ঠিক তার স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারত কিন্তু কৃষ্ণের এলাকার বাইরেই থেকে যেত।

সমুদ্রভাগে ও সমুদ্রগ্রাসে দ্বারবতীর একাংশ

আগের পাতায় স্কেচে সবকিছু দেখানো হল। যদি সমুদ্রের জলকে প্রাচীর দিয়ে আটকানো না হত, তবুও সর্বাপেক্ষা ভারী জোয়ারের সময় সমুদ্রজলতলের রেখার উপরেই কৃষ্ণের আবাসস্থানটি থাকত যা সম্ভবত রৈবতকের পাদদেশেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু প্রাচীর ভগ্ন হলে শহরের গড়ে ওঠা নতুন অংশ সম্পূর্ণরূপে জলতলে যাওয়ার কথা। এটাকেই দ্বারবতী বলা হত। অবশ্য বৃহত্তর দ্বারবতী ছিল সাবেক কুশস্থলীকে নিয়ে। দৃষ্টান্ত: যেমন শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী। কৃষ্ণের দ্বারবতীর ক্ষেত্রে ঠিক সেটিই হয়েছে। তবে ঠিক কবে হয়েছে, তা এবার দেখা যাক।

বস্তুত কৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই দ্বারবতীর ক্ষয় শুরু হয়েছিল। খুবই স্বাভাবিক। যাদবেরা দাম্ভিক ও এতই আত্মতুষ্ট হয়েছিলেন যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছিল। নগরীর সুরক্ষাকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল, — হচ্ছিল সমুদ্র-প্রাচীরের ও রক্ষণকর্মের। ফলে সমুদ্রজল, দ্বারবতী নগরীর নিম্নভাগকে প্লাবিত করছিল — উত্তরোত্তর বেশি-বেশি অঞ্চলকে এবং অধিবাসীদের সেখান

থেকে সরিয়ে সাবেক কুশস্থলী এলাকায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল। অনেকে দ্বারকা ত্যাগ করে অন্যত্র (অন্য দেশে) চলে যাচ্ছিল। বৃষ্ণিবংশীয় বা এক কথায় যদুবংশীয় ছাড়া তো বহিরাগত লোক ছিল অনেক। তারা প্রায় সকলেই গৃহযুদ্ধের (প্রভাসে) আগেই চলে গিয়েছিল। ছিল শুধু কৃষ্ণের স্ব-বংশীয়েরা ও আত্মীয়স্বজনেরা। তার কারণ প্রভাসে প্রধান-প্রধান পুরুষেরা নিহত হন। বহু যাদবরমণী প্রভাসে নিহত তাঁদের স্বামীদের সাথে সহমরণে যান।

অতএব যদুবংশীয়দের কিছু মহিলা, বালক-বালিকা এবং বৃদ্ধই অবশিষ্ট ছিল। অল্পসংখ্যক পুরুষও থাকতে পারে। কৃষ্ণ মূলত এদেরই সুরক্ষার জন্য তাঁর প্রয়াণের আগে অর্জুনকে বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন। অর্জুন দ্বারকায় এসে ছ-দিন ছিলেন। তার মধ্যে নিহতদের প্রেতকার্য সম্পন্ন হয়। তার পর তিনি সকলকে নিয়ে সপ্তম দিবসে ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করেন। কারা-কারা কীভাবে গিয়েছিলেন, সেই বিবরণ রয়েছে মহাভারতে :

> তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দভ ও উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক তাঁহার (অর্জুনের) অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদয় অর্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্বতাকার গজসমূহে আরোহণপূর্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশীয় বালকগণ, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও প্র-পৌত্র বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ওই সময় ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথী অর্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোকসমভিব্যাহারে দ্বারকানগরী হইতে বহির্গত হইলেন। [মহাভারত/ মৌসলপর্ব/৭ অধ্যায়]

উপরোক্ত বর্ণনায় দু-টি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় : (১) অর্জুনের সঙ্গে শুধু যদুবংশীয়রা যাননি, চতুর্বর্ণের জনসাধারণের কিছু মানুষও গিয়েছিলেন। অবশ্য শেষোক্তদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্জুন দ্বারকায় আসেননি। (২) এদের প্রস্থানে দ্বারকাপুরী জনশূন্য হয়ে গেল, এমনটা যেমন বলা হয়নি, তেমনি বলা হয়নি সমুদ্র দ্বারকাকে গ্রাস করেছিল।

সমুদ্রজল প্লাবিত করেছিল সেই সব স্থান যা অর্জুন সদলবলে অতিক্রম করছিলেন, — এমনটাই মহাভারতে বলা হয়েছে। ঠিক এমন ঘটনা ঘটেছিল, এমনটা মনে করার কারণ নেই কিন্তু এই বিবরণের মধ্যে সত্য হল, অর্জুন দ্বারকা ত্যাগের পর সমুদ্রজল দ্বারকাকে প্লাবিত করেছিল। কিন্তু দ্বারবতী নগরীর সমগ্রটা যে প্লাবিত হয়নি, তা বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় স্পষ্ট — সমুদ্র কৃষ্ণের গৃহ ছাড়া শূন্য দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করল অর্জুন দ্বারকা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর [বিষ্ণু ৫/৩৮/৫—৯]। আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি স্কেচ সহযোগে যে, দ্বারকার সাবেক কুশস্থলী অংশ তখনো জনবহুল যদি নাও হয় জনবসতি ছিল সে- অঞ্চলে। অতএব শূন্য দ্বারকাপুরী বলতে নগরীর নব অংশ (New Township) যা মুখ্যত সমুদ্র-বেলাভূমির উপর গড়ে উঠেছিল। আমাদের বক্তব্য সেই অংশ সমুদ্রজলপ্লাবিত হয়েছিল আগেই — কৃষ্ণের জীবিতকালে। পুরাণগুলিতে সেই ঐতিহাসিক সত্যই বিধৃত কিন্তু কৃষ্ণের ঈশ্বরীয় সত্তার আবরণে ঢাকা।

এবারে আমাদের যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা হল: কোথায় গেল, কৃষ্ণের সেই আবাসস্থান? এহো বাহ্য — কোথায় গেল সেই রৈবতক পর্বত? আবাসগৃহ নিশ্চিহ্ন হতে

পারে কিন্তু পর্বত? একটা আস্ত পর্বতকে কেউ তুলে নিয়ে যায়নি। অতএব সেটি সমুদ্রগর্ভেই রয়েছে — শুধু জলের তলায় নয়, পলিমাটির স্তরে — অনেক নীচে। ভূ-পদার্থবিদরা জানিয়েছেন — গত ১০,০০০ বছরে কচ্ছ উপসাগরের জলস্তর ৬০মিটার বেড়ে গেছে। নানা রকম প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে ধারণা করা হয়েছে, রৈবতক সহ দ্বারকা সমুদ্রজলস্তরের নীচে চলে যায় খ্রি:পূ: ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি, অর্থাৎ ৩,৫০০ বছর আগে।

অতএব ঐকিক নিয়মে সাড়ে-তিন হাজার বছরে সমুদ্রজলের উচ্চতা বৃদ্ধি দাঁড়ায় ২১ মিটার [৩৫০০x৬০/১০০০০]। ভূ-পদার্থবিদরা জানাচ্ছেন, অতটা নয়, দ্বারকা-সন্নিহিত সমুদ্রে জলস্তরের বৃদ্ধি ঘটেছে ১০ মিটার। রৈবতক টিলা জাতীয় পাহাড় তাই তার সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে অবস্থান করার কথা এবং বলাই বাহুল্য কৃষ্ণের সমগ্র দ্বারকাপুরীরও তাই। অতএব অর্জুন দ্বারকা ত্যাগের খুব কম করেও হাজার বছর পর কৃষ্ণের দ্বারবতী নগরী সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রগর্ভে চলে যায় — এমনটাই প্রতীয়মান হচ্ছে।

১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য

সমুদ্র বুজিয়ে যে শহরটি তৈরি হয়েছিল তার কিছু প্রমাণ মিলেছে জলের মধ্যে প্রাপ্ত দেওয়াল-গম্বুজের ভিতগুলির অবস্থান থেকে। গোল গম্বুজগুলো আয়তাকার চুনা পাথরের বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিতের উপর চারটি পাথরের স্তর মিলেছে। বাকিগুলি জলের প্রভাবে স্থানচ্যুত হয়েছে।

কৃষ্ণের দ্বারবতী নির্মাণের আগে যে কুশস্থলীতে জনবসতি গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ মিলেছে ভেট-দ্বারকায় (শঙ্খের আকৃতি বলে শঙ্খদ্বারও বলে) প্রাপ্ত ফুটো করা বয়াম ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে।

খননের ফলে দ্বারকা শহরে পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া গেছে। শহরটি আয়তাকার ছিল, অন্তত এক কি.মি. লম্বা, আধ কি.মি. চওড়া। পুরাণে বর্ণিত দ্বারকার মতোই ডুবন্ত শহরটি।

ঝিনুক, মুক্তা সংগ্রহ ও বহির্বাণিজ্যের ফলে দ্বারকার সম্পদ বেড়ে ওঠে। অধিবাসীরা শিক্ষিত ছিল। তারা সংস্কৃত ব্যবহার করতেন।

ভেট-দ্বারকার পূর্বপ্রান্তে ৩০ থেকে ৪০ মিটার উঁচু পাহাড়ের অবস্থান জানা গেছে। ওটা রৈবতক পাহাড়ের অংশ বলে মনে হয়।

হরিবংশে, নগরীতে স্থানে-স্থানে শতঘ্নী স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। শতঘ্নী হল লোহার কাঁটাযুক্ত দণ্ড। ভেট-দ্বারকায় খননে একটি লৌহদণ্ড মিলেছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যে শতঘ্নী একটি। কাশ্মীরের গুফক্রালে খননের ফলে ওখানে ১৫০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে লৌহ ব্যবহারের কথা জানা গেছে। এর থেকে দ্বারকানগরী নির্মাণের একটা বয়স পাওয়া যায়, যা অন্তত ৩,৫০০ বছরের কম নয়।

দ্বারকার সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার পৌরাণিকতাকে ইতিহাসে রূপান্তরিত করল এভাবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এখনো অব্যাহত।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : 'শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার সত্যানুসন্ধানে'/মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়/'দেশ' - ৫ জুন ১৯৯৩

অন্যান্য রচনা

বন্দিনীর বন্দি

গোলাম মুরশিদ

[ভূমিকা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শুভ সন্ধ্যা। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা শুনলেন জনাব গোলাম মুরশিদ আজ আমাদের অতিথি, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। মুরশিদ সাহেব আবার হাইটেক পণ্ডিত। দেখেছেন, সামনে একটা কী সব খুলে বসেছেন। উনি কিছু একটা করবেন মনে হয়। আমাদের সাধারণত সাহিত্যের বক্তৃতায় এসব দেখার অভ্যেস নেই। কিন্তু উনি তো বিলেতের লোক, ওঁদের দেশে এসব চলছে বোধহয়। যাই হোক, আমরা নিশ্চয়ই চিন্তা-উদ্রেককারী কিছু শুনতে পাব। মাইকেলের জীবন সম্পর্কে আমরা যতটা আগ্রহী, যেটা আমাদের রামকুমার বললেন যে সিনেমায়, নাটকে, যাত্রায় মাইকেল এলেই বেশ ভালো চলে, তাঁর রচনা কিন্তু খুব বেশি লোকে পড়ে না। লোকে মাইকেল পড়ে, প্রধানত পাঠ্যবইতে *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর অংশ, আর শখ করে কেউ কিছু পড়েছে বলে তো আমার মনে হয় না, যদিও সকলেই মাইকেলের নাম জানে। সুতরাং তাঁর রচনাগুলি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার যেমন প্রয়োজন আছে, সে-রকমই তাঁর জীবনী এখনো কিন্তু সম্পূর্ণ জানা যায়নি। বিশেষ করে মাইকেলের যে দক্ষিণভারত পর্ব, আগেকার জীবনীগুলিতে তার অংশ খুবই কম। গোলাম মুরশিদের লেখা যে জীবনীর কথা আপনারা জানেন, 'আশার ছলনে ভুলি' যেটা 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তা পরে আরো সম্মার্জিত এবং আরো সংযোজিত হয়ে পুস্তক আকারে বেরিয়েছে। খুবই জনপ্রিয় বই হয়েছে সেটা। তার মধ্যে যে শুধু পাণ্ডিত্যের ছায়া আছে তা নয়। অত্যন্ত সুখপাঠ্যও বটে। তাতে উনি অনেক বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করে অনেক তথ্য হাজির করেছেন। এখনো বোধ হয় মাইকেল সম্পর্কে, মাইকেলের ইউরোপ প্রবাসের কিছু-কিছু ব্যাপার পরিষ্কার জানা নেই। হয়তো নতুন তথ্য আমরা মুরশিদ সাহেবের কাছ থেকেই আজ জানতে পারব।

মাইকেল সম্বন্ধে কতগুলো খটকা আমার মনে আছে। জানি না সেগুলো আপনাদের মনেও আছে কি না। যেমন শুনেছি, মাইকেল অল্প বয়স থেকেই খুব ইংরেজি বলতেন, প্রায় কলেজে পড়ার সময় থেকেই। কেন? আমি এটা এখনো ধরতে পারিনি। কারণ মাইকেল তো যশোরের একটা গ্রামের ছেলে। এবং গ্রামে প্রায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন। তার আগে তো কলকাতায় আসেননি। তাঁর বাবা তো একলাই কলকাতায় থাকতেন। তিনি মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। তা দশ বছরে একটা ছেলের মধ্যে যথেষ্ট ছাপ পড়ে যায়। তার ভাষা সম্বন্ধে, তার পরিবেশ সম্পর্কে। তিনি বাংলা জানতেন না ভালো এটা খুব বাজে কথা, ভালোই জানতেন। কিন্তু কেন এত ইংরেজি বলতেন, সাহেবি-কায়দা কি করে এল যশোরের একটা গ্রামের ছেলের, সেটা একটা চিন্তার বিষয়! আমার থিওরি হচ্ছে—মুরশিদ সাহেব একমত হবেন কি না জানি না, আমার মনে হচ্ছে যশোরের বাঙাল মাইকেলের ভাষায় বোধ হয় বাঙালত্বটা খুব বেশি ছিল যা একেক জনের থাকে, কিছুতেই যায় না। যেমন সিলেটের যারা লোক কিছুতেই তারা সিলেটের উচ্চারণটা ত্যাগ করতে পারে না। আমি দেখেছি তো। তেমনি অনেক যশোরের লোক আছে যাদের ওই বাঙাল উচ্চারণ থেকেই যায়। আমার মনে হয় মাইকেল যখন কলকাতায় এসে খিদিরপুরে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুলে ভরতি হলেন, সেখানে ওই বাঙাল ভাষায় কথা বলার জন্যে সহপাঠীদের কাছে হাস্যাস্পদ হতেন। আর বাঙালদের সম্পর্কে তখনকার কলকাতার লোকেদের ব্যবহার এরকমই ছিল। তখন তারা সহজে মুখ খুলত না, বাংলা

বলত না। মাইকেল তখন তাড়াতাড়ি ইংরেজি শিখে গিয়েছিলেন। এরকম একটা কিছু হলেও হতে পারে! আর মাইকেল যে অল্পবয়সে রামায়ণ মহাভারত খুব ভালো পড়েছিলেন তার কিছু-কিছু প্রমাণ আছে। কারণ পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর রচনায়, *মেঘনাদবধ কাব্য*ছাড়াও অন্যান্য রচনায় মহাভারতের যে প্রয়োগ করেছেন, সেগুলি শুধু বেশি বয়সে হঠাৎ একদিন পড়ে হয় না। ওর জন্যে একটা রুচি তৈরি করতে হয়। সেটা ওঁদের পারিবারিক ভাবেই উনি পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। এরকম আরো নানা প্রশ্ন ওঁর সম্পর্কে আসতে পারে। গোলাম মুরশিদ এবার তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণ দেবেন। আর আমার বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। আমি বক্তাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

সাহিত্য আকাদেমিতে প্রদত্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রারম্ভিক ভাষণটিকে মুদ্রণের প্রয়োজনে যৎসামান্য সম্পাদনা করা হল।]

মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধাভাজন সুধীবৃন্দ।

আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাব সাহিত্য আকাদেমিকে আমাকে বলবার সুযোগ দেবার জন্যে। এই যোগাযোগটা ঘটেছে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি খুবই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সুনীলদা যে রাজি হয়েছেন এরকম একটা বক্তৃতার সভাপতিত্ব করতে, সে-জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অনেক গুণী ব্যক্তি এখানে আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা যে আমার মতো একজন সাধারণ লোকের কথা শোনার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন সে-জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি। সত্যি-সত্যি, যেটা সভাপতিমশাই বলছিলেন একটু আগে যে সামনে একটা কম্পিউটার রাখা আছে। আমি অনেকদিন ধরে বিদেশে থাকার ফলে বলতে পারেন প্রায় হাই-টেক সব ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি। আমি শুধু কম্পিউটার ব্যবহার করি না বক্তৃতার সময়, এর সঙ্গে একটা multi-media projector-ও জুড়ে দিই। তার ফলে অনেক audio-visual দেখা যায়। কথাগুলো type-writer-এর মতন আসছে, কি শব্দ করে আসছে, দরকার হলে music তার মধ্যে থাকতে পারে। চলমান ছবি থাকতে পারে, নানারকম জিনিসই করা যায়। তা ছাড়া সেটা থাকলে বক্তৃতা খেই হারিয়ে যায় না। অনেকটা কাঠামোর মধ্যে থাকে। আমি সেইজন্য কম্পিউটারটা ব্যবহার করি। আজকাল ভুলেও যাই অনেক কিছু। এলোমেলো হয়ে যায় কথাবার্তা, সেইজন্য এই ব্যবস্থাটা আমি নিয়েছি। আশা করি যে আমার কম্পিউটারটা বিগড়ে যাবে না। এই ভাষণের একটা title দেওয়া যেতে পারে। সেটা হচ্ছে 'বন্দিনীর বন্দি'। এক বন্দিনীর কাছে যিনি চিরজীবন বন্দি ছিলেন। দেখুন, বাঙালি জীবনে আমরা মাইকেলের ছেলেবেলার বা কৈশোরের কথা বলেছি, প্রথম যৌবনের কথা বলেছি। তখন যে-প্রেম ছিল সে-প্রেমের মধ্যে রোম্যান্টিক প্রেমের কোনো আদর্শ ছিল না। গার্হস্থ্য প্রেম — বাপ-মা ঠিক করে দিয়েছেন এ আপনার স্ত্রী — তাঁর সঙ্গে ঠিক কি প্রেম হয় আমি জানি না। কিন্তু এক ধরনের গার্হস্থ্য প্রেম হত, সন্তানাদি হত, কিন্তু আমরা ইংরেজি সাহিত্যে যে রোম্যান্টিক প্রেম দেখলাম, সেটার ধারণা এদেশে তখনো ব্যাপকভাবে চালু হয়নি। ধীরে-ধীরে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে কেন্দ্র করে হয়তো এসেছিল। কিন্তু মাইকেল তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। আমরা যেটা শত চেষ্টা করেও আয়ত্ত করতে পারি না, তিনি সেটা সহজেই দেখে আয়ত্ত করেছেন। ভূমিকায় সুনীলদা বলছিলেন

তিনি খুব ইংরেজি বলতেন। ইংরেজি বলাটা তো সহজ কাজ নয় এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজি খারাপ ইংরেজি নয়। ভালো ইংরেজি। সেটাও কি সেকালে অনেক বাঙালি শিখতে পেরেছিলেন! পারেননি। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়েছিল। তিনি এই যে প্রেম করবেন, প্রেম করে বিয়ে করবেন সেটা পরের কথা, কিন্তু প্রেম করবেন এই ধারণা প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর মধ্যে এসেছিল। এটা বলেছেন তাঁর বন্ধুরাও, তাঁর লেখাতেও আমরা দেখতে পাই। সতেরো-আঠারো বছরে লেখা, তাঁর যে-সব কবিতা আমরা দেখতে পাই, সে কবিতার মধ্যে 'নীল নয়না'র কথা তিনি বার বার বলেছেন। 'Blue eyed maid'— এই নীলনয়না সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর কোনোদিন দেখা হয়নি। সে-ছিল শুধু তাঁর স্বপনচারিনী। স্বপ্নেই নীলনয়নার কথা ভেবেছেন। কিন্তু এই যে ধারণা 'আমি ভালোবাসব', এই ধারণাটাকেই তিনি ভালোবেসে ছিলেন। কিন্তু যারা তাঁর সমসাময়িক ছিলেন তাঁরা তখনো ভালোবাসার কথা চিন্তা করেননি বরং বয়স হলে পর তাঁরা অনেকেই বারবণিতাদের বাড়িতে চলে যেতেন। সেকালে সেটা খুব অপরাধের বিষয় ছিল না, যেমনটা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ বলেছেন। এমনকী মধুসূদন ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে, যে তোমাকে তোমার বাড়িতে প্রায়ই পাই না। তুমি কি, যে-পাপের পথে অন্য যুবকেরা যায়, সেই পথেই যাচ্ছ? কিন্তু মধুসূদনের এ-সমস্ত দোষ ছিল না। তিনি সত্যিসত্যিই রোম্যান্টিক ছিলেন। সে-অশরীরী প্রেমিকার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল। আয়োজিত বিবাহ এবং বাল্যবিবাহে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। সেইজন্যে তাঁর বাবা যখন ডানাকাটা পরির সঙ্গে তাঁর বিবাহ ঠিক করলেন, তিনি লক্ষ করেছিলেন ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে। অন্য পাঁচ-জন যেসব জিনিসে আনন্দিত হয়, সে-সব জিনিসে আনন্দ পায় না। ব্যাপারটা কি! তিনি একটা দাওয়াই তাঁর জন্যে ঠিক করেছিলেন। সেটা হচ্ছে একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া। তাহলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু বিয়ে দিতে গিয়ে দেখলেন ছেলেটা আর পাঁচ-জনের মতো খুশি হচ্ছে না। বিয়ে এড়াতে চাইলেন মধুসূদন। যেদিন খবর পেলেন সেদিনই যে-চিঠি লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু গৌরদাসকে, সে-চিঠি থেকে বোঝা যায় যে তিনি রীতিমতো বিবাহ-আতঙ্কে ভুগছেন। প্রেম করে বিয়ে সে অন্য জিনিস, কিন্তু প্রেম করে বিবাহ এবং দশ বছরের কি নয় বছরের একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে, এটা তিনি ভাবতে পারতেন না। এবং বিশ্বাস করুন গবেষণা থেকে এবং মধুসূদনের সাহিত্য বিশ্লেষণ করে আমার যেটুকু ধারণা হয়েছে, সে হচ্ছে যে, তিনি খ্রিষ্টান যে হলেন তার পিছনে হয়তো বিলেতে যাওয়ার লোভও ছিল, তার পিছনে খ্রিষ্টান ধর্মকে হিন্দুধর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করার একটা কারণও হয়তো ছিল। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মকে এক করে ফেলেছিলেন। গুলিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু প্রধান কারণ যার জন্য তিনি খ্রিষ্টান হলেন আমার ধারণা সেটা হচ্ছে বিয়েটা এড়ানোর জন্যে। খ্রিষ্টান হলে বিয়ে করতে হবে না এবং তিনি হলেন। অতবড় একটা সিদ্ধান্ত তিনি যে নিলেন, তিনি যে বাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু ত্যাগ করলেন, বলতে গেলে জীবনের সবচেয়ে বড় ত্যাগ তিনি স্বীকার করলেন, তার পেছনে কিন্তু এই একটিই কারণ। আমার একটা ছোট্ট মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, যে প্রেম বলে কিছু জানে না এবং আমি প্রেম করতে পারছি না বা পারব না। তিনি কিভাবে বিপদে পড়ে খ্রিষ্টান হলেন, বিশপস্ কলেজে গিয়ে ভরতি হলেন, এতদিন সে-সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। কিন্তু আমি প্রায় দৈবক্রমে অক্সফোর্ডে, তাঁর

বিশপস্ কলেজের সমস্ত কাগজপত্র খুঁজে পাই। এবং সেখান থেকে আমি যেভাবে পুনর্নির্মাণ করেছি এবং এও দেখিয়েছি যে তিনি সত্যিসত্যিই মিশনারি হতে চেয়েছিলেন, খ্রিষ্টান ধর্মে তাঁর বেশ আগ্রহ জন্মেছিল। কারণও আমি আমার বই-এ বলেছি, কিন্তু সে-নিয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই না। শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতার সঙ্গে এমনই দ্বন্দ্ব হল যে পিতা তাঁর সব খরচ বন্ধ করলেন বিশপস্ কলেজের। ২০০ টাকা করে তিনি দিতেন মাসে। সেই যুগে, তখন মাইকেলের কাছে বিকল্প আর কিছু থাকল না। তিনি তখন জাহাজের ডেকের যাত্রীর টিকিট কেটে, (যে সমস্ত যাত্রীবাহী জাহাজ তাতে নয়,) একটা Coaster-এ করে উনিশ দিনের সফরে মাদ্রাজে গেলেন এবং মাদ্রাজে গিয়ে তিনি বসন্তে ভুগলেন, সে-সব কথা এখানে বলছি না কিন্তু তিনি একটা স্কুলের সহকারী শিক্ষক হলেন। সেটা হচ্ছে একটা অনাথ আশ্রম। বেতন ৪৬ টাকা। যে-টাকা তিনি আগে পেতেন তার থেকে কম। মানে যে-টাকা তিনি বিশপস্ কলেজে পড়ার সময় বাবার কাছ থেকে পেতেন, কিংবা যে-টাকার চাকরি তাঁকে offer করা হয়েছিল, ধর্মপ্রচারক হিসেবে ৮০ টাকার চাকরি, তার থেকেও কম। কিন্তু তিনি Usher হিসেবে সেই চাকরিটা গ্রহণ করলেন। এবং সেখানে যদিও Boy's Asylum বলত, সেই স্কুলে মেয়েরাও পড়ত। তার মধ্যে একটি মেয়ের নাম রেবেকা টমসন। রেবেকার সঙ্গে সেখানেই তাঁর প্রেম। কয়েক মাস মাত্র রেবেকা তাঁর ছাত্রী ছিল। কিন্তু প্রেমে পড়তে সময় লাগেনি। আর সত্যি-সত্যি প্রেম এমনি একটা জিনিস যে ওটা তো সত্যি-সত্যি practice করে পড়তে হয় না, সহজেই পড়া যায়। সুতরাং প্রেমে পড়লেন এবং মাইকেলের মতো কালো একটি লোককে ভালোবাসতে একটি ইংরেজ মেয়ের বা আধা-ইংরেজ মেয়ের বেশি কষ্ট পেতে হয়নি। আমার ধারণা অন্ধ প্রেম বলেই তখন সে আর রঙ বিচার করেনি। কবি, রোম্যান্টিক, হয়তো কথাবার্তা শুনেই খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন রেবেকা। ভালোবেসে ফেললেন এবং বিয়ে করলেন। মাইকেল চিঠিতে লিখছেন যে, এই বিয়েতে অনেকেই বাধা দিয়েছিল। রেবেকার বন্ধুরাও খুব বাধা দিয়েছিল। সে-বাধা অতিক্রম করেই বিয়ে করেছিলেন এবং বিয়ের পরে দারুণ পরিতৃপ্তি তাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ পেল। বিয়ের কয়েকমাস পরে তিনি লিখলেন *Captive Lady*। হঠাৎ কবিতার যেন একটা ফোয়ারা খুলে গেল। এবং এই *Captive Lady*-র অনেকটাই আত্মজৈবনিক। আপনি যদি শুধু কাহিনীটাকে ইতিহাস থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারেন, আপনি যদি দেখতে পান যে একজন বন্দিনী নারীকে মুক্ত করে বিয়ে করার চেষ্টা করছে একজন, যে তাকে ভালোবাসে, আর এখানে যদি আপনি এইভাবে চিন্তা করেন যে শ্বেতাঙ্গদের শিবিরে বন্দি একটি নারীকে প্রেম দিয়ে জয় করে বিয়ে করে নিয়ে এসে মাইকেল তাকে মুক্ত করলেন সেখান থেকে, তাহলে খুব একটা অমিল মনে হয় না এ-দুটো কাহিনীর মধ্যে। আমার নিজের ধারণা মাইকেল, ঐতিহাসিক বা আধা-ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে নিজের জীবনের খানিকটা ছাপ রেখেছিলেন। এবং এই যে বন্দিনী নারী যাকে তিনি মুক্ত করলেন, অতঃপর সারাজীবন আমার ধারণা তিনি সেই নারীর কাছে প্রেমের দিক থেকে বন্দিই হয়ে ছিলেন, যদিও বিবাহিত জীবনটি তাঁর খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রেবেকার প্রতি যে তাঁর গভীর প্রেম ছিল তার প্রকাশ আমরা *Captive Lady*-র ভূমিকায় দেখতে পাই। তিনি বলছেন, 'আমি রবিকরোজ্জ্বল স্বপ্ন বুনতে থাকব, তোমার নয়ন আমাকে জোগাবে প্রেরণা। একমাত্র তোমাকে নিবেদন করব আমার প্রেমের মালা। এই নয়নে নয়ন রাখা সত্যিই মধুর। যে-নয়ন প্রেম

জমিয়ে তুলেছে তা সবচেয়ে নরম রশ্মিজাল।' এ-কথা তিনি ভূমিকায় বলেছেন। তার পর মাইকেল বেঁচেছিলেন পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছরে তিনি অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছেন। ১৮৪৮ সালের জুলাইতে বিয়ে হয় তাঁর — ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৮ এই ক-বছরও তিনি অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু *Captive Lady*-এর ভূমিকায় তিনি বলছেন, 'আমি অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়েছি, কিন্তু আর কোনো ক্ষোভ নেই।' তিনি বলছেন, 'তোমার হাসির আলো দিয়ে এই যে ঠাণ্ডা, এই যে হিমের মধ্যে আমি ছিলাম সেটাকে তুমি স্তব্ধ করতে পারো।' একে পেয়ে তিনি দারিদ্র্যের কথাও ভুলে গেছেন। এও ভুলে গেছেন যে তিনি ৪৬ টাকার মাস্টার। তিনি লিখছেন—'তুমি তো আছ সেখানে।' এবং এই সূচনার শেষে তিনি লিখছেন 'তুমি আমার মধুর স্বপন, তুমি আমার। ঝরে যাও আমার বসন্তের স্মৃতি, এখনো তিক্ত, তবু দুঃখ নেই কোনো।' এর পর আমরা দেখতে পাই তাঁর সংসার পাতানোর ছবি। সন্তানের জন্মে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। গৌরদাসকে বলছেন, 'জানো, আমার সন্তান হতে যাচ্ছে।' তার পর এক চিঠিতে লিখছেন 'আমার সন্তান হয়েছে।' এবং লিখছেন 'বাবা-মাকে একটু খবরটা দিতে পারবে? আমি এমন বাংলা জানি না যাতে বাবা-মাকে লিখতে পারব এই খবর।' এ এক অদ্ভুত Pretension বা ভান ছিল মাইকেলের যে তিনি বোধ হয় বাংলা লিখতে পারেন না! বাংলা ভুলে যাওয়াটাই বোধ হয় সেখানে সাহেব হওয়ার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় বলে বিবেচিত হত। আমার ধারণা এটা একটা Snobish ভাব, এ-ছাড়া আর কিছুই নয়। নয়তো মাইকেল বাংলা খুব ভালোই লিখেছেন। গদ্যও, পদ্যও। তার পর তাঁর স্ত্রী চলে যাচ্ছেন নাগপুরে, কারণ নাগপুরে জন্ম হয়েছিল রেবেকার।

রেবেকা তখন গর্ভবতী। কিন্তু তিনি যে গেলেন তখন মাইকেল 'সনেট' লিখছেন। তার মধ্যে খুবই দুঃখ করেছেন যে আজকে আমার ঘর শূন্য। এবং সনেটের শেষের চার পঙ্‌ক্তিতে তিনি নিবেদিত একটি সনেট। এর মধ্যে বিরহের আকুলতাও যেমন আছে, পরিবারের মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্নতাও তেমনি আছে। আর তার পরে গৌরদাসের পত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক উচ্ছ্বাস বউয়ের জন্য। আমার বউ হচ্ছে ইংরেজ, সন্দেহ কোরো না ইত্যাদি। ১৮৫৫ সালে তিনি যখন গৌরদাসের চিঠি পেলেন — বাবা মারা গেছেন, তোমার সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি হচ্ছে, তুমি এসে উদ্ধার কর ইত্যাদি... তখন যে-চিঠি তিনি লিখলেন, সে-চিঠির মধ্যেও অপ্রাসঙ্গিকভাবে লিখলেন, I have a fine English wife and four children — যার দরকার ছিল না। কিন্তু লিখলেন। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে— দাঁড়াচ্ছে ১৮৪৮ সালে তিনি মাদ্রাজ ত্যাগ করলেন, তার এক মাস আগেও তিনি তাঁর এই 'fine English Wife' নিয়ে গর্বিত, সন্তানদের নিয়ে গর্বিত। সুখী। ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে থাকলে এরকম করে লিখতেন না হয়তো! তার পর মাইকেল চলে এলেন কলকাতায়। পরের মাসে। চিঠিতে তিনি লিখছেন ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫। আর তিনি মাদ্রাজ ত্যাগ করছেন ২৮ জানুয়ারি ১৮৫৫। এই এক মাস আট দিনের মধ্যে কি ঘটেছে যার জন্যে রেবেকার কাছে আর কোনোদিন ফিরে যেতে পারলেন না! তার মধ্যে ছোট সন্তানটির বয়স ছিল তখন মাত্র ১ বছর ১০ মাস। এবং তিনি চলে আসার পর কলকাতায় মাত্র দু-মাসের মধ্যে সন্তানটি মারা যায়। কিন্তু মাইকেল তাও গেলেন না মাদ্রাজে। যেতে পারলেন না। নিশ্চয়ই একটা কিছু ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল। আসলে যখন

তিনি প্রেমের কথা লিখছেন, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন তখন দিগন্তে বিচ্ছেদের ঘূর্ণিঝড় দেখা দিয়েছে, সেটা তখনো তিনি টের পাননি, কিন্তু এই ১ মাস ৮ দিনের মধ্যে সেই ঝড় প্রকাশিত হয়ে গেল। হেনরিয়েটাকে যে তিনি ভালোবাসেন, হেনরিয়েটার সঙ্গে যে তাঁর একটা বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম চলছে এ-খবরটি নিশ্চয়ই প্রকাশ পায় তখন। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর প্রেম হল কেন? যে লোকটা বউকে এত ভালোবাসে তাঁর সঙ্গে আবার আর একটি মেয়ের ভালোবাসা হয় কেন! আরে হতেই পারে ভালোবাসা, বউ থাকলেও হতেই পারে! এমনকী আগের যুগে যাদের দুটো-তিনটে বউ থাকত, তাদেরও এমন হতে পারত। মাইকেলের হওয়ার একটা কারণ ছিল। মাইকেল যখন Usher হন, মেইল ও ফার্নের Asylum-এ, তাঁর ঠিক আগে হেডমাস্টার ছিলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর নাম George Xyleswhite। তিনি আবার মাইকেলের একই পাড়ায় থাকতেন। তা ছাড়া মাইকেল যখন মাদ্রাজ University-তে — আসলে হাইস্কুল, হাইস্কুলে যখন Second tutor হলেন তখন First tutor হচ্ছেন এই একই ভদ্রলোক, George Xyleswhite। তাঁর কন্যার নাম হেনরিয়েটা। তিনি কোনো ফরাসি নন। ওই একজন ভদ্রলোক, উত্তরপাড়ার মুখুজ্যে, তিনি এই হেনরিয়েটা ফরাসি ছিলেন এই কথাটি বলে প্রায় একশো বছর লোকেদের বিভ্রান্ত করেছেন। সবাই ভেবেছেন দেখি ফরাসি কে ছিল ওই কলেজে, ওই স্কুলে। একটাই নাম তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন, ডিক্। সেই জন্য মাইকেল মধুসূদনের সমাধিতে যে ফলক লেখা আছে হেনরিয়েটার নামে সেখানে লেখা আছে ডিক্। ডিক্ না আসলে White। আমি এই নামটি খুঁজে পাই যেখানে মাইকেলের দুটি সন্তান হয়েছিল সেই ভার্সাই-তে, ভার্সাই মিউনিসিপ্যাল আর্কাইভ থেকে। তার আগে পর্যন্ত আমি এই পরিচয়টি উদ্ধার করতে পারিনি। সেখানে আমি তাঁর নাম দেখলাম White এবং White দিয়ে যখন আমি তাঁর নাম খোঁজ করলাম Index-এ, সঙ্গে-সঙ্গে পেয়ে গেলাম যে ইনি হচ্ছেন George Xyleswhite-এর কন্যা। কাজেই পরিচয়ের সূত্রটা বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু প্রেমের সূত্রটা কি? প্রেমের সূত্রটা আর একটু অন্যরকম। ১৮৫০ সালে George Xyleswhite-এর স্ত্রী Elisa মারা যান ৪০ বছর বয়সে। তখন তাঁর তিনটি সন্তান, সবাই কিশোর। হেনরিয়েটার জন্ম হচ্ছে ১৮৩৬ সালে। আর এই ঘটনাটা হচ্ছে ১৮৫০ সালে, যার অর্থ হেনরিয়েটার তখন ১৪বছর বয়স। তার তিন বছর পর হেনরিয়েটার বয়স যখন ১৭ তখন White যেহেতু বিয়েতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, একটি নারী দরকার, তাই আর একটি বিয়ে করলেন। বিয়ে যাঁকে করলেন সেই মেয়েটির বয়স হচ্ছে ১৬ বছর। নিজের কন্যার থেকে ১ বছরের ছোট। সুতরাং সম্পর্ক সে-পরিবারের মধ্যে কি হতে পারে, সন্তানদের সঙ্গে মায়ের, এটা আপনারা অনুমান করে নিতে পারেন। আমার নিজের ধারণা, এটার তো কোনো দলিলপত্র নেই, অনুমান করছি, যে তখন কান্নার জন্য হেনরিয়েটাকে তাঁর কাঁধ এগিয়ে দিয়েছিলেন মধুসূদন, সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। সেই সহানুভূতি থেকে আস্তে-আস্তে প্রণয়ের সঞ্চার। কিন্তু প্রণয় কতদূর এগিয়েছিল আমরা সেটা জানি না। কিন্তু এটা যখন জানতে পারেন রেবেকা, নিঃসন্দেহে তিনি খুব ব্যথিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি এক জন কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করেছেন। তখনো পর্যন্ত কোনো শ্বেতাঙ্গ মহিলা কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করেছেন আমি অন্তত তার কোনো record পাইনি। যদিও সূর্য চক্রবর্তী বিয়ে করেছিলেন ওই প্রায় একই সময়ে, এ-ছাড়া আর কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। রেবেকা ভালোবেসে কালো লোককে বিয়ে করেছিলেন, আর এখন সেই কালো লোকটা তাকে ঠকাচ্ছে, অন্য একজন

মেয়েকে ভালোবেসে, এটাকে নিশ্চয়ই তিনি ভালো চোখে দেখতে পারেননি। তখনি তাঁদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে আমার ধারণা। মাদ্রাজ থেকে মাইকেল চলে এলেন, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ হল না। হেনরিয়েটাও মাদ্রাজেই থেকে গেলেন। মাইকেল একা ফিরলেন। তার পর দু-মাসের মধ্যে মাইকেল যার বুদ্ধিতে মাদ্রাজে গিয়েছিলেন বিশপ্স কলেজে, তাঁর সেই বন্ধু Charles Edburgh Keneth কলকাতায় চলে এলেন বউকে নিয়ে। তাঁর বউয়ের নামেই মাইকেল তাঁর নিজের মেয়ের নাম রেখেছিলেন, তৃতীয় মেয়ের। কাজেই তাঁদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। এডওয়ার্ড কেনেথ এলেন, নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য ছিল মাইকেল আর রেবেকার মধ্যে মিলন ঘটানো। তিনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে আর জোড়া লাগেনি। তখন, ঠিক তখনিই নয়, আরো দু-বছর পরে মাইকেল যখন দেখলেন রেবেকার সঙ্গে বিয়ে আর কিছুতেই জোড়া লাগবে না, তখন ডেকে পাঠালেন হেনরিয়েটাকে। হেনরিয়েটা কলকাতায় এলেন এবং জনশ্রুতি তার পর বিয়ে হল। আমার যতদূর মনে হয় এটা ঠিক নয়, আমি জাহাজের তালিকা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও নাম পাইনি হেনরিয়েটার। আমার ধারণা অন্য নামে তিনি এসেছেন, বা অনেক সময় মেয়েদের নাম লেখা হত না। লেখা হত 'এত জন মহিলা।' এই সবের মধ্যে ছিলেন হেনরিয়েটা। কিন্তু হেনরিয়েটা কলকাতায় নামার আগেই *শর্মিষ্ঠা* রচনা করেছিলেন মাইকেল ১৮৫৮ সালে। এই *শর্মিষ্ঠা*-র কাহিনী আসলে নিজের জীবনেরই কাহিনী। *শর্মিষ্ঠা*-র কাহিনী আপনারা সবাই জানেন, দেবযানীর বিয়ে হয়েছে, দেবযানীর পরিচারিকা হয়ে এসেছেন শর্মিষ্ঠা। তিনি হচ্ছেন অসুররাজের কন্যা। এবং শর্মিষ্ঠাকে দেখেই যযাতি ভুলে গেছে। গোপনে তাঁদের গান্ধর্বমতে বিয়ে হয়েছে। সন্তান জন্মেছে তাঁর তিনটি। তার পর একদিন দেবযানীর হাত ধরে যখন শর্মিষ্ঠার বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছেন যযাতি, তখন দৌড়ে এসেছে শর্মিষ্ঠার সন্তানরা। দৌড়ে এসে বলছে, তোমার কি সাহস, তুমি কিনা আমাদের বাবার হাত ধরে যাচ্ছ। কি ব্যাপার? তখন জানাজানি হল বিষয়টা। মাইকেলও সেইরকম যযাতির উক্তির মতোই তাঁর নাটকে একটি উক্তি রেখেছেন। বয়স্যের সঙ্গে কথা হচ্ছে। রাজা বলছেন, কি বলব ভাই, এতদিন পরে রানি আমার প্রেয়সী শর্মিষ্ঠার ব্যাপারে সকলি অবগত হয়েছেন। আমার ধারণা মাদ্রাজ থেকে আসার আগে রেবেকা সকলি অবগত হলেন। নাটকের মধ্যে জিনিসটি কিন্তু মিলনান্তক। কারণ শুক্রাচার্য। রাগ করে চলে গেলেন দেবযানী, কিন্তু শুক্রাচার্য তাঁদের মিলন ঘটালেন। কিন্তু সে-রকম কোনো মুরুব্বি ছিল না। এডোয়ার্ড কেনেথ সেই মিলন ঘটাতে পারেননি। সুতরাং মাইকেলের নিজের জীবনে বিষয়টা হল বিয়োগান্তক। এইটুকুই অমিল। হেনরিয়েটার সঙ্গে সংসার পাতলেন। প্রথমেই চিঠিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন গৌরদাস বসাকের কাছে। তাতে তিনি লিখলেন যে, তুমি যে আমার বউকে শুভেচ্ছা জানিয়েছ তাতে তিনি খুশি হয়েছেন... ইত্যাদি। যতদূর মনে পড়ছে ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের চিঠি। রাজনারায়ণ বসুর কাছেও তিনি এ-রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। না না না, তাঁদের বিয়ে কখনো হয়নি। কারণ তখনো খ্রিষ্টানদের বিয়ে ভাঙার আইন হয়নি — এক, আর দুই হচ্ছে, রেবেকা যখন মারা গেলেন ১৮৯২ সালে তখনো তাঁর নাম লেখা হয়েছে Mrs. Rebecca Dutta। আর বিয়ে না ভাঙলে তো আর-একবার বিয়ে করা যায় না। খ্রিষ্টানদের মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহের কোনো নিয়ম ছিল না, in fact ব্রিটেনে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন পর্যন্ত চালু হয়নি ১৮৮৫ সালের আগে। কিন্তু Civil marriage, যে Civil

marriage ১৮৭৫ সালে চালু হয় ব্রাহ্মদের চেষ্টায়, সেই আইন অনুসারে বিয়ে ভাঙা সম্ভব ছিল হয়তো, কিন্তু সে তো মাইকেলের মৃত্যুর সময়। তার আগে এদেশে কোনো Civil Marriage Act চালু হয়নি। সুতরাং বিয়ে ভাঙেনি, তাঁরা একত্রে বাস করেছেন। মানুষ ধারণা করেছেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু বিয়ে হয়নি। এই সময়টাতে মাইকেলের আরো একবার, যেমন রেবেকার সঙ্গে বাস করার সময় হয়েছিল, তেমনি হেনরিয়েটার সঙ্গে বাস করার সময় সাহিত্যের ফোয়ারা খুলে যায়। তিনি নাটক লিখলেন, আপনারা জানেন, তিনি ৪টি নাটক, ২টি প্রহসন লিখলেন, এতগুলি কবিতার বই লিখলেন, সবই চার বছরের মধ্যে। মোট কথা খুবই সাফল্য এল তাঁর জীবনে। তিনি বন্ধুর কাছে বলছেন, 'একটা বই যে আমাকে এত খ্যাতি দেবে সে তো কক্ষনো ভাবিনি।' এ কথা তিনি বলছেন *তিলোত্তমা* সম্পর্কে। এমনকী *শর্মিষ্ঠা* সম্পর্কেও বলছেন যে, 'আমি কিন্তু এই সাহিত্যের ইতিহাসে বেশ অক্ষয় হয়েই থাকব।' এই সময় তিনি সম্পত্তি উদ্ধার করেন, বাবার সম্পত্তি ফিরে পান। ১৮৬১ সাল নাগাদ। এবং এর ফলে আর্থিক অনটন খানিকটা প্রশমিত হয়। ১২৫ টাকা বেতনের কেরানি ছিলেন তিনি। তারই মধ্যে, ঠিক যখন *মেঘনাদবধ কাব্য* শেষ হল, তখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে 'আত্মবিলাপ' লিখলেন। 'আত্মবিলাপ'—এত কম বয়সে, এত সাফল্যের মধ্যে, এত পরিতৃপ্তির মধ্যে! এর কারণ কী? আমার ধারণা পাপবোধ— মনে রাখবেন তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন— খ্রিষ্টানদের মধ্যে পাপবোধ একটু বেশি থাকে। আর নিতান্ত পাষণ্ড না হলে এই পাপবোধ না থেকে তো পারে না। ভালোবেসেছিলেন একটি মেয়েকে, চারটি সন্তান পেছনে ফেলে এসেছেন, সুতরাং এই পাপবোধ থেকেই তিনি বিলাপ করছেন। তিনি তিনটি বিষয় অবশ্য বেছে নিয়েছিলেন এই 'আত্মবিলাপ'-এর জন্য। অর্থ, যশ আর প্রেমের লোভ। কিন্তু আসল জিনিসটা হচ্ছে প্রেম। তিনি বলছেন, 'প্রেমের নিগড় গড়ি পড়িলি চরণে সাধে', তার পর বলছেন, 'কি ফল লভিলি?/ জলন্ত-পাবক-শিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে/ উড়িয়া পড়িলি!' এই পাবকশিখাটি হচ্ছেন হেনরিয়েটা, অনুমান করছি। 'পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!/ না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!' এখন কার জন্য পরাণ কাঁদছে, রেবেকার জন্য। এবং সত্যি-সত্যি নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনাই হচ্ছে তাঁর 'আত্মবিলাপ'। আপনারা দেখবেন 'রাবণের আত্মবিলাপ' একই সময়ে লেখা প্রায়, দু-তিন মাসের ব্যবধানে। সেটির সঙ্গে তুলনা করলেই দেখবেন সেই প্রেমের Factor-টি এখানে নেই। এইটি হচ্ছে মাইকেলের নিজস্ব বিলাপ। এবং একটু আগেই আমি বললাম যে পাপবোধ থেকেই এটা লেখা। রেবেকার প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্যে, সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠুরতার কারণে। তার পরে, এই যে রেবেকার প্রতি তাঁর আনুগত্য ও প্রেম এইটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাই আমরা *বীরাঙ্গনা কাব্য*-তে। *বীরাঙ্গনা কাব্য* এর পরে লেখেন তিনি, আর তো কোনো কাব্য নেই তাঁর এ-সময়! কাজেই এর পরের কাব্যেই তিনি লিখছেন রেবেকার সম্পর্কে। বিশ্বাস করুন, এর এগারোটি কাহিনীর মধ্যে একটিই ঐক্যসূত্র, সে-ঐক্যসূত্রটা হচ্ছে প্রতারক পুরুষকে অভিযোগ করছেন একজন মহিলা। সে-মহিলা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। কিন্তু একটি জায়গায় মিল এবং মিল এই যে প্রতারিত নারীর অভিমান এবং অভিযোগ, এইটি আর কারো নয়, প্রত্যেকটি কথা রেবেকার সঙ্গে মিলে যায়। যে-কথাগুলো রেবেকা লেখেননি অভিমান করে, মাইকেল কল্পনা করে সেই কথাগুলোই বিভিন্ন নারীর জবানিতে লিখেছেন। নানা নামের আড়ালে এই নারী হচ্ছেন রেবেকা।

যেমন ধরুন শকুন্তলা। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে লিখছেন, 'এ নব যৌবনে এরে ত্যজিলা কি তুমি,/ প্রাণপতি? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি, /দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে?'— এ-কথা কি রেবেকা বলতে পারতেন না? অথবা সোমের প্রতি তারা— 'যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে/ প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল/নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম/উল্লাসে,— ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে!' যেন যেদিন রেবেকা তাঁকে দেখেছিলেন Boy's Asylum স্কুলে সেদিনকার কথা। এ-কথা হয়তো বলেছেন 'রুক্মিনীর অনুতাপ'-এ— 'তুমি পতি ভাগ্যদোষে বাম মম পতি, /তুমি কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে'—আজকে আমার বেঁচে থাকাটা অসহনীয়, যেহেতু তুমি নেই। রেবেকাকে সাত বছর মাইকেল দেখেননি এ-কবিতা যখন লিখছেন। কাজেই কল্পনা করছেন মনে-মনে ২১ বছরের যে-মেয়েটিকে ফেলে এসেছি, সে আজকে কেমন হয়েছে দেখতে? আজকে তার দেহের সেই গঠন কি আছে? আজকে তার মুখে কি বয়সের কোনো ছাপ পড়েছে? এ-কথা ভাবতে-ভাবতে লিখছেন রেবেকার জবানিতে — 'না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে! /নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-/সদৃশ! সে কটি, হায়, কার-পদ্মে ধরি /যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,/আর নহে সরু, দেব! নম্র-শিরঃ এবে/উচ্চ কুচ!'— এ-কথা অবশ্যই রেবেকা বলতে পারেন, মাইকেল কল্পনা করে নিতে পারেন। কিন্তু কেকয়ী (কৈকেয়ী) কি অভিযোগ করছেন, বলছেন— 'কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি!— /সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,/কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,/মোর কাছে?' কিংবা 'কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে, /অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত/ কৌশলে'। তুমি কামী এবং চোর, আমার মন একদিন চুরি করেছিলে। রেবেকা একথা বলতে পারতেন কিন্তু বলেননি। কারণ আমার যতদূর ধারণা রেবেকা খবর রাখতেন, মাইকেল কি করছে, কোথায় আছে, সেই প্রমাণও আমার কাছে আছে, কিন্তু রেবেকা অভিমানভরে কখনো যে চিঠি লিখেছেন মাইকেলকে, এটা আমার মনে হয় না। কেকয়ী আরো অভিযোগ করছেন— 'কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?'—আমি না হয় দোষ করেছি, কিন্তু বলো তুমি পুত্রদের কিভাবে ফেলে গেলে? দ্রৌপদীর অভিযোগ কি? দ্রৌপদী বলছেন, 'যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে দ্রৌপদী?' '...কবীশ্বর তুমি, /গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।...' তুমি কবীশ্বর! অর্জুন কবীশ্বর ছিলেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু মাইকেল তো কবি ছিলেন এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই 'কবীশ্বর তুমি গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।' শর্মিষ্ঠার সবচেয়ে কঠোর অভিযোগ কি, যে অভিযোগ রেবেকার সেটাই — সেটা হচ্ছে 'দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা/ কুরঙ্গী শাবক সবে সঙ্গে লয়ে চলে,/না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।/হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজে সাথে/ চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে/ আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।/নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল/আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,/ কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু /দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?'— এই রাজবালা মানে 'শ্বেতাঙ্গ আমি'। আমার নিজের ধারণা যে এ কথা মাইকেলের বানানো নয়, আবার পুরাণেও কোথাও লেখা নেই। এ কথাগুলো মাইকেল কল্পনা করেছেন রেবেকার অভিযোগ হিসেবে। আমরা শেষ পর্যন্ত, এর পরে হয়তো আপনারাও বলতে পারেন, রেবেকা মুছে গেল মাইকেলের মন থেকে। কিন্তু এ কথা আমার মনে হয় না, কখনো রেবেকার স্মৃতি তাঁর কাছে ম্লান হয়েছে। হেনরিয়েটাকে নিয়ে কোথাও একটিও পঙক্তি লিখেছেন মাইকেল, তা আমার

জানা নেই। আমি মাইকেলের রচনা মোটামুটি মন দিয়ে পড়েছি, বোঝার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁর সনেটেও দেখতে পাই, সুদূর ইউরোপে গিয়েও রেবেকার স্মৃতি তাঁকে haunt করছে, তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি বলছেন, 'প্রেমের সুবর্ণ রঙে সুনেত্রা যুবতী/ চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়/স্থলে মুছে তারে এ হেন কার আছে লো শকতি/যতদিন ভ্রমি আমি এ ভব মণ্ডলে' এবং 'দূরে কি নিকটে যখন সেখানে থাকি ভজিব তোমায়', তার পরে বলছেন সব শেষের কথা যেখানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা হেনরিয়েটা নয় কিছুতেই, বলছেন, 'অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতিপৃষ্ঠ-মঠে'। তোমার স্মৃতি দিয়ে তৈরি যে মঠ, তোমার সেখানে অধিষ্ঠান। হেনরিয়েটা তো সঙ্গে আছেন, তাকে নিয়ে কীসের স্মৃতি। তার মানে আমরা দেখছি দূরত্ব অথবা সময়ের দূরত্ব কোনোটাই রেবেকার স্মৃতিকে দুর্বল করতে পারেনি। এবং আমার ধারণা যে মাইকেল মদ ছেলেবেলা থেকেই খেতেন, মানে প্রথম যৌবন থেকে খেতেন একপাত্র, সে তো আমরা জানিই, কিন্তু মাইকেল মদ্যপ ছিলেন সব সময় এটা মনে হয় না, তার লেখা থেকেও মনে হয় না। তিনি তাঁর চিঠিতে লিখছেন, 'তুমি কি ভেবেছো আমি যখন কবিতা লিখি আমি মদ খাই, কক্ষণো না। আমি বিয়ারও খাই না।' কিন্তু মাইকেল এই যে মদ খেতে-খেতে নিজেকে মেরে ফেলছেন, হতাশাটা কোথায় কিসের দুঃখ তার। আমার ধারণা এই দুঃখ হচ্ছে তাঁর ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, এই বেদনা তাঁর, যে আমি রেবেকার জন্য মরে যাচ্ছি, আর আমি সারা দিন ভান করে যাচ্ছি আমি হেনরিয়েটাকে ভালোবাসি—এই যে দুঃখ এটা তিনি কোনোদিন ভুলে যেতে পারেননি এবং তিনি দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। সেটা ভোলার জন্যই তিনি মদ্যপ হয়েছেন। বা মদ খেয়ে প্রাণ দিয়েছেন। মাইকেলের আর-একটা দুঃখ শেষপর্যন্ত এসেছিল, সেটা হচ্ছে ইউরোপ থেকে ফেরার পরে যখন আমরা দেখতে পাই যে তিনি দারুণ আর্থিক অনটনে ভুগছেন। এত অনটন যে বাড়িও ছাড়তে হল তাঁর, খাবারও জুটত কি না ঠিকমতো সে-বিষয়েও সন্দেহ আছে। সে-সময়ও হতাশা থেকে তাঁর পক্ষে মদ খাওয়া সম্ভব। তেমন একটা সময়ই মনোমোহন ঘোষ তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'দিনের বেলা নির্জলা হুইস্কি আপনি খাচ্ছেন, এটা কি? কি হচ্ছে?' মধুসূদন বলেছিলেন — এটাও নিজেকে মেরে ফেলা। কিন্তু নিজেকে চাকু দিয়ে খুন করার মতো কষ্টের নয়। আমার ধারণা শুধুমাত্র আর্থিক অনটন বা হতাশা থেকে নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে ট্র্যাজিডি, দুই নারীর মাঝখানে পড়ে তাঁর যে বিক্ষুব্ধ অবস্থা সেটাও তাঁকে হতাশ করেছিল। মাইকেল সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমার বই থেকে আপনারা অনেকটাই পেয়েছেন। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা হলে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তার উত্তর দেব। আপনাদের সবাইকেধন্যবাদ।

---

*বক্তৃতাটিকে মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করা হল। মাইকেলের উদ্ধৃতি, ড. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, **মধুসূদন রচনাবলী**, অনুসারে।*

শৈলজানন্দের অপ্রকাশিত রচনা ও অসংকলিত ভিন্নধর্মী গদ্য 'জাগরণী'

বাঁধন সেনগুপ্ত

ব্যতিক্রমী লেখক হিসেবে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের পর থেকেই নিজস্বতায় চিহ্নিত। বাংলা সাহিত্যে চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত পটভূমি সর্বপ্রথম তাঁরই অধিকৃত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে লেখকজীবনের ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক পর্বে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও সহমর্মিতার বিনিময়েই বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে সেদিন স্থান পেয়েছিল অন্ত্যজ গোষ্ঠীভুক্ত বিশাল সেই সমাজ আর সেই সমাজের মানুষজন। সেই চিত্রায়ণে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: 'দেখেছি দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তার বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। "নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি" জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি — দরিদ্রনারায়ণের পূজারীর মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই।...'

আজীবন সেই আত্মভোলা মানুষটি সংগত কারণেই কারো কাছে কোথাও কিছু প্রার্থনা করেননি। জীবনের শেষ পর্বে এসে তিনি হয়তো কিঞ্চিৎ অভিমানী হয়ে পড়েছিলেন। কেন না যতখানি তাঁর প্রাপ্য ছিল তার অনেকখানিই আজীবন থেকে গিয়েছিল তাঁর নাগালের বাইরে। বলা ভালো তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে নানাভাবে। ফলে প্রাপ্য অনেক কিছুই শেষপর্যন্ত তাঁর অনার্জিত থেকে গিয়েছিল। অথচ বিগত শতাব্দীর গোড়ায় তাঁর আবির্ভাব পর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবল উপস্থিতির পাশাপাশি শৈলজানন্দকে একাই পথ কেটে এগিয়ে যেতে হয়েছে। 'কয়লাকুঠীর দেশে'র লেখক মাত্র আঠারো বছর বয়সেই 'মর্মবাণী' পত্রিকায় উপহার দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'আমের মঞ্জরী' (১৯১৯)। পঁচাত্তর বছরের জীবনে, প্রথম পর্বে মাত্র কুড়ি বছর ও শেষ পর্বে বছর কুড়ি অর্থাৎ মোট ৪০ বছর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাংলা সাহিত্যকে তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ উপহার দিয়ে গিয়েছেন। শেষ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রায় বছর আটেক ছিলেন বিছানায় সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। সেই সময় তেমন লেখালেখির সুযোগ তাঁর হয়নি। লেখক জীবনে তিনি তারাশঙ্করের চেয়ে অনেক আগেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। তারাশঙ্কর তাই বলেছিলেন, তাঁর সাহিত্যজগতে অনুপ্রবেশের মূলে ছিলেন স্বয়ং শৈলজানন্দ। জীবনের মধ্যপর্বে প্রায় বাইশ বছর (১৯৩৫-১৯৫৭) তিনি কাটিয়েছিলেন মূলত চলচ্চিত্রের আঙিনায়। মোট ৩৬টি চলচ্চিত্র তাঁর গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে ১৬টি ছবিই ছিল তাঁর নিজের পরিচালিত। চলচ্চিত্রের অসামান্য সাফল্য তাঁকে সে-সময় সাহিত্য সৃষ্টির আঙিনা থেকে কিছুটা দূরে ঠেলে দেয়। এই পর্বে আর্থিক সাফল্য ছিল তাঁর করায়ত্ত।

তাঁর জনপ্রিয় ৮টি ছবি মাত্র আট বছরের মধ্যে তোলা হয়েছিল। সেকালে, (১৯৩৮-১৯৪৫) চলচ্চিত্র থেকে মোট ৩৩টি পুরস্কার পাওয়াই শুধু নয়, একটি ছবি সেকালে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে, একমাত্র ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবেও আমন্ত্রণ পেয়েছিল। ছবিটির নাম — 'দেশের মাটি'। পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু। তাঁর সাহিত্য থেকে হিন্দিতেও সাত-সাতটি সফল ছবি তোলা হয়েছিল। ছবিগুলির নাম — অনাথ আশ্রম (১৯৩৭), ধরতীমাতা (১৯৩৮), দুষমন(১৯৩৯), বন্দী(১৯৪২), ডাক্তার(১৯৪৯), এক গাঁও কি কাহানী(১৯৫৭) ও আনন্দ আশ্রম(১৯৭৭)। লেখক শৈলজানন্দ স্বয়ং চারটি ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন। ছবিগুলির নাম — পাতালপুরী (১৯৩৫), কথা কও (১৯৫৫), রকক্লাব (১৯৫৭) ও শিলালিপি (অসমাপ্ত)। পাতালপুরী-র সংগীত পরিচালক ছিলেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু সহপাঠী কাজী নজরুল ইসলাম।

এরই মধ্যে কী করে যে তিনি সাহিত্যজগতে মাত্র বছর ত্রিশেক যুক্ত থেকে প্রায় পৌনে-তিনশো উপন্যাস, আড়াইশোর কাছাকাছি ছোটগল্প, ন-টি কিশোর সাহিত্যসংগ্রহ এবং ন-টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধসংগ্রহ গ্রন্থ ও দুটি নাটক লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। কয়েকবছর আকাশবাণীতে যুক্ত-থাকা কালে তিনি বেতারে নাট্য প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয়কার্যেও যুক্ত ছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে কৈশোরেই আলাপ হয়েছিল তাঁর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। নজরুল ছিলেন তখন শিয়ারশোল রাজ্য-হাইস্কুলের ছাত্র। ১৯১৬ সালে নজরুল ময়মনসিংহ থেকে এসে সেই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে অর্থাৎ তখনকার মতে থার্ড ক্লাসে ভরতি হয়েছিলেন। থাকতেন স্কুলের একপ্রান্তে 'মোহামেডান বোর্ডিং'-এ। শৈলজানন্দও তখন পাশের রানিগঞ্জ হাইস্কুলে পড়তেন। ১৯১৮ সালে শৈলজার মতো নজরুলেরও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসবার কথা। নজরুল অবশ্য নবম শ্রেণিতে কখনো পড়েননি। অষ্টম শ্রেণি থেকে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে (১৯১৬ সালে) সরাসরি ডবল প্রমোশন পেয়ে তিনি দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণির ফার্স্ট-বয় নজরুল সৈন্যবাহিনীতে চলে যাওয়ায় তাঁর আর ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসা সম্ভব হয়নি। সৈন্য-বাহিনীতে যাবার জন্যে প্রস্তুত শৈলজানন্দ সামরিক বাহিনীর নির্বাচনে অনুপযুক্ত বলে ঘোষিত হওয়ায় ফিরে যান। তারপর রানিগঞ্জ হাইস্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শৈলজানন্দ সে-বছরই(১৯১৮) উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালেও এঁরা অভিন্নহৃদয় বন্ধু হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। নজরুলকে নিয়ে কৈশোর-জীবনের ইতিবৃত্ত, প্রথম রচনা করেছিলেন বন্ধু শৈলজানন্দ। সেই স্মৃতিচারণার ফসল — *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*। এ-ছাড়াও লিখেছিলেন *আমার বন্ধু নজরুল*। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে পাঠকসমাজে তা সমাদৃত হয়েছিল। *কেউ ভোলে, না কেউ ভোলে*, ষাটের দশকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রতি সপ্তাহে বেরোত। আসলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুলকে নিয়ে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি (১৯৫৫-১৯৫৬) একটি ডকুমেন্টারি তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহে সেই ছবি পরিচালনা করতে গিয়ে শৈলজানন্দ লেখা শুরু করেছিলেন, *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*। নজরুলকে বিদেশ থেকে

চিকিৎসা ও পরীক্ষা - নিরীক্ষার পর বাধ্য হয়ে অসুস্থ অবস্থাতেই ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সাত মাস সে-বার নজরুল ইয়োরোপে কাটান। লন্ডন, ভিয়েনা ও পূর্ব-জার্মানির বন-এ কাটিয়ে নজরুলকে অবশেষে (১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩) কলকাতায় বিমানযোগে ফিরিয়ে আনা হয়। ফিরে আসবার পর শুরু হয়েছিল সেই ডকুমেন্টারির পরিকল্পনা। শৈলজানন্দ পরবর্তীকালে *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে* প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন — 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুলের একখানি ডকুমেন্টারী ছবি করতে চেয়েছিলেন। তারই জন্য সর্বপ্রথম এটি লিখতে শুরু করেছিলাম। তাই এর আরম্ভটা যেন কেমন কেমন। দু'চার পাতা লিখেই আর লিখতে ইচ্ছে করেনি। যাকে নিয়ে ছবি করবো, সে কোথায়? তার এখনকার এই অসহায় রূপটি লোকের চোখের সামনে টেনে বের করতে মন চায়নি। তাই সে ছবি আমি করিনি। ছবি করার চেয়ে লেখা ভাল। তাই যখন মন চেয়েছে, একটু একটু করে লিখে গেছি।' এ-সব ১৯৬১ সালের আগের কথা। গোড়ায় ডায়েরিতে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে শৈলজানন্দ শুরু করেছিলেন সেই কাহিনী লিখতে। পরে যখন বই হিসেবে তা বেরোল তখন গোড়ার লেখাটির অনেকখানি বদলে ফেলে নতুন করে শৈলজানন্দ তা লিখেছিলেন। ডায়েরি থেকে অপ্রকাশিত সেই রচনার অসমাপ্ত প্রথম অংশটি *বিভাব*-এর পাঠকের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ প্রযোজিত তথ্যচিত্র 'বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম' শেষপর্যন্ত মন্মথ রায়ের পরিচালনায় নির্মিত হয়ে মুক্তি পায়।

কাজী নজরুল সম্পাদিত 'ধুমকেতু' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২ আগস্ট, ১৯২২ তারিখে। সপ্তাহে দু-বার প্রকাশিত সেই 'ধুমকেতু' পত্রিকায় নজরুলের অনুরোধে লেখা শৈলজানন্দের একটি গদ্যরচনা 'জাগরণী' প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ ২৫ আগস্ট,১৯২২ (১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)। এটি ৮০ বছর আগে 'ধুমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও আজ পর্যন্ত তা কোনো গ্রন্থে বা সংকলনে প্রকাশিত হয়নি। এই রচনায় যেন অন্য এক শৈলজানন্দের সে-দিন আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। নজরুলের রচনা ও লেখনশৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব একমাত্র এই রচনাতেই লক্ষ করা যায়। পাঠকের অবগতির জন্যে তা পুনঃপ্রকাশিত হল।*

---

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মিলন মুখোপাধ্যায়

APRIL 1 — FRIDAY

নজরুল ইসলাম আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার আবাল্য সহচর। একই দেশের কাছাকাছি দুই গ্রামে আমরা জন্মগ্রহণ করেছিলাম। একজন মুসলমান, একজন হিন্দু। কিন্তু বিধাতার কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না, দু'জনকে একত্র করে দিলেন। একত্র তো অনেককেই করেন তিনি, কিন্তু এক করেন ক'জনকে তিনি? প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় ক'জনের সঙ্গে।

তখন আমরা ইস্কুলের ছাত্র। নজরুল পড়ে শিয়াড়শোলে, আমি পড়ি রাণীগঞ্জে। পাশাপাশি খুব কাছাকাছি দুটো ইস্কুল। কিন্তু দুটি ইস্কুলে দুজন পড়লে তো মেলামেশার তত সুযোগ হয় না। কিন্তু সে সুযোগ আমাদের হলো কেমন করে জানেন? শিয়াড়শোল ইস্কুলের একটি 'মেহামেডান বোর্ডিং' ছিল, আপনারা ভাবছেন বুঝি সে একটা খুব বৃহৎ ব্যাপার। কিন্তু বৃহৎ মোটেই নয়। রাণীগঞ্জে আমি যেখানে থাকতাম, তারই একান্ত সন্নিকটে অর্থাৎ যে পুকুরে আমরা স্নান করতাম, তারই একদিকের একটা পাড়ের কাছে নিতান্ত ছোট একটি মাটির বাড়ী। মাত্র জনপাঁচেক মুসলমান ছাত্র থাকতো সেখানে। তারই নাম ছিল 'মোহমেডান বোর্ডিং'। আমরা একই পুকুরে স্নান করতাম। গ্রীষ্মকাল — সাঁতার কাটতাম সেই পুকুরে। তখন ছিল মর্ণিং স্কুল। একদিন দেখি — নজরুল কিছুতেই এককোমর জলের বেশি নামবে না। তখনই বুঝলাম — নজরুল সাঁতার কাটতে জানে না। জানবে কেমন করে? আমরা তো নদীর দেশের লোক নই। কয়লাকুঠির দেশ। একেবারে শুকনো খটখটে। আর গরম যা — সে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। কাজেই পুকুরে স্নান আর আমাদের শেষ হতো না। হাতের আঙুল যতক্ষণ না চুপ্‌শে সাদা হয়ে যেতো ততক্ষণ আমরা উঠতুম না জল থেকে। কিন্তু শুধু তো এককোমর জলে চুবুং চাবুং করলে চলবে না। নজরুলকে সাঁতার শেখাতে হবে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কোমরে গামছা বেঁধে কোনো রকমে ডুবন জলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া। প্রথম দিন তো নজরুল যায়-যায়! জল খেয়ে চোখমুখ লাল করে জল থেকে উঠে দে দৌড়! বলে — কাজ নেই আমার সাঁতার শিখে।

কিন্তু কে জানতো — তাকেই একদিন লিখতে হবে—

এ তরণী ভারি দিতে হবে পাড়ি জানে না সন্তরণ
কে ডুবিছে হায় জিজ্ঞাসে মায় ডুবিতেছে কোন্ জন?
হিন্দু না ওরা মুসলিম
ডুবিছে মানুষ —

আমাদের ঘোড়ার গাড়ীর একজন কোচ্‌ম্যান ছিল। নাম মেহবুব। সেই নজরুলকে সাঁতার শেখালে। শিখতে বিশিদিন লাগলো না। দিনদশেক পরেই দেখি — নজরুল আমাকে পেছনে ফেলে দিয়ে সেই বিরাট পুকুরটার এপার-ওপার করছে একদমে।

রোজই যাই স্নান করতে। কোনোদিন দেখি সেই এসেছে আগে। কোনোদিন-বা আমিই তাকে ডেকে আনি বোর্ডিং থেকে। শেষে এমন হলো স্নান করবার আগে পুকুড়ের পাশে গাছের ছায়ায় বসে আমরা গল্প করি — জলে নামা আর হয়ে ওঠে না। শেষে যখন বেলা

Carew's makers of fine liquors since 1885

দিনলিপি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অনেক হয়ে যায় তখন টুব্ করে জলে ডুবে কোনোরকমে স্নানটা সেরে যে যার আস্তানায় ফিরে যাই।

আবার দেখা হয় বিকেলে। আমাদের বন্ধুত্ব দেখে কত লোক কত কথা বলে। বলতো না — যদি না আমরা হিন্দু আর মুসলমান হতাম। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান — এদের এত বন্ধুত্ব হয় কেমন করে?

আমরা কিন্তু তখন ছেলেমানুষ — ইস্কুলের ছাত্র — তখন বুঝতাম না, কিন্তু আজ বুঝি — হয়। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে আজ যে ভেদাভেদ দেখতে পাই সেটা সৃষ্টি করেছে আমাদের সমাজব্যবস্থা। সেটা সৃষ্টি করেছে মোল্লা আর পুরোহিতের দল। নইলে আমরা এক। একই মানুষ। একই আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা, একই আমাদের হৃদয়যন্ত্র, একই আমাদের আনন্দ-বেদনা। একই ভগবানের সন্তান আমরা।

নজরুল নিজেই লিখেছে —

ভগবানের জাত যদি নাই
তবে কেন জাতের বড়াই?

এই নিয়ে কম দুর্ভোগ পোয়াতে হয়নি আমাদের। আমাদের আর এক বন্ধু ছিল — তার নাম ছিল শৈলেন ঘোষ। একই সঙ্গে পড়তাম আমরা। সে ছিল ক্রিশ্চান।

একজন মুসলমান, একজন হিন্দু, একজন ক্রিশ্চান।

আশ্চর্য ছিল আমাদের মনের মিল। আমরা একসঙ্গে খেতাম, একসঙ্গে বেড়াতাম কিন্তু কোনোদিন ভুলেও আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগেনি যে আমরা ভিন্ন জাতি। লোকে আমাদের দিকে তাকায় আর বলে, 'দেখেছ? এদের এত ভাব কেমন করে হলো?'

কিন্তু আমরাই কি সেকথা তখন জানতাম?

আমার দাদামশাইকে প্রায়ই বলতে শুনতাম — এ ছোঁড়াটার কিছু হবে না। ওর বন্ধু দ্যাখো না — বেছে বেছে দুটো বন্ধু বাগিয়েছে — তার একটা মুসলমান একটা ক্রিশ্চান।

এই নিয়ে একটা ভারি মজার কথা আমার মনে পড়লো। সেইটে এইখানে বলে নিই ভুলে যাব।

নজরুল তখন করাচিতে। আর আমি কলকাতায় — রামকান্ত বসু স্ট্রীটে — আজ যেটা মণীন্দ্র কলেজ। ওই বাড়ীটা মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর। ওটা ছিল বহুদিনের পুরণো একটা পেড়ো বাড়ী। ওইখানে ছিল একটি পলিটেকনিক ইস্কুল।

(অংশবিশেষ)

---

* লেখক ব্যবহৃত বানান ও যতিচিহ্ন হুবহু রক্ষা করা হল। এমনকী, একই বানান দু-জায়গায় দু-রকম থাকলেও (উদা : 'মেহামেডান বোর্ডিং' ও 'মোহমেডান বোর্ডিং') পরিবর্তন করা হয়নি। কয়েকটি জায়গায় (Underline চিহ্নিত) লেখকের অনবধানবশত বিভ্রম থাকলেও, তা অবিকৃত রাখা হয়েছে, সংশোধিত হয়নি।

জাগরণী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভারতের ঘরে ঘরে আজ ক্রন্দন, আর হাহুতাশ — আকাশে বাতাসে চিতাধূমের পূতিগন্ধ — ঘরে বাইরে নির্যাতন! অনাহারক্লিষ্ট ভারতের অসংখ্য নরনারীর নিঃসহায় নিরবলম্ব ভাইবোনেরা আমার। শত উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করে আর্তকণ্ঠে সমস্বরে চিৎকার করছে — বাঁচা মা রুদ্রাণী, তোর এই উৎপীড়িত সন্তানদের, তাদের মুখের পানে একবার চেয়ে দেখ মা, কাতরতার কি করুণ চিহ্ন সেখানে। মিথ্যাচারের ভীতিকম্পন থেকে তাদের রক্ষা কর্ — নইলে এ ধ্বংসের মাঝে তোর তরুণ ভারত মাথা তুলে জাগবে না! — জাগবে না!

স্বাগত হে ধূমকেতু! শ্মশানচিতার ধূম্রমলিন ভারত আকাশে আজ যে তোমার রক্তমাখা অগ্নিপুচ্ছ দেখা যাচ্ছে তাকে নমস্কার! তোমার অগ্নিসম্মার্জনী দিয়ে মাতৃমন্দিরের আবর্জনা দূরে ফেলে দাও এই পদদলিত দাসজাতির মলিন অন্তরের ঘৃণিত পাপের বোঝা। আর তুমিও এস সারথি তোমার অগ্নিবীণায় আমার রুদ্রাণী মায়ের বোধনমঙ্গল বেজে উঠুক, যা কিছু অসুন্দর, যা কিছু মিথ্যাচার তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দাও মায়ের পবিত্র অঙ্গণ থেকে।

এস আমার পবিত্র নির্যাতিত ভাইবোনেরা! এসো শুদ্র, মেথর, মুচি, চামার, চণ্ডাল ভাইরা আমার! কশাঘাতের দারুণ যন্ত্রণা ভুলে যাও — পৃষ্ঠে তোমার অত্যাচারীর পাদুকা — লাঞ্ছনা নিয়ে এসো! চোখের রক্ত-অশ্রু মুছে ফেলে দাও ভাই! ক্রন্দনের সময় নাই — সময় নাই! এসো তোমাদের সমবেত শক্তি একত্রিত করে' — তোমাদের প্রতি রক্তকণা কাজে লাগাও। বরাভয়দায়িনী মা তোমাকে চায় — ওই দেখ, সম্মুখে তোমার মুক্তি তোরণদ্বার! নবীনের রাজটীকা পরে এস তোমরা তরুণের দল। তোমাদের অবিনশ্বর আত্মা ম'রে যাবে না — শত শত মৃত্যুর মাঝে তোমাদের নবীনত্বের বিকাশ ফুটে উঠবে! তোমরাও এসো, মা বোনেরা আমার! মায়ের ডাকে ছুটে বেরিয়ে এসো, অন্ধকার গৃহকারার প্রাচীর ভেঙে — তোমাদের মঙ্গলহস্তে শঙ্খ বেজে উঠুক! গাও নবীনের উদ্বোধনগীতি। আজ এই প্রায়ান্ধকারের ভিতর তোদের তরুণ যাত্রীদলের অভিযানযাত্রা জয়যুক্ত করে দে মা কল্যাণ!

চোখ খুলে দেখ একটীবার, তোমার ঘরে কে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসছে! সোনার ভারত চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নিঠুর কশাই এর কড়ড়া চাবুকের আঘাতে জর্জরিত দেহ দিয়ে আর কতকাল মায়ের ওপর এ নির্মম অত্যাচার চেয়ে দেখতে চাও? মা ভৈ! এসো চিতাভস্মের টীকা তোমার কপালে এঁকে দিই এসো, ভয় করো না। প্রলয়ের দেবতা তোমার সহায়, বরাভয়দায়িনী মা তোমার সাথী, ভয় কিসের? বন্ধন? তোমাদের বাঁধবে কে সে মুক্তিদাতা? মনে রেখো তোমার সত্য বন্ধনের বাইরে। তবে কি মৃত্যু? — তুমি মরবে না — তুমি অমর। অমৃতের সন্তান তুমি, এসো, অযুত নবীন কবির প্রলয়োল্লাস তোমায় ডাকছে — মরণবরণ করে এগিয়ে চলো তোমার চিরন্তন সত্যের পানে!

আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়! এ দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা আর মুখ পেতে নিয়োনা ভারতের ত্রিশ কোটি নরনারী! জাগো — ভাই বোনেরা আমার! সত্যের অনির্বাণ শিখা দাউ দাউ করে

জ্বলে উঠুক! মিথ্যা অপসারিত হউক! মা তোমার সত্যমূর্ত্তি দেখতে চায়। নির্জ্জীব কাপুরুষতার ঘৃণিত চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে দাও অঙ্গ থেকে। ওগো মায়ের সন্তান! বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও এসে মায়ের সুবিস্তৃত আঙিনার মাঝে, অগ্নিসেতুর পারে চেয়ে দ্যাখ তোমার সোনার ভারত।

জাগো ভারতের দুরন্ত সিংহ! জাগো কল্যাণময়ী নারী! তোমাদের সমবেত শক্তির আত্মসমর্পণ! মা ভৈ!

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ১মবর্ষ ৫ম সংখ্যা, (২৫ আগস্ট ১৯২২/৮ ভাদ্র ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) শুক্রবার প্রথম প্রকাশিত। লেখকের বানান ও যতিচিহ্ন হুবহু রক্ষা করা হল।

গল্পগুচ্ছ

আরে না না, মানবিকতা লোপ পায়নি

সত্যপ্রিয় ঘোষ

হে পাঠিকা, আপনি যদি শেয়ালদা সাউথ সেকশনের ট্রেনের নিত্যযাত্রী না হন তাহলে আগে মুখস্থ করুন যাদবপুর থেকে শেয়ালদা আসতে নির্ধারিত স্টপেজগুলো — ঢাকুরিয়া, বালিগঞ্জ, পার্ক সার্কাস। লাগে একুশ থেকে পঁচিশ মিনিট। পার্ক সার্কাসে সব ট্রেন দাঁড়ায় না তো। রেললাইনের পাশেই অগণিত মানুষের ঝুপড়ি, তাই লাইন ক্লিয়ার দেওয়া থাকলেই হয় না, মোটরম্যানকে একটু হুঁশ রাখতে হয় লাইনে কিছু নেই-টেই তো? গরু-ছাগল-মানুষ কাটা পড়লে হয়ে গেল — তখন পাংচুয়ালিটির দফা সারা।

বালিগঞ্জটা আবার জাংশন স্টেশন — ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং বা বজবজ, যেদিকেই ট্রেন ছুটুক না, বালিগঞ্জে থামতেই হবে, স্টপেজটাও একটু বেশি।

হে পাঠক, এ-সব লাইনে আপনি ডব্লিউ-টি যাত্রী হন বা না হন, আপনি অবশ্যই অবহিত আছেন টি.টি.ই.-রা (ওরফে মামুরা) যাদবপুর পর্যন্ত রেলের কালো কোটে মূর্তি ধারণ করেন না। সেটি ছাড়ালে নিশ্চিন্দি হয়ে ব্যাগ থেকে কোটটি বার করেন, বাঘা যতীন বা গড়িয়া পেরোনোর পর চেকিং শুরু করেন। তবে মোবাইল চেকিং থাকলে আপনার হয়ে গেল, সেদিন নিজের বাড়ির বদলে জি.আর.পি.-র হাজতে চালান যেতে পারেন — সে আপনার নসিব।

কথা হল যা হবে তা তো হবে, গল্পের মধ্যে এ-সব বাজে কথা কেন। কেন পরে বুঝবেন, একটু সবুর।

আর একটা কথা। এ কাহিনী পাস্ট টেন্সের তো, তখনো নকশালদের জন্য নানা পকেট ছমছমে, যাদবপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা তখনো ওদের দখলে, কংগ্রেসি রাজত্বের জরুরি অবস্থা তখনো ঘোষিত না হলেও যত্র-তত্র টিয়ার গ্যাস, লাঠি-গুলি, ডাকাতি-ছিনতাই, লোডশেডিং ইত্যাদিতে গোটা পশ্চিমবঙ্গই এত ভঙ্গ হয়েও কত রঙ্গে, কখন-কী-হয় ধন্দে, সদা থরহরিকম্প। বামফ্রন্টের বড় শরিক তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে।

যাদবপুরের বিবেকনগর কলোনি থেকে টিউশনি সেরে এ-কাহিনীর আনফরচুনেট নায়ক নরেশ চক্রবর্তী সে-রাতে যাদবপুর থেকে নটা বাইশের ট্রেনে শেয়ালদা ফিরছিল। রেলের আপার ডিভিশন করণিকত্বে, সংসারধর্ম, অতীব বিচিত্র বোধে টিউশনির সাইড-ইনকামে টুকটাক চালিয়ে নিচ্ছে। ট্রেন থেকে নেমে খুব একটা পথ না, পা চালিয়ে গেলে রেল-কোয়ার্টার্স সাত মিনিটের ব্যাপার। এ তো গেল বাবুর পেশা, নেশা-টেশা কিছু নেই? যাকে বলে হবি? কবি-টবি নয়তো ? সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং বঙ্গে কবি নয়-টা কে? ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ধাড়ি-ধাড়ি সাহেবগুলোকে বাংলা শেখানোর জন্য কেরিসাহেব যদি বাঙালি পণ্ডিতদের গদ্য লিখতে না বলতেন তা হলে কী যে হত, তা হলে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় পড়ানোর জন্য উনিশ শতকে সেই জাগরণকালে বাংলায় ভূগোল বা পদার্থবিদ্যাও অক্ষয় দত্ত গদ্যে লিখতেন না, পদ্যেই চালাতেন।

হে পাঠিকা, আপনি উসখুস করছেন কেন, গল্পের ধান ভানতে এ-সব মহীপালের গীত কেন, ভেবে মেজাজ খারাপ করবেন না, আমাদের এই নায়কটির হবি হল বাংলা সাহিত্যের

উনিশ শতকে চরে বেড়ানো — যেন ছাড়া গরু। তাই একটু গেয়ে রাখতে হল।

একে মাঘ মাস, তার ওপর সে-রাতে ঠাণ্ডা পড়েছিল বেজায়। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে যায়, জামা খোলা থাকলে সেই দৃশ্য দেখাও যায় কেন না বাবু বেজায় রোগা, উপরন্তু বারোমেসে সর্দির রুগি, প্রাতঃকালে এবং রাত্রে শয়নকালে হাঁচি ও কাশির দ্বারা তিনি ব্যায়াম করেন তাই যোগব্যায়ামের দরকার পড়ে না। বাবুর সাহসও খুব, নকশালদেরও ডরান না, তথাপি পাছে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা বর্জনের জন্য ওই অঞ্চলের নকশালরা নরেশের উপর চড়াও হয় সেই আশঙ্কায় নরেশের দুই ইলেভেনের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর পিতা নরেশকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান। ওই পিতাকে নকশালরা ছাড় দিত, কেন না তাঁর বউ নকশাল ছেলেদের ইন্টারন্যাশনাল মাসিমা, মাথা পিছু দু-খানা রুটি ও গুড় প্রতিদিন দিতেন।

তো সে-রাতেও ভদ্রলোক নরেশকে ডায়মন্ডহারবার থেকে শেয়ালদাগামী লোকালে তুলে দিলেন। ন-টা বাইশের ওই ট্রেনে প্যাসেঞ্জার বড় কম থাকে। ইঞ্জিনের পরে প্রথম ও দ্বিতীয় কম্পার্টমেন্টেই যা-কিছু লোক, অনাগুলিতে ভূতের রাজত্ব। ভূতে যাদের বিশ্বাস নেই তারাও অন্য কম্পার্টমেন্টগুলোতে রিস্‌কের মধ্যে নেই।

বয়স পঞ্চাশ ছুঁই- ছুঁই হলেও নরেশের আধুনিকতার রকমসকম প্রশংসনীয়। ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছেন তবু বাবু মাথাটি র‍্যাপারে মুড়বেন না, ট্রেনে বা বাসে জানলা পেলে আর কথা নেই, খোলা জানলায় খোলা মাথায় যেন তিনি নয়া রবি ঠাকুর! নয়া এই কারণে যে বাবুর দাড়ি নেই, মাথায় বাহারি টুপিটিও নেই, অথচ খোলা জানলার মুক্ত হাওয়া বাবুর দুই কান দিয়ে ঢুকে তরলীকৃত হয়ে তিন দিন ধরে নাক দিয়ে ছুটবে নায়াগ্রা প্রপাতসম, ফলে বাবুর স্কুলটিচার গিন্নি আত্মরক্ষার্থে বাপের বাড়ি চলে যেতে পারেন — এ-রকম রিস্‌ক সত্ত্বেও বাবুর চরিত্রের বদল নেই।

অতি আশ্চর্যের বিষয়, এমন যে নরেশ চক্রবর্তী, সেই মানুষ সে-রাতে মাথায় শাল জড়িয়ে ফেলেছিল এবং অষ্টম আশ্চর্য—কম্পার্টমেন্টটায় জানলাগুলোর সব কটাতেই পাল্লা ছিল এবং সেগুলি সেঁটে বন্ধ অবস্থায়, আর কী কাণ্ড, বাবু জানলা পেলেন কিন্তু খুললেন না। গাড়িতে উঠেই নরেশ অনুপ্রাণিত হয়েছিল একটি মূর্তি দেখে, আগাপাশতলা কম্বলে-মোড়া প্যাসেঞ্জারটি পুরুষ কি নারী, বার্ধক্যে কি যৌবনে, কিছুই বোঝার উপায় নেই। শীতে এত আরাম নরেশ জীবনে এমনটি আর দেখেনি, সেই আরাম পেতে নরেশ দুই পা তুলে কম্বলীকৃত ওই মূর্তিটির মতো আরাম কামনায় যথাসাধ্য দেহটিকে মুড়ল সাদা শালটায়। তারপর উনিশ শতকের দশ দিগন্ত ছাড়িয়ে অষ্টাদশ শতকের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে চরে বেড়াতে লাগল।

চিন্তায় ডুবলেই ঢুলুনি বা চোখ বুজলেই ঝিমুনির মহানন্দময় মুক্তি আমাদের নরেশ চক্রবর্তীর অদৃষ্টে নেই, তাই চোখ ঢাকা অবস্থাতেও সে টের পেল ঢাকুরিয়ায় ট্রেন দাঁড়াল, ছাড়ল। রাতের এই ট্রেনটা থেকে ঢাকুরিয়ায় নামবার মতো হতভাগ্য কোনো প্যাসেঞ্জার নরেশ আদৌ কখনো দেখেনি, দু-চারজন ওঠে বটে কিন্তু নামবে কোন্ দুঃখে, কিন্তু সে-রাতে এ-সব কী হচ্ছে —উঠল না তো একজনও অথচ কম-সে-কম সাত-আটজন এখানেই নেমে গেল কেন? এই এমু কোচগুলিতে কেন যে টয়লেটের ব্যবস্থা নেই, নিরুপায় হলে লোকে করবেটা কী? কিন্তু এত রাতে আজ এতগুলি লোকের ইয়ে পেয়ে গেল? স্টপেজ তো এক মিনিট, তার মধ্যে

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের ফাঁকে রেললাইনে কম্মোটি সেরে ফের ওঠার টাইম পাবে তো? নরেশ চক্রবর্তী এই ভুল কাজটির মধ্যে নেই, ইলেকট্রিক ট্রেনে উঠতে হলে তার আগের ঘন্টা দুই জলপানটি করে না, তাই ও-দরকারটি হয় না। কিন্তু আজ এতগুলি বেকুব একসঙ্গে এই ডাব্বায় জড়ো হল কী করে? আজ বিয়েটিয়ের লগ্ন আছে নাকি? র‍্যাপারে আবৃত অবস্থায় নরেশ এই বেকুব বাবুদের ড্রেসটি লক্ষ করতে পারেনি—আর করবেই বা কেন, তোরা ঢাকুরিয়ায় ইয়ে করতে নামবি — এই যাঃ, ট্রেন ছেড়ে দিল যে, দেবেই তো, তোরা পরিবেশদূষণ ঘটাবি, তার জন্য এমু কোচগুলি ওয়েটিং-এ থাকবে—ওদের গায়েই তো— বেশ হয়েছে, থাক তোরা পড়ে ঢাকুরিয়ায়, অনেক টাইম পাবি এবার, পরের ট্রেনে ফিরিস। ঘোমটা ফাঁক করে নরেশ দেখে নিল তা দশ-বারো জন এখনো আছে ডাব্বাটায়।

ঠিক আছে, ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দরামের তুলনা টানার অন্যায়টা না করেছেন, মহারথীদের মধ্যে এমন একজনও নেই—বঙ্কিম করেছেন রবীন্দ্রনাথ করেছেন—তা হলে আর কথা কী, ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে ও-তুলনা দেড় পাতা না লিখলে যত্তসব অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ওই বাবদে মাইনাস করবে সাত নম্বর, কুড়ির মধ্যে। নরেশের কন্যা প্রেসিডেন্সিতে বাংলা অনার্সের ছাত্রী। কন্যার লেখাপড়ার সঙ্গে নরেশ ওর ক্লাস ফাইভ থেকে যুক্ত আছে (অঙ্ক আর সংস্কৃত বাদে)। নরেশের বউ এম.এ. হলেও এ-দায় অর্ধাঙ্গিনী রূপে অর্ধেকও বহন করে না এবং নরেশ বউয়ের এতই বাধ্য থাকতে গৌরব বোধ করে যে, কন্যার লেখাপড়ায় অবকাশকালটা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে বাৎসল্যসুখ পেয়ে চলেছে ষোলো আনা। তাই এই শীতে, ট্রেনের এই অবকাশে, ভারতচন্দ্র। নরেশ তাল তুলেছিল মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকের, তার দুশো বছর বাদে ভারতচন্দ্র দিনকালের হালচাল বদলের দরুন আদিরসের ছলাকলার চূড়ান্ত করেছেন, তা তো করবেনই—তিনি তো রামপ্রসাদের মতো দে মা আমায় তবিলদারিতে ছিলেন না, যস্মিন কালে যদাচার, তাতে যদি ওঁর কাব্যে মুকুন্দরামের গভীরতা কমে গিয়ে থাকে—গোল্লায় যাক সে কথা, মনের গভীরতা কমেছে দেহের ক্ষুধা বেড়েছে, বাড়বেই তো, তাতে ভদ্রলোকের পেছনে লাগার কী হল, অতি কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বঙ্কিম, এমনকী তোদের কবিগুরু—গুরু! কবিতা লিখেও গুরু! রবিঠাকুরের লাইফে এই ব্ল্যাক স্পটটা নিয়ে সমালোচকরা চটকায়নি এমন নয়, আরো একটু দরকার—এ কী! বালিগঞ্জ আসতেই সবকটা হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল কেন? তোদেরও ইয়ে পেয়ে গেল? আজ সব প্যাসেঞ্জারই এত জল খেয়ে ট্রেনে উঠেছে! তাজ্জব কি বাৎ হ্যায়!

তা যাক, বালিগঞ্জে টাইম একটু বেশি পাবি, সেরে এই ট্রেনেই উঠতে পারবি। ডায়াবিটিস রোগটা কি দিনে-দিনে বেড়েই চলেছে? রোগটা খুবই চিন্তায় ফেলে—দূরপাল্লার বাস এবং এমু কোচ দূর-অস্ত! এক দল থেকে গেল ঢাকুরিয়ায়, এ-দলটা কি অন্য বিয়েবাড়ির? একটু বাদে পেল?

সপ্তাহখানেক আগে এই ট্রেনটায় ছিনতাইপার্টি উঠেছিল। নরেশের বিলডিং-এর চার তলার বাসিন্দা লেডি-প্যাসেঞ্জার, গাইড অর্চনা চ্যাটার্জির ঘড়ি-গয়না সব গেছে এই ট্রেনটা থেকেই। বালিগঞ্জে প্যাসেঞ্জার ভেক ধরে উঠেছিল, সকলের সর্বস্ব নিল, তার পর পার্ক সার্কাসে নেমে গেল অথচ এই ট্রেনটার পার্ক সার্কাসে স্টপেজই নেই—গার্ড আর মোটরম্যানের সঙ্গে ছিনতাই পার্টির সাঁটে কাজ চলছে। কেনই বা চলবে না? মহাভারতের আমল থেকেই তো এ-

সবের চল হয়েছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটাই হল চূড়ান্ত সাঁটে, ভীষ্মের হিসেব ছিল একরকম, দ্রোণাচার্যের একরকম, ব্যাটা দুর্যোধনের তাল ছিল এক অক্টোহিনী নারায়ণী সেনা— সুইসাইড স্কোয়াড, কিন্তু স্বয়ং নারায়ণ যে কেষ্টলীলাটি চালালেন সাঁটে, যুদ্ধের বর্ণনা দিতে-দিতে বেচারা সঞ্জয়ের পর্যন্ত বদন বিগড়ে গেল—

কী হল আজ? ট্রেনটাই বিগড়ে গেল নাকি? ছাড়ে না কেন? বালিগঞ্জ বলে কি অনন্তকাল স্টপেজ নাকি? ইয়ে করতে যাওয়া লোকগুলোর এখনো সারা হল না? ফিরছে না তো কেউ?

না ফিরুক— ন ভেতব্যম্। ক্লাস নাইনে পণ্ডিতমশাই এই উপদেশটি দিয়েই নস্যির ডিবাটি খুলতেন। রুমালটি বের করতেন একটু পরে যখন তাঁর নস্যাহ্যাচ্য থেকে রক্ষা পেতে ফার্স্ট বেঞ্চের ছাত্ররা লাস্ট বেঞ্চে চলে যেত।

কিন্তু নরেশ এখন কোথায় যাবে—কম্বলীকৃত পিণ্ডটাও হঠাৎ কম্বল খুলে কী পরখ করল, তারপর কূর্মাসন ত্যাগ করে কই মাছের মতো যেন খলুই থেকে লাফিয়ে পালাল প্ল্যাটফর্মে। কী ব্যাপার! তোরও পেয়ে গেল?

ন ভেতব্যম্। একলা চলো রে। কবিগুরু গেয়ে রেখেছেন। গান্ধিজিও নাকি এটা বুঝে গিয়েছিলেন, যিনি সংগীতজগতে রামধুন চালু করেছিলেন তিনিও রবীন্দ্রসংগীতের একলা চলো রে-র পথ দেখিয়েছেন। চলতেই হবে, উপায় কী, এত রাত্তিরে যদি দোকলা না পাই তাহলে—

যদি সবাই নেমে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা, সবাই নেমে যায়, যদি শেয়ালদাতে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে নরেশ ভায়া, ও তুই র‍্যাপার-মোড়া হ্যাপায়-পড়া একলা চলো রে—রবীন্দ্রসংগীতে মরা মানুষ জ্যান্ত হয় এই তত্ত্বটি—

হলটা কী রে বাবা! ট্রেনটা যে নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু হয়ে রইল! সেই দুখানা অ্যাটম বোমা ছাড়ার পর থেকে বিশ্বের সবকিছু বনবন ঘুরতে-ঘুরতে কী যে পেরু টিমবাকটু হয়ে গেল, ব্রহ্মের লেত্তি আর ধরাই যাচ্ছে না, রেল কোম্পানির মতলব ধরবে কে! সে এখনো মায়ের পেটে—নতুবা এত রাতে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন শালার বালিগঞ্জে এতক্ষণ! নাকি মোটরম্যানও ইয়ে করতে নেমে গেছে?

বিগত আড়াইটি বছর যাবৎ নরেশ এই টিউশনির কারণে সপ্তাহে দু-দুটো দিন যাতায়াত করছে— সে এই রাস্তার হাল-হকিকত জানে না! এতক্ষণ বালিগঞ্জে? এবং এত লোক এই রাত্তিরে বালিগঞ্জে নেমে যেতেই ট্রেনে উঠেছে? ইয়ে করতে যায়নি?

ঠিক আছে, দেখতে হল ব্যাপারটা। অতএব বাবু নরেশচন্দ্র সুখাসনটি ছেড়ে শালটা মুণ্ডু থেকে ঈষৎ অনাবৃত করে বহির্বিশ্ব অবলোকনে উত্থিত হলেন। দেখি তোরা কী করচিস? কম্বলের লোকটাই বা ভাগল কোথায়?

না, অপকর্মটি কেউ তো কাছাকাছি করছে না? দূরে দুটো-চারটে লোক প্ল্যাটফর্মে। তারা নরেশের হিসাব-বহির্ভূত। ঠিক আছে। ফার্স্ট বগিটাতে যাওয়া যাক, সেখানে নিশ্চয়ই কিছু আছে, ওটাও ফাঁকা করে সবাই নেমে গেছে এ হয় না। কিন্তু এ কী? এটাতে যে আলোই নেই? হে রেল কোম্পানি! নরেশ লজ্জিত, সে নিজেও যে এই রেল পরিবারে এক সদস্য, পরিবারের এমনি হতকুচ্ছিত অবস্থায় শ্রী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, আমি রেলের কেউ নই বলার মতো বিভীষণোচিত আচরণে যাবে না।

দুঃখিত নরেশ দ্বিতীয় ডাব্বাটার কাছেই ফিরে এল। কনকনে ঠাণ্ডায় নিজের শরীর ও শালের ওম দিয়ে যে স্থানটুকুকে এতক্ষণ ঈষদুষ্ণ করতে পেরেছিল সেখানে পুনঃ-উপবেশন শ্রেয় নয় কি?

একটি পা প্ল্যাটফর্মে একটি পা ডাব্বায় রেখে নরেশ কী-করি কী-করি করতে লাগল। তৃতীয় বগিটাতে লোক আছে কিনা দেখতে যাওয়ার সাহসও হচ্ছে না—যদি অমনি ছেড়ে দেয়? তখন রানিং ট্রেনে লাফিয়ে উঠতে হবে। উঃ একবার তা করার দরুন বিশ বছরের ছোট ভাই কী বিশ্রী ধমক দিয়েছিল—অতএব ওরকম ভুল নরেশ পুনর্বার করতে চায় না।

তবে এক হিসেবে মন্দ না, হাজার মন্দেরও একটা ভালো, দিক থাকেই—এই যে ট্রেনটা এত রাত্রে বেকুবের মতো থেমে আছে এ মন্দের ভালো, কেন না দু-চারটি করে লোকের আগমন দেখা যাচ্ছে। রেলের প্ল্যাটফর্মটা ভ্রমণস্থল নাকি, উঠে পড়ো না বাবা এলে যদি পথ ভুলে। ঘুরঘুর করছ কেন?

ধুস—নাকি বাসে চলে যাব? এখান থেকে দশ নম্বর বাস যায় তো শেয়ালদা, সে কি আর না জানে নরেশ—টিউশনি নিমিত্ত দূর-দূরান্তে গমনও তার একটা হবি। কত এসেছে সে বালিগঞ্জে ওই দশ নম্বরেই। বাস টার্মিনাসটা তো স্টেশনের কাছেই। বাজে কটা? তবে দিন তিনেক আগে একটা স্টেটবাস অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, সেই থেকে ট্রাম-বাস রাত আটটা-নটাতেই নাকি গ্যারেজ! হাতেরটা ছেড়ে দূরেরটায় যাব? খাঁদিদির চেতাবনি মনে পড়ে গেল নরেশের: ঠ্যাকোরটা বাদ দিয়ে ফারাকেরটা ধত্তে যেয়োনি বাবু, মরবে!

যাক, যা থাকে কপালে, ঠ্যাকোতেই থাকি। আচ্ছা, এই যে ট্রেনটা এতক্ষণ অচল হয়ে আছে, সে কি বিকল হয়ে গিয়ে? কলকবজার ব্যাপার, বিগড়াতেই পারে—তো একটা অ্যানাউন্সমেন্ট নেই! না কি আজ লেডি অ্যানাউন্সাররাও বেগতিকের রাতে আর্লি গ্যারেজ হয়ে গেল! ও-কম্মে তো ল্যাডাদের গলাও মাঝে-মাঝে শোনা যায়— হচ্ছেটা কী!

নাঃ, স্বস্থানেই গিয়ে বসি, সুটেড-বুটেড লোকটা ডাব্বায় ওঠার আগে নরেশকে সি. আই. ডি.-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করাতে নরেশ খুবই বিরক্ত হয়ে নিজের হকের জায়গাটিতে গিয়ে পুনরায় বসল। এবং ডুব দে রে মন কালী বলে ভায়া-রামপ্রসাদ সে আবার ভারতচন্দ্রে ডুবতে চাইল। কিন্তু যা গতিক, ছিনতাইপার্টি আজ নির্ঘাত—এতদিনের হাতঘড়িটা আজ গেল! কী করা যায়? পাশেই এসে বসল চোয়াড়ে একটা লোক, তাকানোটা সন্দেহজনক।

নরেশ তখন নিজেই নিজের ঘড়ি চুরি করল বেমালুম। শালের তলায়, কোন মুভমেন্টই হল না যেন। চুপিসারে, ঘড়িটা হাত থেকে চালান হল পাঞ্জাবির অন্দরপকেটে, নরেশের মুখখানা তখন ডিমে তা দিতে বসা মুরগির মতো বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত—কার সাধ্য বুঝবে তার হাতসাফাই। কিন্তু পকেটটা উঁচু হয়ে থাকল কি? দেখতে গেলে শাল সরাতে হবে — সে হয় না।

যা হয় না তখন সেই-সবই হচ্ছে দেখে নরেশ আশ্চর্য, চমকিত এবং উত্তরোত্তর আনন্দিতও। কেন না এখান থেকে আজ প্যাসেঞ্জার উঠছে বেশ — এত লোক কি ছিনতাই পার্টিতে থাকে— তা হলে বখরা হবে কী রেটে?

তবে এত যখন আজ উঠচিস, তোদের কি আগে থেকে সাঁট ছিল গার্ড আর মোটরম্যানের সঙ্গে যে তোদের এত কটাকে তুলে তবে আজ বালিগঞ্জ থেকে নড়বে? তা বেশ তা বেশ। তো

উঠলিই যখন, অত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসচিস কেন? কাছাকাছি থাক না—ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড—যাক গে, তোদের বেশির ভাগেরই যা চেহারা, এ-সব বুঝবি না। আরে তুই ইয়ং লেডি হয়েও অত দূরে কোণে গিয়ে বসলি! এর পর ওরা এসে যখন তোকে সব খুলে দিতে বলবে তখন তোকে বাঁচাবে কে? দিতে দেরি করলে নাকি ওরা থাপ্পড় মারে। তুই-তোকারি করে। অর্চনা চ্যাটার্জী কী বলল? দশাসই এক ভদ্রলোক কেঁদে ফেলে বলেছিলেন তাঁর কাছে মাত্র দুটি টাকা আছে, তাতে তিন থাপ্পড় গালে সপাটে, খালি পকেটে ঘর থেকে বাইরে বেরোস কেন মড়া? একটি মেয়ে হাতের বালা কানের টপ লুকিয়ে ফেলেছিল ব্লাউজের ফোকরে, ব্যাটারিতে চলা সস্তা হাতঘড়িটা মাত্র দিয়েছিল বলে ওরা ভয়ানক জোরে গাল টিপে দিয়েছিল, লেডি-প্যাসেঞ্জার, গাইড অর্চনা চ্যাটার্জীর গয়না ইমিটেশনের হলেও ঘড়িটা ছিল বেজায় দামি—সেও অবশ্য পাল্টা তুই-তোকারি করেই কিছুটা গায়ের জ্বালা মেটাতে পেরেছিল: 'কোন্ সমাজে জন্মেচিস তোরা, তোদের ঘরে মা-বোন নেই?' একটা ছোকরা অবশ্য জবাবও দিয়েছে: 'আছে বলেই তো দিদি'— বলে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটাও কেড়ে নিয়েছে। আর একটা হাতে-ছোরা ছোকরা, চোখ ট্যারা করে বলেছিল: 'আমরা পেশান্ত মহলানবীশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জারজ সন্তান। তেনার অঙ্কের ভুলে আমাদের এই লাইন ধরতে হল।' তো ভুল অঙ্কের সেই জারজেরা আজ যদি ফের চড়াও হয়? আমার কাছে কিছু না পেলে তো থাপ্পড় অনিবার্য—চিন্তা করল নরেশ, আচ্ছা, ওরা শাল নেয়? এটা তো কাশ্মীরি, দামি—হয়তো একটানেই নিয়ে নেবে, তার পর যদি আমার পকেট হাতড়ে টের পেয়ে যায় তাহলে ঘড়িটা তো যাবেই, প্লাস... দরকার নেই বাবা, যা হবে সসম্মানেই হোক, অতএব ঘড়িটা নরেশ হাতেই বেঁধে নিল। কী হচ্ছে আজ, ট্রেনটা যে আজ এত রাতে এত প্যাসেঞ্জার পাচ্ছে, এ যে আজব সব কাণ্ড শুরু হয়ে গেল— তার মধ্যে এটাই বা কী হচ্ছে, হোক না শীতকাল, তাই বলে পাবলিক প্লেসে তুই দুই ঠ্যাং তুলে—বিকৃত করিয়া মুখ চুলকাইতে বড় সুখ— সেটা ডেমনস্ট্রেট করচিস! আর তার পর? আরো খারাপ কাজ করচিস, কোমর থেকে অত বড় লম্বা গেঁজেটি ঝেড়ে বেঞ্চিতে এত টাকাপয়সা উপুড় করে ফেলে গোনা শুরু করেচিস! এক্ষুনি যদি ওরা আসে? আসুক, আসাই উচিত, তোর যখন এত টাকার গরম!

নরেশ শুনতে পেল বন্ধ জানলার বাইরের কিছু কথাবার্তা : 'কোন্‌টা? কোন্‌টা আগে ছাড়বে?' টাকা গোনা শেষ করে লোকটা গেঁজেটা কোমরে বেঁধে বিড়ি ধরিয়ে বলল: 'স্‌সালা রেল কোম্পানি!' সুযোগটা ছাড়ল না নরেশ, বলল, 'কী হয়েছে আজ রেলের বলুন তো?'

'কী আবার হবে! যা হচ্ছে রোজ! ব্যাম্মন হয়!'

'ট্রেনের গোলমাল?'

'গোলমালের দিন শ্যায় দাদু'—গোল-গোল ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে চুলকানি-ছোকরা নবদ্বীপ হালদারি গলায় বলল, 'এই দুনিয়ায় এখন সব চ্যাপটা মাল!'

রসিকতা নরেশ পছন্দই করে, কিন্তু তার একটা সময়-গময় আছে, এই পরিস্থিতিতে রসিকতার মতো বদ বস্তু আর হয় না তাই সে আর কিছু যাতে শুনতে না হয় এমনি করে শালটা মুড়ি দিয়ে বাবু হয়ে বসতে-বসতে ঠ্যাং নামিয়ে ফেলল, কেন না অবাক কাণ্ড, এই ট্রেনে, এত রাতে, আজ এক বেঞ্চিতে চার জন! উলটোদিকের বেঞ্চিতেও চার জন বসে গেছে! ভূতুড়ে কাণ্ড বাবা—এরা সব মানুষ তো? ভূতটুত নয় তো? কিন্তু নরেশ? হে নরেশ!

নরেশ নরেশকেই তখন প্রশ্ন করছে: তুই কি ভূতে বিশ্বাস করিস?

এরা যদি জলজ্যান্ত মানুষই হয়, এত রাতে এল কোথা হতে? হয়তো আজো ট্রামবাস পুড়িয়েছে, তাই এত লোক জমে গেছে, তাই হয়তো এই বিশেষ পরিস্থিতিতে, ট্রেনটা লোকবোঝাই হয়ে তবে আজ ছাড়বে। মন্দ না, এর মধ্যে ছিনতাই পার্টি কিছুই করতে পারবে না, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই—

আমি তো ভগবানও বিশ্বাস করি না, করি? নরেশ তখন আত্মগত এই প্রশ্নে পীড়িত। না, না, ভগবান নয়, বামপন্থীদের বড় শরিক কংগ্রেসিদের গুঁতোয় এখন তো সব গর্তে, আজ নিশ্চয়ই তেনারা বালিগঞ্জের কাছেপিঠে আন্ডারগ্রাউন্ড মিটিং সেরে এখন ফিরছেন রাজধানীর বক্ষে, তা বেশ তা বেশ।

এই তো ওরাও এল, ট্রেন যেন একটু নড়েও উঠল। জয় মা, এবার জয় মা বলে ভাসা—

কিন্তু এ কী? ট্রেনটা কোন্ দিকে চলল? উলটোদিকে কেন? ইয়ারকি? উলটোরথ নাকি আজ? ট্রেনের আবার এ-সব কী—বসা-অবস্থা থেকে নরেশ মুহূর্তের মধ্যে গুলতির বাঁটুলের মতো ছিটকে দরজার মুখে।

কিন্তু দুজনে তাকে ধরে ফেলেছে জাপটে।

'ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্—'

'চাঁদু আমার! পকেটমার! শালা তালে ছিলিস!'

'আরি বাপ্‌রে বাপ্, কার কী গেল দ্যাখ রে দ্যাখ—'

নরেশ সকলের হাত ছাড়িয়ে ছিটকে গেল দরজায়—ট্রেনটা বালিগঞ্জ থেকে শেয়ালদার দিকে না গিয়ে উলটোদিকে চলল কেন বলতে-বলতে এবং সে যে-দিকটাকে সোজা বলে মনে করছিল সেই দিকে মুখ করেই—অর্থাৎ ট্রেনের গতির বিপরীতমুখী হয়ে নেমে যাবার জন্য পা বাড়ালো, তখনো ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু কার এক হেঁচকায় নরেশ ভেতরে এসে পড়ল। এক যুবক তাকে বজ্রমুষ্টিতে পাকড়ে টানতে-টানতে সিটে এসে জবরদস্তি বসিয়ে দিল এবং নরেশের সামনে ভীমের মতো মুখ করে দাঁড়ালো যেন নরেশই। জরাসন্ধ। এবং বলল: 'কেইসটা কী?'

নরেশ তখনো নরেশই, বলেই চলেছে : 'ট্রেনটা উলটোদিকে যাচ্ছে কেন?'

ভীম বলল, 'উলটো? অ্যাঁ! উলটো?'

'উলটো নয়? ট্রেনটা শেয়ালদার দিকে না গিয়ে এদিকে যাচ্ছে কেন?'

ভীম তখন আরো ভীম গলায় বলল, 'বটে! তা এদিকে যাবে না তো কি ট্রেনটা ওদিকে যেতে গিয়ে প্ল্যাটফর্ম ভেদ করে তোমার মুণ্ডুর মধ্য দিয়ে সেঁদিয়ে ট্রামলাইন ধরে হাওড়ার দিকে ছুটবে এমনি-এমনি করে!'—দুই হাতের আঙুলগুলি দিয়ে যে-মুদ্রা ভীম দেখাল তা দুই খণ্ডে পরিণত হবার আগে জরাসন্ধও দেখেছিল কিনা সন্দেহ।

বিনা হাততালিতেই চতুর্দিকে হাস্যধ্বনি।

'অ্যাঁ? ট্রেনটা কোথা থেকে ছাড়ল?'—নরেশের আর্তনাদ—'শেয়ালদা? বালিগঞ্জ নয়?'

'ছাড়াচ্ছি! রোসো, তোমাকে বালিগঞ্জ থেকেই ছাড়াচ্ছি!'

'লোকটা পাগল!'

'বদ্ধ পাগল!'

'আরে না না, পকেটমার। কাঁইচিবাজও হতে পারে। অথবা তোলাবাজ।'

'মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অ্যাটেমপট্ নিয়ে ফেইলিওর হয়ে পাগল সাজছে, আর্জেন্ট ধোলাই দিলেই স্বরূপটি বেরুবে। স্টার্ট দেবো?'

'দাঁড়া দাঁড়া, কেসটা আগে বুঝতে দে, লোকটা একদম ওই কোণায় ছিল, এ-ধরনের বদমাইসরা সাইডে থাকে, কাজটি সেরেই টুক করে নেমে যায়, তা তো নয়। তা ছাড়া প্রফেসর জাতীয় ভাবভঙ্গি! এই যে ভদ্দরলোক, আপনি ছুটছিলেন কেন? সত্যি করে বলুন। তার পর হবো— এই না না, আগেই না, একটু চান্স দেবো, তার পর, গণধোলাই, কাকে বলে, বুঝবেন।'

'আমাকে শেয়ালদা যেতে হবে তাই'—নরেশের গলার সুর করুণ, মিনতি-মাখা। দুঃসময়ে যেমনটা হয় আর কি।

'শেয়ালদায় যেতে হবে! অ! শেয়ালদা থেকে শেয়ালদায় কবে থেকে যাচ্ছে দাদা!'

'আমি বুঝতে পারিনি শেয়ালদায় এসে গেছি। ভাবছিলাম বালিগঞ্জে এসেছি তাই বসেছিলাম। আমি তো গতির দিকে মুখ করে বসি অলওয়েজ, গতির উলটোদিকে মুখ করে বসি না তো, মাথা ঘোরে, বমি হয়, গতির উলটোদিকে সিট ফাঁকা থাকলেও—ট্রামে বাসে ট্রেনে—বসি না, দাঁড়িয়ে থাকি, তাই যেই ট্রেনটা উলটো চলল অমনি বুঝেছি, বুঝতে দেরি হয় না।'

'বলচে বেশ!'

'বাক্যবাগীশ! প্রফেসার তো।'

'মিথ্যুকও বটে।'

'অ্যাঁ, মিথ্যুক?'

'আলবত মিথ্যুক। বলল বসে ছিল, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি দাঁড়িয়ে ছিল।'—বললেন স্যুটেড-বুটেড, প্রচণ্ড ধমকে বললেন, 'বলুন ছিলেন কি না? দাঁড়িয়ে? দরজার মুখে?'

'কামরাটা ফাঁকা হয়ে গেল বলে'—কাঁচুমাচু গলায় কৈফিয়ত দিল নরেশ, 'নেমে দাঁড়িয়ে ছিলাম বটে।'

'হুঁ।' অন্য একজন বলল, 'শেয়ালদা যেতে হবে, তা কোথা থেকে আসা হয়েছিল?'

'যাদবপুর।'

'যাদবপুর? তো শেয়ালদা পৌঁছে গিয়ে বসেছিলেন কেন? কী মতলবে?'

'বললাম তো, বুঝতে পারিনি আমি। বালিগঞ্জ ভেবে—'

'ঘুমোচ্ছিলেন।'

'মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যে কথা। আমি স্বচক্ষে দেখেছি লোকটা জাগা ছিল। ভীষণই জাগ্রত ছিল। আর কী ছটফট! একবার এ-দিক, একবার ও-দিক।'

'আরে পাগল তো! পাগলদের কিছু ঠিক থাকে? ঠিক থাকলে লোকে পাগল বলে কেন?'

'পাগলই। পূর্ণ বিকার। চোখেমুখে পূর্ণ বিকার।'

'আবার হাসচে কীর-ম, যেন পাগল নয়, স্যায়না পাগল!'

'তোমরা ভুল করছ, লোকটা সুইসাইড করতে যাচ্ছিল, তোমরা বাঁচিয়ে দিলে এ-যাত্রা। তবে পারবে না, আবার অ্যাটেমপট নেবে। সেটাই সিম্পটম, জানি তো। কত দেখলাম।'

'মানসিক রোগ যা বাড়ছে না! ধরাদ্ধর! আমার খুড়তুতো ভাইয়ের এক শালা—এই তো কদিন আগে রেললাইনে ঝাঁপালো। সব কটা দৈনিকে উঠেছিল, পড়িসনি?'

'আমি ও-সব পড়ি না, এমনিতেই ডিপ্রেশানে আছি, ও-সব পড়লে—'

'তা হলে তো এর জোর বরাত, খুব বেঁচে গেল এ-যাত্রা। ধুর মশাই, দু-টুকরো হয়ে যেতেন যে—ছিঃ, ওর-ম ভাবে মরার চেষ্টা করবেন না। কী দিনকাল হল রে বাবা!'

'আর কইয়েন না! অইব না! ত্যালের কিলো হালায় সাড়ে এগারো! গরমেন্ট! ডাকাইতের গুষ্টি! এই রাজ্জেত্বে লুকে পকেটমার তো অইবই, কিছুই আইচ্চয্য না।'

'আমি পকেটমার নই'—আরো করুণ গলায় নরেশ বলল, 'আমি রেলেই চাকরি করি। মাইনে ভালোই পাই, পকেটমার হতে যাব কেন?'

'রেলে চাকরি করেন! ফের মিথ্যে কথা! রেলের লোক তো ট্রেন থেকে নামতেও জানেন না? রানিং ট্রেন থেকে রেলের লোক উলটোদিকে মুখ করে নামবে! বাছাধন, কোথায় খাপ খুলেছ!'

'বালিগঞ্জে এ-লোকটাকে জি.আর.পি.-তে হ্যান্ডওভার করে দেওয়াই ভালো। ওকে ছেড়ে রাখা ঠিক নয়।'

'ছেড়ে! প্রশ্নই নেই। হয় ধোলাই, নয় পুলিশ। এমন কেস হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবো!'

'চ্চ্চ্

নরেশ তখন করজোড়ে বলা শুরু করেছে প্রতিটি প্যাসেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে, 'দেখুন, আমাকে পুলিশে দিলে আমার বাবাও হার্টফেল করতে পারেন—তা ছাড়া আমি অন্যায় তো কিছুই করিনি, যাদবপুর গিয়েছিলাম টিউশনি করতে। ক্লাস ইলেভেনের দুই ছাত্রছাত্রী, বাংলা ইংরেজি দুটোই পড়াই, আমি যদি পাগল হব বা আত্মহত্যার কেস হব তবে কেউ আমাকে টিউটর রাখবে? এই দেখুন কত খাতা'— বলে নরেশ কাঁধঝোলা থেকে ফুলস্কেপ-সাইজের গোটাকতক খাতা বের করল, আদালতে যেন এমন সাক্ষ্য পেশ করল যাতে অকাট্য প্রমাণ হয় সে পাগল নয়।

'বাঃ বাঃ, অ্যাকটিং করছে বেশ! আমি না ঠেকালে এতক্ষণে চাঁদু চন্দ্রলোকে!' হঠাৎ ভীষণ ধমকে নরেশকে লোকটি বলল, 'কাপুরুষ! জীবনযুদ্ধে ফাইট দিতে না পেরে মরে বাঁচতে চাও! ছিঃ! হবে না! আমরা আছি কী কত্তে?'

'আরে কী মুশকিল! আমি মরতে চাই না, রেলে চাকরি করি। পকেটে ভ্যালিড টিকিট আছে—'

'কী আছে?'

'ট্রেনের টিকিট।'

'ট্রেনের টিকিট! লায়ার দ্য গ্রেট! এইমাত্র বলছিলে তুমি রেলওয়ে-স্টাফ।'

'স্টাফ তো বটেই, রেল আমাকে থাকার জন্য কোয়ার্টার্সও দিয়েছে। শেয়ালদায়। ফ্যামিলি নিয়ে থাকি। আমার মেয়ে—'

'চোপ! যাদবপুর টু শেয়ালদা কেউ টিকিটই কাটে না, আর তুমি রেলের লোক হয়ে টিকিট কেটেছ! কই, দেখি টিকিট, আছে?'

সঙ্গে-সঙ্গে নরেশ বুকপকেট থেকে ট্রেনের টিকিট বের করল। একখানা নয়, দুখানা। একটি শেয়ালদা থেকে যাদবপুর, অন্যটি উলটো।

ভীম এগিয়ে এসে খপ করে দুটো টিকিটই ছিনিয়ে নিল নরেশের হাত থেকে। তার পর সে একবার টিকিট একবার নরেশের মুখ এমনভাবে চেক করতে লাগল যেন টিকিটে নরেশের মুখের ছবিও আছে। অতঃপর যখন টিকিট-দুটি অন্য যাত্রীদের হাতে-হাতে ঘুরতে লাগল তখন যেন তারা আর যাত্রী নয়, সকলেই টি.টি.ই.-তে পরিণত।

ওই-সময় নিজেদের কথোপকথন চলতে লাগল:

'পাগলামির প্রমাণ নিজের হাতেই তুলে দিল!'

'আরে এই পাগল সেই পাগল না— কেইসটা আপনেরা আদপেই বুঝেন নাই, হেইতে হওয়া-পাগল না, সাজা-পাগল!'

'সে আবার কী?'

'জানেন না? শুনেন শুনেন। আমাগো আপিসের এউক্যা লুকের বিত্তান্ত শুনেন। হেইতের রাইত বারোটার পূর্বে বাড়িত ঢুকনের উপায় নাই—অইব না? পুলা-মাইয়া হাফে-ডজন! ঘরে ঢুকনের সাথ-সাথই চিল্লাইব : ও বাবা, আমার এইডা আনছ অইডা আনছ? কাম কী অত দিগদারিতে—গুষ্টি ঘুমাইব, অর্ধাঙ্গিনী ঢুলতে লৈব, তখনে বাবু চুরের লাহান বাড়িত ঢুকনের টাইম অইব। কেইসটা বুঝলেননি?'

অট্টহাস্য।

'যুলো আনা না বুইঝাই এত হাসি? মা রে মা, যাইব কুথায়? একদিন হইসে কি, দত্তমশয় মনের ভুলে রাইত এগারোটার মৈধ্যেই বাসের থিকা নাইমা বাড়িত যাওনের পথে, হঠাৎ শুনেন কি, মা রে মা, পাড়ার পানবিড়ির দুকানে র‍্যাডিওখান তখনতরি চিল্লাইতাছে, নিউজ! অর্থাৎ? এগারোটাই পুরা বাজে নাই, দত্তমশয় তখনে কী করেন? অ্যাবাউট টার্ন! উলটাদিকের বাসে চাইপা বসলেন!'

অট্টহাস্য।

'এইটা হইল সেই রুগ। উলটারথের জগন্নাথ। বাড়িত অশান্তি, তাও কয় কিনা শান্তিপূর্ণ পরিবার। র‍্যালের লুক, টিকস দুইখান! যুলো আনায় বত্তিরিশ আনা বিকারগ্রস্থ!'

নিরুপায় নরেশচন্দ্র তখন নিজের অ-পাগলত্ব প্রমাণের জন্য নিজেও গণহাস্যে সামিল। এবং পুনরায় দাবি করল,'কিন্তু আমাদের পরিবারে বাস্তবিকই কোনো অভাব নেই। পাগলও নেই কেউ।'

'এয়া কয় কি'— এক বরিশালি এবার মুখ খুলল, 'ও মনু, তুই তো ঠিকই ধরছ, এডা যে বেহুদা পাগল, এই বাজারে কয় কিনা কোনো-কিছুরই আনাস্টন নাই! ঠাকুমায় কইথো— অদন্তের হাসি, আমি দ্যাখথে ভালোবাসি, এক্কালে হেই পদ! ত্যালের কিলোই সাড়ে এগারো, অখাইদা চাউল এহনই দুই-যাইট। মুসেরের ডাইল তো তিন ট্যাহাও ছারাইসে। হালার হলুদ কয় কিনা নয় ট্যাহা। মরিচ তেরো, চিনি চাইর নব্বই, আর মাছ? ও মনু, শিগ্‌গিরও মাছের মুখ দ্যাখসো? কয় কিনা অভাব নাই—তয় টিউশনি ক্যান রে!'

পার্ক সার্কাস স্টেশনের কাছে ট্রেনটার গতি মন্থর হতেই নরেশ উঠে দাঁড়াল। এই আশায় সবাই এখন রঙ্গ-রসিকতায়, এই ফাঁকে যদি কেটে পড়া যায়। কিন্তু ভবী ভুলবে! এক সাঁড়াশি-মুঠো, এক হেঁচকা, নরেশ যথাস্থানে।

'আমাকে ছেড়ে দিন না'— নরেশের গলা তখন যেন সকরুণ বেণু! কী হবে বাজিয়ে! ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা কেউ তোমার বিদেশি নয়, তাদের রাগিনী তোমার গায়ে লাগল তো তুমি যাবে কোথায়!

'নড়বার চেষ্টা করলে এমন ঝাড় দেব না, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব।'

'বৃথা চেষ্টা! মরতে যার মন উঠেচে তাকে তোমরা কী করে বাঁচাবে গো! দ্যাখো দ্যাখো চোখ দুটো—পূর্ণ বিকার! মরণ ওকে টানছে! এ বড় ভয়ানক টান গো! আমার এক বউদির চোখে দেখেছিলাম, অবিকল এমনি! যেদিন দেখলাম, তার পরের দিনই!'

'রেল লাইনে?'

'না গো, গলায় দড়ি দিয়ে। ঝুলে ছিল। পারল কেউ বাঁচাতে? মরণের হাতছানি, টানছে ওকে।'

সঙ্গে-সঙ্গে নরেশের মুক্ত হাতটা পুনরায় একজনের বজ্রমুষ্টিতে।

যে-লোকটা নরেশের জি.আর.পি.-র হাতে তুলে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে, সে বলল, 'ওকে আমার পাশে দিন তো এখানে, দাদা আপনি ওর জায়গাটায় যান। কেলেঙ্কারির একশেষ। আমার বাড়ির লোকেরাও চিন্তায় পড়বে। আরে তুই হিতেশ, তুই তো আছিস, তুই কাইন্ডলি আমার বাড়িতে একটু জানিয়ে দিস, আমি আজ লাস্ট ট্রেনে ফিরব। দিবি তো?'

'দেবো দেবো। তুই ভাবিস কী আমাকে? এ-টুকু সার্ভিস দেবো, তার জন্য অত ভঙ্গি

কচ্চিস কেন। কোনো ব্যাপারই না।'

'কাউনসেলিং!'—ষাট বছর বয়সের এক প্রৌঢ় নীরবতা ভঙ্গ করে জলদগম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'হি রিকোয়ার্স কাউনসেলিং। সিমপ্যাথি। হি সাফার্স ফ্রম অ্যালিয়েনেশন। নিঃসঙ্গতা। এ বড় ভয়ানক ব্যাধি। মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। শুনুন ভায়া, লুক অ্যাট মি। কী? মরতে চান। কিন্তু কেন? মরে কী সুখ? যত যাই হোক, তবু মরবেন কেন? নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দিয়ে যাবেন? তা ছাড়া মরবেনই যদি, রেললাইনে কেন? রেলে কাটা পড়ে কী সুখ? অতি কুৎসিত মৃত্যু। তা ছাড়া মরেই তো আছেন, এই যে সংসারটা পৃথিবীটা অক্টোপাসের মতো— সে কি আপনার দোষে? মোটেই না, আরে টাকার দাম নামতে নামতে আটাশ পয়সা! তো? তা আপনি তার জন্য মরবেন কেন? মন শক্ত করুন।'

নরেশ চক্রবর্তী তখন কোনে-বসা মহিলাটির দিকে তাকাল যেন স্রোতের মুখে কুটো, ওঁর কাতরোক্তি ভরসা করে নরেশ গলা বাড়িয়ে বলতে লাগল, 'আপনি দিদি, দিদি, আপনি দিদি—'

'কী হল?'—মহিলা আরো ব্যাকুলা।

নরেশ দেখল ট্রেনটা পার্ক সার্কাসে একটু থেমে তখন বালিগঞ্জের দিকে।

'দিদি, আপনি আমাকে বাঁচান, আমি আত্মহত্যা করব না। মনের ভুলে এটা হয়ে গেল, শেয়ালদাকে বালিগঞ্জ ভেবে দিদি'— নরেশের গলার সকরুণ বেণুতে মধ্যবয়স্কা সহযাত্রিনীর বক্ষ তোলপাড়।

'বুঝেচি বুঝেচি'—মৃদুকণ্ঠেই বললেন তিনি, 'আমি অনেক আগেই আঁচ করেচি আপনি খুবই ভুলো মন। আমার ছোট ভাইটার মতো। কবিতার বাই আছে তো! আপনিও লেখেন কবিতা, ঠিক ধরেচি না?'

আশান্বিত নরেশ গুল ঝেড়ে দিল, 'হ্যাঁ'—এমন সলজ্জ হাসল যে কবি ছাড়া ও-রকম হাসি অসম্ভব।

দিদি তখন দাঁড়িয়ে পড়েছেন যেন গর্জন তেল ঢেলে জনগণের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ শান্ত করবেন স্বয়ং জগদ্ধাত্রী, বললেন, 'আপনারা এঁকে ছেড়েই দিন। কিছু হবে না।'

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল নরেশের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব-নেওয়া ক্যানিং-এর যাত্রীটি, 'যদি কাল কাগজে দেখি এই লোকটা ট্রেনে কাটা পড়েছে তা হলে আপনি দায়ী থাকবেন?'

মহিলা কেঁপেই উঠলেন, বিবর্ণ হাসিতে নরেশের দিকে তাকালেন, নরেশ তখন করজোড়ে এতই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে মহিলার করুণ আবেদনে যেন এ-জন্মে তো বটেই, পরজন্মেও সে আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকবে।

মহিলা বললেন, 'দায়ী থাকব।'

বালিগঞ্জ আসছে, ট্রেনের গতি মন্থর, নরেশ বড়ই উতলা।

'না, না, অত তাড়াহুড়া নয়'— ক্যানিং-এর যাত্রীটি নরেশের হাত মুঠো করে ধরল।

'সাবধানে নামুন। ধীরে।'—বলে সে নরেশকে হাতে ধরেই নামাল।

নামিয়ে— নরেশ যেন একটা নৌকা, নৌকা জলে নামিয়ে পাড়ের লোকেরা যেমন ঠেলে দেয় খালে বা নদীতে, তেমনি সে নরেশকে ঠেলে দিল প্ল্যাটফর্মে। ট্রেন ছাড়তেই পাছে নরেশ লাইনে লাফায় সেই আতঙ্কে শুধু ক্যানিং-এর যাত্রী না, শুধু ওই মহিলা নন, কামরাটার সমস্ত

লোকই দরজা এবং জানলাগুলি দিয়ে ঝুঁকে হাত নেড়ে-নেড়ে চেঁচাচ্ছে : যান, যান আরো দূরে আরো দূরে —

যন্ত্রচালিতবৎ নরেশও পিছু হঠতে-হঠতে উন্মাদতুল্য হাসিতেমুখ ভরিয়ে হাত তুলে সমবেত প্রাণরক্ষাকারীদের বাই-বাই দেখাতে লাগল—কামরার ভীমটি শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত রেডি ছিল, জরাসন্ধটা লাইনে ঝাঁপাতে এলে এক লাথিতে তাকে প্ল্যাটফর্মে উলটে দেবে—ভীম তো দ্বাপর যুগে পড়ে নেই, কলি যুগে তার প্রাণেও কত মানবিকতা!

নরেশ করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়াল, ট্রেনের পশ্চাদ্দেশে লাল টেলল্যাম্পটিও যখন অদৃশ্য তখন নরেশ নিজেই যেন নিজেকে জীবনে এই প্রথম দেখল।

এ কী? এই শীতে ঘেমে যাচ্ছি কেন? উঃ, শালটা তো বড্ড গরম, ভাঁজ করে কাঁধে ফেলব? ওরা তো চলে গেছে, এখন তো আমি পাগল নই, আত্মহত্যাতেও নেই, কিন্তু এই শীতে, এখন গরম লাগলেও একটু আগেও তো যথেষ্ট শীত ছিল, শাল কাঁধে ফেললে ফের যদি পাগল প্রতিপন্ন হই? ধরছেটা কে? চতুর্দিক জনহীন—এটা সত্যিই বালিগঞ্জ তো? সর্বাগ্রে সেটাই সেন্ট পারসেন্ট নিশ্চিত করা দরকার—আচ্ছা ওই যে বা-লি-গ-ঞ্জ, বাংলায়, ইংরেজিতে, নরেশ প্রতিটি অক্ষর একাধিকবার পড়ল—গুড। তবে বাজে কটা? দশটা বেজে তেতাল্লিশ, স্টেশনের ঘড়িতে এক মিনিট কম,—ও ঠিক আছে যাহা বায়ান্ন তাহা তিপ্পান্ন। এখন প্রশ্ন ফিরব কী উপায়ে? সিগারেট এখন না, আগে একটু চা, ভেন্ডারটা কম্বলমুড়ি দিয়ে আছে দেখে নরেশ অবাক : তোর এত শীত? 'হ্যাঁ ভাই, একটু চা হবে? হ্যাঁ ভাই, শেয়ালদা যাবার আর ট্রেন আছে তো? হ্যাঁ ভাই, এটা বালিগঞ্জ তো?'

চা ঢালা বন্ধ করে ভেন্ডারটা ওভাবে দেখছে কেন নরেশকে? নরেশ কী এমন দর্শনীয় বস্তু! নরেশ মুখটা খুব হাসি-হাসি করল কেন না এও কি আমাকে পাগল ঠাওরাল? ভেন্ডারের দৃষ্টি সন্দেহজনক।

আরে ওটা কে? ঢ্যাঙা লোকটা গুলিখোর নাকি, দেখতে হাঁড়িচাচা, এত রাত্রে এখানে কেন বাবা? কাঁইচিবাজ নয় তো? কাকে বলে কাঁইচিবাজ তা নরেশের অজানা, কিছু আগে শব্দটা তার উদ্দেশেই প্রযুক্ত হয়েছিল— ভোলেনি নরেশ, হয়তো এই হল প্রকৃত কাঁইচিবাজ কেন না হেঁড়ে গলায় বলল ভেন্ডারটাকে: 'শালা এখনো চা দিলি নে, মুণ্ডু চটকে দেব তোর।' 'কটা বাজল?'—নরেশ চমকে উঠল, কাঁইচিবাজটা তাকেই প্রশ্ন করল যে?

নরেশও চালাকি করল, ড্রাম ঘড়িটার দিকে বেশ করে তাকিয়ে তারপর বলল, 'দশটা চুয়াল্লিশ'—

'বাঞ্চোত রেলের ঘড়ি, ঘড়ি নাকি! নিজের ঘড়িতে কত?'

নরেশের হৃৎকম্প— গেল আজ ঘড়িটা। তথাপি প্রাণ আগে, তাই বলল, 'দশটা পঁয়তাল্লিশ—আপনি কি শেয়ালদা যাবেন? ট্রেন আছে তো?'

'বাঞ্চোত ট্রেনের তোয়াক্কা আমি করি না। হেঁটেই যাব। ডবল-হাফটি চোঁচোঁ মেরে দিয়ে হাঁটা ধরব, কী রে শালা মারব ঝাপড়?'

'হাঁটবেন কেন, ট্রেন নেই? আচ্ছা বাস আছে? আচ্ছা লাস্ট বাস কটায়?'—নরেশ প্রশ্নগুলি করতে উদ্বেগ কিন্তু দেখাচ্ছে না— পাছে এরা পাগল ঠাওরায়, কী-যে শান্ত গলা তখন নরেশের। নরেশ আবার বলল, 'চলুন না, বাসেই যাই।'

'বাসের পোঁদে আমি পাঁচ লাখ ঝেড়ে এইচি শ্‌শালা।'

চায়ের খুরিটা নিতে-নিতে নরেশ, তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই, জানতে চাইল, 'আচ্ছা, এখান থেকে শেয়ালদা যেতে ট্রেন ভালো, না বাস ভালো, মানে কোন্‌টা আগে পাবো?'

'মাথাটা খারাপ নাকি? পয়সাটা ছাড়ুন তো আগে'— মাফলার-পেঁচানো ভেন্ডারের চোখদুটো যেন হুতোমপেঁচা (নরেশের মতে)। পয়সাটা চটপট দিয়ে ফেলে নরেশ চিন্তায় পড়ল — এও আমাকে পাগল ঠাওরাচ্ছে? নাঃ, যাদবপুরের এই টিউশনিটা ছেড়েই দেব— বাবা বারংবার মাকে দিয়ে বলাচ্ছেন। ছেড়ে দিলে আজ পাগলে পরিণত হতে হত না। কিন্তু পাগল তো সত্যিই হইনি আমি, তবে নরেশ চিন্তা করল পাগলামির সর্বপ্রধান সিম্পটম নাকি নিজেকে না, অন্যকে পাগল ভাবা। এই যারা আমাকে পাগল ভাবছে তারা কি সকলেই পাগল? এত পাগল একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছে? আবার এই ভেন্ডারটা চা বেচছে—আমাকে দেখেই পাগল ভাবার দরুন ও-ই যদি প্রকৃত পাগল হয়— নাকি আমিই পাগল—নরেশের হৃৎকম্প হতে লাগল, ত্রাসে চা-টাও কী ঠাণ্ডা লাগছে।

এমতকালে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ঝুপ্ ঝুপ্ ঝপাস্— যেন এক ফুৎকারে ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার, গব্-গব্-গবাস্ লোডশেডিং এবং সঙ্গে-সঙ্গে গুলিখোর অথবা কাঁইচিবাজের মুখ ছুটল: ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চোদ্দপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ এমন জঘন্য ভাষায় করতে লাগল খ্যাঁশ-খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ গলায় যে নিকষ অন্ধকারটা যেন নরেশকে সত্যিই এবার পাগলামির গহ্বরে না ঢুকিয়ে ছাড়বে না।

ভেন্ডারের উনুনটার জ্বলন্ত আঁচে নরেশ দেখল কাঁইচিবাজটা তার খুবই কাছে।

'কী হল পটলাদা?'— ভেন্ডার বলছে, 'আজ খেপলে কেন এত? আর এক কাপ দেব?'

'দে গুয়োর ব্যাটা, তোর...ই খাই।'

পটলাদার ভাষাটা নরেশ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিল—ছিঃ, ভাষা এত কুৎসিত হওয়া কি উচিত—যত যাই হোক?

আরে, এই তো আলো জ্বলে উঠল, শাবাস শাবাস শাবাস! আরে এত লোক? পি. সি. সরকারের ম্যাজিক নাকি? এই ভ্যানিশ, এই দেখুন সব এসে গেল ফের, হোকাস পোকাস গিলি গিলি গিলি—ফক্কা হয়ে গেল সব —ওঁ হ্রীং ক্রীং ঠঃ ঠঃ ভো ভো রোগ—এ কী, সত্যিই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি, নরেশ আতঙ্কিত।

আচ্ছা ওরা না হয় উদ্বাস্তু কিন্তু ওই যে বেশ কিছু লোক প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে ওরা যাবে কোথায়?

'আচ্ছা দাদা'—নরেশ এক প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি শেয়ালদা যেতে চাই, তা হলে কোথায় দাঁড়াব?'

'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন'— প্রৌঢ় শ্মশানবৈরাগ্যে উত্তর দিলেন, 'অদৃষ্টে থাকলে এখানেই —'

'শেয়ালদা যাবার তো?'— নরেশ খুব স্বাভাবিক।

'কোথায় যাবে কেউ কি হলপ করে বলতে পারে!'—নরেশের মনে হল ইনিও তারই মতো খুব স্বাভাবিক। গরমটা উত্তরোত্তর বাড়ছে, কেন যে শালটা...

ছিনতাই পার্টি এলেই ভালো হত, শালটা বইতে হত না।

আরে! দৈববাণীর মতো ঘোষিত হল : শেয়ালদা যাবার ট্রেন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে বজবজ থেকে। বাংলায় হিন্দিতে ইংরেজিতে ওই ঘোষণা নরেশের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশা সত্ত্বেও, সে তিন নম্বরেই থাকা সত্ত্বেও, আরো-আরো-আরো নিশ্চিত হবার জন্য এগিয়ে গেল এক চোঙা প্যান্টের যুবকের কাছে ; 'হ্যাঁ ভাই, ওই যে ট্রেনটা আসচে, ওটা কি শেয়ালদায় যাবে?'

চোঙা প্যান্ট নিরীক্ষণ করল নরেশকে, সিগারেটটা মুখ থেকে না নামিয়েই বলল, 'নট সিওর অ্যাবাউট এনিথিং!'

অগত্যা? চিন্তিত নরেশ এবার এক নব দম্পতিকে প্রশ্নটা করল। উত্তর দিল পতিটি : 'পাগল না হোমগার্ড!' জায়া কুলকুলিয়ে হেসে আকুল।

'ওই তো এসে গেছে! ওই আসে ওই অতি... এটা তিন নম্বর তো?'

'আপনি এত লাফাচ্ছেন কেন, আরে ট্রেনটা আসুক আগে, লাইনে মাথা দেবেন নাকি!'— জায়ার চিৎকার শুনে পতির অট্টহাস্য।

লাফিয়ে একটা কামরার উঠে পড়েই নরেশ সাবধানের মার নেই চিন্তায় আরামসে-বসা একটা লোককে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'শেয়ালদা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে জানেন?

আরামে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত লোকটি চটিতং হয়ে বলল, 'তার কি কোনো ঠিক আছে! রাতভোর হয়ে যেতে পারে।'—বলেই এক চোখে নরেশকে দেখতে লাগলেন।

নরেশ অন্যত্র তখন। দরজার মুখে গিয়ে শেয়ালদা যাবার রাস্তা মেলাতে লাগল — আরে ওই তো পার হল বন্ডেল গেট.... ওই তো কারখানাটা... ওই তো ওই তো.... পার্ক সার্কাস? কেউ তো নামল না? নরেশও নামল না। নামবে। যথাস্থানে। শেয়ালদা আসুক, গোল্লায় যাক ভারতচন্দ্র, উপযুক্ত বসার সিট আছে, থাকলেই বা, ফের যদি ভারতচন্দ্রের ভর হয়, না আগে নিজের বাড়িঘর, শান্তিপূর্ণ পরিবার, পরে ভারতচন্দ্র... শীত লাগছে কনকনে হাওয়ায়, শাল জড়াব না, ওই তো ওই তো শেয়ালদা—রানিং ট্রেন থেকেও নামতে নরেশ ভালোই জানে, গতির বিপরীতে না, কী ভাবে নামতে হয় নরেশকে শিখতে হবে না— এই তো মারলাম লাফ— শেয়ালদা!

স্বর্গে অশ্বিনীকুমারের গতিতে নরেশ শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে। চলার বেগে পায়ের তলায় প্ল্যাটফর্ম জেগেছে— কিসের টিকিট কিসের কী! দুখানা টিকিট পকেটে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া নরেশের গতির সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য টিকিট কালেক্টর পেছনে থিস্তি ঝাড়ল : 'শ্‌শালা ডাবলু-টি!'

প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে রাস্তায় নরেশ হাঁটছে কিন্তু হাঁটছে না, উড়ছে কিন্তু উড়ছে না।

রেল কলোনিটার মধ্যে পা দিয়ে নরেশ বুঝল তার পিতৃদেব পাড়া জাগিয়েছেন, অনেক লোক রাস্তায়, 'কী হয়েছিল, কী হয়েছিল'—জনতার এ-সব প্রশ্নের উত্তর নরেশ এখন দিতে রাজি নয়। আরে? তিন তলায় তার বউটা লোহার জাল লাগানো বারান্দায়—ঠায় দাঁড়িয়ে?

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আজ তিন লাফে তিনতলায়।

'কী রে? কী হইসিল?'—দরজায় মা, 'ট্রেনের গোলমাল?'

'ভীষণ গোলমাল, কাইল কমু'—বলেই নরেশ আর একটি লাফে ভিতরে নিজের ঘরে।

এ কী? বউ যে মশারির মধ্যে! ধূমাবতীরূপেণ সংস্থিতা! একটু আগেই বারান্দায় দেখলাম

যে? মরুকগে যাক, আগে নিজেকে দেখি ভেবে নরেশ আলমারিটার ফুলসাইজ আয়নাটার সামনে। বাবা রে, কে এটা? নরেশ নিজের মূর্তি দেখে নিজেই অবাক—শাল মাথায় জড়ানোর দরুন চুলগুলো খাড়া-খাড়া হয়ে এ কী চেহারা, এবং দু-চোখে সত্যিই তো—

'ন্যাকামির আর অন্ত নাই।' মশারির মধ্য থেকে ছুটে এল। বউয়ের এক নম্বর পেটো।

নরেশ গ্রাহ্য করল না, কেন না তার দুচোখে সত্যিই তো—

'বাকি রাত্তিরটা থাকতে দিল না?'— দু-নম্বর পেটো। মশারির অভ্যন্তর থেকে।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু দ্যাখো তো—'

'তারা দ্যাখে নাই?'

তিন নম্বর পেটোতে নরেশ সুনিশ্চিত তার দুই চোখে সত্যি সত্যিই বিকার পরিপূর্ণ।

পাখি-ওড়া ছায়া

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

—ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

আজ মীনাক্ষী বাড়ি নেই। বিশিষ্ট সাহিত্যিক চঞ্চলকুমার ভাদুড়ি আজকাল আর পারতপক্ষে ফোন ধরেন না। ধরেন না বলতে, ডাইনিং স্পেসের ক্যাবিনেটে রাখা ফোন পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁর ক্ষেত্রে আট থেকে দশ রিঙিং পর্যন্ত দেরি হয়ে যায়। অথচ, ফ্ল্যাট ৬৫০ স্কোয়ার ফিটের। এবং রিসিভারের দূরত্ব ৫ গজের বেশি হবে না। তুলনায়, স্ত্রী মীনাক্ষী তিন বার বাজার আগেই ফোন ধরে থাকেন, সে ফ্ল্যাটের যেখানেই তিনি থাকুন না কেন। কেন না, ৭/৮ বার বাজার মধ্যে ফোন না ধরলে ওদিকেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তারা ফোন কেটে দেয়। এ-ভাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয়ে গেছে মীনাক্ষীর।

এ নয় যে সাহিত্যিক বার্ধক্যরোগে আক্রান্ত। লেকে যারা জগিং করে তাদের মধ্যে প্রতি তিনজনে একজন ৫২ বছরের যুবককে পাওয়া যাবে। বয়স এক হলেও তাঁরা কেউ তাঁর মতো নয়।

—ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

আসলে বয়স তো নয়। অবসাদ। ম্যানিয়াক ডিপ্রেসন। আর, অনন্তশয্যায় এই যে শয়ন তাঁর, এ কি সাধ করে!

আজকের কাগজের খবরটাই ধরা যাক না কেন। কামসূত্র কন্ডোম যারা তৈরি করে[১], ব্যাবসার খাতিরেই নিঃসন্দেহে, তারা একটি সমীক্ষা করিয়েছে। পড়ে দেখলেন চঞ্চলকুমার, যৌন ব্যাপারে সমস্ত গোঁড়ামি ঝেড়ে ফেলে অন্তত নাগরিক ভারতীয়রা এক অত্যন্ত খোলামেলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ২ লক্ষ দম্পতির বৈধ যৌনাচরণ সম্পর্কে যে-সব তথ্য ওই সমীক্ষায় বেরিয়েছে, তা স্তম্ভিত করে দেবার মতো। যেমন শতকরা ৪৭ জন বিবাহিতা জানিয়েছেন, তাঁদের বিবাহপূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা ছিল। এমনি আরো অনেক বিস্ফোরক উন্মোচন থাকা সত্ত্বেও যে-তথ্যটি চঞ্চলকুমারকে সবচেয়ে বেশি ভিটে-ছাড়া করেছে তা হল, ওই ২ লক্ষের মধ্যে ১৮ থেকে ৫৫ বয়ঃসীমার মধ্যে শতকরা ৬৫ জন দম্পতি সপ্তাহে ৬ বার নৈশ, ছুটির দিনে একবার দ্বিপ্রাহরিক সহবাস করে থাকেন।[২]

অথচ, শেষের কবিতা-ফবিতা যদি হিসেবে নাও ধরা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবারাত্রির কাব্যেও তো এ-সব ব্যাপারে, দিবা দূরস্থান, রাত্রিযাপন নিয়েও টুঁ-শব্দটি নেই। আর ওদেরই বা কেন মিথ্যে অপবাদ দিই। সে-অপরাধে তো আমিও অপরাধী।

৭২খানা বই লিখেছি। তার মধ্যে অর্ধ-শতাধিক শুধু উপন্যাস। কই, নর-নারী বিছানায় কী করে থাকে—কিবা দিন, কিবা রাত—সে-নিয়ে একটি প্যারাগ্রাফ তো আমারো নেই কোথাও! সে-সব কথা কি তা হলে ভবিষ্যতের ভারতীয় নারী-লেখকদের জন্যেই বরাত দেওয়া রইল? আনসেল কোম্পানির সমীক্ষা তো সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

---

১. জে.কে আনসেল লিমিটেড

২. দি এশিয়ান এজ, ২৬ জুন, ২০০২

— ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

বস্তুত, আজকের সমীক্ষা-রিপোর্টটি লাংসের গভীরতম বায়ুথলি থেকে উঠে এসে একটি দীর্ঘশ্বাসে তাঁর গোটা যাপিত জীবনকে যেন এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে গেছে এ-ব্যাপারে।

তাঁর সাহিত্যিক ব্যর্থতার জন্যই যে এই দীর্ঘশ্বাস, শুধু তা নয়।

সেটা একটা কারণ হলেও, গুরুত্বে তেমন কিছু নয়। কেন না, লেখক, শিল্পী, গায়ক, কতই তো আসে এক-একটা সময় জুড়ে। সকলেই তো কবি নয়, কবি বলে গেছেন, কেউ কেউ কবি। অথবা, পিতৃলোক হেসে ভাবে কাকে বলে গান, আর কাকে সোনা-তেল-কাগজের খনি — এ-সব তো বলাই আছে।

খেলতে চেয়েছিলাম, খেলতে এসেছিলাম, খেলতে নেমেছিলাম; কিন্তু হিটেই উঠতে পারিনি। এই তো বৃত্তান্ত? কিংবা কে জানে, হয়তো খেলতেই আসিনি। হয়তো নন-ইভেন্ট। এমনও তো আছে কত। শশধর দত্ত। ২৭২ গ্রন্থ-প্রণেতা। নন-ইভেন্ট। বেন হার। ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮, ৩ বছরের বিক্রি ৩০লক্ষ। তবু নন-ইভেন্ট। কেউ জানে না, লেখকের নাম কী।

তাই, এ-সব ব্যর্থতার আদৌ কোনো দীর্ঘশ্বাস-যোগ্যতা আছে কি?

আসল কারণ অন্য। ওই রিপোর্ট পড়ে আজ তাঁর মেধার কথা মনে পড়ে গেছে। অথচ, মেধা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাশিত কামসূত্র-তথ্যের একেবারেই বিপরীত মেরুতে।

— ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

সাহিত্যিকের ৪৮ বছর বয়সে মেধা মানজালি এসেছিল অল্প সময়ের জন্য। নয়-নয় করেও চঞ্চলকুমারের জীবনে নারীর সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জনের মতো হবে— আর তাদের প্রত্যেকেই যে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, এমন নয়। সবসময় তাঁদের সকলের নাম পরপর মনেও পড়ে না। মেধা মানজালি এই দ্বিতীয় গোত্রে পড়ে। অর্থাৎ সম্পর্ক হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি। তারপর, মাঝখানের ৪টি বছরই বলে দিচ্ছে, তাঁর নারী-স্মৃতিতে যদি একটিও অর্গ্যাজম থেকে থাকে, তা ওই জীবনের মাত্র ১৫ দিনের মেয়েটিকে ঘিরে।

মেধার সঙ্গে চঞ্চলকুমারের দেখা হয়েছিল কোট্টায়মের মহাত্মা গান্ধি ওপেন ইউনিভার্সিটির একটি আড্ডায়। অধ্যক্ষ রবিচন্দ্রন একাধারে কবিও — বাংলা আধুনিক কবিতার দিকটা তাঁর খানিক জানা আছে। তারাতলার সাহিত্য আকাদেমিতে কেরল থেকে বলতে এসে, মৌখিক আমন্ত্রণের সময়, 'আড্ডা' শব্দটি বাংলায় উচ্চারণ করে বলেছিলেন — এই ১৫ দিন আপনাকে আড্ডাই দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। 'নট হোয়াট উই ইউয়ুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইন্টার-অ্যাকশন ইন সেমিনারোলজি।'

কোট্টায়মের এম.জি.ওপেন ইউনিভার্সিটি একটা ছোট টিলার ওপর ছড়িয়ে। সেখান থেকে যত দূর দু-চোখ যায়, শুধু শ্যাওলার সর-পড়া জল। গাড়িতে পাহাড়ে উঠতে-উঠতে রবিচন্দ্রন বললেন, 'এই সেই ভেনিস অফ দা ইস্ট। ৯০০ মাইল শান্তি ও কল্যাণ। কেরালার বিখ্যাত ব্যাক-ওয়াটার। এর মধ্যে অনেকগুলো দ্বীপও আছে।'

আড্ডার মেজাজ শুরুতেই যাতে এসে যায়, সেজন্য প্রথম ক্লাস নিতে হয়েছিল ক্যাম্পাসের কফি কর্নারে। প্রথম দিনে সবার আগের যে এসেছিল, সে মেধা। আর সে এসেছিল দু-বেণী

দুলিয়ে ছুটতে-ছুটতে। পরনে ছিল নীল ভেলভেটের স্কার্ট।

'শি হ্যাজ অলরেডি এস্ট্যাবলিশড হারসেলফ অ্যাজ এ মাইনর পোয়েটেস।' ঠাট্টা করে বললেন রবিচন্দ্রন।

প্রথম দিনেই প্রথম প্রশ্ন ছিল মেধার, 'স্যার, এখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় কেমন লিখছেন?'

চঞ্চল বিষাদময় মুখে দু-দিকে ঘাড় নাড়লে মেধা জানতে চাইল, 'উনি কি প্রেম ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে লিখে থাকেন?'

ইংরেজিতে কথা হচ্ছিল। এইখানে রবিচন্দ্রন মালয়ালমে ওকে যা জানালেন, চঞ্চল তার মানে বুঝতে পারলেন। কেন না, শুনে মেধার মুখটা এতটুকু হয়ে গেল।

'ও আপনি জানেন না, না?' রবি বললেন, 'এখানে দু-পাশে মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ। মাথা যখন ওপর-নীচে, তখন, না। ও তাই প্রথমে বুঝতে পারেনি যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন।'

পাশের একটি টিলার মাথায় আর ক-জন ছেলে-মেয়ে দেখা গেল। রবি বললেন, 'ওই যে, ওরা আসছে।'

পরদিন সকালবেলা দু-জন বন্ধুর সঙ্গে মেধা ওঁর কাছে এল। ক্যাম্পাসের মধ্যে ছোট ফ্ল্যাট দিয়েছে অতিথি-অধ্যাপককে। কিচেনেট-এ গিয়ে মেধা চা করে আনল। রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলতে বলল। কেতকী কুশারী ডাইসন সম্পাদিত ভিক্টোরিয়ার জার্নাল পড়ে যা মনে হয়, বলল। জানতে চাইল, রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স কত?

চঞ্চল বললেন, '৬৩।'

'আর ভিক্টোরিয়া?'

'৩২ হবে।'

'তা হলে আর এমন কী বয়স।'

চঞ্চল বললেন, 'কার?'

মেধা বলল, 'কেন রবীন্দ্রনাথের!'

দু-দিন পরে ছিল স্টিমারে কোচি। প্রেস ক্লাবে মালয়ালম লেখকদের সঙ্গে সভা। এক ঘণ্টার জার্নি। রবিচন্দ্রন বললেন, 'মেধা সঙ্গে যেতে চাইছে। তোমার আপত্তি আছে।'

জলের ওপর ডেকে বসে অনেক কথা হল মেধার সঙ্গে। বেশিটাই রবীন্দ্রনাথ-ওকাম্পো নিয়ে। একটা রক্তমাংসের সম্পর্ক হল না কেন। বিশেষত, ভিক্টোরিয়া তো স্প্যানিশ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙালি। তদুপরি গুরুদেব। বললেন চঞ্চল।

'খুব তো সুন্দরী ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আর বিদুষী।' বলতে -বলতে চঞ্চল দেখলেন, কোথা থেকে উড়ে এসে দুটি অভ্রবিন্দু মেধার দু-চোখ জুড়ে বসে গেছে।

ক্যাম্পাসের ফ্ল্যাটে মেধা একা-একা আসা-যাওয়া শুরু করল। চার বছর আগে চঞ্চলের অ্যাকাডেমি পাওয়া বইটি (*অস্তিত্ব অতিথি তুমি*) এখনো মালয়ালমে আসেনি। ইংরেজি থেকে

মেধা অনুবাদ করতে চায়।

চঞ্চল বললেন 'হ্যাঁ।'

শ্রী মীনাক্ষী মিউজিয়ামের আর্কিওলজি বিভাগের প্রধান। শুধু সেজন্য নয়। আর্কিওলজির সঙ্গে শুধু ইতিহাস নয়, চলমান জীবনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। আবর্জনার স্তূপের নীচে জীবনেরও কত কিছু লুকিয়ে থাকে না? তারা উঠে আসে।

আসার দিন সকালবেলা। প্লেন দেড়টার সময়। এয়ারপোর্ট এক ঘণ্টা দূরে। রবিচন্দ্রন গাড়ি পাঠাবেন সাড়ে ১১টায়।

ফ্ল্যাটে ঢুকে ল্যাচ-কী বন্ধ করে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেধা। মাথা নিচু। মুখ টকটকে লাল।

'ফের ছুটতে-ছুটতে এসেছ তুমি?' সস্নেহে বকুনি দিলেন চঞ্চল।

মাঝখানে হাতখানেকের ব্যবধান। মেধা চুপ। চঞ্চলও চুপ।

হালকা আলিঙ্গনে চঞ্চলকুমার তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে শিরস্পর্শ করলেন। দেখা গেল, বুকদুটি দূরে রাখার তার একটুও ইচ্ছা নেই। যদিও চুম্বন এড়াতে সে রেখেছিল মুখটা ঘুরিয়ে। অথচ, চঞ্চল তার শ্যাওলা-রঙা স্টোনওয়াশ টপের দু-একটি বোতাম খুলতে চাইলে সে কিছুতেই খুলতে দিল না। অবশ্য, পীড়াপীড়ি করেননি তিনি। সে-বয়স আর নেই, যদিও রবীন্দ্রনাথের ৬৩-র তুলনায় তাঁর বয়স মাত্র ৪৮, কিন্তু ব্যবধান সেই একই অর্থাৎ সেই ৩০-এর ফের। রুপালি ভেলভেটের নীচে শুধু তার বাম স্তনটি সে আদর করতে দিয়েছিল।

হাত দিয়ে ধরে চঞ্চলের ডানহাতটা সে বারবার তার বাম স্তনের ওপর রাখছিল।

'নিঙ্গল প্রেমত্তিল বিশ্বেসক্কু নুন্দো?'

'?'

'ডু ইউ বিলিভ ইন লাভ?' কত গভীরভাবে জানতে চেয়েছিল ওইটুকু মেয়ে।

চঞ্চলকুমার মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেই বুঝতে পারলেন 'না' বলা হয়ে গেছে।

— ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল। আবার বাজছে। হঠাৎ মনে হল চঞ্চলের। আরে, এতো ট্রাঙ্ককলের আওয়াজ!

— হ্যাঁ। বলুন।

— মি. ভাদুড়ি স্পিকিং?

— ইয়েস প্লিজ।

— গুড ইভনিং স্যার। স্পিকিং ফ্রম তিরবনন্তপুরম মেডিক্যাল হসপিটাল। ডা. ও পি নাইয়ার।

...আমার একজন পেসেন্ট। মেধা মানজালি। আপনি চেনেন তাকে? তার ম্যামালোস্কোপি হয়েছিল। এবং বাঁ-দিকের ব্রেস্টে কার্সিনোমা পাওয়া যায়। না-না, প্রথম না। ডান স্তন ৫ বছর আগে আমিই কেটেছিলাম। যা হয়, ওখানে রাবারব্রেস্ট-ব্রেসিয়ার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু

এবার মেটা স্টেসিস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই কিছুই করা গেল না।

আপনার সঙ্গে পেসেন্ট কথা বলতে চেয়েছিল। আমাকে ফোন নম্বরও দিয়েছিল আপনার। তবে তখন মাথাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সে-সুযোগ দেওয়া যায়নি। আর এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবিনি। যদি হঠাৎ মরে যায়, আপনাকে জানাতে বলেছিল। আমি আমার কর্তব্য করলাম।

আচ্ছা, বাই। গুড নাইট।

আর্কিওলজির সঙ্গে জীবনের একটা সম্বন্ধ আছে। ইউফ্রেটিস নদীর ধারে উর অঞ্চলে যখন খনন কাজ চলছিল, ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের সামনে সবার আগে উঠে আসে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগেকার সুমের সভ্যতা থেকে, দুজনে শোবার একটি দাম্পত্য বিছানা।

বিছানাটি অটুট অবস্থায় পাওয়া যায়। এটা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি, ১৯২২ সালে স্যার হাওয়ার্ড কার্টার যখন টুটানখামুনের সমাধি আবিষ্কার করেন, মাঝখানে হাজার-হাজার বছর কেটে গেছে — তরুণ ফারাও-এর কণ্ঠে বালিকা বধূর পরিয়ে দেওয়া মালাটি তখনো তাঁর গলা থেকে ঝরে যায়নি। আজ ৫২ বছর বয়সে সাহিত্যিক চঞ্চলকুমারের মাথার ভিতরে আর -একবার সেই অনির্বচনীয় অর্গ্যাজম হল — যা শুধু প্রত্ন-ই দিতে পারে।

---

* গল্পের নাম শঙ্খ ঘোষের পঙ্‌ক্তি থেকে।

মাত্র আধখানা শতাব্দী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১.

মাদুর পেতে বসে আছে তিন অকাল-বুড়ি।

পা ছড়িয়ে, সামনে পানের বাটা। একজনের মাথার চুল কদমছাঁট। এক ভাসুর-ঝি নিয়মিত এর চুল ছেঁটে দেয়। বিধবাদের চুল রাখতে নেই। এই প্রথা বন্ধ হবার ঠিক পরের দশকটা ইনি দেখে যেতে পারেননি।

এই রমণীর চুল ছিল মেঘের মতন, নিতম্ব-ছোঁয়া। স্বামীর মরদেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন এক দাই বড় কাঁচি দিয়ে কচ-কচ করে কেটে ফেলে দিল সেই চুলের রাশ

ইনি বললেন, আমাগো টিয়াঠুঁটি গাছটার মতন অমন বড় আমগাছ আর দ্যাখলাম না এ-দেশে!

অন্য একজন বললেন, চটাস-চটাস কইরা কত পুঁটিমাছ ধরতাম, মনে আছে? পাছ-পুকুরডা আছিল লক্ষ্মী। দুইখান গজাল মাছ, ঢেঁকির মতন বড়, একসাথে ভাইস্যা ওঠতো।

আর একজন বললেন, এ-দ্যাশের মাছে সোয়াদ নাই।

চুল-ছাঁটা মহিলাটি মাছ খাননি বহুদিন। এখন আর সে-জন্য আপসোস করতেও ভুলে যান। মাছের চেয়ে গাছের গল্প তাঁর বেশি ভালো লাগে।

তিনি বললেন, টিয়াঠুঁটি গাছটারে কি কাইট্যা ফ্যালাইসে? কিছু শোনছেন? পুঁটি মাছের স্মৃতিকাতর মহিলাটি বললেন, আ লো বড় পিসি! দ্যাশটারেই কাইট্যা ফ্যালাইসে? আর তুমি কও গাছের কথা!

২.

একটিমাত্র গোলাপ ফুল আঁকা ছোট টিনের সুটকেশ নিয়ে যুবকটি ছেড়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ি।

জায়গাটার নাম বাদু। শহর থেকে বেশি দূর নয়, তবে শহরের লকলকে জিভ এখনো এ-পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। তাদের একান্নবর্তী পরিবার, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নিয়ে প্রায় আঠাশ জন। প্রায় কেন? মানুষ কি প্রায় হয়? এক জন দু-জন করে বাড়ে, দু-জন তিন জন কমে। অর্ধচন্দ্রাকারে সাত খানা ঘর, কয়েকটি পাকা, কয়েকটি কাঁচা। এদের বাজারে দু-খানা দোকান আছে। সংসারে অভাব নেই। দু-বেলাই ভাত হয়, ফেনা ভাতে ঘি জোটে।

তবু সাদেক চলে যাচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানে।

এই বয়সের সে-ই প্রথম বি.এ. পাশ। গ্র্যাজুয়েট ছেলে কি বাজারের দোকানে মশলা বিক্রি করতে বসবে? না তেলের ঘানি চালাবে। তা হলে আর এতটা লেখাপড়া শেখার দরকার কী ছিল?

সে ভদ্রলোকের মতন চাকরি করবে।

যুদ্ধের পর শুরু হয়েছিল ছাঁটাই। স্বাধীনতা মানে ছাঁটাই, চতুর্দিকে বেকারদের কলরব। সাদেক কি সেই কারণেই চাকরি পাচ্ছে না? নাকি সে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে বার বার শুধু মুসলমান

বলে?

সরকারি কাজে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, টিউশনি? অনেক বেকার ছেলেই টিউশনি করে, যেমন তার কলেজের কয়েকজন বন্ধু। কিন্তু সাদেককে কেউ রাখে না। এদিকের মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার তেমন চল নেই, বাড়িতে মাস্টার রাখবে কে? সাদেক মধ্যগ্রাম, বারাসতে গিয়েও টিউশনি করতে রাজি আছে। কিন্তু হিন্দু বাড়িতে তার নাম শুনলেই নানান ছল-ছুতো দেখায়। কেউ বলে, আমরা মেয়ে-মাস্টার রাখব ভেবেছি। কেউ বলে, এক জন এম.এ. পাশ এই টাকায় রাজি হয়ে গেছে।

দাঙ্গার আগুন লাগেনি এ-পল্লীতে, বাড়িতে অন্নবস্ত্রের অভাব নেই, তবু সাদেক মায়ের কান্না, বাবা-দাদার নিষেধ অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে। মানুষ কি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দেশান্তরে যায় না? কিন্তু সাদেকের বুক-ভরা অভিমান, আর মুখে অপমানের ময়লা ছাপ।

৩.

এইখানে গোবিন্দ গাঙ্গুলির স্বপ্ন লেগে ছিল। এইখানে এখনো ভেসে বেড়ায় গোবিন্দ গাঙ্গুলির দীর্ঘশ্বাস।

এইখানে পুকুরের জল ছিল কাকচক্ষু, স্নিগ্ধ। এখন পানায় ভরতি, জল দেখাই যায় না। এইখানে মন্দিরে ঘণ্টা বাজত সকাল ও সন্ধ্যায়, এখন একটা অশথ গাছ দৃঢ় আলিঙ্গনে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মন্দিরের চুড়ো।

এ-দেউলে আর দেবতার মূর্তি নেই, ঘুরে বেড়ায় দুটো সাপ।

৪.

বেলেঘাটার সেই বস্তি এখন চেনাই যায় না।

এখানে প্রধানত থাকত ধুনুরিরা আর দরজির দল। সবই খাপরার চালের ঘর, সরু-সরু গলি। এ-বস্তির মালিক ছিল মল্লিকবাবুরা, আর অধিবাসীরা মুসলমান। এখন সেখানে একটা দোতলা বাজার আর পাশে একটা পাঁচ তলা ফ্ল্যাটবাড়ি। পাড়ার ছেলেদের খেলার মাঠ।

সেই সে-বারে রাজাবাজার ও মানিকতলার প্রতিযোগিতা! খেলার নয়, খুনোখুনির। এদিকে নাড়ায়ে তকদির, আল্লা হো আকবর। ওদিকে বন্দেমাতরম্! ভারত মাতা কি জয়! মাঝখানে রক্তের স্রোত। রাস্তায় পড়ে থাকা লাশের পচা গন্ধ। সে-প্রতিযোগিতা গড়িয়ে এল বেলেঘাটার বস্তি পর্যন্ত। ছলাৎ-ছলাৎ করে কেরোসিন ছেটাবার শব্দ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু পুড়ে ছাই।

নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসেছেন হেদায়েত হোসেন। বয়েস হয়েছে অনেক। কিন্তু কর্মক্ষমতা এখনো যথেষ্ট। হেদায়েত বেড়াতে আসেননি, এসেছেন ব্যাবসার কাজে। গেঞ্জির ব্যাবসায় বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন চেহারায় ও জমানো টাকায়। আগে ওদিকে গেঞ্জির ব্যাবসায় হিন্দুদের ছিল আধিপত্য, তারা অনেকেই পালিয়ে এসেছে এদিকে, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হেদায়েতের দেরি হয়নি।

কলকাতা থেকে কিছু মেশিনপত্র নিয়ে যাওয়া দরকার। সরাসরি বর্ডার দিয়ে পার হওয়া

যায় না, তবে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে নদীপথে পৌঁছোনো যায় সাতক্ষীরায়। সে-ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তার পর হেদায়েত একটু বেড়াতে এসেছেন বেলেঘাটায়। এখানেই কেটেছে তাঁর বাল্য ও কৈশোর।

বাজারের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন পাঁচ তলা বাড়িটার সামনে। দুটো ফুটফুটে বাচ্চা লোহার গেট দিয়ে উঠছে আর নামছে। হেদায়েতের স্পষ্ট মনে আছে, স্মৃতিতে দেখতে পাচ্ছেন ছবি। ওই পাঁচ তলা বাড়িটার জায়গাতেই ছিল তাঁর আব্বাজানের দরজির দোকান। সর্বস্বান্ত হয়ে সপরিবারে পালিয়েছিলেন ওপারে, শুধু ছোট ছেলেটাকে নিয়ে যেতে পারেননি। হেদায়েতের কোলের ভাইটি ওই আগুনের বেড়াজাল থেকে বেরুতে পারেনি।

হেদায়েতের চোখ পানিতে ভিজে গেল। বুকে জ্বলছে আগুন। এই পাঁচ তলা বাড়িটা কোনো ক্রমে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না?

৫.

এটা কয়েকজন অফিসারের একটা নিজস্ব ক্লাব। প্রকাশ্যস্থানে নয়, একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট, ধানমণ্ডিতে। করিমসাহেব থাকেন সরকারি কোয়ার্টারে। এই ফ্ল্যাটটা কিনে রেখে দিয়েছেন, এখন কোনো কাজে লাগছে না, পরে তো লাগবে। তাঁর আর একটা বাড়ি আছে সাভারে।

ক্লাবের সদস্য ঠিক ন-জন, বাইরের লোকের আসার অধিকার নেই। মহিলাবর্জিত। এখানে দরজা বন্ধ করে মদ্যপান হয়, তাস খেলা চলে, অফিস পলিটিক্সের প্রসঙ্গ তো আসবেই। উচ্চশিক্ষিত অফিসাররা পানাহার ও গল্পগুজবের মাঝে-মাঝে হঠাৎ মুখস্ত বলেন শেক্সপিয়ারের দু-চার লাইন। কেউ গান ধরেন। মীর তাকি মীরের রচনা। এখন দেশে খুব বাংলা-বাংলা হুজুগ চলছে, এরা নিজেদের উর্দু জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন এক-একসময়।

করিমসাহেব এ-ফ্ল্যাটে কাজের লোকও রাখেননি। সপ্তাহে দু-দিনই শুধু আসর বসে। তিনি কোনো সাক্ষী রাখতে চান না। কে কখন খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে লাগিয়ে দেবে, তার কি ঠিক আছে?

এমনকী ড্রাইভারদেরও বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু সোডা-পানি, চানাচুর-বাদাম-কাবাব এসবও তো লাগে। আগে থেকে কিছু আনলেও ফুরিয়ে যায়।

একমাত্র ফিনান্স সেক্রেটারি হায়দার আলি তাঁর ড্রাইভারকে এসব কাজে লাগান। তিনি অত কিছু পরোয়া করেননি। তা ছাড়া তাঁর ড্রাইভার কখনো মুখ খোলার সাহস করবে না। সেলোকটি অতি বিনয়ী। সাত চড়ে রা কাড়ে না।

ড্রাইভার সোডার বোতল নিয়ে এসেছে। হায়দার আলি বললেন, রাখেন, টেবিলের নীচে রাখেন। একটার ছিপি খুলে দ্যান।

প্রথম দিনই তাঁর সহকর্মী রফিকুল জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি তোমার ড্রাইভারকে আপনি-আজ্ঞে করো নাকি? দ্যাট্স গুড হ্যাবিট।

হায়দার আলি বললেন, গুড না ব্যাড জানি না। হ্যাবিট ঠিকই। এ-লোকটির বয়েস হয়েছে, আমাদের গ্রামেরই লোক, ওর নাম হরেন ভটচাইজ।

করিমসাহেব বললেন, ভটচাইজ মানে ভট্টাচার্য? হিন্দু ভট্টাচার্যরা ব্রাহ্মণ হয় না?

হায়দার আলি বললেন, রাইট। আপনি জানেন দেখছি। আমাদের গ্রামে তো বেশ কিছু ঘর হিন্দু ছিল, এই ভটচাইজরা ছিল পূজারী বামুনের ফ্যামিলি। ছোটবেলা থেকে দেখছি তো, আমরা ওদের সম্মান করতাম। তার পর ফিফটির রায়টে পুরো হিন্দু এলাকাটা সাফ হয়ে গেল। ভেরি আনফরচুনেট, ভেরি আনফরচুনেট। লোকগুলো ভালো ছিল। আমি ছোটবেলায় একে হরেনদা বলে ডাকতাম।

রফিকুল বললেন, এ-লোকটা বেঁচে গেছে, তা ওপারে পালায়নি?

হায়দার আলি বললেন, কেন যায়নি কে জানে। মাটির মায়ায় বোধহয়। এখন তো আর এখানে পুরুতগিরিরও স্কোপ নাই। টাকাপয়সার টানাটানি।

করিমসাহেব বললেন, তুমি তা হলে এক পুজুরি বামুনকে ড্রাইভার রেখেছ? বেশ তো!

হায়দার আলি বললেন, আমাদের বাড়িতে রেখেছি বলেই ও এখনো বেঁচে আছে। আমার চাচা ওকে ড্রাইভিং শিখিয়েছিল। খুব কাজের লোক। আমার যখন কুক থাকে না, তখন এ ড্রাইভার আমার জন্য রান্নাও করে দেয়।

করিমসাহেব বললেন, বামুন যখন, রান্না ভালো জানবেই!

হায়দার আলি বললেন, বিফের কারি এত ভালো বানায়, যে-কোনো হোটেলের চেয়ে...

করিম সাহেব আপন মনে হেসে উঠলেন।

৬.

দাদা, আপনি কতদিন পর এ-দেশে আসলেন?

এই ধরুন, ফর্টি এইটে লাস্ট এসেছি, তার পর এটা সেভেন্টি টু, উফ্ কতগুলি বছর কেটে গেছে!

এর মধ্যে আসতে ইচ্ছা করে নাই?

ইচ্ছে তো ছিলই মনের মধ্যে সবসময়, স্বপ্নও দেখতাম, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই কি আসা যায়? মাঝখানে যে অদৃশ্য দেয়াল ছিল এতদিন, অদৃশ্য হলেও বার্লিনের দেয়ালের চেয়েও কঠিন।

আপনি তো আমাদের দ্যাশের মানুষ?

আমাদের বাড়ি ছিল রাজশাহী। কিন্তু এটা তো আর আমাদের দেশ নয়।

রাজশাহীর বাড়িতে এখন কেউ নাই?

এই সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত ছিলেন আমার ছোটমামা। তার পর তার বাড়িতে পুলিশ এসে ডাকাতি করল।

পুলিশ ডাকাতি করল? বলেন কি দাদা?

হ্যাঁ, এমনি ডাকাত হলে বলার কিছু ছিল না। ডাকাত তো সব দেশেই আছে। কিন্তু পুলিশ যদি রাত্তিরবেলা দল বেঁধে এসে জিনিসপত্র জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়। মেয়েদের ধরে টানাটানি করে — তার পর কি আর থাকা যায়?

রক্ষকই ভক্ষক, হা-হা-হা।

তখন বেশ মজার ব্যাপার হত। রাজশাহী ছেড়ে যাবার আগে আমার কাকা কলকাতায় একটা টেলিফোন করতে চেয়েছিলেন। আগেকার বাংলা তখন ছিল এপার-বাংলা ওপার-বাংলা। দুটো আলাদা দেশ হলেও পাশাপাশি তো বটে। কিন্তু তখন কি ঢাকা থেকেও কলকাতায় টেলিফোন করা যেত?

জানি, জানি। সেই সময়টা কইলকাতায় ফোন করতে হইলে আগে কল করতে হইত লন্ডনে। লন্ডনে কোনো চেনা লোককে ধরতে পারলে, সে তখন কইলকাতায় কানেকশন কইরা খবরটা দিয়া দিত!

আমরা একে বলি, ঘুরিয়ে নাক দেখানো। ছেলেমানুষদের খেলা। বড়-বড় পলিটিশিয়ান, আর্মি জেনারেলরাও সেই খেলা খেলেছে।

দাদা, আপনে কিন্তু একদিন আমাগো বাসায় পায়ের ধুলা দেবেন।

আরে, কী যে বলেন! আমার পায়ে এখনো কলকাতার ধুলো। আমি এখানকার ধুলা মাথায় নিতে এসেছি। আমার দেশ না হোক, তবু তো জন্মভূমি!

৭.

প্রখ্যাত গায়ক সমর মিত্র সফরে এসেছেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে।

তিনি শুধু গায়ক নন। একাত্তর সালের ন-মাস পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর উদাত্ত দেশাত্মবোধক গানে মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালি শ্রোতাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর সমর মিত্র, এই দুজনের কণ্ঠে সংবাদ ও সঙ্গীত শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত সবাই।

সমর মিত্র এই প্রথম এসেছেন বাংলাদেশে। বহু জায়গায় দেওয়া হচ্ছে তাঁকে সম্বর্ধনা, তাঁর গানের আসরে জনতা ভেঙে পড়ে। বিভিন্ন বাড়িতে তাঁকে দাওয়াত দেবার জন্য প্রতিযোগিতা চলছে। এক দিনে তিন-চার বাড়িতে খেতে যেতে হচ্ছে তাঁকে।

এক পত্রিকা সম্পাদকের বাড়িতে সন্ধেবেলা খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে গেলেন। এতসব পদ কি মানুষ খেতে পারে? মস্ত বড় টেবিল, তাতে খাদ্যবস্তুগুলি ভারি সুন্দর করে সাজানো, দেখতেই ভালো লাগে, কিন্তু সব একটু-একটু করে চাখাও অসম্ভব।

কী কুক্ষণে তিনি এক বার বলে ফেলেছিলেন যে তিনি শুঁটকি মাছ ভালোবাসেন। তাই প্রত্যেক বাড়িতে কত রকম যে শুঁটকি হয়! শাকে শুঁটকি, ডালে শুঁটকি, আলুভর্তা-বেগুনভর্তায় শুঁটকি, চিংড়ি শুঁটকি, বম্বে ডাক (লইট্টা) শুঁটকি! আর মাছও যে কত রকম। সিরাজগঞ্জের রুই, পদ্মার ইলিশ, মেঘনার চিতলপেটি, অতি তেলাশে পাঙাস, বিশাল-বিশাল গলদা, তার পর মাংসও পাঁচ রকম।

এ-বাড়ির গৃহকর্ত্রী সুরাইয়া ভাবীর হাতের রান্নার খুব সুনাম। এবং যেমন তাঁর রূপ, তেমনি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর।

সমর মিত্র বললেন, এ কী করেছেন, খাইয়ে-দাইয়ে মেরে ফেলতে চান নাকি?

সুরাইয়া ভাবী বললেন, আপনার যেটা যতটুকু ইচ্ছা নেন। জোর করব না। তবে বিফ করি নাই, আপনার ভয় নাই।

সমর মিত্র বললেন, ভয়? ছাত্রবয়েসে বিফ কাবাব আর রুটি খেয়েই তো বেঁচে থেকেছি।

সবচেয়ে শস্তা ছিল।

প্লেটে শাদা ফুলের মতন একটু ভাত আর দু-তিনটি পদ তুলে নিয় সমর মিত্র একটা চেয়ারে বসলেন।

এক গুণমুগ্ধ তরুণী তাকে জিজ্ঞেস করল, স্যার, এখানে এসে আপনার কেমন লাগছে?

সমর মিত্র বললেন, এমন আত্মীয়তা, এমন ভালোবাসা যেন জীবনে কখনো পাইনি। এখানকার বাতাসেও যেন নতুন গন্ধ। স্বাধীনতার গন্ধ। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে কী অপূর্ব উদ্দীপনা, এটা আমাদের ওদিকে দেখাই যায় না। তবে ভাই, তোমরা বড্ড বেশি খাওয়াও! আমাদের ওখানে কোনো কাগজের সম্পাদক বা মালিকের বাড়িতে এতরকম খাবারের ব্যবস্থা, চিন্তা করা যায় না। তারা এত বড়লোকও হয় না। এখানে যা এক-একটি বড়লোকের বাড়ি দেখছি, বাপ রে বাপ, মাথা ঘুরে যায়!

পাশ থেকে একটি যুবক বলল, কিন্তু আপনাদের কলকাতায় নিউজ পেপার তো অনেক বেশি বিক্রি হয়?

সমর মিত্র বললেন, হ্যাঁ, শুনলাম তো, এখানে অনেকগুলি ডেইলি নিউজ পেপার কোনোটারই বিক্রি আমাদের ওদিককার কাগজগুলোর সমান তো নয়ই, বরং অনেক কম। কিন্তু এদিককার সম্পাদকরা অনেক বেশি বড়লোক।

ছেলেটি বলল, শুনেছি আপনাদের আনন্দবাজার গোষ্ঠী...

প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে সমর মিত্র বললেন, তোমরা যেমন আন্তরিক আতিথেয়তা দিতে জানো, হিন্দুরা অতটা জানে না। হিন্দুর বাড়িতে গেলে তোমাকে মোটে তিন-চার পদ খাওয়াবে।

যুবকটি বললেন, এখানে কিছুটা শো-অফ করারও ব্যাপার আছে। এতগুলো আইটেম কেউই খেতে পারে না, তবু কিছুটা দেখাবার জন্য...

আবার প্রসঙ্গ বদলে সমর মিত্র বললেন, আমার মাঝে-মাঝে কী ইচ্ছে হচ্ছে জানো? তোমরা যদি থাকতে দাও, তালে আমি এখানেই থেকে যাই। এখানে সবাই বাংলা ভাষাকে এত ভালোবাসে, বাংলা সংস্কৃতি আমাদের দেশের মতন পাঁচমিশেলি নয়। এখানেই তোমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইব।

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল, থাকুন, থাকুন।

জানলার ধারে একটি আলাদা হল-এ বসে সাংবাদিক মিজানুর রহমান। তিনি খাবার নেননি, হাতে হুইস্কির গ্লাস। সব শুনছিলেন, এবার বলে উঠলেন, ও-কম্মোও করবেন না সমরবাবু! এখানে থাকার ইচ্ছেটা মন থেকে মুছে ফেলুন! আপনি যাকে ভালোবাসা বলছেন, সেটা আসলে ইনফ্যাচুয়েশন। বেশি দিন থাকে না। উবে যায়। আপনি এখানে থাকলে কিছুদিন পরেই কি হবে জানেন? অন্য গায়কদের সঙ্গে কমপিটিশন হবে। তারা আপনার পেছনে লাগবে। অন্য অনেকে, যারা আপনার সামনে মিষ্টি ব্যবহার করবে, তারাই পেছন ফিরলে বলবে, এই শালা মালাউন, একে তাড়াও! আপনি যদি...

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুরাইয়া ভাবী বললেন, মোটেই এগুলো ঠিক না। মিজান ভাই বড় উলটা-পালটা কথা বলেন।

পত্রিকার সম্পাদকমশাই বললেন, আমাদের মিজান সাহেব এক নম্বরের সিনিক!

মিজানুর রহমান বললেন, যা সত্যি, তাই বলছি! ইতিহাস থেকেই এর শিক্ষা নিতে পারেন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান আর্মি, পশ্চিমবাংলার মানুষ অনেক সাহায্য করেছে। তখন এখানে কত উচ্ছ্বাস, গলা জড়াজড়ি, ইন্ডিয়ানরা আমাদের বন্ধু। বাঙালি-বাঙালি ভাই ভাই, কিন্তু এসব কতদিন? নাৎসি-জার্মানদের হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করেছিল আমেরিকা, তার কয়েকমাস পরেই ফরাসিরা আমেরিকানদের দেখে ঘেন্নায় মুখ কুঁচকেছে না? আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মির আঠেরো হাজার সোলজার প্রাণ দিয়েছে, এই মাটিতে গোর রয়েছে তাদের। দেখবেন, একসময় সে-কথা সবাই ভুলে যাবে, হিস্ট্রি বইতে তাদের প্রাণ দেওয়ার উল্লেখ থাকবে না। এমনকী ইন্ডিয়া যে কিছু সাহায্য করেছিল, সে-কথাও উচ্চারণ করতে চাইবে না কেউ। এই রকমই হয়।

দু-তিনজন একসঙ্গে প্রতিবাদ করলেন।

সমর মিত্র বললেন, আমারো মনে হয়, আপনি বেশি-বেশি পেসিমিস্টিক কথা বলছেন। ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশের মধ্যে পলিটিকাল সম্পর্ক কী হবে তা জানি না, কিন্তু দু-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসার সম্পর্ক —

তাঁর ভক্ত মেয়েটি তেজের সঙ্গে বলল, রাজনীতি বাদ দ্যান! বাংলা ভাগ হয়েছে, কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির একটা মিলন সেতু আমরা ফিরে পেয়েছি, পাকিস্তানিরা তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেয়েছিল...

সুরাইয়া ভাবী বললেন, সমরদা, আপনি থেকে যান আমাদের এখানে। আপনাকে আমরা ধরে রাখব। সবাইকে গান শোখাবেন। আমরাও যদি চান্স পাই, কলকাতায় একটা বাড়ি কেনার ইচ্ছা আছে। বছরের মধ্যে কয়েক মাস কলকাতায় গিয়ে থাকব।

মিজানুর রহমান গেলাসে আবার হুইস্কি ঢেলে হাসতে লাগলেন আপন মনে।

৮.

এলগিন রোডের পাশের একটা রাস্তায় বহুকাল ধরে দেখা যায় একটা হানাবাড়ি। আশেপাশে পুরনো বাড়ি ভেঙে গড়ে উঠছে নতুন রূপের প্রাসাদ, শুধু মাঝখানের এই দোতলা ভাঙা বাড়িটা ঘিরে প্রচুর আগাছা জন্মে গেছে, জানলা-দরজা অদৃশ্য। কলকাতার এই অঞ্চলে জমির দাম সোনার মতন।

বাড়িটার সামনে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পেছনদিকটা দেখাই যায় না, এত গাছপালা। নিশ্চয়ই বড় বাগান ছিল। একসময় ওখানে ফুটফুটে শিশুরা খেলা করত। লাল চটি পরা ফরসা রমণীরা বিকেলে গোল ছাতার নীচে বসতেন চায়ের আসরে। বেলজিয়ামের টি-সেট, কাটগ্লাসের গেলাসে রু-আফজার সরবত। ব্যারিস্টার মনিরুজ্জমান দেশ ভাগ হবার কয়েক বছর পর পাড়ি দিলেন পাকিস্তানে। পূর্বে নয়, পশ্চিমে। দলিলে কিছু গন্ডগোল ছিল, তাড়াহুড়োতে বাড়িটা বিক্রি হতে পারেনি, ভেবেছিলেন পরে একসময় এসে ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তান-ভারতে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল।

ব্যারিস্টারিতে ভালোই পসার জমেছিল ইসলামাবাদে। তিনি সেখানকার একটি ছোটখাটো মন্ত্রীও হয়ে গেলেন। একাত্তরের গৃহযুদ্ধের সময় বাঙালি হিসেবে তিনি হলেন সরকারের চোখে সন্দেহভাজন, মুক্তিযোদ্ধারাও তাঁকে মনে করত বিশ্বাসঘাতক। একেবারে যাকে বলে না-ঘরকা না-ঘাটকা। বাংলাদেশে ফেরার উপায় নেই। ভারতেও না, পাকিস্তানেও টিকতে

পারবেন না বেশিদিন, এর মধ্যে মুজাহিদিনদের সঙ্গে দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হল তাঁর ছোট ছেলেটি। তার পরই তিনি সপরিবারে সাগর পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন লন্ডনে। তাঁর দুটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে পাকিস্তানিদের সঙ্গে, তারা কেউ বাংলা বলে না, বৃদ্ধ মনিরুজ্জামানও হারিয়ে গেলেন বাঙালি জীবন থেকে।

মনিরুজ্জামানের স্ত্রীর এক ভাই, অর্থাৎ শ্যালক, হাবিবুল্লাহ, তাঁর সেজোছেলে কামাল। এদের বাড়ি চন্দননগরে। হাবিবুল্লাহ ছিলেন জজকোর্টের উকিল, কামাল চাকরি করে একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে। চন্দননগর থেকে যাতায়াতের খুব অসুবিধে, সদ্য বিয়ে করেছে তহমিনাকে, সেও পড়ায় একটি ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে। সুতরাং ওদের একটা ফ্ল্যাট দরকার কলকাতায়। তহমিনার স্কুলটি সাদার্ন অ্যাভিনিউতে, সুতরাং ফ্ল্যাটটি ওই অঞ্চলে পেলেই ভালো হয়।

কামাল তার পারিবারিক সূত্রে জানে, এলগিন রোডের কাছে ওই অনেকটা জমির ওপর পোড়োবাড়িটা তাদেরই এক আত্মীয়ের। সে-যদি ওই বাড়িটার দখল পেত, তা হলে প্রোমোটারকে দিলে এগারো তলা মাল্টিস্টোরিড হয়ে যেত, তার গোটাকতক ফ্ল্যাট বিক্রি করলেই আর চাকরি-বাকরি করতে হত না, সারাজীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে —। সরকার এ-বাড়ি অধিগ্রহণ করেনি, রিফিউজিরা এ-পাড়া পর্যন্ত পৌঁছোয়নি, সে-জন্য জবরদখলও হয়নি। এখন সেখানে আগাছার চাষ হচ্ছে।

কামালের কাছে দলিলপত্র কিছুই নেই। ও-বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তার শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কামালকে তার বন্ধু শামসের বলেছিল, পার্ক সার্কাসের দিকে বাড়ির খোঁজ কর্ মোছলমান পাড়ায়, অন্য পাড়ায় বাড়ি পাবি না। কামাল বিশ্বাস করেনি। চন্দননগরে তো তারা হিন্দু পাড়ার মধ্যেই থাকে, কলকাতা আজো কসমোপলিটান শহর, সেখানে আবার পাড়া-ফাড়া আছে নাকি?

কিন্তু সাদার্ন অ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জ, যোধপুর পার্কে একটার পর একটা জায়গায় তাকে ব্যর্থ হতে হল। পুরো ভাড়া, এমনকী ডিপোজিট দিতে রাজি থাকলেও কেন সে প্রত্যাখ্যাত হয়, সে-কারণটাই দুর্বোধ্য।

শেষপর্যন্ত আশার আলো পাওয়া গেল তহমিনার এক ছাত্রী বিশাখার কাছ থেকে। বিশাখা জানালো যে তাদের যোধপুর পার্কের বাড়ির একতলার ভাড়াটেরা উঠে গেছে, বাবাকে সে বললেই রাজি হয়ে যাবে।

তহমিনা আর কাকলি দুজনেই এক রবিবার সকালে গেল বাড়ি দেখতে। নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন এলাকা, ফ্ল্যাটটাও আলো হাওয়া সমন্বিত, পছন্দ না হবার কোনো কারণই নেই। ডিপোজিট লাগবে না, ভাড়াও যুক্তিসঙ্গত। বিশাখার বাবা রঙ্গনাথ বাজার করতে গেছেন, তিনি মৎস্যরসিক, গড়িয়াহাট-লেকমার্কেট ঘুরে-ঘুরে বাছাই করা মাছ নিয়ে আসেন, তাই দেরি হয়।

বিশাখা এর মধ্যে তহমিনা ও কামালকে কেক, পেস্ট্রি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করল।

রঙ্গনাথ ফিরতেই বিশাখা বলল, বাবা, এই আমার স্কুলের মিস।

কামাল উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আর আমি এই মিসের মিস্টার!

পটে আরো চা আছে, রঙ্গনাথ চা খেলেন ওদের সঙ্গে। হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করলেন খানিকক্ষণ।

তার পর বিনীতভাবে বললেন, আপনাদের দিতে পারলে ভালোই হত, কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানেন, আমার তো চায়ের ব্যাবসা, অফিসটা খিদিরপুরে, সেখানে আর জায়গা হচ্ছে না। স্টাফও বেড়ে গেছে। তাই এ-ফ্ল্যাট আর আমি ভাড়া দেবো না। আমার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টটা এখানে সরিয়ে আনব। খুবই দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না।

বিশাখা ওদের দুজনকে পৌঁছে দিতে গেল ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত।

ফিরে এসে দেখল, রঙ্গনাথ তখনো দাঁড়িয়ে আছেন কামালের নামের কার্ডটা হাতে নিয়ে।

বিশাখা বলল, বাবা, তুমি সত্যিই এখানে অফিস করবে? আগে বলোনি তো?

রঙ্গনাথ বললেন, তা এখনো ঠিক নেই। তা বলে মুসলমানকে ভাড়া দেব নাকি! ওদের বিশ্বাস নেই।

বিশাখা বলল, না বাবা, আমার মিসের কথাবার্তা শুনে কিছুই বোঝা যায় না। খুব ভালো ব্যবহার। এত ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারেন ।

রঙ্গনাথ বললেন, ভালো তো হোক না ভালো। নিজেদের মধ্যেই থাক না। ফিরে চলে যাক পাকিস্তানে, ওদের ঢাকায়, সেখানে আরো ভালো থাকবে।

বিশাখা বলল, বাবা, ঢাকা তো পাকিস্তানে নয়। এখন বাংলাদেশে। তুমি কী যে বলো!

রঙ্গনাথ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, ওই একই হল। এর মধ্যেই তো আবার হাফ পাকিস্তান হয়ে গেছে শুনেছি!

৯.

মাঝপথে অফিস ছুটি হয়ে গেল। দারুণ দুঃসংবাদ।

সরকারের হেলথ-ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে হেনা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে। এর মধ্যে ট্রাম-বাস বন্ধ হতে শুরু করেছে, প্রাইভেট গাড়িগুলো পালিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। হেনা কোনোক্রমে একটা বাস পেয়েছিল, একদল লোক হল্লা করে থামিয়ে দিল বাস মাঝপথে।

এখান থেকে তার বাড়ি বেশি দূরে নয়, হেনা প্রায় দৌড়তে লাগল। একবার তার হাত থেকে পড়ে গেল ছাতাটা। সেটা তুলতে গিয়ে তার ভয় হল, পেছন থেকে কেউ যদি তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাড়িতে ঢুকেই সদর দরজাটা চেপে বন্ধ করে কাজের লোক সইফুলকে বলল, খবরদার আর দরজা খুলবি না! যে-ই আসুক!

ওপরে এসে দেখল, তার স্বামী আলম একটা গল্পের বই পড়ছে। কয়েকদিন ধরে তার জ্বর। সে অফিস যাচ্ছে না।

হেনা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, তুমি রেডিও শোনোনি? নিশ্চিন্তে শুয়ে আছ? জানো কী হয়েছে?

কী?

ইন্দিরা গান্ধি মারা গেছেন। মানে তাঁকে খুন করা হয়েছে।

আলম ধড়ফড় করে উঠে বসে বলল, অ্যাঁ? কী বলছ? কে মারল? কোনো মুসলমান!

ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল।

ওদিক থেকে একজন বলল, হেনা আপা, বাড়িতে ফিরে এসেছ! খবরদার, আর বাইরে বেরিয়ো না। জানো কী হয়েছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। কে মেরেছে বল তো?

তা এখানে ডিটেইলসে জানায়নি, প্রথম খবর দিয়েছে বি.বি.সি.। আমাদের রেডিও স্পষ্ট করে কিছু বলছে না। বি.বি.সি. জানিয়েছে, ওরই কোনো বডি-গার্ড।

ফোন রেখে দিয়ে হেনা আলমকে জিজ্ঞেস করল, ইন্দিরা গান্ধির বডি-গার্ডদের মধ্যে মুসলমান আছে?

আলম বলল, নিশ্চয়ই আছে। মুসলমান, শিখ, আরো কত জাতের লোক রেখেছেন।

কিন্তু এক জন মুসলমান ইন্দিরা গান্ধিকে খুন করবে কেন?

করতেই পারে। হতে পারে পাকিস্তানের এজেন্ট। ইন্ডিয়ার অনেক মুসলমানেরও খুব রাগ আছে ইন্দিরা গান্ধির ওপর।

কেন, উনি তো কমিউনাল নন্। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় কত সাহায্য করেছেন —

সেইজন্যই তো। উনি যে পাকিস্তানকে দু-টুকরো করে দিলেন, তা বেশির ভাগ মুসলমানই পছন্দ করেনি। বিশেষত নর্থ ইন্ডিয়ার মুসলমানরা। এমনকী আমাদের মধ্যেও...করিম চাচা সর্বক্ষণ বলে না। এটা হিন্দু ডিপ্লোম্যাসি!

খুনি যদি মুসলমান হয়?

তা হলে উন্মত্ত জনতা মুসলিম খুন করতে শুরু করবে। যাকে যেখানে পাবে। তার পর শুরু হয়ে যাবে দাঙ্গা।

আমার তো ইন্দিরা গান্ধিকে খুব পছন্দ ছিল। পাকিস্তান ভেঙেছেন বেশ করেছেন। পশ্চিম-পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানে অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল না? শেখ মুজিবকে কিছুতেই প্রধানমন্ত্রী করল না। তা ছাড়া ওখানকার বাঙালিরাই তো আগে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল।

তুমি পছন্দ করলেই তো হবে না। এর আগের ইলেকশানে ইন্দিরা গান্ধি হেরে গেলেন কেন? পুরো মুসলিম-ভোট তাঁর বিরুদ্ধে গেছে। সেইজন্যই যদি কোনো পাগল ধর্মান্ধ মুসলমান হঠাৎ গুলি চালিয়ে দেয়—

আবার দাঙ্গা হবে?

রাস্তায় কারা যেন বিকট চিৎকার করে ছুটে যাচ্ছে, ভয়ে কেঁপে উঠছে হেনা।

আলম বিমর্ষমুখে বসে আছে রেডিও খুলে।

বিকেলের দিকে জানা গেল, ইন্দিরা গান্ধির আততায়ী মুসলমান নয়, শিখ। তিনি শিখ উগ্রপন্থীদের ধরবার জন্য স্বর্ণমন্দিরে সৈন্য ঢুকিয়ে দিলেন, তাঁর দেহরক্ষীদের মধ্য থেকেই এক জন শিখ গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তাঁর শরীর।

সারা ভারতে শুরু হয়ে গেছে শিখ-নিধন-যজ্ঞ। দিল্লিতে শিখদের বাড়িঘর জ্বলছে। কলকাতায় এ-ব্যাপার অবশ্য বেশিদূর ছড়াতে পারল না, পুলিশ থামিয়ে দিল দৃঢ় হাতে। কিন্তু শিলিগুড়িতে ক্রোধান্ধ হিন্দুরা জ্বালিয়ে দিয়েছে পেট্রল-পাম্প, সেই আগুনে ঠেলে দিয়েছে ওই পাম্পের মালিক বৃদ্ধ সর্দারজিকে।

মুসলমান নয়, শিখ, এ-সংবাদ পাকাপাকি জানার পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও মুখখানা কালো করে রইল হেনা। এতক্ষণ ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর জন্য দুঃখবোধ করার বদলে সে নিজেদের নিরাপত্তার কথাই শুধু ভাবছিল। কোথাও কোনো গন্ডগোল হলে, মারামারি বাঁধলে, পুলিশ গুলি চালালেই কেন মনে হয়, এই বুঝি দাঙ্গা বেঁধে গেল। এই বুঝি আততায়ীরা তেড়ে আসবে তার দিকে। শুধু মুসলমান বলেই এই নিরাপত্তাহীনতা, এই সবসময় চাপা আতঙ্ক, কেন, কেন? এই নাকি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

১০.

কলেজে ভরতির ফর্ম জমা দিতে গেছে রাবেয়া, কেরানিবাবুটি সেটা উলটে-পালটে দেখে বললেন, রিলিজিয়ানের জায়গায় কিছু লেখোনি কেন?

রাবেয়া বলল, আমার ধর্মটা আমার ব্যক্তিগত, তা সবাইকে জানাতে হবে কেন?

কেরানিবাবুটি বললেন, অত পাকামি করতে হবে না। লেখো!

রাবেয়া লিখল না। সে-জন্য শেষপর্যন্ত তাকে যেতে হল প্রিন্সিপালের ঘরে।

প্রিন্সিপাল সব শুনে ঈষৎ বিদ্রুপ করে বললেন, ধর্মের কথা লিখতে চাও না? তা হলে লিখে দাও নাস্তিক।

রাবেয়া বলল, আমি তো নাস্তিক নই। আমার নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস আছে। কিন্তু সেটা ফরমে লিখতে আমি বাধ্য হব কেন?

এটাই নিয়ম। আর এক জায়গায় তুমি লিখেছ, ম্যারেড। তোমার স্বামীর নাম কী?

স্বামীর নাম জানানোও কি বাধ্যতামূলক? যাই হোক, বলছি, আমার স্বামীর নাম সত্যেন বসু চৌধুরী।

তা হলে তোমার পদবি পালটাওনি কেন? তোমার স্বামী হিন্দু?

তিনি হিন্দু কি না আমি জানি না। তিনিই বলতে পারবেন। বিয়ে করলেই মেয়েদের পদবি পালটাতে হবে এমন কোনো আইন আছে?

দ্যাখো, তুমি অযথা আমার সময় নষ্ট করছ। ফর্ম ঠিক করে নিয়ে এসো। না হলে ভরতি হবার কোনো প্রশ্ন নেই।

স্যার। আমি ভরতি হবোই!

গায়ের জোরে? তোমাকে কি দারোয়ান ডেকে বার করে দিতে হবে?

তা দিতে পারেন! আমি আবার কোর্টের আদেশ নিয়ে এ-কলেজে ঢুকব। দরকার হলে আমি সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত যাব।

সত্যেন বসু চৌধুরী বিয়ের পর নিজেদের পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে মধ্যমগ্রামে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। সরকারি ফ্ল্যাট, জাত ধর্মের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

রেশন কার্ডটা পালটাতে হবে। তার ইন্সপেক্টরবাবু বাড়িতে এসে বললেন, আপনারা স্বামী-স্ত্রী, আপনি মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছেন, দ্যাট্‌স অল রাইট, কিন্তু স্বামী আর স্ত্রীর তো এক পদবি হতে হবে!

তাই নাকি? আমরা যদি না চাই?

সেটা তো চলবে না! এটাই নিয়ম।

কোথাকার নিয়ম? ব্রিটিশরা এই নিয়ম চালু করেছিল। এখনো সেটা মানতে হবে? জানেন কি, মুসলমানদের কোনো পদবিই হয় না। পুরোটাই শুধু নাম। আপনার দিদিমার নাম কি ছিল মনে আছে?

আমার দিদিমার নাম? তা দিয়ে আপনার...মানে সে-কোশ্চেন আসছে কী করে?

আমি বলতে চাইছি, আপনার দিদিমার নিশ্চয়ই কোনো পদবি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর নাম কি ছিল জানেন? মৃণালিনী দেবী। কোথাও দেখেছেন মৃণালিনী ঠাকুর লেখা আছে? সব হিন্দু মহিলাই আগে ছিলেন দেবী কিংবা দাসী। তার বদলে শুধু নামটাই ভালো নয়?

বিকেলে সত্যেন আবার বেড়াতে বেরুলো। যাবে এক বন্ধুর বাড়িতে। মাঝপথে বৃষ্টি নামল। কাছাকাছি আশ্রয় নেওয়ার মতন জায়গা নেই, ওরা গিয়ে দাঁড়ালো একটা গাছতলায়। গাছতলায় দাঁড়ালেও বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। ওরা ভিজছে আর হাসছে।

মাঝে-মাঝে ওপরের দিকে তাকিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে চাইছে আকাশ। সব সময় আকাশের কথা মনে থাকে না, আকাশের দিকে তাকালেই হয় না। শুধু এইরকম সময়ই মনে হয়, আমরা সবাই এক আকাশের নীচে মানুষ!

গুড বুক ও ব্যাড বুক

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

একসময় বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় কলকাতার সারস্বত সমাজে এক অতি পরিচিত মানুষ ছিলেন। এক ডাকে চেনার মতো যেক-টি মানুষ সে-সময় কলকাতায় ছিলেন বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ছিলেন তার অন্যতম। ছাত্র অবস্থায় সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, পেশায় ডাক্তার, এই বিরল চরিত্রের মানুষটি যে-কোনো বির্তকসভায় হয়ে উঠতেন প্রধান পুরুষ। বস্তুত তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলার মতো লোক রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও ছিল বিরল। কৌতুকের এক চাপা বিচ্ছুরণ তাঁর প্রতিটি কথাবার্তার মধ্যে ফুটে উঠত। প্রথমে জামশেদপুর, পরে কলকাতায় তাঁর রোগনির্ণয় ক্ষমতায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান। অর্থ নয়, জনসেবাকেই তিনি জীবনে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন আজীবন।

তাঁর লেখার হাতটিও ছিল চমৎকার। দৈনিক আজকাল ও অন্যান্য কাগজে তাঁর লেখা রম্যরচনা ও ফিচারগুলি আজো অনেকের কাছে অমলিন স্মৃতি। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করেছেন।

এই অপ্রকাশিত গল্পটি আমরা তাঁর স্ত্রী পূবালি মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পেয়েছি — সম্পাদক।

পুরনো বেয়ারা ফটিকদা পাড়ার লোক। টিপস দিয়েছিল প্রথম দিনই। দ্যাখ্, যা খুশি কর্। শুধু ওই বুড়ো গোঁফকে রোজ দু-ফোঁটা করে মাস্টার্ড অয়েল মাখিয়ে যাবি। ব্যস্।

অক্ষরে-অক্ষরে মেনেছি ফটিক-ব্যাক। পাক্কা গত আড়াই বছর। কিংবদন্তি ঝুড়ো গোঁফ, অর্থাৎ বড়বাবু, অর্থাৎ এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, অর্থাৎ ই.এ.ও.-র দেরাজে না কি দুটো খাতা। একটা গুড বুক, অন্যটা ব্যাড। কারো নাম যদি থাকে গুড বুকে, তবে তার সাতখুন মাপ। আর ব্যাড-এ থাকলে — ভগবান রক্ষা করুন তাকে।

গুড বুকে থাকার ফল পেয়েছিলাম অফিসে ঢোকবার তিন মাসের মাথায়। দুপুর তিনটেয়, ঘণ্টাটাক ঢুলুনির পর, আয়েস করে একটু আড়মোড়া ভাঙছি, হঠাৎ ফটিকদা ত্যারছা চোখে ইশারা করল ওদিকের পরদা দেওয়া ঘরটার দিকে। বলল, ডেকেছে। দুরু-দুরু বুকে পা বাড়াই। নির্ঘাত দেখে ফেলেছেন দিবানিদ্রা।

আশ্বস্ত হই চড়া ধমকের গলা শুনে। কারণ অফিসে দ্বিতীয় কিংবদন্তি, ওই উচ্চগ্রামের গলা মানেই সব ঠিক আছে। অল ইজ রাইট উইথ দি ওয়ার্ল্ড! আর মিহি, মাখন-মসৃণ, মধুভাষ মানেই — বিওয়্যার! বাঁশ!

পরদা পুরো সরাবার পূর্বেই গাঁক-গাঁক গলায় প্রশ্ন — অফিসে ঢুকেই বাঁদিকে সাজানো একটা ঘর আছে, জানিস? বিনীত ঘাড় নাড়ি, হ্যাঁ স্যার। পুনরায় প্রশ্ন — ওতে কি হয়? বলি, স্যার ইয়ে, সম্মানিত ভিজিটাররা বসেন। এবার ডবল পাওয়ারের ধমকের গলা, তা হলে ভদ্দরলোকের মেয়েকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখিস কেন? (এ আবার কী বিদঘুটে প্রশ্ন রে বাবা? বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড লাগে। এবং বোঝামাত্রই লজ্জায় অরুণ হই)। কোনো রকমে, ঘেমে, ঢোঁক গিলে, মাথা খুব নিচু করে কৃতজ্ঞ স্বরে বলি, আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।

আসলে প্রতিমার অফিসটাও কাছেই। তবে ওর ছুটি হয় আমার ছুটির আধ ঘণ্টা আগে।

অতএব ওই আধ-ঘণ্টা প্রতিমা মোড়ের বাস-স্ট্যান্ডে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর বাদামভাজা ও ট্র্যাফিকের ধুলো খায়।

অফিসে তৃতীয় কিংবদন্তি বড়বাবুর দুটি হাত এবং দুটি পা। কিন্তু চোখ নাকি একশোটা।

এবার নমুনা ব্যাড বুকের। নিপাট ভালোমানুষ পুরনো বড়সাহেব বদলি হলেন সিউড়ি। মালদা থেকে এলেন দারুণ এক ঝাঁঝানো নতুন বড়সাহেব। এবার তার ঢিলেঢালা হাওয়াই, ঢলঢল প্যান্ট নয়। নেভি-ব্লু ট্রাউজারে গোঁজা ডার্ক-বিস্কিট-কালার শার্ট, ধাঁ-চকচক জোডিয়াক টাই, চুলে ব্রিলক্রিম। হিটলারি গোঁফ। মুখ দেখা যায় পালিশ করা জুতোয়।

তবে রঙটি বেশ কালোই। তৎক্ষণাৎ চুটকি বানাল করবীদি। আসলে বুঝলি, ওদেশেরই খাস-বাসিন্দা। এদেশে আসবার সময় এরোপ্লেন থেকে পড়ে গিয়েছিল ব্ল্যাক সি-তে।

তৃতীয় দিনেই অফিস কাঁপানো গলায় হাঁক — মি. দত্ত! বিনীত ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে, হাতদুটি বুকের নীচে জড়ো করে গুটি-গুটি এসে দাঁড়ান বড়বাবু।

— স্যার? (সেই অতিশয় ভয়ংকর রেশম-চিক্কন গলা! বুকের মধ্যে যুদ্ধের বাজনা শুনতে থাকি আমরা)।

— ওগুলো কী? (বিস্কিট রঙের ফুল হাতা থেকে বেরিয়ে আছে একটি মিশকালো করতল। তার থেকে তর্জনিটি যেন স্প্রিং-এর মতো ছিটকে বেরিয়ে এসে কম্পাসের কাঁটার মতো স্থির হয়ে রয়েছে সিঁড়ির নীচেয় ঝুল-কালি-ধুলোয় মাখামাখি একগাদা কাঠকুটোর দিকে)।

তা বছর পাঁচ-ছয় হবে। অফিসের সব আলমারি হয়ে যায় লোহার। বাড়তি বলে ঘোষিত হয় গোটা দুয়েক মস্ত কাঠের নড়বড়ে র‍্যাক। এমনিতেও বয়েস হয়ে ভেঙে-চুরে গিয়েছিল ওগুলি। সেগুলিকে বাণপ্রস্থ দেওয়া হয় সিঁড়ির নীচে। তার পর, সেগুলির খোঁজ আর করে না কেউ। এখন নেহাতই ধ্বংসাবশেষ।

গভীর অভিনিবেশ সহকারে নিচু হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে উপর-নীচে ঘাড় ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন সিঁড়ির নীচের জায়গাটা। তার পর কোমরের দু-পাশ ধরে পিঠ কোনোমতে সোজা করেন। নিরীহতম গলায় প্রশ্ন করেন বড়বাবু — কোনটা স্যার?

সেই মুহূর্তে সারা অফিসে পিন-ড্রপ সাইলেন্স! সকলেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখে যাচ্ছে নিজের-নিজের ফাইল। কান দুটি অবশ্য হরিণের ন্যায় উৎকর্ণ।

তীক্ষ্ণ চিৎকার — বুঝতে পারছেন না কোনটা?

— না স্যার।

— ওইটা, ওইটা, ওইটা, ওই জঞ্জালগুলো।

— ওঃ ওগুলো? ওগুলো জঞ্জাল নয় স্যার।

— তবে কি ওগুলো?

— কাজের জিনিস স্যার। মানে, ছিল।

— যখন ছিল, তখন ছিল। এখন ওই ঘোড়ার ডিমগুলো কি কাজে লাগছে?

— ঘোড়ার ডিম ঠিক কী-কী কাজে লাগে — জানি না তো স্যার।

বেগুনি হলেন জোডিয়াক টাই। মনে হল মেরেই বসবেন বুঝি। ছোটাসা ব্রেক। সাহেব শ্বাস নিলেন একটা। লম্বা। তার পর গলার স্বর নামিয়ে আনলেন দু-পরদা।

দাঁত গিসগিস করে হিংস্র গলায় বলেন, আমি চাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওগুলি হয় ডাস্টবিন,

না-হয় জাহান্নমে — যেখানে খুশি পাঠাবেন।

— নিশ্চয়ই স্যার। তবে স্যার, সরকারি প্রপার্টি। জাহান্নমে পাঠাতে হলে সচিবালয়ের স্যাংশন লাগবে স্যার।

রেগে রগ প্রায় ছিঁড়ে যায় জোডিয়াক টাই-এর। পুনরায় দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, তবে তাই-ই করুন।

— নিশ্চয়ই স্যার।

টেবিলে পা তুলে দিয়ে নিরাসক্ত গলায় ডিক্‌টেশন দিয়ে যান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। গণেশ আমি শর্টহ্যান্ড নিই। টাইপ করি। বড়সাহেবের সই করিয়ে পাঠাই সচিবালয়ে। এনট্রি করি ডেসপ্যাচ বুকে। সামারি লিখি।

জবাব আসে। একেবারে ঠিক যেমন বলেছিলেন বড়বাবু। সচিবালয় বলছেন, 'অমুক রুলের তমুক সেকশানের তমুক সাব-সেকশন অনুসারে সরকারি কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ডিসপোজ-অফ করতে হলে পূর্বাহ্নেই অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল (এ.জি.) অফিসের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।'

পুনরায় দাঁত গিসগিস। এবার চিঠি যায় এ.জি. অফিসে। জবাব আসে মাস চারেক পরে। তিনটি রিমাইন্ডারের পরে। না, ঠিক জবাব নয়। এ-ব্যাপারটাও বড়বাবু আগেই যেমন বলেছিলেন। এসেছে দীর্ঘ একটি প্রোফর্মা। 'সরকারি কোনো প্রপার্টি বিক্রি, দান বা ডিসপোজ-অফ করবার পূর্বে ওই প্রোফর্মা অনুযায়ী বিশদ বিবরণসহ ট্রিপলিকেট-এ অর্থাৎ তিনটি কপি সহ পাঠাতে হবে এ.জি. অফিসে।'

উপরন্তু তাঁরা জানাচ্ছেন যে ওই সরকারি সম্পত্তি অর্থাৎ কাঠের র‍্যাকগুলি কেনার সময়কার স্যাংশান লেটার, টেন্ডার, বিল, পে-অর্ডার, রসিদ ইত্যাদি সবই পাঠাতে হবে এ.জি. অফিসে — ইন অরিজিন্যাল। 'ইন অরিজিন্যাল' শব্দের নীচে নীল পেনসিলের দাগ।

অফিস তোলপাড় করে খোঁজা হতে থাকে 'অরিজিন্যাল'। চুল ছিঁড়তে থাকেন বড়সাহেব। কারণ, কানাঘুষোয় শোনা গেছে যে-কোনোদিন স্বয়ং মন্ত্রী আসবেন সারপ্রাইজ ভিজিট-এ। এবং বলা বাহুল্য, অফিসে ঢুকেই সর্বাগ্রে তাঁর নজর পড়বে ওই জঞ্জালগুলোতে।

সপ্তাহে তিন বার করে তাড়া দিতে থাকেন বড়সাহেব। প্রতিবার, একই মসৃণ জবাব বড়বাবুর—খুঁজছি স্যার। পাচ্ছি না।

ওদিক থেকে বারে-বারে পালটা তাড়া আসতে থাকে এ-.জি. অফিস থেকে ফাটা রেকর্ডের মতো — পারচেজ অর্ডার কই?

ঘুম ছুটে যায় বড়সাহেবের। বড়বাবু অবশ্য নির্বিকার। ব্রহ্মবাদীর ন্যায় মোহমুক্ত। কা তব কান্তা! পাচ্ছি না স্যার। অবশেষে নিঃশর্ত সারেন্ডারের চিঠি যায় এ-জি অফিসে। হদিস পাওয়া যাচ্ছে না ওই কাগজগুলোর।

ঠিক সেই সময়েই হুট করে একদিন মন্ত্রী আসেন। সদলবলে। কিছু না জানিয়েই।

কিন্তু অসুবিধে হয় না। কারণ বড়বাবুর শুধু চোখই একশো নয়, কানও একশো। চর মারফত আগেই সংগ্রহ করেছিলেন মন্ত্রী আসবার তারিখ।

সেই মুহূর্তে অফিস একেবারে সাফ-সুতরো। মেঝের দিকে তাকিয়ে চুল আঁচড়ানো যায়। সমস্ত টেবিল-চেয়ার-ফাইল যথাস্থানে। সকলেই গায়ে চড়িয়েছেন ধোপদুরস্ত পোশাক। এমনকী

বড়বাবুর গায়েও সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবির বদলে শার্ট-প্যান্ট।

আর সেই সিঁড়ির নীচেটায়? আগের দিনই সেটা ঢেকে ফেলা হয়েছিল লাল সালু দিয়ে। সেটার গায়ে লাগানো হয়েছিল ফুটপাথ থেকে কেনা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, গান্ধিজি, লেনিন আর স্ট্যালিনের ছবি। মিনিস্টার আসামাত্রই তড়িঘড়ি লোক গেল বাজারে। এবং সাড়ে সাত মিনিটেই চলে এল পঞ্চাশ টাকা দামের মস্ত গোড়ে মালা। এবং তেঁতুল দিয়ে মাজা ঝকঝকে পেতলের পঞ্চপ্রদীপ। (আসলে সবই সকাল থেকে রেডি করে রাখা ছিল ফটিকদার জিম্মায়)।

আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে, বয়সে সিনিয়ার মোস্ট করবীদি পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে কীসব সংস্কৃত বলে আরতি করলেন মন্ত্রীকে। জুনিয়ার মোস্ট হিসেবে মালা দিলাম আমি। (চুলে সেদিন কষে কলপ দিয়েছিলেন করবীদি)।

সসম্মানে বড়সাহেবের ঘরেই বসানো হল মন্ত্রীকে, হেঁ হেঁ এই সামান্য একটু জলযোগ।

সব দেখেশুনে মন্ত্রী বললেন বড় সাহেবকে — আপনার অফিস এত স্পিক অ্যান্ড স্প্যান। কিন্তু আপনার নিজের চেম্বার এমন শ্যাবি কেন? মস্ত রাজভোগ গলায় আটকে প্রবল বিষম খেলেন জোডিয়াক টাই।

অবশ্য গল্পের পেছনেও গল্প থাকে। বড় সাহেবের খাস বেয়ারা আবদুল। তাকে দিয়ে দু-দিন পূর্বেই ছুটির দরখাস্ত পাশ করিয়ে নিয়ে তাকে দেশে চালান করেছিলেন বড়বাবু। তার একমাত্র প্রিয় ফুফি এই নিয়ে তৃতীয় বার হঠাৎ জলে ডুবে মারা গেছে।

এর পরেই আরেকটা অর্ডার। 'ফ্রেন্ডস কেবিন' থেকে চপ আনিয়ে সকলে খাই আমরা। সাত দিনের মধ্যেই বালুরঘাটে জয়েন করতে হবে বড়সাহেবকে।

সাত দিন পর। অফিসে সকলেরই মুখে হাসি। ফিরে এসেছেন সেই পুরনো বড়সাহেব। রিটায়ারমেন্টের আগে শেষ পোস্টিং এই কলকাতাতেই।

বড়বাবুর মুখে সেই বৈষ্ণবি বিনয়টা আর নেই। সহজেই যাচ্ছেন আসছেন বড়সাহেবের ঘর থেকে।

এ হেন সময়ে ভয়ংকর পত্রবোমা। এ.জি. অফিস জানাচ্ছে, 'সরকারি কোনো সম্পত্তির কেনাকাটা সংক্রান্ত জরুরি কাগজপত্র অফিস থেকে হারানো — গ্রস নেগলিজেন্স অফ ডিউটি। এ-জন্য আপনার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা কেন নেওয়া হবে না, তার জবাব দিন।'

বড়সাহেব প্রায় কাঁদো-কাঁদো। রিটায়ারমেন্টের ঠিক আগেই কেরিয়ারে কীরকম দাগ লেগে গেল বলুন তো বড়বাবু!

বড়বাবুর মুখে গৌতম বুদ্ধের বরাভয় — ঘাবড়াবেন না স্যার।

আবার ডিকটেশান নিই। আবার টাইপ।

— 'উক্ত কাঠের র‍্যাক দুটি কেনা হয়েছিল পঁচিশ বছর আগে। এবং কেনবার পরেই সেই পারচেজ-অর্ডার, টেন্ডার, রসিদ ইত্যাদি সমস্ত কাগজপত্রই একত্র করে আপনাদের অফিসেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব ওগুলি আপনাদের জিম্মাতেই রয়েছে। খুঁজে দেখলে নিশ্চয়ই পাবেন।'

ওই মোক্ষম চিঠিটি পাঠানোর পরে এ.জি. অফিসার একেবারে নিশ্চুপ। তার পর, আজ পর্যন্ত আর ট্যাঁফো করেনি এই নিয়ে।

পুনশ্চ : গল্প এখানেই শেষ হওয়া উচিত। তবুও সামান্য উপসংহার রয়ে যায়।

মাস সাতেক পরে হঠাৎ বড়সাহেব ডেকে পাঠান বড়বাবুকে। আচ্ছা, সিঁড়ির নীচের ওই নোংরা কাঠকুটোগুলোর সত্যিই কোনো গতি করা যায় না? অবসর নেওয়ার পর নতুন যিনি আসবেন, তিনি কি ভাববেন বলুন তো আমার সম্পর্কে?

একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে যান বড়বাবু। তৎক্ষণাৎ জরুরি তলব যায় ফটিকদার কাছে। সাহেবের ঘর থেকে বেরোনোর ঠিক সাতান্ন মিনিট তেরো সেকেন্ডের মধ্যে বিলকুল সাফ হয়ে যায় সিঁড়ির নীচটা। পুরনো খবরের কাগজ বিক্রিওলার কাছ থেকে কাঠকুটো বাবদ একশো তিন টাকা সত্তর পয়সা জমা পড়ে অফিসের ক্যাশে।

মাস ছয়েক পরে, নিজের সই করা একটি ফাইল বড়সাহেবকে দিয়ে কাউন্টার সাইন করান বড়বাবু। 'আলোচিত সরকারি সম্পত্তি' — অর্থাৎ ওই দু-চারটি ভাঙাচোরা কাঠকুটো সম্পূর্ণভাবে নিখোঁজ। আদৌ মিলছে না তাদের হদিশ। সম্ভবত উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে সেগুলি। অতএব, এ-সম্পর্কিত ফাইলটি বরাবরের মতো ক্লোজ করা হল।

নিকি বাইজির কথা

শেখর বসু

অমিতাভ পুরনো কলকাতার একটি বনেদি পরিবারের ছেলে। সম্পদ ও শিক্ষা— দুটি ব্যাপারেই একদা বেশ জাঁক ছিল এই পরিবারের। এখন আর তা নেই; কিন্তু নেই-নেই করেও যা আছে, তাও নেহাত কম নয়। অমিতাভ বহুজাতিক একটি সংস্থার এগজিকিউটিভ, কিন্তু ছুটির দিন বাড়ির বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেকেলে আড্ডা বসায়। অমিতাভ পুরনো কলকাতার দারুণ ভক্ত, সুতরাং ওর আড্ডার মধ্যে, মাঝেমধ্যেই এমন-কিছু চমক থাকে যা আড্ডার সবাইকে পুরনো কলকাতার দিকে ঠেলে দেয়। সেদিন আড্ডার মাঝপথে অমিতাভ উঠে গিয়ে মাঝারি মাপের একটি পেন্টিং নিয়ে এসে বলল, 'আমাদের বাড়ির একটা পুরনো তোরঙের মধ্যে এটা পাওয়া গেছে। এটাকে নিছক ছবি না বলে মূলধন বলাই ভাল। ছবিটা কার 'আঁকা জানিস? মাদাম বেল্‌নোস।'

নামটা বন্ধুদের কাছে গ্রিক-ল্যাটিনের মতো ঠেকেছিল।

বন্ধুদের অজ্ঞতায় অমিতাভ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'পুরনো কলকাতার কোনোও খবরই তোরা রাখিস না। মাদাম বেল্‌নোস সে আমলের একজন বিখ্যাত পেইন্টার। পুরনো কলকাতার নানান বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন। দুর্ধর্ষ সব ছবি। উনি বেশ কয়েকজন বাইজিরও ছবি এঁকেছিলেন। এই ছবিটা এক বাইজির।'

বাইজির কথা শোনার আগে পর্যন্ত অমিতাভ-র বন্ধুরা ছবিটাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি। এবার তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ধুলো পড়ে-পড়ে ছবির বেশির ভাগ রঙই ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বেশ লাগে।

ছবির বাইজির পরনে বিশাল এক ঘাগরা। ঘাগরায় সাদা আর রঙিন মসলিনের ফ্রিল। তার ওপর বোধহয় সোনা-রুপোর জরির কাজ। সাটিনের ঢিলে পাজামা। বাইজির এক হাত ঘাগরার এক প্রান্ত ধরে রেখেছে, অন্য হাতে নাচের মুদ্রা। মাথায় ঘোমটা, চোখের চাউনি তির্যক।

বাইজির ছবি অমিতাভ-র বন্ধুদের হাতে-হাতে ঘুরতে লাগল। অমিতাভ মনে-মনে পুরনো কলকাতার ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। চাপা গলায় ধারাবিবরণী দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'পুরনো কলকাতার একেবারে গোড়ার দিকে রাজা-মহারাজা আর বাবুদের প্রিয় উৎসবে বাই নাচ ছিল মাস্ট। দুর্গাপুজো পর্যন্ত বাইজিদের নাচ চালু হয়ে গিয়েছিল। কে কেমন বাই নাচাচ্ছে তার ওপর নাকি তখনকার বাবুদের মান-সম্মান নির্ভর করত অনেকখানি। একদিকে পুজোর মণ্ডপ, অন্যদিকে বাই নাচের আসর। ওই সব আসরে ভি.আই.পি. গেস্ট হিসেবে কাদের ধরা হত বলত?'

পুরনো কলকাতার গল্প ফাঁদলে অমিতাভ মাঝে-মাঝেই এই ধরনের প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, কিন্তু বন্ধুরা বেশির ভাগ সময়ই বোবা হয়ে থাকে। এবারো তাই হল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে অমিতাভই উত্তরটা দিয়ে দিল। 'সাহেব-সুবো, আবার কারা। রাজার জাত, ওদের তোয়াজ করলে বাবুদের লাভ। ব্যবসাবাণিজ্য পাবে, নানা পথে উপরি লাভ হবে। সুতরাং সাহেবদের

খাতির করার জন্য বাইজিদের নাচ-গানের ঢালাও ব্যবস্থা থাকত। সেই সঙ্গে থাকত দামি খাবারদাবার আর মদের মস্ত আয়োজন। একই সঙ্গে মা দুর্গা আর সাহেব মাদার-ফাদারের ভজনা চালাত বাবুরা। হ্যাঁ, আমার পূর্বপুরুষরাও নির্ঘাত এসব করেছে। নইলে রাতারাতি এত বড়লোক হতে পারত না। তবে ওসব করার জন্য আমি দোষ দিই না। কারণ, সে-সময় ওটাই ছিল রেওয়াজ। ফূর্তি বলো, এন্টারটেইনমেন্ট বলো, রিক্রিয়েশন বলো— সব কিছুতেই ভরসা বলতে ছিল বাইজিরা। আর তো কিছুই ছিল না তখন। নাচ-গানের ব্যাপারটা খেলো করে দেখা উচিত নয়। ওটাও আমাদের সংস্কৃতির মস্ত বড় একটা অঙ্গ। আমার মাথায় দারুণ একটা আইডিয়া এসেছে। এবার পুজোর সময় একটা দিন চল্ আমরা সেই পুরনো কলকাতায় ফিরে যাই। যাকে বলে টাইম-ক্যাপসুলে ভ্রমণ। এমন সব ব্যবস্থা করব যাতে মনে হবে আমরা উনিশ শতকের গোড়ার কলকাতায় ফিরে গিয়েছি। যাবি?'

অমিতাভর কথায় হই-হই করে উঠল বন্ধুরা। 'আলবত যাব।' কিন্তু কী ভাবে পুরনো কলকাতায় ফেরা হবে তা নিয়ে কেউ একটা প্রশ্নও করল না। কারণ, অমিতাভ ওর মতলবের কথা কখনোই আগে থেকে ফাঁস করে না। জোরালো চমক পেতে হলে অপেক্ষা করতে হবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

পুজোর তিন দিন আগে অমিতাভ বলল,'নবমীর রাতটা আমরা সবাই মিলে আমাদের বারাসাতের বাগানবাড়িতে কাটাব। তোরা কিন্তু অবশ্যই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসবি। আরো কয়েকজন অতিথি-অভ্যাগত আসছে, তাদেরও ওই পোশাক।'

প্রদোষ বলল, 'ওহ্! তোর সেই টাইম- ক্যাপসুলে চেপে উনিশ শতকের কলকাতা-ভ্রমণ! নবমীর রাতেই কি আমরা পুরনো কলকাতায় হাজির হব?'

যথারীতি প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে এক চিলতে রহস্যপূর্ণ হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে অমিতাভ বলল, আয় না, এলেই জানতে পারবি।'

২.

নবমীর সন্ধেয় অমিতাভদের বাগানবাড়িতে ওর জনা-বারো বন্ধু আর অতিথি-অভ্যাগত এসে হাজির হয়েছিল। প্রত্যেকের পরনেই ধুতি-পাঞ্জাবি। বেশ কয়েক বিঘে জমির ওপর বাগান আর বাড়ি। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। বাগানের মধ্যিখানে আদ্যিকালের বিশাল বাড়ি। গোটা বাড়িটাই ঝকঝকে-তকতকে। আজ আবার বিশেষ সাজে সেজেছে। বাড়ির সামনে পুরনো দিনের দু-খানা ফিটনগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অতিথিরা বুঝতে পেরেছিল, এবারের মজাটা একেবারে অন্য ধরনের।

সদর দরজার কাছে আসতেই প্রথম চমক। পূর্বপুরুষদের রেখে-যাওয়া চোগা-চাপকান পরে বন্ধু ও অতিথিদের আপ্যায়ন করল অমিতাভ। বাইরে ফিটন, ভেতরে এই পোশাক— সবাই বুঝতে পারল, এসব হচ্ছে টাইম-ক্যাপসুলে ঢুকে পড়ে পুরনো কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি।

পুরনো দিনের পোশাক-পরা গৃহস্বামীকে দেখার পরে এক-এক করে অনেক কিছুই চোখে পড়েছিল অতিথিদের। দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে সাবেক কলকাতার হুঁকোবরদার, পাখাওয়ালা আর ফরাস। ঠাকুরদালানের একদিকের ঘরে ডাকের সাজের দশভুজা, অন্যদিকে জলসা

বসবার মস্ত ঘর। ঠিক তার পাশের ঘর থেকে সুখাদ্যের গন্ধ ভেসে আসছিল।

পুরনো দিনের পোশাক-পরা তিন জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আর সে-যুগের বাবুদের পোশাকে চার জন আসরে ঢুকতেই টাইম-ক্যাপসুল দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করেছিল পেছনদিকে।

গৃহস্বামীর অনুরোধে আসন গ্রহণ করেছিল সবাই। অমিতাভ বিনীতভাবে সকলের উদ্দেশে বলল, আপনাদের সামান্য কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপনারা অবশ্য এসব কথা সবাই জানেন। আমি শুধু কথাগুলো আপনাদের আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। ভাববেন না যে লেকচার দিচ্ছি।'

কিন্তু অমিতাভ যা বলল তা প্রায় লেকচারের কাছাকাছি। বলল, 'উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীমতী ফ্যানি পার্ক্স। তিনি চমৎকার একটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। ভ্রমণকাহিনীতে সেই সময়ের কলকাতার নানা ঘটনার কথা লেখা আছে। বর্ণনা এত সুন্দর যে, লেখা পড়লে সেই সময়ের ছবিগুলো পরিষ্কার দেখা যায়।

'রামমোহন রায়ের বাড়ির ভোজসভার দুর্দান্ত এক বিবরণ দিয়েছেন ফ্যানি। রাজার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার বিশাল এক আয়োজন হয়েছিল। আর এক ঘরে বসেছিল বাইজিদের নাচ-গানের মস্ত আসর। তাদের সঙ্গে এক ঝাঁক বাজিয়ে ছিল। সারেঙ্গি, মৃদঙ্গ আর তবলার ঠেকায় সে এক জমাটি আসর। তখন সাহেবদের খাবার-দাবারের আয়োজন করত সাহেব-কেটারাররা। সেই সময়ের এক বিখ্যাত কেটারারের নাম ছিল মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপার। সভায় খাবার-দাবারের সঙ্গে আসত প্রচুর পরিমাণে ফরাসি মদ আর বরফ।'

শ্রোতাদের একজন হঠাৎ একটু গলা তুলেই বলে উঠল, 'আজ এখানেও নিশ্চয়ই ওইরকম কিছু ব্যবস্থা আছে—।'

অমিতাভ মৃদু হেসে জবাব দিল, 'সে-দিনের সেই সাহেব-কেটারারকে আজ আর আমি কোথায় পাব! তবে অভ্যাগতদের সবিনয়ে জানাচ্ছি, আজ এখানে যে-আয়োজন হয়েছে, তা মনে হয়, খুব একটা খারাপ হবে না। ফরাসি মদের ব্যবস্থাও আছে।'

গৃহস্বামীর কথা শুনে হই-হই করে উঠল অতিথিরা। উচ্ছ্বাস থামার মুখে আচমকা একজন চেঁচিয়ে উঠল 'ব্রাভো ব্রাভো' বলে। সেই আমলে কলকাতায় এই সব জায়গায় 'ব্রাভো' শব্দটার খুব চল ছিল। লাগসই শব্দটা কানে যেতেই চাঙ্গা হয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করেছিল অমিতাভ। 'পুরনো কলকাতার একেবারে গোড়ার দিকে দুর্গাপুজোর সময় সাহেবদের বাড়িতে ঢোকানো নিষিদ্ধ ছিল। পরে ব্যাপারটা উলটে যায় একেবারে। পুজোর সময় বাবুদের বাড়িতে সাদা চামড়া না এলে গোটা উৎসবটাই ম্যাড়মেড়ে হয়ে যেত। হলওয়েলের ইন্টারেস্টিং হিস্টরিক্যাল ইভেন্টস-এ এই ধরনের অনেক মজাদার ঘটনার কথা লেখা আছে। হলওয়েল ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেবের সমসাময়িক। পুজোর সময় সম্ভবত নবকৃষ্ণ দেবই প্রথম সাহেবদের বাড়িতে ডেকে এনে আপ্যায়ন করেছিলেন। তার পর সেই রীতি ছড়িয়ে পড়েছিল বাকি রাজ-রাজড়া আর বাবুদের মধ্যে। পুজোর সময় স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ না কি নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে এসেছিলেন এক বার।'

অমিতাভ-র খুব কাছের বন্ধুদের এক জন হল প্রদোষ। ও হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'তা, আজ কি এখানে লর্ড ক্লাইভের কোনো বংশধরের আসার কথা আছে?'

প্রদোষের কথায় গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিল সবাই। হাসেনি শুধু অমিতাভ। হাত তুলে ও

অতিথিদের শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করে বলেছিল, 'না, ক্লাইভের কেউ আসছে না, তবে নিকির বংশের একজন আসছে।'

'নিকি! নিকি আবার কে?'

অতিথিদের বিস্ময় কয়েক মুহূর্ত উপভোগ করার পর অমিতাভ বলল, 'এ-যুগের মতো সে-যুগেও সুপারস্টারদের খুব কদর ছিল। তখন অবশ্য স্টারদের মধ্যে প্রধান ছিল বাইজিরা। তা সেই আমলের এক জন সেরা বাইজির নাম ছিল নিকি।'

কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে যেন একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। হাত তুলে চাপা গুঞ্জন থামিয়ে অমিতাভ বলল, 'এক মিনিট, আরো একটু আগের কথা জেনে নেওয়া দরকার। সে-যুগে নিকির জনপ্রিয়তা কেমন ছিল তার ছোট্ট একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আপনারা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গেলে ক্যালকাটা জার্নাল-এর পুরনো ফাইল কপি দেখতে পারেন। খুব ইন্টারেস্টিং জার্নাল। শিক্ষিত মহলে ওই জার্নালের খুব কদর ছিল তখন। তা, ওই জার্নালের এক সংখ্যার বিজ্ঞাপনে বেরিয়েছিল যে, সে-বছর পুজোর সময় নিকি, মহারাজ রামচন্দ্র রায়, বাবু নীলমণি ও বোষ্টমদাস মল্লিকের বাড়িতে অতিথিদের নাচ-গানে আপ্যায়িত করবে। সে যুগের বিখ্যাত ধনীরা ওই ভাবে নিকি বাইজির বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে— ভাবা যায়! আসলে নিকি তখন পয়সাওয়ালা বাবুদের কাছে ছিল স্টেটাস সিম্বল। বাড়িতে নিকির নাচ-গানের আসর বসানো মানে বিরাট টাকার ধাক্কা। আন্দাজ করুন তো, নিকি তখন এক রাত্তিরের অনুষ্ঠানের জন্য কত টাকা নিত?'

শ্রোতাদের কেউই আন্দাজে ঢিল ছুড়তে রাজি হল না। উলটে একটাই প্রশ্ন ভেসে এসেছিল চারদিক থেকে : কত? কত টাকা নিত নিকি তখন?

কয়েক মুহূর্ত শ্রোতাদের নিজস্ব আন্দাজের মধ্যে রেখে দেওয়ার পরে অমিতাভ বলল, 'উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতি রাতের নাচ-গানের জন্য নিকি নিত হাজার টাকা। প্রায় দুশো বছর আগে হাজার টাকা মানে এখনকার হিসেবে কত টাকা ভেবে দেখুন একবার! কয়েক লাখ তো বটেই! কিন্তু বাইজির এতই চাহিদা ছিল যে, পুজোয় ওকে বুক করার জন্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত বাবুদের মধ্যে। নিকির যে এত চাহিদা তার একটাই কারণ— নিকি ছিল সাহেব-সুবোদের পেয়ারের নর্তকী। যত টাকাই খরচ হোকনা, পুজোর সময় নিকিকে বাড়ির আসরে আনতে পারলে সাদা-চামড়া প্রভুদের পাওয়া যাবে। দামি মদ খেতে-খেতে দামি বাইজির নাচ দেখতে ভালোবাসত সাহেবরা। ওইভাবে প্রভুদের খুশি করতে পারলে কোম্পানি বাহাদুরের বড় বড় অর্ডার ধরার কাজটা বাবুদের কাছে বেশ সহজ হয়ে যেত।'

অমিতাভ ওর বক্তৃতা আরো লম্বা করতে যাওয়ার মুখে ওকে থামিয়ে দিয়ে কমল বলল, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু নিকির বংশের সেই মেয়েটি কোথায়?'

প্রশ্নের ধাক্কায় ছোট্ট একটা ঝড় উঠেছিল শ্রোতাদের মধ্যে : হ্যাঁ-হ্যাঁ, কোথায় গেল সেই নিকি? একটু নাচ-গান হোক।

শ্রোতাদের এবার শান্ত করতে একটু সময় লাগল অমিতাভ-র। মাথার ওপর দু-হাত তুলে রেখেই ও বলল, 'নিকির বংশের এই মেয়েটিও বাইজি। অসাধারণ নাচ-গান করে, কিন্তু কপাল খারাপ হওয়ায় তেমন প্রচার পায়নি এখনো। আমি অনেক কষ্টে ওর খোঁজ

পেয়েছি। ওকে আনতে লোক গিয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে এখানে। আমরা ততক্ষণে টাইম- মেশিনে চেপে প্রায় দুশো বছর আগের সেই বাবু কলকাতার পথে রওনা হয়ে যাই। যাত্রা শুরু করার মুখে পুরনো কায়দায় কিঞ্চিৎ বরফ সহযোগে ফরাসি মদ্য পান করা যাক।'

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অরিন্দম চেঁচিয়ে উঠে বলল: 'থ্রি চিয়ার্স ফর বাবু অমিতাভ'। আসরের বাকি সবাই হাততালি দিয়ে গলা মেলাল—থ্রি চিয়ার্স ফর বাবু অমিতাভ।

সাবেক কালের উর্দিপরা জনা-তিনেক বেয়ারা পুরনো দিনের লম্বা গ্লাসে ফরাসি মদ পরিবেশন করল অতিথি-অভ্যাগতদের। পরস্পর গ্লাস ঠুকে চিয়ার্স জানাবার পরেই আসরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল।

একটু আগেই অমিতাভ পুরনো ইতিহাসের কয়েকটি পাতা শুনিয়ে দিয়েছে শ্রোতাদের। এই আসরটি আবার এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে মনে হচ্ছে—প্রাচীন কলকাতারই এ-টি একটি অংশ। এখানে বসে একটু চেষ্টা করলেই বুঝি পুরনো সেই শহরে ঢুকে পড়া যায়। ফরাসি মদে চুমুক দিতে দিতে সেই চেষ্টায় মেতে উঠেছিল সবাই।

পুরনো এই বাগানবাড়ির ফরাস-পাতা মস্ত হলঘরে তাকিয়া নিয়ে আয়েস করে বসেছিল প্রত্যেকে। মাথার ওপরে মস্ত সেকেলে ঝাড়লণ্ঠন। লণ্ঠনে অবশ্য মোমবাতির বদলে লুকনো বাল্‌ব। জোরালো হাওয়ায় অল্পস্বল্প দুলছিল ঝাড়লণ্ঠন। সেই দুলুনিতে বিচিত্র সব ছায়া ফুটে উঠছিল হলঘরের দেয়াল আর স্তম্ভে। আলো-আঁধারি পরিবেশ পুরনো দিনে ফেরার রাস্তাকে আরও মসৃণ করে দিয়েছিল।

ফরাসি মদের পরে এল স্কচ। ফরাসে বসা মানুষজন এখন পুরনো কলকাতার বাবু হয়ে গিয়েছে। বাবুদের মেজাজ ফুরফুরে হতে শুরু করার একটু পরেই সদরে ফিটনের আওয়াজ উঠল। তার পরেই কে যেন বলে উঠল—নিকি এসেছে।

নিকি কোথায়? এ-তো নিকির বংশের এক বাইজি। কিন্তু পুরনো কলকাতার বিখ্যাত সেই নিকি বাবুদের মনে এমনই একটা ছাপ ফেলেছিল যে, এক বাবু বলে উঠল, 'নিকির মেয়ে নিকি, তার মেয়েও নিকি, তারও মেয়ে নিকি। আসলে নিকির বংশের সবাই নিকি।'

ওই বাবুর কথায় ফরাসে বসা বাকি বাবুরা সায় দিয়ে বলল—নিকির বংশের সবাই নিকি

একটু বাদে গাড়ি-বারান্দা, সদর-দরজা পেরিয়ে হলঘরে ঢুকল এক বাইজি। অতিথিরা অবাক হয়ে দেখল, দেয়ালে ঝোলানো মাদাম বেল্‌নোসের আঁকা বাইজির ছবির সঙ্গে এই বাইজির চেহারা আর পোশাকের আশ্চর্য মিল!

বাইজির পরনে কুঁচি-দেওয়া পেল্লায় এক ঘাগরা আর গায়ে মস্ত ওড়না। ঘোমটার আড়াল থেকে পরমাসুন্দরীর আধখানা মুখ দেখা যাচ্ছিল। কেতা আর সহবত-জানা সুন্দরী। দু-পা এগোচ্ছিল আর কচি বেতের মতো শরীর বাঁকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করছিল বাবুদের।

একটু আগে পর্যন্ত বাবুমশাইরা একুশ শতকের গোড়ার দিকে ছিল, এখন কিন্তু অনেকেরই বিভ্রম হতে লাগল—ওরা বোধ হয় অলৌকিক কোনো উপায়ে উনিশ শতকের কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে। ফরাসি মদ, ফরাস-তাকিয়া, ঝাড়লণ্ঠনের আলো-আঁধারি আর সামনের ওই পরমাসুন্দরী বাইজি—সবাই, সব কিছু একসঙ্গে মিলেমিশে অসম্ভব এই কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল মায়ানগরীর আসর। তবলা, মৃদঙ্গ আর সারেঙ্গির

সঙ্গে ঘুঙুরের মিঠে বোল। বাইজির পরনে মস্ত বড় ঘাগরা। সাদা ও রঙিন মসলিনের ফ্রিল সেই ঘাগরায়। তার ওপরের কাজগুলো নির্ঘাত সোনা-রুপোর জরি দিয়ে তৈরি। ঘাগরার নীচে সাটিনের ঢিলে পাজামা। বাইজির এক হাত ঘাগরার প্রান্তে, অন্য হাতে নাচের মুদ্রা। বাবুদের সামনে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রভার মতো একবার ঘুরে এসে ফরাসের ঠিক মধ্যিখানে ঘাগরা ছড়িয়ে বসে পড়ল বাইজি।

এক হাঁটু মেঝেতে ভাঁজ করা, অন্য হাঁটু উঁচু। উঁচু হাঁটুর ওপর একগোছা চুড়ি-পরা লম্বা হাত মেলে দিয়ে বাকি হাতটা কানের কাছে নিয়ে এসে সুরেলা গলায় গান ধরল বাইজি— সাঁইয়া মত্ যাইও অব...

বাবুদের মনে হল সাতটি সুকণ্ঠী-পাখি একতানে খেলা করছে বাইজির গলায়। গানের পর গান। তার পর নাচ। নাচের পর নাচ। বাইজির দুই ভুরু যেন জোড়া ধনুক। ধনুক থেকে অদৃশ্য কিছু তির ছিটকে এসে বুঝি বাবুদের বুকে বিঁধে যাচ্ছিল। বাইজির চোখে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুতের ঝলকে বাবুদের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছিল বারবার। বাবু অমিতাভ পুরনো দিনের এক রুপোর থালায় কোম্পানি-আমলের বেশ কিছু রুপোর টাকা নজরানা হিসেবে দিয়েছিল বাইজিকে। উপহার পেয়ে নৃত্যের তালে-তালে বাবুকে কুর্নিশ জানিয়েছিল বাইজি।

সেই আমলের মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপারের মতো বিখ্যাত এক কেটারার হাজির হল বিস্তর সাহেবি-খানা নিয়ে। সুখাদ্যের সঙ্গে ছিল বিখ্যাত পানীয়। এদিকে খানাপিনা, ওদিকে নাচ-গান। কেয়াবাত! সাবাশ! ব্রাভো ইত্যাদি জড়ানো গলার তারিফ বাবুদের মুখ থেকে ছিটকে পড়ছিল চারদিকে। রাত এদিকে গভীর হতে লাগল ধীরে-ধীরে।

নাচ-গানের রাত, হুল্লোড়ের রাত। মায়াময় রাত ভোরের দিকে গড়াবার মুখে মাতাল বাবুদের বেশ কয়েকজন ঘুমিয়ে পড়েছিল ফরাসের ওপর। যারা এখনো ঘুমোয়নি তাদের চোখ ঢুলু-ঢুলু, ঘুমিয়ে পড়তে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। এমন সময় গানবাজনার আর বুঝি দরকার নেই। বাইজি আর তার দলবল খানাপিনা সেরে নিয়েছে এক ফাঁকে।

নেশায় রঙিন হলেও মোটামুটি সজাগ ছিল বাবু অমিতাভ। এই বাবুই বড়বাবু। বড়বাবুর মনোরঞ্জনের জন্যে বাইজি একটা গানের সুর ভাঁজছিল, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে বড়বাবু বলল, 'যাক, আর গান নয়, অনেক গান হয়েছে। চলো আমরা দু-জনে মিলে ফিটনে চেপে শেষ রাতের কলকাতা দেখে আসি। আপত্তি নেই তো?'

চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়ে বাইজি বলল, 'বাবু, আপনি মেহেরবান, যা বলবেন তাই শুনব। আমি তো আপনাকে খুশি করার জন্যেই এসেছি।'

'চলো তাহলে।'

মায়াময় শেষরাত। চাঁদ ঢলে পড়েছে আকাশের নীচের দিকে। ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। ফিটনে বাবু অমিতাভ আর বাইজি। ফিটনের জোয়ান দুটো ঘোড়া টগবগ করে ছুটে চলেছিল শহর কলকাতার দিকে। ফাঁকা রাস্তা। একটু পরেই এসে গেল কলকাতা। কিন্তু এ কী! কলকাতার চেহারাটা অবিকল দেড়শো-দুশো বছর আগের কলকাতার মতো দেখাচ্ছে কেন? পুরনো ছবিগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে কোনো জাদুমন্ত্রে। স্নিগ্ধ হাওয়ায় নেশাটা আরো জমে ওঠার মুখে অমিতাভ বলল, 'এ কোথায় আমরা এসেছি বাইজি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ঝলমল করে হেসে উঠে বাইজি বলল, 'কী করে বুঝবেন! মগজ কাজ করছে না। নেশা করে-করে তো রাত ভোর করে দিয়েছেন। দিক ভুল হয়ে যাচ্ছে আপনার? ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি। ওই সামনের দিকে গেলে লাটসাহেবের বাড়ি, আর পেছনে গেলে লর্ড ক্লাইভের কুঠি। পরিষ্কার তো? চলুন এবার বাগানবাড়িতে ফিরে যাই।'

বাইজির অদ্ভুত উত্তর শুনে থম্ মেরে গিয়েছিল অমিতাভ। ফেরার পথ ধরল ফিটন। নির্জন পথ। ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই কানে আসছিল না বাবু অমিতাভ-র।

বাগানবাড়িতে ফিরে এসে আর একবার ঝলমল করে হাসল বাইজি। 'কী বাবু, ফিটন থেকে নিজেই নামতে পারবেন; না কি নামানোর জন্যে কাউকে ডাকতে হবে—।'

চটকা ভেঙে গিয়েছিল বাবু অমিতাভ-র। সামান্য জড়ানো গলায় বলল, 'না-না, কাউকে ডাকার দরকার নেই। তুমি আগে নামো, তার পরে আমি নামছি।'

ফরাসের ওপর সব বাবুই এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাইজির সঙ্গের বাজনদাররা বোধ হয় অন্য কোনো ঘরে। নিজের মনে একটু হেসে নিয়ে বাবু অমিতাভ বলল, 'আমার বন্ধুরা তোমাকে কিন্তু নিকি বাইজি ভেবে নিয়েছে।'

রহস্যপূর্ণ একটা হাসি হেসে বাইজি বলল, 'আমার নাম তো নিকিই।'

অমিতাভও হাসল, 'নিকির ছবি ওই তো ওদিকের দেয়ালে ঝুলছে।'

ছবির দিকে এগোতে-এগোতে বাইজি বলল, 'ওটাতো আমারই ছবি। মাদাম বেল্‌নোস এঁকেছে।'

চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছিল অমিতাভ-র। 'অ্যাঁ! তুমি মাদাম বেল্‌নোসের নামও জানো?'

'কেন জানব না? মাদাম আমাকে সাত-সাতটা দিন সামনে বসিয়ে রেখে ছবি এঁকেছে। কত কথা হয়েছে ওর সঙ্গে।'

তারিফ করার ভঙ্গিতে হেসে উঠল অমিতাভ। 'ওহ্! তুমিই তাহলে নিকি?'

রীতিমতো ক্ষুণ্ণ হল বাইজি। 'কেন এ-কথা বলছেন! দেশসুদ্ধ লোক আমাকে চেনে। আমি এক রাতের মুজরো করার জন্য হাজার রুপিয়া নিই। গত বছর পুজোর সময় আমি মহারাজ রামচন্দ্র রায়, বাবু নীলমণি ও বোষ্টমদাস মল্লিকের বাড়িতে গানবাজনা করেছি।'

বাবু অমিতাভ-র জমে-ওঠা নেশায় বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা লাগল এবার। 'অ্যাঁ!'

বাইজির চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। 'আপনি এমন করছেন যেন এসবের কিছুই জানেন না। ক্যালকাটা জার্নালের বিজ্ঞাপন দেখে আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল কে? বাবু অমিতাভ, না অন্য কেউ?'

মুখ টিপে হেসে বাইজি বলল, 'ভোর হচ্ছে, এবার আমি চলি।' এই না বলে দেয়ালে টাঙানো মাদাম বেল্‌নোসের আঁকা ছবির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল বাইজি।

দৃশ্যটি দেখে সারা শরীর টলমল করে উঠেছিল অমিতাভ-র। পায়ের নিচে ফরাস, সেই ফরাসে ভেঙেচুরে বসার পরেই শুয়ে পড়েছিল ও।

৩.

টাইম-মেসিনে চেপে প্রায় দুশো বছর আগের কলকাতা থেকে ঘুরে আসার বিচিত্র

অভিজ্ঞতাটা বন্ধুদের মুখে-মুখে ফিরেছিল অনেক দিন।

সত্যি, গোটা ব্যাপারটা অমিতাভ যেভাবে সাজিয়েছিল— তার জবাব নেই! কিন্তু ওই রাতের প্রসঙ্গ উঠলেই অমিতাভ কেমন যেন চুপসে যেত, আর প্রাণপণ চেষ্টা করত প্রসঙ্গটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার।

অরিন্দম সেদিন অমিতাভকে একা পেয়ে চেপে ধরেছিল। বলল, 'আজ তোকে বলতেই হবে, যে-মেয়েটা সেই রাতে নিকি সেজেছিল— তাকে তুই কোত্থেকে পেয়েছিলি?'

বিষয়টা ঘোরাবার চেষ্টা করেও পারল না অমিতাভ। শেষে ম্লান মুখে বলল, 'অফিসপাড়ায় থিয়েটার করে এমন একটা মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ওরই নিকি সাজার কথা ছিল।'

'কথা ছিল! মানে?'

'আগে তো জানতে পারিনি। পুজোর পরে জানতে পারলাম যে, হঠাৎ খুব জ্বর হয়ে গিয়েছিল বলে ওই মেয়েটা সেই রাতে আসতে পারেনি।'

'বদলি বাইজি হিসেবে ও-ই মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল?'

'না।'

'তা হলে ওই মেয়েটাকে কোত্থেকে জোগাড় করেছিলি তুই?'

'আমি তো জোগাড় করিনি।'

'কে করেছিল তা হলে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শুকনো মুখে জবাব দিয়েছিল অমিতাভ, 'জানি না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে গলা ছেড়ে হেসে উঠে অরিন্দম বলেছিল, 'তোদের বাগানবাড়ির নাচঘরে মেমসাহেবের আঁকা নর্তকীর যে-ছবিটা আছে, মেয়েটাকে তো অবিকল ওই ছবির মতো দেখতে। এমনো হতে পারে, ওই ছবিটা সেই নিকির। তোর সাজানো বাইজি আসেনি দেখে ছবি থেকে বেরিয়ে এসে নিকি সারারাত নাচ-গান করে ভোরবেলায় আবার ছবির মধ্যে ঢুকে গেছে।'

বন্ধুর হাতটা হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে উজ্জ্বল মুখে অমিতাভ উত্তর দিয়েছিল, 'আমার ঠিক তাই মনে হয়!'

সাড়ে তিন হাতের কম

সাধন চট্টোপাধ্যায়

সন্ত থমাস যখন তাঁর আশ্রমের বাইরে, বনের মধ্যে তন্ময় হয়ে প্রার্থনা করে চলছিলেন, আদৌ ভাবতে পারেননি মৃত্যু ওত পেতে আছে কাছেই এবং এক হাজার বছর পর সমাধি থেকে অস্ত্র হাতে তিনি জেগে উঠবেন। সময়টা ছিল মে-মাসের একটি দিন। ভারি উজ্জ্বল আকাশ। সমুদ্রের শরীরের মতো হালকা নীল মাথার ওপর চাঁদোয়া হয়ে আছে। রবার ও ব্রাজিলিয়ান গাছের ঘন সবুজ, চারদিকে দাউদাউ জ্বলছিল রোদের মধ্যে।

অঞ্চলটি ভারি নির্জন। ছোটখাট শহরই বলা যেতে পারে। যাতায়াতের সহজ সুযোগ-সুবিধে নেই কারণ এখানে বণিকদের পা পড়ে না বললেই চলে। পড়বে কেন? সংগ্রহ করার মতো পণ্য তেমন নেই। বেশ কয়েকটা রাজ্য পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে অগভীর অঞ্চলে অসংখ্য মুক্তা-ব্যবসায়ী ভাড়াটে লোক দিয়ে নারকোলপাতার ডেরা বানিয়ে অপেক্ষা করছে দিনরাত। আর ভাড়াটে লোকগুলো ছোট-ছোট নৌকো থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে জলে মুক্তা-ঝিনুকের জন্য। এ-শহরে পা দেবে কেন তারা? মে-মাসের দিকে সন্ত থমাসের আশ্রমের চারদিকে বিষাক্ত মাকড়সা আর বিছে গিজগিজ করে।

থমাস যখন তন্ময় হয়ে জঙ্গলে প্রার্থনারত, স্থানীয় গোবী-সম্প্রদায়ের কালকেতু হাজির হয়েছে শিকারের জন্য। এখানে পর্যাপ্ত ময়ূর পাওয়া যায়।

থমাসের দেহের রং তামাটে-ধবল, চুল লম্বা জটধরা, বুক অবধি কাঁচাপাকা শ্মশ্রু। এই গোবী-সম্প্রদায় মূর্তিপূজক কিন্তু মুসলমানদের মতো গো-মাংস খায়। কালকেতু জানত না থমাস লালমাটির দেশে জঙ্গলে আশ্রম বেঁধে আছেন এখানে। ছোট্ট রাজ্যের রাজাকে কালকেতু চেনে। ভারি ধার্মিক ও দয়ালু মানুষ। দেশের অন্য সকলের মতো আদুড় গায়ে থাকেন। শুধু একটুকরো মিহি কাপড় তাঁর কোমরের নীচে জড়ানো। তবে গলায় ঝোলে একটি হার। পুরোটাই মাণিক্য, নীলা, পান্না ইত্যাদি নানা রকম দামি দামি রত্ন দিয়ে তৈরি। এটি রীতিমতো মূল্যবান। এ-ছাড়া একটি মিহি রেশমের সুতোও সর্বদা তাঁর গলায় ঝোলে। তাতে লটকানো আছে ১০৪টি বড়-বড় মুক্তা আর মাণিক্যের বিশাল-বিশাল টুকরো।

কালকেতু ময়ূরশিকারের জন্য তির-ধনুক নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে যখন জঙ্গলের অনেকদূর চলে এল, সন্ত থমাসকে সে দেখতে পায়নি। ময়ূরদের দেখে শিকারের জন্য তাদের একটিকে লক্ষ্য করে তির ছুড়ল। তিরটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিঁধল এসে পবিত্রপুরুষের দেহের দক্ষিণভাগে। তিরটি এত জোরে ছুটে এল এবং এত গভীর হয়ে বিঁধল যেন তামার ফলক বেয়ে আলতা গড়িয়ে পড়ছে।

এখানে ডেরা বাঁধার আগে তিনি নানা রাজ্যে ছিলেন অজ্ঞাতবাসে। কিছুদিন নুবিয়ায় থেকে বহু মানুষকে যিশুখৃষ্টের মতবাদের প্রতি বিশ্বাসী করে তুলছিলেন যখন, তখনই জানতে পারেন শত্রু পিছু নিয়েছে। যে ১২ জন ঘনিষ্ঠদের নিয়ে যিশুর গোপন চলাফেরা, সন্ত থমাস তাঁদের অন্যতম। মরু, সমুদ্র এবং নানা পর্বত ডিঙিয়ে এখন এখানেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। সেইলান রাজ্যে দেখতে পেয়েছিলেন কিছু ইহুদি বণিকদের। তৎক্ষণাৎ সেই রাজ্য ছেড়ে এখানে। গোবী-সম্প্রদায়ের কিছু হতদরিদ্র মানুষ শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় তিনি ঈশ্বরের অপার

করুণার সঞ্চার দেখতে পেলেন।

যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে সন্ত হাঁটু গেড়ে বসলেন। বিড়-বিড় করলেন ঈশ্বরের বাণী। প্রিয় পূজ্যপাদ যিশুর মুখটি ভেসে উঠল।

কালকেতু ভয়ে ছুটে এসে সন্তকে কোলে নিতেই, তিনি বললেন, ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন কালকেতুকে।

কালকেতু জিজ্ঞেস করল — কে আপনি? এখানে কী করছিলেন?

যন্ত্রণায় সন্ত হাসলেন এবং ক্রমে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। কালকেতু হতভম্ব। শিকার মাথায় উঠেছে তার। আজও শূন্য হাতে বাড়ি ফিরতে হবে। এর পর কখন শিকার হবে, মাংস নিয়ে বসবে হাটে? ইতিমধ্যে দু-একজন গরীব গোবীশিষ্য হাজির হয়ে, থমাসের অবস্থাটা দেখে বজ্রাহত। ওরা কালকেতুকে নিয়ে রাজার দরবারে উপস্থিত হবার জন্য শাসাল। কারণ, ময়ূরভ্রমে এ-হত্যাকাণ্ডটিকে তারা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করল না।

— ময়ূর তো পাখি, উনি সাক্ষাৎ ভগবান!

— জঙ্গলে পাখি-ভগবানে তফাত কোথায়? তির হাতে উঠলে, নিশানা ছাড়া কিছুই ঠিক থাকে না।

— ওনাকে শয়তান ভেবেছিলি। নরকে নিক্ষিপ্ত হবি তুই।

— তোমাদের সন্ত কালো পোশাক থাকলেই পারতেন!

— যখন তোরা ষাঁড়কে পুজো দিস, মন্দা বলে ভুল করিস?

আসল ব্যাপার হল এ-রাজ্যে সবার রংই যথেষ্ট কালো। তবু গায়ের বর্ণ কী করে আরো বেশি কালো করা যায়, এ-নিয়ে সবার ভাবনা-চিন্তার শেষ নেই। বিশেষত মেয়েরা। জন্মাবার পর থেকেই তারা আপন আপন শিশুদের যথেষ্ট কালো বানাবার দিকে মন দেয়। প্রতি হপ্তা সন্তানদের গায়ে তিল তেল মালিশ করে চলে। ফলে, তারা শয়তানের মতো কালো রঙ পায়। তারা তাদের দেবতাদের কালো, শয়তানকে শাদা এবং সাধু-সন্তদের মূর্তি আপাদমস্তক কালো রঙে রাঙায়।

শোকে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে গোবী-সম্প্রদায়ের নতুন ধর্মাবলম্বীরা বিচারের জন্য কালকেতুকে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা আদুড় গায়ে দামি মুক্তার হার পরে, মাটিতে বসে বিচার করলেন। এ-দেশের মানুষরা মাটিকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে।

রাজার কোমরে একখণ্ড দামি কাপড়। তিনি মূর্তিপূজক। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তাকে গলার মূল্যবান মালাটি দিয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতার কাছে ১০৪ বার করে প্রার্থনা জানাতে হয়। এ-রকমটিই তাদের ধর্মীয় বিধি ও চলিত রীতি। তাঁর যে-সব পূর্বপুরুষ রাজা হয়েছেন তারাও এ-বিধি পালন করে গেছেন। রাজা নালিশ শুনে চোখ বুজে তিন বার উচ্চারণ করলেন — পকৌতা! পকৌতা! পকৌতা!

অর্থাৎ হা ভগবান!

গরীব গোবী-সম্প্রদায়ের মানুষগুলো নীরব।

রাজা বল্লেন — হত্যা এ-রাজ্যে জঘন্য অপরাধ। কিন্তু সন্ত মূর্তিপূজক ছিলেন না। তা ছাড়া, কালকেতু নির্দোষ, স্বীকার করেছে!

— মহারাজ, ওটা কালকেতুর মিথ্যাচার। ...সন্তের ফরসা চেহারা, কালকেতুকে তির ছুড়তে সাহায্য করেছে।

— গোল করে লাভ আছে? মৃত কখনোই ফিরে আসে না।... তবে এ-রাজ্যে কেবল পোড়ানোই বিধি... এ-ক্ষেত্রে তোমাদের স্বাধীনতা দিলাম সন্তকে সমাধি দিতে পারো।...মাটি পবিত্র... তবু আমি তোমাদের হুকুম করছি!

নির্জন জঙ্গলে জনা দশ গরীব নিরক্ষর, সন্তকে কবর দিল এবং পাশেই গড়ে তুলল ছোট্ট একটা গির্জা।

গোবী-সম্প্রদায়ের একজন লোক কৌবুকি, কবরে এক-কোদাল লাল মাটি ফেলে দীর্ঘশ্বাসে উচ্চারণ করল — এটাই রাজ্যের এক নম্বর অপরাধ।

এক হাজার বছর পর, কালকেতু কিংবা কৌবুকি — কেউই জীবিত ছিল না। কিন্তু রাজা ছিলেন। তবে আদুড় গায়ের রাজা ঝাঝর এর বেঁচে থাকার কথা নয়। প্রতিটি জীব নির্দিষ্ট আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসে। প্রচুর খায়, বিপুল প্রবৃত্তি নিয়ে রমণ করে, উদ্যোগী পুরুষ হবার চেষ্টা করে — শেষে এক মুঠো ছাই কিংবা সাড়ে তিন হাত গত্তের মধ্যে থাকে চিরঘুমে। পোকারা জন্মায় সেখানে। তবু নির্দিষ্ট আয়ু, ক্ষমতার লোভে কারো-কারো খাটো হয়ে যায়। রাজা ঝাঝরের ছিল প্রায় দুই শত পত্নী। যখনই কোনো সুন্দরী দেখতে পেতেন রাজ্যে, তুলে এনে নিজের কোলে বসিয়ে দিতেন। একবার তো আপন ভাইয়ের সুন্দরী স্ত্রীকেই কেড়ে নিয়ে মহলে বন্দি করে রেখেছিলেন। রাজাকে দেখাশোনা করার জন্য অনেক পারিষদ। তারা সবসময়ে রাজার পাশে-পাশে ঘোরে। রাজা ঝাঝর মারা গেলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন বলে অন্য সকলের মতো আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হল। কিছু ঘনিষ্ঠ পারিষদ প্রথা-অনুসারে রাজার সাথে চিতায় ঝাঁপ দিয়েছিল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল — এ-জগতে তারা রাজার সঙ্গী, পরলোকেও রাজাকে তাদের সঙ্গ দেয়া উচিত।

এক হাজার বছর পর রাজা রইলেন। তবে তিনি ঝাঝর-এর বংশের কেউ নন। ইনি হলেন রাজা হবিষ্ক। গোবী-সম্প্রদায়ের মানুষ। গির্জা তখন ঘর-বাড়ি নিয়ে মস্ত তীর্থে পরিণত। বণিক থেকে শুরু করে নানা-সম্প্রদায়ের মানুষ গির্জায় আসে। হাজার বছরে সমুদ্র ভেঙ্গে এ-রাজ্যে খানিকটা ঢুকে পড়ায়, গির্জায় উপস্থিত হবার পথ, পর্বতের চড়াই-উতড়াই বেয়ে হয়েছে। পথ দুর্গম। নানা হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। শোনা যায় এই পর্বতে হীরার গোপন খনি আছে। তাই তীর্থযাত্রীর পাশে অনেক স্বার্থান্বেষীরাও আসে এখানে।

রাজা হবিষ্ক গোবী-সম্প্রদায়ের হলেও মূর্তিপূজক। কিন্তু হাজার বছরে ওই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সন্তের মতাবলম্বী হয়ে উঠেছে। দেশে নতুন বন্দর হওয়ায় সম্প্রদায়ের আর্থিক ভাগ্যও গেছে খুলে। রাজা স্বয়ং অর্ণবপোতে চালের বাণিজ্য করেন।

তো একদিন তিনি পারিষদ দিয়ে এখানকার গির্জাটির চারপাশের সব ঘরগুলোয় চাল বোঝাই করে রাখলেন। থমাসের অনুগামীরা পড়ল ভীষণ বিপদে। যে-সব তীর্থযাত্রী সন্তের সমাধিক্ষেত্র দেখতে আসে, তাদেরও আশ্রয় নেবার ঠাঁই রইল না। খুব অসুবিধেয় পড়ল। শুধু কি তাই! থমাসের অনুগামীদের মতো মুসলমানরাও এই সন্তকে গভীর শ্রদ্ধা করে। তারা বলে, সন্ত একজন মুসলমানও ছিলেন, ঈশ্বর-প্রেরিত মহান দূত। থমাস না বলে, মুসলমানরা বলত অভরীন বা পবিত্র পুরুষ। মুসলমান তীর্থযাত্রীরা বছরের যে-কোনো সময়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে পিছ-পা হয় না। এ-দেশে সময়ে-সময়ে এত গরম পড়ে যা চমকে দেয়ার মতো। জুন, জুলাই, আগস্ট — বছরে তিন মাস মাত্র বর্ষা। এই বর্ষা মাটির বুকে নতুন জীবনের সঞ্চার করে এবং আবহাওয়া ঠাণ্ডা করে দেয়। যদি বর্ষা না আসে কোনো বছর, খরার প্রকোপ

এতই ভয়ঙ্কর যে কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারে না।

তো, মুসলমান তীর্থযাত্রীরা খরার মধ্যেও প্রিয় অভরীন দর্শনে আসে। গির্জার ঘরগুলো রাজার ব্যবসায়িক চালে ঠাসা থাকায়, দুর্দশা খুবই হতে থাকল। এখানে-ওখানে মাটিতে রাত কাটাবার জন্য বিষাক্ত মাকড়সা বা রক্তশোষক কীটের দংশনে প্রাণ হারাল অনেক পুণ্যবান তীর্থযাত্রী। রাজা এবং সম্ভ্রান্তরা গ্রীষ্মে খুব হালকা বেত-বুনোট করে তৈরি এক ধরনের বিছানায় ঘুমোয়। এই বিছানা এমন কৌশলে তৈরি, যখন কেউ শোয় এখানে, তখন দড়ি দিয়ে টেনে অতি সহজে ছাত অবধি তুলে নেয়া যায়। কীটদংশনের হাত থেকে সারারাত নিশ্চিন্তে ভালো ঘুম হতে বাধা থাকে না। রাজা এই বিছানায় শোন প্রতিদিন। গির্জার তরফ থেকে পুণ্যবানদের জন্য এ-ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

একদিন গির্জার তরফ থেকে গোবী-সম্প্রদায়ের জন লুলু নামে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি রাজাকে বললেন — দয়া করে আপনি চালগুলো সরিয়ে, গির্জাঘর মুক্ত করুন।

রাজা তাকিয়ে জবাব দিলেন না। একজন পারিষদ উত্তর করল — দেখা যাবেখন!

উনি তো বলেই খালাস। কোনো উদ্যোগ নেই।

ফের জন লুলু অনুরোধ করেন — রাজামশাই, দয়া করে আমাদের বিশ্বাসকে মর্যাদা দিন!...গতকালও তিন তীর্থযাত্রীর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে।

একজন পারিষদ হেসে বলে — মৃত্যু অমোঘ! তাকে কে রুখতে পারে? ফের জন লুলু রাজার কাছে অনুগত হলেন।

গির্জার চারধারে প্রচুর নারকোল গাছ। এক একটা গাছের জন্য, রাজাকে প্রতি বছর ৬ গ্রোট (মুদ্রা) কর দিতে হয়। জন লুলু এই অধিকারেই বার বার রাজার কাছে অনুরোধ পাঠাতে থাকেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই ফল হয় না। রাজা হবিষ্ক মূর্তিপূজক; গোবী-সম্প্রদায়ের এই আবদারকে বড্ড বাড়াবাড়ি মনে করলেন। ভীষণ চটলেন জন লুলুর ওপর।

একদিন রাতে হবিষ্ক বেতের বিছানায় শুয়ে আছেন। ভীষণ গরম ছিল সে-দিন। মাঝে-মাঝে সমুদ্রবাতাস ভেসে আসছিল। চারদিকে নিশিপক্ষীদের ডাক! এখানে মুখ লাল এক ধরনের হিংস্র বাদুড় দেখতে পাওয়া যায়। শোঁ-শোঁ আওয়াজ হয় তারা উড়ে গেলে।

রাজার চোখে ঘুম নেই। বিদেশি বণিকরা বড্ড অত্যাচার চালাচ্ছে। যথেচ্ছাচার চালিয়ে পর্বতের হীরা পাচার করছে। ঠিক-ঠিক হিসেব দিচ্ছে না। শোনা যায়, এই সব বণিকদের মুখে মুক্তো-মণি-মাণিক্যের কথা শুনে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে পরাক্রমশালী সম্রাটরা সশস্ত্র সৈন্যদল পাঠাচ্ছে লুটপাটের জন্য।

হঠাৎ অলৌকিক ঘটনা ঘটল। সন্ত থমাস কবর থেকে উঠে এলেন। ধবধব করছে দেহ, চুলগুলো শণের মতো, আবক্ষ দাড়ি, হাতে দুই ফলকবিশিষ্ট শূল। তিনি শূন্যে হেঁটে বিছানার কাছে এসে কাঁটাটি হবিষ্ক-র গলায় চেপে ধরে হুকুম করলেন — তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য যদি না এক্ষুনি ঘরগুলো ফাঁকা করে দাও, তুমি অপঘাতে মারা পড়বে। কাঁটা দিয়ে সন্ত থমাস এত জোরে চাপ দিতে থাকলেন যে, রাজা হবিষ্কর মনে হল বুঝি সত্যিই তিনি মারা পড়ছেন। মৃত্যুর আতঙ্ক চমকে দিল তাঁকে। পরদিন সকাল হতে না হতে পারিষদরা চাল সরিয়ে নিয়ে ঘরগুলো খালি করে দিল। রাজা হবিষ্ক সন্তের হাতে নাকাল বনবার কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানালেন না কাউকে। কিন্তু জন লুলুর ওপর অপমানের প্রতিশোধ নিতে তক্কেতক্কে রইলেন।

অবশেষে একদিন সুযোগ এল। মিথ্যা অপরাধের অভিযোগে জন লুলুর মৃত্যুদণ্ড হল। দেশের আইন-অনুসারে, অপরাধীর দোষ রাষ্ট্র হওয়ার আগে শহীদ হওয়ার সুযোগ পায়। এ-রকম ঘোষণা অপরাধী করতে পারে যে, 'আমি অমুক বা অমুক দেবতার সম্মানে আত্মবলিদান করছি।' রাজা তখন পরিস্থিতি বিচার করে আত্মবলিদানের অনুমতি দেন।

দলে-দলে বিশ্বাসী মানুষ লুলুর জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাইতে এলে, রাজা হবিষ্ক বললেন — আত্মবলিদানের অনুমতি নাও!

— প্রভু, আমরা মূর্তিপূজক নই...কোন্ দেবতার সম্মান চাইব?

— পৃথিবীতে সব দেবতাই সবার!...

— আপনি আমাদের রক্ষক...দয়াপ্রদর্শন করুন!

রাজা হাসলেন — দেবতার ধর্মই হল দয়া। আমাদের দেবতা চিরকাল দয়া দেখিয়েছেন। ম্লেচ্ছরা বোঝার চেষ্টা করেনি।

সম্প্রদায়রা ফিরে গেল। তার পর রাজার প্রথানুসারে, আত্মীয়স্বজন, ভক্ত, বন্ধু-বান্ধবরা জন লুলুকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে, হাতে ১২ খানা ধারালো ছোরা তুলে দেয় এবং তাকে নিয়ে শহর-পরিক্রমা করে বেড়ায়। লুলুর দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ শরীর ভয়ে থিরথির কাঁপতে থাকে। সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিক্রমাকালে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলতে বাধ্য হল— এই সাহসী মানুষটি দেবতা বিষ্ণুর প্রতি গভীর ভক্তির নিদর্শন রূপে নিজেকে তার কাছে বলিদান করছেন।

গোপনে সবাই চোখের জল মুছতে-মুছতে ফিরে গেল।

মরণভূমিতে পৌঁছে জন লুলু একখানি ছোরা নিজের ডান বাহুতে বিঁধিয়ে চিৎকার করলেন — দেবতা মহেশ্বরের প্রতি আমার ভক্তির নিদর্শন দিতে আমি তাঁর কাছে নিজেকে বলিদান করছি। ঘন লাল রংয়ের ধারা হাহাকার তোলে। এর পর তিনি আর একখানি ছোরা নিয়ে 'দেবতা কৃষ্ণের জন্য' বলে নিজের পেটে বিঁধিয়ে দিলেন। তার পর মরণভূমিতে অসংখ্য ভক্তের চোখের সামনে জন লুলু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

তখন মৃতদেহ নিয়ে গির্জার মাটিতে চুপচাপ কবর দেয়া হল। কৌবুকি বা কালকেতু বেঁচে ছিল না। জনৈক চণ্ডা নামের এক ব্যক্তি ফিসফিস করে উঠল — এটাই রাজ্যের দুই নম্বর অপরাধ।

আরো হাজার বছর পর। হবিষ্ক মৃত। রাজ্যও লুপ্ত হয়ে গেছে। পর্বত ডিঙিয়ে তীর্থযাত্রীদের চলাচলের পথ অনেক সহজ। টেলিফোন, ফ্যাক্স হয়ে গেছে। সমুদ্র ফের দূরে সরে গেছে। এক রাতে অলৌকিক ঘটনায় মানুষ রাস্তায় নেমে এল পিলপিল করে। সন্ত থমাস ও জন লুলুর পাশাপাশি কবর দুটো থেকে নাকি একটি তির ও তিনটি ছোরা উঠে আছে। শরীরে রক্ত মাখা।

রক্ত কতকাল টাটকা থাকে? অলৌকিক ঘটনাটির খবর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ার পর, যে-কোনো কবর থেকেই তির অথবা ছোরা উঠে আসতে দেখল মূর্তিপূজকরা। লম্বায় সব দীর্ঘ। তাদের কেউই সন্ত থমাস বা জন লুলুকে চেনে না। দাবি তুলল, এখন থেকে রাজ্যে যে-কোনো কবর সাড়ে তিন হাতের ছোট বানাতে হবে।

প্রস্তাব গেল প্রতিনিধিদের কাছে।

গেরো

অসীম সেনগুপ্ত

ভগবানকেও যেন এরকম সমস্যায় পড়তে না হয়। তা হলে যে তাঁর ভগবানগিরি ঘুচে যাবে এ আমি হলফ করে বলতে পারি। উঃ, এই ক-দিনে আমার বয়স তিনশো বছর বেড়ে গেছে। চোখের কোলে ইঞ্চিখানেক পুরু কালি। পেটের ভেতর নানা ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ তরঙ্গ। হজম হচ্ছে না। মনের যে অবস্থায় লোকে বিবাগি হয়ে সন্নেসী হয় আমারো সেই অবস্থা। পার্কের বেঞ্চে বসে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ভাবলাম — 'ধুর্ শালা, আর বাড়িই ফিরব না, যা থাকে কপালে। কেন ফিরব? কিসের টানে? কিসের মোহে? কী সুখে? স্ত্রী-পুত্র-পরিবার তারা কোথায়? স্বগৃহে পরবাসী হওয়ার প্রথম রাত পোহাতেই স্ত্রী দুই জোয়ান ছেলে লঙ্কা, বঙ্কাকে নিয়ে চলে গেছে বাইপাশের ধারে ছোটবোনের বাড়ি। এখন আমার বাড়িতে নেপোদের ভিড়। তারাই মহানন্দে দইটুকু মেরে যাচ্ছে। এদের হাত থেকে এখন নিষ্কৃতি পাই কী করে?

কিন্তু তাই বলে সব ছেড়ে-ছুড়ে সন্নেসী হয়ে যাব? গ্লানি বোধ করলাম। ছেলে, বউরা, মানে ছেলেরা বহুবচন, স্ত্রী একবচন, তারা তো কোনো দোষ করেনি। তার চেয়ে বরং ক-দিন টঞ্চাদার বাড়ি গিয়ে থেকে আসি। টঞ্চাদা আমার মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো শালা। অতি নিকট সম্পর্ক। জ্যোতিষ-টোতিষ করেন। খলিফা লোক। বাড়িতে হোম যজ্ঞ হয়। বহু বার আমাকে মূল্যবান স্টোন গছিয়ে আমার ভাগ্যের পুড়ে যাওয়া ফিউজ পালটে দিয়েছেন। খুবই পরোপকারী। আমার দু-হাতে আটটা আংটি টঞ্চাদার উপচিকীর্ষার দিব্য বিজ্ঞাপন। তাতে অবশ্য টঞ্চাদার ভাগ্য খুললেও আমার ভাগ্য খুলেছে, না বন্ধ হয়েছে বুঝি না।

পেটে লঘু-গুরু পারকাশনের ধ্বনি মূর্ছনা শুনতে-শুনতে পার্ক থেকে উঠে পড়লাম। বুড়ো আঙুলে তো আর টঞ্চাদা আংটি পরাতে পারবে না। পার্ক থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে এগারো পা গিয়েছি কি না সন্দেহ, নিত্যানন্দ পাকড়াশির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। ছেলেবেলা থেকে ওকে চিনি। আমাকে বেশ ভক্তিশ্রদ্ধাও করে। কাঠ বাঙাল। আমাকে দেখেই নিত্যানন্দ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তো অবাক! পুলিশে কাজ করে। এস.আই.। পোর্ট এলাকায় পোস্টিং। মোস্ট নটোরিয়াস এলাকা। সেই প্রিসিংট-এর এক জন পুলিশ অফিসার তো ততোধিক নটোরিয়াস। সেই জোয়ানমদ্দ এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল? কান্নার কারণ কি জানি না! তবু কেউ কাঁদলে মুখ করুণ করে একটু সহানুভূতি জানাতেই হয়। ভদ্রসমাজের রীতি।

বললাম — কান্দো ক্যান নিত্যানন্দ, কাইন্দো না। বাবা-মা কি মাইনষের চিরদিন থাকে? পোলা মাইয়া বউ ঠাকুরমা, তার পর ধরো গিয়া শ্বশুর শাশুরী শালি খুড়শ্বশুর সকলরেই একদিন যাইতে হয়। তুমি নিজেও কি চিরকাল থাকবা? জন্মাইলেই মরণ, কাইন্দো না— আমার মুখে দার্শনিক উক্তি।

— না দাদা, কেউ মরে নাই। নিত্যানন্দর কান্নার বেগ বাড়ল।

— অ্যাঁ, মরে নাই? আমি অবাক। মিছিমিছি মুখ করুণ করলাম। ঈষৎ বিরক্ত হই। মরে

নাই তো কান্দো ক্যান?

— মরার থিকাও বেশি দাদা। নিত্যানন্দর কান্না নাভিমূল থেকে উঠে এল। — দাদা, আমার প্রমোশন হইসে।

প্রমোশন হইলে কেউ কান্দে। আনন্দে লাফায়। বাড়িতে ইলিশ মাছ, মিস্টিটিস্টি কিনে নিয়ে যায়। ফিস্টি লাগিয়ে দেয়। আর এ হতভাগা ভেউ-ভেউ করে কাঁদছে।

— প্রমোশন হইসে তো ভালই হইসে। এয়াতে কান্দনের কি আছে?

— আপনে তো সবই জানেন দাদা, আপনের কাছে লুকাছাপা নাই। পোর্ট এলাকায় যে থানায় আছিলাম হেইখানে উপরি, তোলা, রেড এইসব মিলাইয়া মাস গেলে এক্কেরে লাখ টাকার মতো হইত। মাইনা আর কয়ডা টাকা পাই কন। এখন প্রমোশন দিয়া ইনেসপেক্টর করসে সইত্য, কিন্তু পোস্টিং কি দিসে জানেন? পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের মাস্টার। ইনকাম এক্কেরে নিল। দশতলার উপর থিকা ফুটপাতে ফালাইয়া দিল। সাধে কি কাঁদি।

— তোমারে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের মাস্টার করসে?

— হ। এক্কেরে মৃত্যুর মুখে।

একটু ভাবি। — শোনো নিত্যানন্দ, তুমি উইদ্যোগী পুরুষ। উইদ্যোগী পুরুষেরে যেইখানেই ফালাইব, হেইখানেই সোনা ফলব। ধরবা ধুলা, মুঠা খুললে সোনা।

— সোনা? ক্যামনে? হ, আপনের তো বেশ হুনারি বুদ্ধি আছে, কয়েন তো দাদা ক্যামনে? আমার হুনারি বুদ্ধি আছে শুনে রাগ হয়। তবু বলি — শোনো, টিউশনি করবা।

— টিউশনি? পুলিশ কোনোদিন টিউশনি করসে?

— তুমি করবা। যে-সব পোলাপান ট্রেনিং নিতে আইব, তুমি তাগো প্রাইভেটে পড়াইবা। ক্লাসে কিসু শিখাইও না কিন্তু। তোমাগো বাড়িতে এক্সট্রা ঘর আসে?

— আসে দাদা, আপনের আশীর্বাদে বৈঠকখানাটা তো এইক্কেরে হলঘরের লাখান।

— তাইলে তো কাম হাসিল করস। পরোপকারের বিপুল উদ্দীপনায় নিজের কণ্টকিত সমস্যার কথাই ভুলে গেছি। — শোনো, ওই ঘরে গ্রুপ-গ্রুপ কইরা ছেলে পড়াইবা। তুমি পাশ না করাইলে তো ট্রেনিরা পোস্টিং পাইব না। সপ্তাহে এক দিন, চাইরশো টাকা পার হেড। একশো স্টুডেন্ট হইলে চল্লিস হাজার টাকা। এক লাখ হয়তো হইল না, কিন্তু চল্লিস হাজারই বা কম কিসে? কি কও?

— কিন্তু মাস্টারগো টিউশনি নাকি বন্ধ কইরা দিসে। কাগজে পড়সি।

— সে তো ইস্কুল-কলেজের মাস্টারগো, পুলিশের টিউশনি বন্ধ করসে নাকি! না না কিসুই বন্ধ হয় নাই। আরে ভাই অ্যারে কয় আইডিয়ালাইজেশন অফ দুর্নীতি। মাস্টারদের টিউশনি আরো বাড়সে, বন্ধ হয় নাই। চোরের মতো লুকাইয়া গাঁট কাটতাসে। তুমিও তাই করবা। বিদ্যা কি দান করবা, বিক্রি করবা। তবে হ, একটু সাবধানে। গ্রুপ কইরা পড়াইবা তো, যারে কয় কোচিন। পোলাপানরা যখন পড়তে আইব তখন প্রইত্যেকের হাতে যেন একখান কইরা প্লাসটিক থাকে।

— ক্যান দাদা, প্লাসটিক দিয়া কী হইব?

— আরে এয়াও বোঝো না। তোমার ঘরে ঢোকনের আগে জুতাজোড়া প্লাসটিকে ভইরা নিজের কাসে রাখব। দরজার বাইরে এতগুলা জুতা দেইখ্যা লোকের সন্দেহ হইব না। আরে ভাই, উপকার করনের কেউ নাই। কিন্তু অপকার করনের লোকের অভাব আসে নাকি?

দিলো লাগাইয়া।

— হ, ঠিকঅই কইসেন। কিন্তু দাদা আমার ঘরের মইধ্যে বন্দুক চালানো শিখামু ক্যামনে!

— শিখাইবা না। আগে যারা বন্দুকের গুলি ছোড়ায় স্টার পাইছে, তাগো কয়ডা গুলি অপরাধীদের গায়ে লাগছে কও দেহি। আশেপাশের বাড়ির দোতলা-তিনতলায় খাড়াইয়া যারা দৃশ্য দ্যাখতাসিল গুলি লাগসে তাগো গায়। গুলি চালানোর সময় পুলিশের হাত ভয়ে থরথর কইরা কাঁপতে থাকে। শিখাইলেও যা, না শিখাইলেও তাই। ওই নিয়া তুমি মাথা ঘামাইও না।

নিত্যানন্দ কয়েক সেকেন্ড কি যেন ভাবল। মুখমণ্ডলে জলভারাক্রান্ত মেঘের আড়ালে বিদ্যুতের চমক দেখা দিল। তার পর বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে খুব কষ্ট করেই নিচু হয়ে আমার পদধূলি নিয়ে নিজের মাথায় দিল, একটু বোধ হয় জিবেও ঠেকাল। নিত্যানন্দ আমাকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে।

— জব্বর বুদ্ধিটা দিসেন দাদা, কাইল এক জায়গায় আগেই জানাইয়া রেড করসিলাম। একখান দামি ফোরেন ঘড়ি আমার ভাগে পাইসি, হেইডা আপনেরে দিমু। কইতে গেলে এক্কেরে আপনার হাতেই তো আমি মানুষ।

— এইডা কি কইলা নিত্যানন্দ! তোমারে মানুষ করনের সাইধ্য আমার আসে! লোকে কয় না, মানুষ হইলে পুলিশ হয় না, পুলিশ হইলে মানুষ হয় না।

— এয়া আপনে বিশ্বাস করেন! এক্কেরে মিছা কথা, পুলিশের মইদ্যেও মানুষ আছে।

— থাকলেই ভালো। কাঁডালের আমসত্ত্ব কি হয় না? তুমি আমারে ঘড়ি দিবা কইলা, বড়ই খুশি হইলাম। তবে ভাই ঘড়িটড়ি দেওনের কাম নাই, শুধু বাঁশখান দিয়ো না।

নিত্যানন্দ তাড়াতাড়ি দু-হাত দিয়ে দু-কান ছুঁল। — ছি ছি, এমন কথা কইয়েন না দাদা। শুনলেও লজ্জা লাগে।

— তোমাগো লজ্জা আসে তাইলে! শুইন্যা পরাণডা বরফ হইয়া গেল। আইচ্ছা, আজ চলি ভাই।

— আরে চললেন কই। এমন একখান বুদ্ধি দিয়া আমার কি উপকারডা করলেন প্রিতিদানে আমি কিসু করুম না। কয়েন তো দাদা, আপনের কি উপকার করতে পারি?

— আমার উপকার করবা? সঙ্গে-সঙ্গে আমার মস্তিষ্কের কোষে-কোষে হাজার ভোল্টের তড়িৎ প্রবাহিত হল। — সত্যিই উপকার করবা? পারবা?

— কন না কি করতে হইব। দেহি পারি কি না। আপনের আশীর্বাদে নিত্যানন্দ পাকড়াশি সূর্যরেও চাঁদ বানাইতে পারে।

নিত্যানন্দকে ফুটপাতের একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে আমার সমস্যার কথা বললাম। নিত্যানন্দ একগাল হেসে বলল — হেইডা আবার সমস্যা নাকি। আপনে দাদা আর একটা রাত এই গব্বযন্ত্রণা ভোগ করেন। কাইল সকালে গিয়া আমি এক্কেরে মুস্কিল-আসান কইরা দিয়া আসুম অনে।

আর একবার প্রণাম করে নিত্যানন্দ চলে গেল। এবার আমার কিংকর্তব্য? বিমূঢ় হলে তো চলবে না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি উলটোদিকের ফুটপাতে স্লো-সাইনে লেখা সাহা-জ প্রভিশন। লিকার শপ। দেখতে-দেখতে একটা আইডিয়া মাথায় খেলে গেল। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেলাম।

এইবার আমার সমস্যাটার কথা খুলে না বললে চলছে না।

প্রচণ্ড গরমে রাত্রে ঘুমোতে পারি না। তাপমাত্রা যখন ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেল, বাতাসে আগুনের হল্‌কা, তখন লাইফের আর কি আছে ভেবে একটা এ.সি. মেশিন কিনে আমার বেডরুমে লাগালাম। বারো বাই বারো ঘরে জোড়াখাট পাতা। ভাবলাম আমি একদিকে আর ওয়াইফ একদিকে, এ.সি-র ঠাণ্ডায় গা ডুবিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমোব। কিন্তু উপায় কি আছে? আমার দুই জোয়ান ছেলে লঙ্কা বঙ্কা বিদ্রোহ ঘোষণ করল। — না, তা হবে না, আমরা সারাক্ষণ গরমে ঘামব, ঘুমটুম হবে না, আর তোমরা বেশ মজা করে এ.সিতে শোবে। নেভার। আমরাও ঐ ঘরে শোব। বড় খাট, চারজনে দিব্যি কুলিয়ে যাবে, যখন বাচ্চা ছিলাম শুইনি? এখনকার ছেলেদের দু-চোখে ছুরি ঝলসায়। তথাস্তু। দুটো রাত বেশ আরামেই ঘুমোলাম। কি সুন্দর গায়ে জড়ানো ঠাণ্ডা। কিন্তু ঐ দুটো দিনই। কি করে যেন চাউর হয়ে গেল আমি এ.সি কিনেছি। ব্যস্, থার্ড ডে বিকেল থেকেই বাড়িতে অতিথি সমাগমের ধূম পড়ে গেল। স্বামী পুত্রকন্যাসহ পিসতুতো বোনের ফুল ব্যাটেলিয়ান, শাখা-প্রশাখা সমেত খুড়শ্বশুর, বউয়ের নন্দাই (কে জানে সে আমার কে?), ছ-মাসের বাচ্চা সমেত সপতি মাসতুতো শালী ইত্যাদি। গুনে দেখলাম কুড়িজন। কপাল চাপড়ে মনে মনে বললাম — পরম সৌভাগ্য, এত আত্মীয় কুটুম আমার।

খুড়শ্বশুর বললেন, — তুমি বাড়িতে এ.সি. লাগিয়োচো শুনে চলে এলুম বাবাজি। গরমে তিষ্টুতে পাচ্চিনেকো। দিনকয়েক থাকব ভেবিচি, বর্ষা এসে গেল বলে, তার পর ব্যাক টু দা প্যাভিলিয়ন, হা হা। তোমার শাশুড়িমাকে বললুম বিপিন আমাদের তেমন ধারা লোকই নয় কো, পরের উপ্‌গার কত্তে পেলে ও বত্তে যায়। দীর্ঘকাল হাতিবাগানে থাকা খুড়শ্বশুর হাতিবাগানি উচ্চারণে বললেন। এই খুড়শ্বশুর-ক্লাসটাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। এদের জন্মই হয় কাঠি দেবার জন্য। মিহি গলায় বলি — তা থাকুন না, কত ঘর তো পড়েই রয়েছে।

মাসতুতো শালি ছ-মাসের বাচ্চাকে কোলে শুইয়ে হাঁটু দোলাতে-দোলাতে বলল — ঘর তো পড়ে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে-সব তো নন-এ.সি। সে-ঘরে যদি থাকব তবে তো নিজের বাড়িতেই থাকতে পারতাম। যে-ঘরে এ.সি. সেই ঘরেই থাকব।

— মা লক্ষ্মী যা বোলেচো তার চারা নেই কো। ঠিক ঠিক। খুড়শ্বশুরের ফুট।

— কিন্তু বারো বাই বারো একটা ঘরে কুড়ি জন? আমার আর্তকণ্ঠ। — নিজের বাড়িতে এ.সি. লাগিয়ে নাও না।

— আমাদের তো আর আপনার মতো ব্ল্যাকমানি নেই, কী করব বলুন, গরীব গুর্বো মানুষ। দু-নম্বরিও নেই।

আমি পরোপকারী, আমার ব্ল্যাকমানি, দু-নম্বরি কারবার, আর কত শুনব। কপাল যখন মন্দ হয়-সবকিছুতেই গন্ধ হয়। করুণ চোখে তাকাই। কি কাকস্য পরিবেদনা! ভাবি কাকের যদি পরিবেদনা থাকতে পারে মানুষেরই বা থাকবে না কেন? আমার মাসতুতো শালি দেখতে ঠিক যেন পরি। বেদনা পেয়ে সে মনোকষ্ট পাক এটা কাম্য নয়। পরিদের বেদনাই তো পরিবেদনা। — থাকো, যদি থাকতে পারো থাকো। তবে একটা ঘরে কুড়ি জন...।

পিসতুতো বোন বলল — সে তুমি ভেবো না বিপিনদা, মোটে তো কুড়িজন, একটু ঠেসাঠেসি করে সে আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তেমন হলে তুমি আর বৌদি লঙ্কা বঙ্কাকে নিয়ে

ছাতে শুয়ো, ছাতে শোয়ার মতো আরাম আছে নাকি।

— আমিও তো তাই বলতে চাচ্ছিলুম। খুড়শ্বশুরের সংযোজনা।

আমার স্ত্রীকে দেখে মনে হল কথা বলার ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলেছে। ভাবনাটাও। কিন্তু ভাবতে হল আমাকেই। স্পেস, আরো স্পেস বের করতে হবে। জোড়াখাটের এক-একটার চারটে পা। দুটো খাটের আটটা পা। খাট দুটোকে উঁচু করতে হবে। প্রতি পায়ার তলায় যদি চারখানা করে থান ইট বসানো যায় তা হলে মোট ইট লাগে আট ইনটু চার মানে বত্রিশখানা। ভাগ্যক্রমে রাত ন-টা নাগাদ আমাদের এলাকায় এক ঘণ্টার জন্য লোডশেডিং হয়েছিল। রাতটাও ছিল অমাবস্যার। পাড়ায় এক প্রোমোটারের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আমার দুই জোয়ান ছেলে দুটো ঢাউস ব্যাগ নিয়ে ঝটিতি বেরিয়ে গেল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ইট এসে গেল। খাট দুটোকে চাগিয়ে তুলে প্রত্যেক পায়ার নীচে চারখানা করে থান ইট গুঁজে বেশ উঁচু করা হল। অনেকটা স্পেস বেরিয়েছে। খুড়শ্বশুরকে বললাম — আপনি ঝাঁটা নিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ুন, বেশ করে ঝাঁট দিয়ে ধুলো বের করে জলন্যাকড়া দিয়ে মেঝেটা মুছুন। তলায় সতরঞ্চি পাততে হবে। মেয়েরা আর বাচ্চারা শোবে খাটের ওপর। পুরুষেরা খাটের নীচে আর সামনে যেটুকু জায়গা আছে সেখানে।

একটা গুঞ্জন শোনা গেল। প্রথম বিদ্রোহী খুড়শ্বশুর। — না, না, আমি তক্তপোশের নীচে শোব নকো, কোনোদিন শুইচি?

— কোনোদিন কি এ.সি. ঘরেও শুয়েছেন? মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

— এতটুকুনি ভক্তিছেদ্দা নেই তোমার? আমাকে আবার ঝাঁট দিয়ে পুঁচতে বলচো, কোনোদিন এসব করিচি? শুধোও না তোমার শাশুড়িকে।

— আপনার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। আপনাকে খাটের নীচে শোয়াব না। আপনি বয়সে সবার বড়, শোবেনও সবার ওপরে।

— বাঃ বাঃ, এই তো একটা কতার মতো কতা বোলেচো বাবাজি।

— আপনি শোবেন সবচেয়ে উঁচুতে, ওই লফটে।

— লফটে? মনে হল একটা বিড়াল আর্তনাদ করে উঠল।

— কেন খারাপ কী? ট্রেনে থ্রি-টিয়ারে আপার বার্থে শুয়ে আছেন মনে করবেন। ঝাঁকুনি নেই, দুলুনি নেই, ভ্যাকুয়াম ব্রেক কষলে পড়ে যাবার ভয় নেই, তোফা ঘুম হবে।

তা, এইভাবেই শুলো ওরা। ঘরে একটা স্টিলের ফোল্ডিং মই ছিল। সেটা দিয়ে খুড়শ্বশুরকে লফটে তুলে দিলাম। ভেবেছিলাম অতঃপর ইনি কেটে পড়বেন। ধন্য আশা। কালী সিঙ্গির মহাভারত মাথার নীচে দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললেন — বাঃ, দিব্যি হয়েছে, তক্তপোশ ভেঙে চাপা পড়ার ভয় নেইকো, তবে বাবাজি রাত্তিরে যদি বাথরুম...।

— পাশেই ভেন্টিলেটর আছে দেখুন।

— অ। তা বেশ বেশ। বাবাজির সব দিকে নজর।

বলা বাহুল্য স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে আমি ছাদে শুতে গেলাম। যাবার আগে বলে গেলাম — সারারাত বন্ধ ঘরে এতজনের নিঃশ্বাস থেকে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরুবে তাতে যদি সবাই মারা না যাও তা হলে সকালে দেখা হবে। আর যদি মারা যাও তা হলে এই শেষ দেখা।

পরির মতো দেখতে আমার মাসতুতো শালি সেমিকোলনের মত শুয়েছিল। এক কলি

গেয়ে উঠল — এ দেখাই শেষ দেখা নয় গো...গুডনাইট জামাইবাবু, অলক্ষুণে কথা বলবেন না। বলেই ঋষি-মনোহর দৃষ্টিতে তাকাল। আমার স্ত্রীর দুই ভুরুর ত্রিশূল আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

সকালে উঠে দেখলাম সকলে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। আমার স্ত্রী স্পিকটি-নট্ অবস্থাতেই দুই ছেলেকে নিয়ে ছোটবোনের বাড়ি চলে গেল। আমি ডেকরেটরের দোকানে গিয়ে হাঁড়ি-কড়াই ইত্যাদি ভাড়া করে আনলাম। সেই সঙ্গে দিন-চুক্তিতে এক জন রান্নার ঠাকুর ও একজন জোগাড়ে। এরা কত দিন থাকবে ঠিক নেই তো কিছু! রাবণের ঝাড়কে চার বেলা খাবার যোগাতে হবে না! এতটুকু ত্রুটি হলেই দিকে-দিকে ছুটে যাবে নিন্দার এস.ও.এস.। মলমূত্র ত্যাগ করার সময়টুকু ছাড়া কেউ এ.সি. ঘর থেকে বেরোয়ই না। খুড়শ্বশুর শুধু মই দিয়ে নীচে নেমে আসেন। সাধারণত পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের মধ্যে সখ্য-সদ্ভাব থাকে না। আমার ক্ষেত্রে এখন গলাগলি। একমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন ট্রান্সফর্মার বার্স্ট করে একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা কারেন্ট না থাকে। ভগবানও তেমনি। এক মিনিটের জন্যও লোডশেডিং হল না। নন-স্টপ এ.সি. মেশিন চলছে। মেশিনটাও তো বিগড়ে যেতে পারত! কপালে লিখিতং ঝাঁটা কোন শালা কিং করিষ্যতি। তবু তো বুদ্ধি করে টেলিফোনের তার সকেট থেকে খুলে রিসিভারটাকে ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে মুড়ে টয়লেটে সিস্টার্নের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম। নইলে এই তিন দিনেই আমার টেলিফোনের বিল উঠে যেত দশ হাজার টাকা। ওরা অনেক খুঁজেছে। খুড়শ্বশুর তো রীতিমতো বিক্ষুব্ধ।

— এ কেমনধারা কতা বাবাজি, টেলিফোনের তার রয়েচে, রিসিভার নেইকো।

— আমাকে রিসিভার দেয়নি।

— ফোন করব বলে লুকিয়ে রাখোনি তো। অ্যাতো কেপ্পন হলে চলে।

মনে-মনে বলি, আজ রাতে তোমাকে লফটে তুলে দিয়ে স্টিলের ফোল্ডিং মইটাও 'নুকিয়ে' রাখব।

এইভাবে তিন দিন, তিন রাত কাটল। ফোর্থ ডে-তে বিকেলে নিত্যানন্দর সঙ্গে দেখা। সে কথা আগেই বলেছি। নিত্যানন্দ চলে যেতে আমি রাস্তা পেরিয়ে সাহা-জ লিকার শপে গিয়ে বেঁটে ও চ্যাপটা এক বোতল হুইস্কি কিনলাম। না নেশার জন্য নয়। আমি মদ্য কিংবা ধূম্র কিছুই পান করি না। বোতলের ছিপি খুলে তলায় পাঁচ মিলিমিটার মতো মাল রেখে বাকিটা ভ্যাটে ফেলে দিলাম। তার পর রাস্তার একটা টিউবওয়েল থেকে বোতলের ঘাড় পর্যন্ত জল ভরে নিলাম। একটু গন্ধ থাক। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বোতলের ছিপি এঁটে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। বাড়ি ঢুকে ছিপি খুলে খানিকটা জল খেয়ে, বাঁ-হাতে মদের বোতল নিয়ে অতি নাটকীয়ভাবে টলতে-টলতে আমার অতিথিদের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। মাঝে-মাঝে হেঁচকি তুলে (সিনেমায় মাতালকে যেমন দেখেছি) জড়ানো গলায় কথা বলতে লাগলাম। বুঝতে পারছি ওভার-অ্যাকটিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কি করব। প্রথমেই খুড়শ্বশুরের মাথায় জোরে একটা চাঁটি মেরে বললাম — লো ইয়ার, কুছ তো পিয়ো (হেঁচকি)।

খুড়শ্বশুর তাড়াতাড়ি খাটের তলায় ঢুকে পড়লেন। ওখান থেকেই দ্বিমাত্রিক কণ্ঠে বললেন

— তুমি মদ খেয়োচো বাবাজি, ছি ছি।

— চোপ শ্লা, নিজের পয়সায় খেয়েছি (হেঁচকি), কারো বাপের পয়সায় খাইনিকো। সত্যি

বলছি মাইরি, এমনিতে খাই না, যে-দিন খুন করি সেদিন তিন বোতল মাল খাই। দু-বোতল রাস্তায় মেরে দিয়েছি, এক বোতল বাড়ির লোকেদের জন্য নিয়ে এলাম (হেঁচকি)। আত্মীয় কুটুমদের না দিয়ে খেতে পারি। ওই যে, কে বলেছে না, ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে। অন্নপান, মদ্যপানটাও বুঝলে না বাওয়া সকলের সঙ্গে ভাগ করে না খেলে ঠিক জমে না। সবাই মিলে খাব, ছ-মাসের বাচ্চাটাকেও একটু দিও। কথা একটু বেশি জড়ানো হয়ে যাচ্ছে। — নাও নাও চালাও।

খাটের তলা থেকেই খুড়শ্বশুরের আর্তনাদ — হ্যাঁগা, শুনচো, এ যে দেখছি বায়োস্কোপের মাতালের মতো। সাবধানে থেকো, কখন কি করে বসে ঠিক নেই কো।

আমার পরির মত শালি ভয়ে সিঁটিয়েছিল। তার দিকে চেয়ে গেয়ে উঠলাম — 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানি।' সঙ্গে-সঙ্গে ওর স্বামী উঠে দাঁড়িয়ে বলল — খবরদার, একটি চড়ে মুখের জিওগ্রাফি পালটে দেব রাস্কেল।

— তুমি বাওয়া কোন ম্যাক্‌নামারা? দাঁড়াও তোমার হিস্ট্রিটা পালটে দিচ্ছি। রান্নাঘর থেকে বড় ছুরিটা আনি। রান্নার ঠাকুরটা টাকা চুরি করছিল (হেঁচকি)। ওটাকে খুন করে গলির মুখে ফেলে রেখে এসেছি। আরো গোটাদুয়েক খুন না করলে নেশা জমবে না। একটু অপেক্ষা করো ব্রাদার।

আমি টলতে-টলতে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। ফিরে এসে যা দেখব বলে আশা করেছিলাম তাই দেখলাম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। আমিও বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। চেঁচিয়ে বললাম —যদি পুলিশ আসে, কেউ বলবে না যে আমি খুন করেছি। আমার হাতে কিন্তু তেইশটা ভাড়াটে গুণ্ডা আছে, ঝাড়ে-বংশে সব সাফ করে দেবো। দরজা কিন্তু বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। ভালো করে ঠাণ্ডা খাও।

বোধহয় খাটের তলা থেকেই খুড়শ্বশুরের গলা ভেসে এল — পুলিশকে কিচ্ছু বলবো নাকো বাবাজি, কিন্তু আমার যে বার বার বাদ্‌রুম যাবার দরকার হবে। পেটটা কেমন অদিশে...।

— এই বয়সে এত 'পাঁটার মাংস আর নুচি' সাঁটালে হবে না। লফটের মাথায় হুকের সঙ্গে একটা বেডপ্যান ঝুলছে দেখুন। টিসু পেপার নেই, খবরের কাগজ দিয়েই চালিয়ে নিও। আমি বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছি। দরজার তলা দিয়ে এনটারোফ্রুইনলের একটা স্ট্রিপ গলিয়ে দিয়ে বললাম — এই ওষুধটা আধঘণ্টা পর পর একটা করে খেয়ে নিয়ো বাওয়া। জড়ানো গলাতেই বললাম।

— 'আমরা?' একসঙ্গে বৃন্দকণ্ঠে কোরাস।

এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আমি চলে এলাম। খিদে পেয়েছে। ফ্রিজ খুলে দেখি ভেতরে ঠাণ্ডা শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। রান্নাঘরেও ইঁদুরে খাবার মতো কিছু নেই। নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে বিবিধ সুখাদ্য খেয়ে তেমনি নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে এলাম। নতুন বউয়ের মতো লাজুক-লাজুক হাওয়া দিচ্ছিল। ছাদে শুয়ে তোফা ঘুম লাগালাম।

সকাল আটটায় এল নিত্যানন্দ। একেবারে ফুল ইউনিফর্মে উইথ রিভলবার। সঙ্গে প্লেন ড্রেসের দু-জন পুলিশ। আসলে ওরা পুলিশ-টুলিশ কিছু নয়, নিত্যানন্দর দুই শালা-কানাই আর নিতাই। আমি বাড়ির বাইরে পায়চারি করছিলাম।

— দ্যাখসেন তো দাদা, এক্কেরে ঠিক টাইমে আঁইছি। এয়ারেই কয় পাংচুয়ালিটি, এক্কেরে

ব্রিটিশ পাংচুয়ালিটি। আসামিরা কই দাদা।

গতরাত্রির বৃত্তান্ত নিম্নকণ্ঠে নিত্যানন্দকে বললাম। হাড়ে শ্যাওলাধরা পুলিশ অফিসার। নিমেষে সব বুঝে নিল। দু-হাতে ভুঁড়ি চেপে ধরে (বেল্ট না ছিঁড়ে যায়) একচোট হেসে নিয়ে বলল — কিস্‌সু ভাইব্‌বেন না, সব ঠিক কইর‍্যা দিতাছি। আপনি আমারে কিন্তু চেনেন না, আমিও আপনেরে এক্কেরে চিনিই না, বোঝলেন? ভাঁজখোঁজ দিবেন না।

নিত্যানন্দ এ.সি. ঘরের দরজা বাইরে থেকে খুলে পাল্লায় দমাদম চাপড় মারতে লাগল। ভেতর থেকে সমবেত ভয়ার্ত আর্তনাদ — কে? কে?

— ভিতরে কারা আসেন? দরজা খোলেন, আমরা পুলিশ, দরজা না খোললে গুলি চালামু কিন্তু কইয়া দিলাম।

খুড়শ্বশুরের গলা শোনা গেল — দরজা খুলো নাকো, এ পুলিশ নয়, জামাই বাবাজির কারসাজি। খুললেই ছুরি বসিয়ে দেবে। পুলিশ কখনো বাঙালভাষায় কতা কয় শুনেচো?

— এখনো তো অনেক কিসুই শোনেন নাই, দরজা খোলেন। কনেস্টোবল নিমাই গুলি চালাও। ওয়ান...টু...

শালি, জামাই চিৎকার করে উঠল — খুলছি খুলছি, গুলি করবেন না, ছ-মাসের বাচ্চা আছে।

দরজা খুলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে নিত্যানন্দের মুখে অসাধারণ গাম্ভীর্য। — একটা লোকরে ছুরি মাইর‍্যা খুন করা হইসে। ডেড-বডি গলির মোড়ে ভ্যাটে পাওয়া গেছে। বাতাসে ভাইস্যা-থাকা রক্তের ডি.এন.এ. পরীক্ষা কইর‍্যা ট্রেস করসি, খুনটা এই বাড়িতেই হইসে। কেডা খুন করসে কয়েন তো?

বাতাসে রক্তের ডি.এন.এ. শুনে ওদের মনোবল চুরমার হয়ে গেল। সমবেত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, — ওই লোকটা, ওই লোকটা খুন করেছে স্যার। নিজে বলেছে আমাদের।

— উঁহু, একা করতেই পারে না। একটা সঙ্গী আছিল। একা ডেড বডি লইয়া ভ্যাটে ফ্যালন যায়? আপনেরাও কেউ-কেউ হাত লাগাইসেন। কাম, কাম, কইয়া ফ্যালেন।

খুড়শ্বশুর প্রায় কেঁদে ফেললেন। — না স্যার, আমরা কেউ খুন করিনি কো। খুন করেচে ওই বিপিন। এখন কেমন ভেজা বেড়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখুন।

— আপনে যে বড় শুকনা বিড়াল দেহি। বহু নটোরিয়াস খুনির চেহারাই আপনের মতো চামচিকা-মার্কা। কনেস্টোবল নিমাই, দেখো তো জুল্লু মিয়ার ফেরারি খুনির চেহারার লগে এই লোকটার সাইড থিকা মিল দেখা যায় না?

কল্পিত কনেস্টবল ওরফে শ্যালক নিমাই পকেট থেকে কী একটা কাগজ বের করে হাতের তালুতে লুকিয়ে খুড়শ্বশুরের দিকে তাকাল। — অবিকল স্যার, জগা ওরফে পিল্লাই ওরফে গজনু ওরফে রাম সিং ওরফে শের খাঁ ওরফে...।

— থাউক থাউক, আর ওরফে দিয়া কাম নাই, ধরো এইটারে। ওই দিকে বসাইয়া রাখো। পালানোর চ্যাষ্টা করলেই গুলি করবা। আর অ্যারেও লইয়া যাও। বলে নিত্যানন্দ আমাকে দেখাল।

— নিতাই। নিত্যানন্দ আবার হাঁক পাড়ল। অন্য শালাটি তাড়াতাড়ি কাছে দাঁড়াল। — এগো পরনের কাপড়গুলি রাইখ্যা সঙ্গের টাকা-পয়সা, আংটি, গয়নাগাটি, মাদুলি, ব্যাগ,

সুটকেশ সব সিজ করো আর একটা সিজার লিস্ট বানাও, প্রোডিউস করতে হইব না। তবে এয়াও আপনাগো কই, এই সব জিনিস আর ফিরত পাওনের আশা করবেন না! পুলিশের চোখে বুড়াছুড়া, ছয় মাসের বাচ্চা কেউই সন্দেহের ঊর্ধ্বে না। আপনারা প্রেত্যেকে নিজের নাম-ঠিকানা আমার জুনিয়ার ওফিসারের কাছে লিখাইয়া এই মুহূর্তে বাড়ি ছাইড়া চইলা যান গিয়া। আমি বাড়ি সিল কইরা দিমু। আর শোনেন, পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে, দূর ছাই, থানায় আমারে না জানাইয়া কেউ কইলকাতা ছাড়বেন না। পালানোর চেষ্টা করবেন না।

কেউ জিজ্ঞাসা করল না, কোন থানা?

আমি খুড়শ্বশুরকে দেখিয়ে উদার কণ্ঠে বলি — স্যার, খুনটা তো আমিই করেছি, এই বৃদ্ধ মানুষটাকে আর আটকে রাখবেন কেন, খুব পেটের ট্রাবল চলছে।

— ক্রিমিনালগো পেটের ট্রাবল হয় না, চুপ করেন। এতগুলি ওরফে, তারে ছাড়তে কন! খুব যে সাউকারি করেন, আপনে জামিন থাকবেন?

— নিশ্চয়ই থাকব স্যার। আমার গলায় ততোধিক উদারতা।

— ঠিক আছে নিতাই, এই লোকটার আংটি-টাংটি যা আছে লইয়া, নাম ঠিকানা রাইখ্যা ছাইড়া দাও। যান, নিজের বাড়িতেই থাকবেন, পলাইলে কিন্তু রক্ষা নাই। আপনেরাও সকলে আসেন গিয়া।

এক মিনিটের মধ্যে বাড়ি খালি। ত্রিসীমানায় কাউকে দেখা গেল না। নিত্যানন্দ একগাল হেসে বলল — দ্যাখলেন তো দাদা, পুলিশও মানুষ।

— হ, দ্যাখলাম তো। তুমি আমার খুব উপকার করলা নিত্যানন্দ। কমু কি ভাই, চিনিগুলা পর্যন্ত মুঠা-মুঠা কইরা খাইছে। নুনও বাদ দেয় নাই। খুব উপকার করলা।

— সেই সঙ্গে আমার নিজের উপকারও কিছু কম হইল না। নিত্যানন্দ খ্যাক-খ্যাক করে হাসতে লাগল।

পূর্বপুরুষের কামনা

সুব্রত সেনগুপ্ত

বিকেলে বাড়িতে কেউ থাকবে না আশা করেই জয়িতাকে আসতে বলেছিলাম। অন্যসময় ও এলে, এসে গল্প-টল্প করলে অবশ্য অসুবিধে নেই। ওকে আমার বাড়ির সবাই চেনে। কিন্তু আজ ফাঁকা বাড়িতে আমরা একটু প্রেম-ট্রেম করব। কাল ও বালুরঘাটে মামার কাছে চলে যাবে। আবার আসবে পুজোর ছুটি কাটিয়ে। তাই যাওয়ার আগে...

জয়িতা ছ-টার একটু পরে এল। কানে বড়-বড় দুটো কানপাশা। আসল, না নকল সোনার জানি না। ওর ব্লাউজ আর শাড়িতে একইরকম নকশা। দুই স্তনের মাঝখানের খাঁজে বসানো ঝকঝকে একটা লকেট। জয়িতা আমার মুখোমুখি সোফায় বসল। লক্ষ করলাম, কথা বলতে-বলতে ও আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছে।

ওকে কোনো ভূমিকা না-করে আমি শুধু আসতেই বলেছি। জয়িতারও আসা-বসা-কথাবার্তার ধরন এরকম যেন আলাপ-আলোচনা চালানোই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু দুজনেই জানি, এখন আমি প্রেম দেবো, জয়িতাও এসেছে আমার কামনা গ্রহণ করতে। হঠাৎ মজা করবার একটা ইচ্ছে আমার মাথায় ঢুকে পড়ল — আমি নিরীহের মতো চুপ করে বসে থাকি। যেন জরুরি কথা-টথা বলাই এখন আমার কাজ। খুকি, তুমি বার বার আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছ। বুঝতে চাইছ, আমার মতলবটা কী? — দাঁড়াও বোঝাচ্ছি!

আমার হাতের নাগালের মধ্যে বসে আছে আমার কামিনী। আমি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করি, বালুরঘাটে এবার ধানের চাষ কেমন?

অপ্রস্তুত জয়িতা শব্দ করে, অ্যাঁ...

আবার প্রশ্ন করি, বালুরঘাটে এবার বিঘা-প্রতি কত মন ধান হবে?

— ধান? কে-ন?

— ওমা ধান কী জিনিস, তুমি জানো না!

— জানব না কেন?

— বলো তো কত ধানে কত চাল?

— তুমিই জানো।

— তোমারও জানা দরকার। তোমার মামার লাইফ-ইন্সিওরেন্সের টাকা পেতে কি ঝামেলা হচ্ছিল, মিটেছে?

— আমি কী করে জানব!

— বাঃ তোমার মামা... তোমাকে জানতে হবে না?

— জানি না তো কী করব? আগে যাই। গিয়ে সব জেনে তোমাকে চিঠি লিখে জানাব।

— আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় আগামী আর্থিক বছরে বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় পাট বাংলাদেশের পাটের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে?

বিরক্ত জয়িতা এবার বলল, তুমি কী আরম্ভ করেছ, শুনি?

— বাঃ এসব দেশের সমস্যা।

জয়িতা বলল, তোমার মন্তু।

জয়িতার মুখে অদ্ভুত হাসি। সে উঠে এসে আমার গা-ঘেঁষে বসল। বসে আহ্লাদি গলায় ডাকল, এ-ই।

একটু সরে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে গো?

— তুমি তখন থেকে আমাকে আজেবাজে প্রশ্ন করছ কেন? এরকম করলে আমি কিন্তু চলে যাব।

— ঠিক আছে, আর প্রশ্ন করব না। তা হলে, দাবা খেলবে?

— না।

জয়িতার মুখ থমথমে হয়ে উঠছে। কালো চুল পাখার বাতাসে উড়ছে। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, মাসিমারা কখন ফিরবেন?

বললাম, দেরি আছে।

— তোমার শরীর খারাপ লাগছে? মাথা ধরেছে?

— না তো?

— তবে?

— তবে কী?

জয়িতা আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, তবে তোমার কী হয়েছে?

— কিছু হয়নি তো।

প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী মেয়েটার মুখ দেখে বড় মায়া হয়। তবু নিজেকে বলি, হে বীর, সাহস অবলম্বন করো। জয়িতা বলল, তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলছ না। আমি আসায় তুমি খুশি হওনি?

— কে বলেছে তোমাকে? এসব আবার কী কথা?

— হওনি তো? তুমি আমার সঙ্গে কীরকম করছ।

মনে মনে বলি, দাঁড়াও, অন্যদিন এমন ভাব দেখাও যেন প্রেমের ব্যাপারে যত মাথাব্যথা, উৎসাহ, আগ্রহ আমারই। যেন তুমি বেচারা-আমাকে খুশি করতেই যা কিছু করছ ...করতে দিচ্ছ...। আজ তোমাকে এমন অস্থির করে তুলব....

জয়িতা তার শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ও কি সত্যি রাগ করে চলে যাবে না কি?

জয়িতা বাড়ির বাইরের দিকে নয়, ভেতরের দিকে ধীর পায়ে হেঁটে যেতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে ও? কোথায় যেতে চাইছে?

আমি উঠে ওর পেছনে-পেছনে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম। জয়িতা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার অনুসরণ করা দেখল, কিছু বলল না।

কামিনী চলেছে। তার দেহ দুলছে। ঘন কালো চুলের রাশ দুলছে। সে এক বার ডান দিকের ঘরে ঢুকছে। এক বার বাঁ দিকের ঘরে। ঢুকছে, আবার বেরিয়ে আসছে। বুঝতে পারছি, খেলাটা আমার হাত থেকে ক্রমশ ওর হাতে চলে যাচ্ছে। মেয়েদের কি সাধে 'শক্তি' বলেছে।

আমার মতো প্রেমকাতর লোক কি পারে শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে?

জয়িতা হঠাৎ আমাদের পুরনো ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠেলতে জীর্ণ দরজা শব্দ করে খুলে গেল। ভেতর থেকেও একটা শব্দ পাওয়া গেল। বোধ হয় ইঁদুরের পাল ছুটে পালাচ্ছে। এ-ঘরে আমরা সাধারণত ঢুকি না। জয়িতা ঢুকে পড়ল। অগত্যা পেছনে-পেছনে আমি।

চার পাশে আরশোলা ফরফর করছে। ইঁদুর ছোটাছুটি করছে। ঘরময় ঝুল আর মাকড়সার জাল। প্রায় অন্ধকার ঘরের মাঝামাঝি জয়িতা — এলোকেশী দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকের আঁচল কখন খসে পড়েছে। আমি সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে হলুদ আবছা আলোয় ঘর যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠল। ঘরের দেয়ালে আমার পূর্বপুরুষদের বিশাল-বিশাল প্রতিকৃতি। পুরনো আসবাব, বইপত্র, নানা জিনিসে ঠাসা ঘরের অদ্ভুত আলোয় তাঁরা যেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

দুর্বল গলায় আমি জয়িতাকে ডাকি, অন্য ঘরে চলো জয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না।

জয়িতা আমার কথার উত্তর দিল না। তার মুখে কীরকম রহস্যময় হাসি। কোণে পড়েথাকা একটা ছবি সে তুলে নেয়। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখি। ছবিটা দশমহাবিদ্যার। অসম্মত শিবকে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য করতে সতী যে দশরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

জয়িতা ছবিটা মুছে দেয়ালের এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে। আবার একটা জিনিস তোলে। দেখে। তার পর রেখে দেয়। এবার ওর হাতে আরেকটা ছবি। শৌখিন ফ্রেমে বাঁধানো। উঁকি মেরে দেখি, ছবিটা আমার ঠাকুরদার। যৌবনের ছবি। মুখখানা ভারি কোমল আর সুন্দর। জয়িতা বলে উঠল, আহ্ হিরো! প্রেম করতে হয় এরকম লোকের সঙ্গে।

বিরক্ত হয়ে বললাম, কী যা-তা বলছ! ওটা আমার ঠাকুরদার ছবি।

আমার কথা গ্রাহ্য না করে জয়িতা প্রথমে আঁচলে তার পর তার মূল্যবান বুকে ঘষে-ঘষে ছবির কাচ পরিষ্কার করতে লাগল। পরিষ্কার করে হঠাৎ সে ছবিটাতে চুমু খেতে লাগল। থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, জয়িতা, বড্ড বাড়াবাড়ি করছ কিন্তু... কারো বাবা-ঠাকুরদার সঙ্গে... তাঁদের নিয়ে এরকম করা অসভ্যতা।

নির্বিকার মুখে জয়িতা বলল, আমি তো খারাপ কিছু করিনি। আদর করছি। কী নাম ছিল গো ওঁর?

গলায় বিতৃষ্ণা নিয়ে বললাম, নরেন্দ্রনাথ।

— কী সুন্দর নাম! আমি নরেন্দ্রনাথের প্রেমে পড়ে গিয়েছি!

জয়িতা এইসব অপ্রত্যাশিত কথা বলে। বলতে-বলতে ছবিটা ওর দুই স্তনের ওপর চেপে ধরে। আবার তুলে ধরে চুমু খেতে থাকে।

আমি কী করব বুঝতে পারি না। নিরুপায় হয়ে বলি, এক জন মৃত লোক নিয়ে...

ও বলে, মৃত তো কী হয়েছে? এক সময় তো বেঁচে ছিলেন, যুবক ছিলেন। ছবি দেখে তো বোঝা যায় না, মনেও আসে না, যে-তরুণের ছবি, সে পরে বৃদ্ধ হয়েছে, মারাও গেছে।

আমি বলি, ঠাকুরদা কখনো বুড়ো হননি। হতে হয়নি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরেই মারা গেছেন।

জয়িতা আমার কথা মন দিয়ে শোনে। তার পর শান্ত গলায় বলে, অল্প বয়েসে মারা গেছেন। তার মানে অতৃপ্ত কামনা রেখে চলে গেছেন। জানো তো, মানুষের কামনা-বাসনা-কল্পনা সব পৃথিবীতে থেকে যায়। নরেন্দ্রনাথের কামনা হয়তো এ-ঘরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা আরশোলা আমার গা-বেয়ে উঠছে। গা-ঝাড়া দিতে সেটা আমার গালে উঠে আসে। হাত দিয়ে সেটা ফেলতে গিয়ে দেখি, আমার গালে-নাকে নোংরা ঝুল লেগে আছে। পায়ের পাতার ওপর দিয়ে ইঁদুর দৌড়ে যায়। বুকের কাছে লেগে আছে একটা ছেঁড়া মাকড়সার জাল। ধুলোয় দাঁত কিরকির করছে। জয়িতার মুখে-বুকেও ঝুল, মাকড়সার জাল। কিন্তু ওর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর ওপর থেকে সরিয়ে নিতেই চোখ পড়ল আমার মৃত আত্মীয়দের ছবির ওপর। তার মধ্যে আমার ঠাকুরদা নরেন্দ্রনাথ দেয়ালের ছবি থেকে আমার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন। কেন জানি না, আমার গা ছমছম করে উঠল। এ-ঘরে যেন শ্বাস নেয়ার উপযুক্ত বাতাস নেই। এখানে চার দিকে মৃত মানুষর ছবি। আর সর্বত্র অযত্নে ছড়িয়ে আছে, স্তূপ হয়ে পড়ে আছে সেইসব মৃত মানুষের ছবি। আর সর্বত্র অযত্নে ছড়িয়ে আছে, স্তূপ হয়ে পড়ে আছে সেইসব মৃত মানুষের ব্যবহৃত অস্থাবর সম্পত্তি। এইসব আসবাব, বাসনপত্র, বই হয়তো একসময় এই মৃতদের খুব প্রিয় জিনিস ছিল। এই ঘরই বা আগে কী কাজে ব্যবহার করা হত, কে জানে?

এই ঘরে হয়তো কারো শেষনিঃশ্বাস পড়েছে। কেউ এখানে প্রথম চোখ খুলেছে। কারো যৌবনের রমণীয় দিনগুলি এই ঘরে, এখানে কেটেছে। হয়তো — হয়তো নরেন্দ্রনাথই আমার বাবার গর্ভধারিণীর সঙ্গে এ-ঘরে নিশিযাপন করেছেন। তার পর অতৃপ্ত নরেন্দ্রনাথ অকালেই চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন এই ঘরে, আমি জানি না। কিন্তু যাঁরা এখানে ছিলেন তাঁদের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এ-ঘরের দেয়ালে, মেঝেতে, জিনিসপত্রে — সর্বত্র। নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর কামিনীর মধ্যে চুম্বন বিনিময়ে, আলিঙ্গনে, মিলনে হয়তো এ-ঘরের বাতাস একদা পুলকে-লজ্জায়-অনুরাগে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। — আহ্ কী ভাবছি এ-সব? জয়িতাই এ-সবের জন্য দায়ী। নরেন্দ্রনাথের সেই ছবি বুকে চেপে ধরে মেয়েটা ঘরের মাঝখানে আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তবে কি নরেন্দ্রনাথ — আমার পূর্বপুরুষ — আমার পিতামহ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন? ছবি নাকি মিথ্যে বলে না। কিন্তু এই ছবি যে, এক-একদা যুবকের ছবি ধরে রেখেছে, তাঁকে চিরযুবক করে রেখেছে — তা কি মিথ্যে নয়।

কিন্তু...কিন্তু এই যে আমি এক যুবক — আমার এখনকার কোনো ছবিও তো একদিন মিথ্যে হয়ে যাবে? আমি কি সে-কথা কখনো ভেবে দেখেছি? নরেন্দ্রনাথও নিশ্চয় কখনো ভাবেননি। আমার কোনো উত্তরপুরুষও হয়তো এভাবে আমার ছবি দেখে আমার মিথ্যা-যৌবনের কথা ভাববে।

জয়িতার হাত থেকে আমি ছবিটা ছিনিয়ে নিই। জয়িতা নরেন্দ্রনাথের ছবি উদ্ধারের জন্য আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর ভারী স্তনের প্রবল চাপে, উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমার রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে। আমি ছবি ছেড়ে দু-হাতে জয়িতাকে আঁকড়ে ধরি। জয়িতা বাধা দেয় না। কিন্তু আমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকেও নরেন্দ্রনাথের ছবিতে চুমু খেতে থাকে।

সন্দেহ নেই নরেন্দ্রনাথ আমার চাইতে সুন্দর পুরুষ ছিলেন। — কিন্তু এ কি পাগলামি!

আমাকে আমার প্রয়াত পিতামহকে ঈর্ষা করতে হবে? জয়িতা হঠাৎ এক হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, তোমার চোখ দুটো না, একেবারে নরেন্দ্রর মতো!

আমি কী বলব বুঝতে পারি না। জয়িতা আমার থুতনিতে আঙুল রেখে বলে, তোমার নাক-চিবুকও নরেনের মতো। তুমি আমার নরেন। তোমাকে 'নরেন' বলে ডাকব, কেমন?

কিছুক্ষণ আগে জয়িতা বলেছিল, মানুষের কামনা-বাসনা পৃথিবীতে থেকে যায়। জয়িতা বলেছিল...

নরেন্দ্রনাথের রক্ত আমার জন্মদাতার দেহ বেয়ে আমার শরীরেও প্রবেশ করেছে। রক্তের সঙ্গে-সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা-কামনাও...?

জয়িতা আদরের গলায় আমাকে ডাকে, নরেন?

আমি ভেতরে-ভেতরে কাঁপতে থাকি।

পাথরের পরি

শচীন দাশ

পা দু-খানা ধবধবে। তাতে চামড়ার চটি একটা। কালো রঙের। পেছনে ফিতেও আছে। ফিতে দুটি দুই গোড়ালিকে জড়িয়ে ধরে এসে পায়ের পাতার ওপর ফুল তুলেছে। তারই ওপরে চোখ-ধাঁধানো জমকালো শাড়ি একখানা। নিতম্বকে পেঁচিয়ে ঘুরে ফিরে সুগোল স্তনজোড়াকে আড়াল করে পিঠের ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এবং সেখানেই একটা চামড়ার ব্যাগ। হাতের মুঠোয় ধরা। ফলে হাতখানা কনুই ভেঙে ওপরের দিকে। অন্য হাতটি নীচে নেমে এসে তার সুদৃশ্য নরম আঙুলে তুলে ধরেছে কুঁচিটি। অগত্যা কুঁচি যেমন দুলছে, পা-দুটিও তেমন চলছে। দ্রুতলয়ে। প্ল্যাটফরম পার হয়ে এসে এদিকে নেমে।

কিন্তু নামলেও তখনও দেখেনি মান্য। দেখল একবারে শেষ সময়ে। ট্রেন চলে যাবার পরেও প্ল্যাটফরমের বাইরে বেরিয়ে এসে যখন এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি। কে ও, পরি না?

মান্য উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরে ওর ইলেকট্রিকের মতো কিছু একটা। ভেতরটা ছুঁয়ে যেন চলে যাচ্ছে। সেই যে সেবারে কাজ করতে-করতে খোলা ফ্যানের তারে হঠাৎই যেমন হাত পড়েছিল মান্যর।

মান্য এগিয়ে যায়। পায়ে-পায়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ায়।

এ-স্টেশনে ট্রেন তেমন দাঁড়ায় না। সারাদিনে ওই যা দু-চারখানা। হু হু করে এসে নিঃশব্দে থেমে দাঁড়িয়েই তারপর আবার ঝাঁ-চকচকে লাইন ধরে ছুটে যায় নদীর দিকে। আবার যখন ফিরছে তখন কখনো দাঁড়ানো, কখনো বা আবার হুঁউশ করে চলে যাওয়া। ফলে লোকজন নেই তেমন একটা। ওই ট্রেন এলেই একটু যা গমগমে। এক-আধটু নামা ওঠা। হইচই। তারপরেই আবার শুনশান। শূন্য।

এ পরি—?

বাইরে বেরিয়ে এসেই গলা তুলল মান্য। একবার এগিয়েও গেল দ্রুত পায়ে।

তুই এখানি! মান্য অবাক। থমকে দাঁড়িয় পরিকেই দেখছে তখন চোখ তুলে।

পরি হাসছে।

এই এলাম। আসা তো আর হয় না?

তা না হয় বুঝলাম... কিন্তু নেমে ঝে হনহন করি চইলে যাচ্ছিস? একবার তো তাকাবি দোকানের দিকে—

বলতে বলতেই আচমকা থেমে যায় মান্য। পরির হাসিমুখে একটু ঢেউ খেলে। ভুরু দুটির মাঝে সরু একটা ভাঁজ।

দোকান! কোথায় দোকান! কার? পরি অবাক।

মান্যর গলায় অভিমান, কার আবার। নিজিই করিছি। গাঁ-গঞ্জের খোঁজ তো আর রাখলি না?

কী করে রাখব বল!

চোখ ঘুরিয়ে, চোখের তারা নাচিয়ে, মান্যর চোখেই তখন আবার চোখ রাখছিল পরি।

আমি কী আর এক জায়গায় থাকি। সারা বছরের বায়না—

তা এখন এলি ঝে!

মান্যর বুকে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় হাজারো প্রশ্ন।

পরি হাসল আবারো।

হঠাৎ করে ছুটি পেয়ে গেলাম। ছুটি তো মেলে না সহজে—

এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে পরি হঠাৎই নিঝুম।

ভ্যান পাব না এখন?

পাবি। তবে ছাড়তি দেরি হবে। প্যাসেঞ্জার নেই। আবার ছ'টা চল্লিশের গাড়িখানা এইসে ঢুকলি...

ও বাবা, ততক্ষণে তো সন্ধে। তা হলে হেঁটে যাই—

হাঁটবি!

মান্যর চোখ সরেছে তখন পরির পায়ের দিকে। শাড়ির দিকে। এবং নরম শরীরের আশেপাশে। একটা ফিকে সুগন্ধ উড়ে আসছে না পরির দেহ থেকে! অনেকটা ওই বাসি যুঁইয়ের মতো। পরি কি কোনো সুগন্ধি মেখেছে!

খুঁজছিল মান্য।

পরি বলল, না হেঁটে আর উপায় কী! কতক্ষণ আর বসে থাকব! তুই যাবি?

মান্য এক পায়েই রাজি, ঝেতে পারি। কিন্তু একটু দাঁড়াতি হবে—

কেন?

দোকানে ছেলেটারে বইলে আসি—

আয় তা হলে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমে আকাশ, আকাশের নীল প্রান্ত ও সূর্যাস্তের রঙ গায়ে মেখে নিতে-নিতে চোখ নামিয়ে যখন ফসলের ঘ্রাণ নিয়ে দূরে নদীবাঁধে চোখ রেখেছে ঠিক তখুনি আবার ফিরে আসে মান্য।

চল যাই। তবে ভ্যানের রাস্তায় নয় কিন্তু—

নয় কেন? পরির গালে শেষ বিকেলের রঙ। রঙে আর আলোয় জাফরি কেটেছে।

মান্য হাসে, আরিব্বাউ ও রাস্তায় হাঁটলি কি আর নটার আগে পৌঁছুতি পারবি?

তবে চল। এদিকে সটকাট হবে নিশ্চয়ই—

হবেই তো। সাত মাইলের রাস্তা আমরা এক ঘণ্টায় মেইরে দেব।

মান্য পা বাড়াল আস্তে-আস্তে। অগত্যা পরিও পাশাপাশি। উঁচুনিচু পথে সাবধানে এগিয়েছে।

কতদিন পরে এলি বল তো? মান্যর চোখ অনায়াসেই ঘুরছে এখন পরির চোখে।

কিন্তু পরি চোখ সরাচ্ছে অন্যদিকে। পরির চোখে গোপন জল। জলটা লুকোবার জন্যই সে চোখের পাতা ফেলল দু-চার বার।

মান্য বলল, ছ-সাত বছর তো হবেই— না রি?

পরি মাথা নাড়ে, কী জানি—

বলল। বলতে গিয়েই মনে পড়ল হঠাৎ সেই লোকটির কথা। মনে পড়ল সেই সন্ধের ঘটনাটা। যাত্রা দেখতে গিয়েছিল সেদিন। মার সঙ্গে। পাশেই ছোটভাই ইন্দ্র। ইন্দ্রর পাশে গাঁয়েরই আরও দু-চারঘর। উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে। এই বুঝি শুরু হয়-হয়।।

আসরে যন্ত্র পড়েছে। গানও শুরু হয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তেই এখন মঞ্চে ঢুকে পড়বে নিমাই। আজ তাঁর গৃহত্যাগের দিন। গোটা নবদ্বীপকে কাঁদিয়ে-ভাসিয়ে তিনি বেরোবেন আজ বিশ্বপ্রেমের পথে। সেই ঘটনা নিয়েই সেদিনের যাত্রা 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। এবং কলকাতার ওই নাম করা অপেরার বক্স হিরো-হিরোইন বিনয়কুমার ও বীণাকুমারীর প্রাণ মাতানো পালায় নিমাইকেও নাকি ছাপিয়ে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরফে বীণাকুমারী। গোটা মঞ্চ তাই প্রস্তুত। প্রস্তুত হয়ে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বাদা অঞ্চলের লোকজন। এই বুঝি ঢুকে পড়ে বীণা। বীণাকুমারী।

উৎকণ্ঠায় তাকিয়েছিল পরি। হঠাৎই এ-সময়ে কে ডাকল।

এ পরি—

পরি তাকাতেই চোখে পড়েছিল ওদেরই গায়ের নকুড়কা। নকুড় নস্কর। এদেরই তোড়জোড়ে এদিকে এই যাত্রার আসর। প্রায় প্রতি বছরই বসে রাসের সময়ে।

একবার উঠি আয় দেখি। অধিকারী তোরি ডাকতিছে—

অধিকারী! পরি হতভম্ব। অধিকারী কেন ডাকবে ওকে? ও তো তাকে চেনে না। চেনার প্রশ্নও নেই । সে এসেছে যাত্রা দেখতে আর অধিকারী এসেছে যাত্রা করাতে। কারো সঙ্গে কারো পরিচয়ই নেই। অথচ এই ভিড়ের ভেতর থেকে আলাদা করে অধিকারী ওকে ডাকছে।

তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল পরির। মা-ই ওকে উদ্ধার করল।

কাকি ডাকতিছে, ও নকুড়? মানদা ঘুরে তাকিয়েছে তখন নকুড়ের দিকে।

নকুড় বলেছে চেঁচিয়ে, তোমার মেইয়ি গো। পরি। পরিরি ডাকতিছে—

কিন্তু—থমকে গিয়েছিল মানদা। হয়তো কিছু বলতও এর পর। কিন্তু সুযোগ দিল না নকুড়।

আহ্ মাসি, তোমার মেইয়েরি বীণার মতো দেখতে গো। একদম ঝ্যানো বীণাকুমারী। এ যাত্রার বক্স হিরোইন। মঞ্চ থেকি অধিকারীর নজরি পড়ায় আমাকে বলল নিয়ি আসতে—

ও তাই বল! মানদার পান চেবানো গালে ততক্ষণে হাসি। হাসিটা গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের দুই কষ বেয়ে।

তাইলে মা পরি, একবার দেখা কইরে আয়—

মানদার চোখ ফিরেছে তখন মেয়ের দিকে।

কিন্তু মেয়ের মনে ভয় — তুমিও চল না মা?

ও মা, আমি যাব কি রে! মানদা অবাক, আমি কি বীণাকুমারীর মতো...

আহা, চল না কেন মাসি ওর য্যাখন ভয় হতিছে! নকুড় সরব এতক্ষণে।

মানদা বলল, ঝাব? কিন্তু এই ছেইলেরি ফেলি রাখি—

কেন, কারো কাছে গচ্ছিত রাখো। গাঁয়ের অনিকিই তো আছে এখানি—

তাই হল। ছেলেকে একজনের জিম্মায় রেখেই উঠে দাঁড়াল মানদা। তার পর নকুড়ের পেছনে-পেছনে একদম ওই অধিকারীর ডেরায়।

এই হল পরি। আর এই ঝে পরির মা—

নকুড় বলতেই ফিক করে হেসে ফেলেছিল অধিকারী। এক টিপ নস্যি ছিল আঙুলের মাথায়। নাকের ফুটোয় সেটা চালান করে দিয়ে বলল ঘড়ঘড়ে গলায়—

আই দ্যাখ। তুমি তো শাহেনশাহ্। মেয়েকে আনতে বলায় মেয়ের মাকে শুদ্ধ ধরে এনেছ!

নকুড় হাসছে ততক্ষণে, কী করব। মেয়েটা আসতি ভয় পাচ্ছিল।

না না, সে ঠিক আছে। ঠিক করেছ। বলতে-বলতে নাকের ফুটোয় আবারো এক টিপ। বলল, তারপর রুমালে নাকটা ঝেড়ে নিয়ে।

শোনো গো মেয়ের মা, আমি খুব বিপদে পড়েছি। মঞ্চে যন্ত্র পড়েছে। গানও শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু পালাটা তবু শুরু করতে পারছি না। পারব কী করে, বীণায় আমার সুর ওঠেনি এখনো—

বুঝতে পারছিল না মানদা। অধিকারী আবারো বলল খোনা গলায়। তবে এবারে তার গলাটা একটু চাপা।

বুঝলে না তো, কী করেই বা বুঝবে...আসলে বীণা...বীণাকুমারী হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কী হয়েছে?

মানদা জিজ্ঞেস করায় মাছি তাড়াবার মতো করে হাতটা উড়িয়ে দিয়ে অধিকারী মুখ বেঁকায়, কী আর হবে ... সারারাত ধরে মদ গিলে এখন লিভারের যন্ত্রণায় টাটাচ্ছে। ওষুধ অবশ্য দিয়েছি। আর দু-দশ মিনিটেই ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু গায়ের চামড়া কি আর ততক্ষণে আস্ত থাকবে আমার! এতক্ষণেও শুরু না করায় লোকজন সব খেপে যাচ্ছে। তাই বলছিলুম কী—

কী—?

মানদা ফ্যালফ্যাল করে তাকাতেই অধিকারী প্রস্তাবটা দিয়েছিল, তোমার মেয়িটাকেই আমি প্রথম সিনে নামিয়ে দিই—

আমার মেয়ে? মানদা অবাক।

হ্যাঁ গো মেয়ের মা। একদম একরকম। অবিকল এক দেখতে। আমি তো দেখে চমকেই উঠেছিলাম। এক রঙ, এক চোখ, একই গড়ন নাকের। এমনকী চিবুকের তিলটাও একরকম। কী জানি হাসলে হয়তো গালে টোলও পড়বে ও-রকম।

বলতে-বলতেই পা বাড়িয়ে একেবারে পরির সামনে, ও মেয়ে হাসো তো একটু—

কিন্তু হাসবে কী পরী ততক্ষণে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। তাকে পালায় নামাবে ওই লোকটা। বলে কী!

হ্যাঁ গো, ঠিকই বলি। শুধু প্রথম দৃশ্যটা। আর ডায়লগও নেই কোনো। কেবল ওই একটা জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে ধীরে-ধীরে মঞ্চে ওঠা। একটা তুলসী বেদি বানানো হয়েছে মঞ্চে। সেখানে গিয়ে প্রদীপটা রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আবার আস্তে-আস্তে মঞ্চ থেকে নেমে আসা। বাস, এইটুকুই। এরপরে আর পর পর চারটে সিনে বীণা নেই। কাজেই ওষুধটা যখন পেটে পড়েছে এর মধ্যে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে বীণা। এর পর আবার যা ছিল তাই। বিনয়কুমার ও বীণাকুমারী। নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া।

কিন্তু—

না না আপত্তি কোরো না মেয়ের মা। আমার এমন বিপদে যদি একটু সাহায্য কর তাহলে

আমি তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব। কই গো, ও নকুড় বল না একটু বুঝিয়ে—ঘুরে তাকিয়ে নকুড়ের দিকে আস্ত একখানা অসহায় মুখ।

নকুড় বোঝাল, দাও মাসি ভয় নেই কোনো। আমি তো থাকতেছি—

কিন্তু , মেইয়ি আমার এ সব করেনি তো কখনো। ও কি পারবে?

পারবে পারবে। কত একানিকে হিরোইন বানিয়ে ছাড়লাম। এই যে বীণা... বীণাকুমারী... বাঁকুড়া থেকে একানি করে নিয়ে এসেছিলাম। এর পর পার্ট দিয়ে, সেট-মিল করা শিখিয়ে কে ওকে হিরোইন বানাল শুনি... বল না, ও নকুড় তুমি তো সব জানো?

নকুড় হাসে, হ্যাঁ মাসি— সে ভাবনা তোমার নেই। তুমি গিয়ি নিঝির জায়গায় বোস, দেখবে মেইয়ি তোমার দিব্যি মঞ্চে উঠতিছে। তা বাদি হোইয়ি গেলি আমি ওরে তোমার ওখানি দিয়ে আসবখন।

এর পর আর আপত্তি জানাবার কথা নয়। কথা উঠলও না। এবং তার পরেই ভয়ে, জড়তায় ও দ্বিধায় কাঁপতে-কাঁপতে মেক আপ নিয়ে মঞ্চে উঠতে গিয়ে কী যেন একটা ভর করল পরির ভেতরে। প্রদীপটা হাতে নিতেই সে যেন তখন অন্য মানুষ। যেন সত্যিই প্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়াই চলেছে তুলসীমঞ্চের দিকে।

হাঁটছিল পরি। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎই একসময় প্রায় হোঁচট। পড়েই যাচ্ছিল, কোনোরকমে ধরে ফেলল মান্য।

এই দেখ— দেখলি!

কী! পরি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন মান্যর হাতটা ছেড়ে।

মান্যর গলায় হালকা ঠাট্টা, গাঁয়ির রাস্তায় চলতিও ভুইলে গেছিস তুই—

পরি হাসে। কিছু একটা বলতে গিয়েও আবার চুপ করে যায়।

মান্য বলে, তোর নাম কত দেখি কাগজি। ছবিও তো ছাপা হয় মাঝে মদ্যি—

পরি হাঁটছে তেমনই।

একবার কাগজি দেখি কলকাতায় গিয়িছিলাম তোর পালা দেখতি। কী ঝ্যানো জায়গাটার নাম...

রবীন্দ্র কানন?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। ঠিক বলিছিস। তবি একটা সিনে ঝেখানি তোকে বাড়ি থেকি তাড়ায়ে দিচ্ছে তোর বর, সেখানি আর ঠিক থাকতি পারিনি আমি—

কেন! পরির চোখে কৌতুহল।

মান্য মাথা ঝাঁকায়, কী জানি কেন খুব কষ্ট হচ্ছিল।

পরি চমকে ওঠে। একসময় আবার বলে, ধ্যাত ও তো অভিনয়—

আমি হলি এমন অভিনয় করতি পারতাম না। মান্য হাসে খানিকটা বোকার মতো, তোকে কি তাড়ায়ে দেওয়া যায়?

পরির বুকে রক্ত ছলকে ওঠে। মান্য কি তাকে ভালোবাসে? না সে কখনো ভালোবেসেছিল মান্যকে! ভালোবাসা, না ভালোলাগা! ভাবতেই থমকে দাঁড়ায় পরি।

সন্ধে হয়ে এল কখন। চারপাশে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা। অদূরে ওই মরা নদীর খাত। তারই ওপাশের আকাশটা এখনও লালে-কমলায় রঙ ছড়াচ্ছে ক্রমাগত।

পর বলল, এখানে একটু দাঁড়ালে হত না?

মান্য অবাক, দাঁড়াবি?

হ্যাঁ দাঁড়াই না একটু। কেন তোর দেরি হয়ে যাবে?

অদ্ভুত এক শব্দে হেসে উঠে মান্য, ধুর আমার আবার দেরি! আমি তো ফিরি নটার গাড়ি চইলে গেলে—

মান্য তাকায় পরির পায়ের দিকে।

হাঁটতি তোর কষ্ট হচ্ছে , না রে!

না না কোথায় কষ্ট। এমনি একটু দাঁড়াতে ইচ্ছে হল।

বাঁ-হাতে ব্যাগটা তুলে একবার পিঠের ওপরে রাখল পরি। আর ওই তখনই ওর সুগোল স্তনজোড়া লাফিয়ে উঠল হালকা বলের মতো।

মান্য চোখ সরাতে পারল না।

সেই যে, কবে একদিন, কবে ঠিক মনে করতে পারে না, মায়ের সঙ্গে এসেছিল পরি। তখন বাড়িতেই একটা ফুট মেশিন। অনেক চেষ্টা আর উদ্যোগের পর ঘরে এসে ঢুকেছে এবং তাতেই দিনরাত ঘর্ঘর ঘর্ঘর। পরি এল সে-সময়েই একদিন। সকালের দিকে।

ও মান্য—

মান্য চোখ তুলতেই দেখেছিল মানদা। সঙ্গে তার ওই মেয়ে।

এ মেইয়ির গায়ের একটা ছোট জামা তৈরি কইরে দাও না বাবা... শাড়ির সংগি পড়বে—

মান্য বুঝেছিল, ব্লাউজের কথা বলছে মানদা। কিন্তু ব্লাউজ কেন এখুনি!

আমার সংগি সংগি আজকাল কাজের বাড়িতি ঝায় ... আমার কাজে সাহায্য করে ... তা ওই ঝুল জামা পড়লি বাবুরা কী ভাবে—

মানদা কী ইঙ্গিত করেছিল অথবা করেনি, কিন্তু মান্যর চোখজোড়া ঝপ করেই চলে গিয়েছিল পরির বুকের দিকে। একটু ধাতস্থ হয়েই পরে উত্তর ওর।

তা কাপড় তুমি দেবে, না আমাকেই দিতি হবে?

ও মা, কাপড় আবার কোথিকি কিনব গো আমি। ও তুমিই দাও। তবি খরচ বেশি করিও না। চার-চারটে বাড়ি। কিন্তু মাস গেলে ওই বাঁধাধরা পাঁচশো। এতে কি এতগুলো পেট চলে বল?

ফিতে নামিয়েছিল মান্য।

তা মাপ দিতি হবে ঝে—

মানদা বসে পড়ে মেঝের ওপরে, হ্যাঁ তা নাও না কেন! কই রে মেইয়ি... হাই দা, মা সামনি—

পরি এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু ফিতেটা তুলতে গিয়েই মান্য ঘেমে নেয়ে সারা । পরি কুল-কুল করে হেসে উঠেছিল।

বাব্বা মাপ নেবে কিন্তু ফিতে তুলতি গিয়েই দেখ কেঁপে মরতিছে—।

খিলখিল করে হেসেই চলেছিল পরি।

মানদা ধমকে উঠেছিল। দ্যাখ দিনি শুধুই হাসে—

কিন্তু হাসি থামায়নি পরি। বরং হাসতে হাসতেই ফিতেটা টেনে নিয়েছিল মান্যর হাত

থেকে। পরে নিজের বুকের ওপর দিয়েই সেটা ঘুরিয়ে নিয়ে মান্যর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, নাও মাপো এবারি—

হাঁপ ফেলে বেঁচেছিল মান্য।

সেই প্রথম। তারও পরে একদিন। এর পর আবারও একদিন। তার পর আবারো।

মান্য ডেকেছে। চোরা চোখে আলগা হাসিতে তাকিয়েই চলে গেছে পরি। আবার মান্য তাকাতেই প্রবল হাসিতে প্রায় গড়িয়েই পড়েছে মেয়েটা।

কী হল হাসতিছিস কেন? বিরক্ত হয়েছিল মান্য।

কিন্তু হাসি থামেনি পরির।

ও মা হাসবনি। কী একটা বানায়ে দিয়েছিস?

কেন ফিট করেনি গায়ে!

কই করল! কেমন ঢলঢলে। হাত ঢোকালিই সড়াত করি ঢুকে ঝায় হাতখানা —

তা লক্ষণ তো দেখি না। বেশ তো পইরে ঘুরি বেড়াচ্ছিস।

ও মা, সে তো আমি ঠিক করলাম বলি—

হাসতে হাসতেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় পরি।

মান্যর মুখে অন্ধকার। পরে মা ও মেয়ে যখন ফিরছে, যখন দিনান্তের আলো শুষে নিচ্ছে গোধূলির পৃথিবী, যখন হালকা বাতাসে মুচকুন্দ ও কালকেসুন্দির ঝোপে মৃদু কম্পন, যখন খালের জলে বুজকুরি কাটছে কই-মাগুরের ঝাঁক, ঠিক তখুনি একটা জামা হাতে বাইরে বেরিয়ে আসে মান্য।

ও মা— মান্য, এ কার জামা গো! এ তো রানির পোশাক দেখতিছি—

মান্যর মুখে প্রচ্ছন্ন গর্ব, রানির নয় মাসি। মেইয়েদির ফ্রক। অর্ডার পেয়েছি—

তাই নাকি! মানদা বিহ্বল, নাহ্ তোমার হাতযশ আছে মান্য। না কি বল পরি?

কিন্তু পরি ঠোঁট উলটে ততক্ষণে, হুঃ হাতযশ না ছাই। এর থেকি কত সুন্দর-সুন্দর জামা দেখতেছি বাবুদের বাড়িতি। মেইয়িরা পড়তিছে—

মুখ কালো হয়ে আসে মান্যর। হ্যাঙারে ঝোলানো জামাটা নিয়ে সে ভেতরে চলে যায় তাড়াতাড়ি।

সে রাতেই একটা স্বপ্ন ছিল মান্যর চোখে। সোনালি জরি ও চুমকিতে সাজানো মান্যর হাতে তৈরি সাদা ফ্রকটা পরে রাজরানি হয়ে বাগানে নেমেছে পরি। অদূরে শ্বেতপাথরের প্রাসাদ। গাছের ডালে পাখির কূজন। প্রজাপতি উড়ছে। মৌমাছি ঘুরছে। তারই ভেতরে আস্ত একখানা চাঁদ সাবানের ফেনার মতো জোছনা নিয়ে উঠে এসেছে আকাশে। কিন্তু পরিকে তো ধরা যাচ্ছে না। মান্যর চোখ ঘুরল বাগানের চারপাশে। গাছের আড়ালে। কিন্তু কোথায় পরি? এ পরি? মান্য ডাকল। আর ডাকতেই খিলখিল করে হাসি। পরি হাসছে। পরির হাতে সোনার কাঠি। রূপোর কাঠি। এবং মান্যকে দেখেই পরি রূপোর কাঠিটা ঠেকিয়ে দিল মান্যর গায়ে। আর সঙ্গে-সঙ্গে মান্য একটা কোলা ব্যাঙ। দেখে পরির কী মজা। হেসে গড়িয়েই পড়ছিল। এবং ওই তখনই মান্যর গলা থেকে একটা কটকট শব্দ উঠে এল। মান্য বলতে চাইল, পরি আমায় ছেড়ে দে। ওই সোনার কাঠিটা আমার গায়ি লাগায়ে দে না পরি। এ কী মজা করতিছিস। কিন্তু পরি লাগায় না। হাসতে হাসতেই কাঠি দুটো নিয়ে সে বাগানের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে

যায়। আর পরি অদৃশ্য হতেই ঘুমটা ভেঙে যায় মান্যর। মান্য টের পায় সে ভিজে উঠেছে ঘামে।

কিন্তু এমন একটা স্বপ্ন কেন দেখল সে! সে কি পরিকে ভালোবাসে? কিন্তু পরি তো তাকে পছন্দ করে না। পছন্দ না ঘৃণা! না কি উপেক্ষা! সকালের কুসুম আলোয় মনটা ভারী হয়ে আসে মান্যর। এবং এর দু-দিন বাদেই ওই ঘটনা। পরি নামল যাত্রায়। নামল না নামানো হল?

মান্য তাকাল পেছনের দিকে। কই, পরি কোথায়? এই তো ছিল এখানেই।

এ-পাশে ও-পাশে তাকাতে হঠাৎই নজরে পড়ল, অদূরে দাঁড়িয়ে পরি। নদীখাতের দিকে চোখ রেখে। কিন্তু ওখানে কেন? মান্য এগিয়ে যায়।

পরি—

পরি সাড়া দেয় না। প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে সে ততক্ষণে খুঁজছে কোনো নদীপ্রবাহ।

মান্যর নিঃশ্বাস যেন পড়ে পরির ঘাড়ে। পরি চকিতে গ্রীবা ঘোরায়।

আচ্ছা, ওদিকে ওটা কোন্ নদীর খাত বল তো?

মান্য হাসে, কেন বিদ্যাধরী।

তুই দেখেছিস মান্য?

মান্য মাথা নাড়ে, না। আমার বাবার ছেলেবেলায়ই বিদ্যাধরী মরি গেছে। এখন সে শামুকপোতা পার হয়ে ওই ওদিকি—

যাবি মান্য?

কোথায়!

বিদ্যাধরীর খাতে—

গিয়ে!

বসি একটু। কতদিন এমনি আকাশ দেখি না, নদী দেখি না—

কিন্তু ওই নদী তো মরি গেছে পরি।

পরি চুপ। একটু সময় সে চুপ করেই রইল। তার পর তার গলা ভেসে এল যেন বহুদূর থেকে, না রে মরেনি। নদী মরে না। এখনো কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামবে—

চোখজোড়া ছলছল করে উঠল পরির। উদ্‌গত জলটা কোনোরকমে চেপে সে এগিয়ে গেল আরো সামনে।

তখন আকাশে চাঁদ একখানা। ভাসা-ভাসা আলো নিয়ে সবে রেডি হচ্ছে নদীখাতে নেমে আসার জন্য। চারদিকে ফুরফুরে বাতাস। বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। কোথায়ও কি একটা শেষবেলার কাক ডেকে উঠল?

ইচ্ছে ছিল না পরির। আবার অনিচ্ছাও তেমন হয়নি। একটা সোনালি জগতের হাতছানি যেন সারারাত তাড়া করে ফিরেছিল ওকে। আবার ভয়ও হয়েছিল। কিন্তু ভয় আর দুর্লভ জগতের ইশারা এবং ইচ্ছে ও অনিচ্ছের ভেতরে তালগোল পাকাতে-পাকাতে পরের দিনই একসময় রাজি।

নকুড় নস্করকে নিয়ে এসেছিল অধিকারী। প্রভঞ্জন গিরি। আর সকালে এসেই সরাসরি মানদার মুখোমুখি।

কই গো মেয়ের-মা এই নাও?

কী!

মানদা দেখে একখানা একশো টাকার নোট।

ওই যে কাল তোমার মেয়ে নামল না পালায়...

মানদা অবাক, কিন্তু তার জন্যি টাকা!

ও বাবা, বলে কি গো— ও নকুড়!

নকুড়ের দিকে ফিরেই পানজর্দার ছোপধরা দাঁতগুলো বের করেছিল প্রভঞ্জন, তোমার মাসিকে বল না গো, এ-লাইনে বিনে পয়সায় কেউ মুখে রঙও মাখে না—

বলতে বলতেই মানদার দিকে একসময় চোখ, ওই যে বীণা ... বীণাকুমারী ...কত দিতে হয় জানো! বছরে দশ লাখ। দশ লাখের চুক্তি। তার ওপর গাড়ি-বাড়ি আর চাকরবাকর ফ্রি।

মানদা কিছু বুঝল কিছু বুঝল না। কিন্তু দশ লাখ কথাটা যেন মনের ভেতরে কোথায় চেপে গেঁথে বসল। এবং ওই তখনই আবার প্রভঞ্জনের গলা, তাই বলছিলুম কী তোমার মেয়েটাকে না হয় দিয়ে দাও আমাদের এখানে। দেখই না, দু-চার বছরে ও কেমন দাঁড়িয়ে যাবে। দেশজোড়া নামও হবে। আর বছরে-বছরে শুধু টাকার চুক্তি। কই গো মেয়ে, গেলে কোথায়?

বলে দাওয়া ছেড়ে ঘরের ভেতরেই তৃতীয় নয়নটি পাঠিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল প্রভঞ্জন। এনেছিল পরিকে প্রায় নজরবন্দি করে।

তা দৃষ্টিবন্দি হয়েছিল পরি। আর তার পরেই এক সকালে নকুড়ের সঙ্গে তার চিৎপুর যাত্রা। সঙ্গে মা ও পরের ভাই চন্দ্র। কিন্তু মান্য কি দেখেছিল? না কি মান্যর জন্য বুকের ভেতরে কোথাও একটা উদাস হাওয়া পরির! না মন তার পুড়েছিল মান্যর জন্য, মান্যরই কথা ভেবে-ভেবে।

লুকিয়ে গিয়েছিল পরি। ঘর্ঘরে সেই শব্দের জগতে। কিন্তু ঢুকতে গিয়েও পারেনি। পা বাড়িয়েও আবার পিছিয়ে এসেছিল নিঃশব্দে।

অনুজ্জ্বল লণ্ঠনের আলোয় সেই সাদা পরি-জামাটির গায়ে আরো কী কী সব সুতোর কাজ তুলছে মান্য। ফুল ফোটাচ্ছে যেন সেই পরি-জামার শরীরে। ... ফুল কেন ফুটিলে না, ঝরে যাবে বলে/ভালো কেন বাসিলে না, কেন যাবে চলে ...

চমকে উঠেছিল পরি।

মান্যর গলায় সুর। মান্য গাইছে গুনগুন করে। আর সেই স্তিমিত আলোয়, আলোয় ও অন্ধকারে, কথায় ও নৈঃশব্দে, নৈঃশব্দ ও শব্দের ভেতরে ভাসতে-ভাসতে সেই সুর যেন হারিয়ে যাচ্ছে কোনো ব্যাকুল আর্তিতে।

থাকতে আর পারেনি পরি। প্রায় পালিয়েই এসেছিল। এসেই দাওয়ার এক কোণে বসে হাউহাউ করে কান্না এর পর।

মানদা সান্ত্বনা দিয়েছিল। পিঠে হাত রেখে বুঝিয়েও ছিল এক সময়। না না কান্না নয়, পরি কেন কাঁদবে, এত বড় একটা সুযোগ, এ কি সবসময় আসে? তা ছাড়া গাঁয়ে পড়ে থেকে থেকে আধপেটা খেয়ে আর ক-দিন বাঁচবে পরি? তা বাদে নাম-যশ-অর্থ। পরি বাঁচলে তারাও বাঁচবে। ভয় কী, নকুড়ের বন্ধু, অতি সজ্জন লোক। প্রয়োজনে খবরাখবরও করতে পারবে। দরকার মতো বাড়িতেও আসতে পারবে। তার ওপর সে তো যাচ্ছেই। সে কিংবা চন্দ্র। মাসে

মাসে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে আসবে তো! কাজেই কান্না নয়, হাসি। হাসবে এখন পরি।

মানদা বোঝালেও কান্না থামেনি তবু পরি। রাতভর কেঁদেছিল। আর কাঁদতে-কাঁদতে কান্নার ভেতরেই বছর ষোলোর শরীরটা যেন ওর একটু-একটু করে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল। এবং তারপরেই সে শান্ত। শান্ত হয়ে কান্নাভাঙা চোখেই একসময় সে গ্রামে ছেড়েছিল। ছেড়ে এসেছিল গাঁ-গঞ্জ আর জলাভূমি। খাল বিল আর নীল আকাশ।

কিন্তু আকাশে এখন আর কোনো রঙ নেই। সাদা চাঁদখানা শুধু তার শরীর মেলে দুধের মতো আলো ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আর তারই ভেতরে পরি। পরি-আর মান্য।

মান্য অবাক। মেয়েটার আজ হল কী! তা বাদে সেই দমকা হাসিও নেই শরীরে। হাসে। কিন্তু সে হাসিতে কোনো শব্দ নেই। ভালোলাগা আছে। আছে তাতে কিছু দুঃখ কিছু বেদনা। তা ছাড়া বদলেও গেছে কত! কত সুন্দরও হয়েছে আরো।

পরী বলল, হ্যাঁ রে চন্দ্র-র খবর কী রে?

মান্য হোঁচট খায়। চটির ভেতরে বালি ঢুকে পড়েছিল। বালি ছাড়িয়ে এবার চোখ তোলে সে। কী বলবে, কী-ই বা জানাবে পরিকে। বোনের টাকায় নদীর পাড়ে দিব্যি বরফের আড়ত খুলে মেয়েমানুষও পুষতে শুরু করেছে। অথচ ঘরে একটা বউ। দু-দুটো বাচ্চা। তা সেখানে ফেরে না বললেই চলে। আর এই নিয়ে মা-ছেলেতে বিবাদ। ভাইয়ে-ভাইয়ে লাঠালাঠি। চন্দ্র আর ইন্দ্র। এদিকে আবার কানাঘুষোও উঠছে মানদাকে নিয়ে। মানদার স্বভাব চরিত্র ঘিরে।

মান্য ঘাড় ঘোরায়, কেন ভালোই তো আছে—

পরি চুপ।

কোথায়ও একটা পাখি ডাকছে। থেমে-থেমে। অদূরে পিঁপড়ের লাইনের মতো খোপ-খোপ আলো নিয়ে চলে গেল একখানা ট্রেন। তারই শব্দ এসে খানিক তরঙ্গ তুলে আবার খটখট খটখট শব্দে হারিয়ে গেল জঙ্গলের ওপারে।

কোন্ ট্রেন গেল এটা? পরি তাকিয়ে তখনো ট্রেনটার দিকে। কী খুঁজছে সেদিকে নজর রেখে।

মান্য অন্যমনস্ক, এটা কলকাতার ট্রেন। এখানে দাঁড়ায় না—

এক-পা দু-পা করে পা ফেলতে-ফেলতে পরি নামতে থাকে আরও গভীরে। এখানে একসময় জল ছিল। জলে মাছ ছিল। নৌকা ভেসে বেড়াত জোয়ারের টানে।

দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল মান্য, না — যাস না পরি ...ওদিকি সাপখোপ থাকতি পারে

পরির সাদা ধবধবে পা দু-খানা ভেসে উঠল মান্যর চোখে।

পরি হাসল। আর সাপ—! যে বিষ ঢুকেছে তার শরীরে তাতে সর্পদংশনেও তার মৃত্যু নেই। কাল রাতে মদ খেয়েছিল না সে! শুতে হয়েছিল না সুজনকুমারের সঙ্গে। সুজনের আগে নয়ন। তারো আগে অবন। আরো আগে লক্ষ্মী অপেরার প্রভঞ্জন। তার শরীরে নাকি আগুন। আগুনের শিখা না কি নাচে ডালপালা মেলে। তখন শরীর নাকি কথা বলে তার। সুর তোলে। নাড়া দেয় সেতারের মতো। এ শরীরে তাই সেতারিরা সুর তোলে। আলাপ জমায়। শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম? মান্য তুই শশী হবি—!

হাঁটতে-হাঁটতে পায়ে-পায়ে গভীরে আরো গভীরে চলে যায় পরি।

মান্য দৌড়ে আসে, না পরি না—

পরির চুল উড়ছে। আঁচল উড়ছে নদীখাতের বাতাসে।

মান্য বাধা দেয়, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস তুই?

পরির গলা ধরে আসে।

এ শরীরে অনেকদিন এমন হাওয়া লাগেনি মান্য। এমন চাঁদের আলোও এসে পড়েনি গায়ে। মান্য, তুই শশী হবি—

পরী নামতে থাকে হু হু করে। মান্য থমকে দাঁড়ায়। মেয়েটা কি পাগল হল? মান্য চোখ তোলে। এবং ঠিক তখনই খাতের মাঝামাঝি আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে পরি। ধবধবে সাদা আলোয় তার দু-হাত যেন দুটো ডানা। পরি কি উড়বে আকাশে? যদি উড়ে যায়—!

মান্য দৌড়ল। আর দৌড়ে গিয়েই একসময় সে পরির সামনে। খপ করে ধরে ফেলল ডানা দুটো।

কিন্তু পরি ছিটকে উঠল।

নাহ্— না মান্য ... এ শরীরে বড় বিষ!

পরী কাঁদছে মুখে হাত ঢেকে।

এ কী, তুই কাঁদছিস?

মান্য চমকে ওঠে। পরির দুই হাতের ফাঁকে কান্নাভাঙা অশ্রু। তরল জোছনায় মুক্তো হয়ে ঝরে পড়ছে।

মান্য হাত বাড়ায়। আর বাড়াতে গিয়েই কখন স্থির। পরি কি পাথর হয়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে? মান্য ভয়ে চোখ বোজে।

কিছু মুহূর্ত ঈশ্বরের

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় বছর দশেক পরে পরিদের ডানায় ভর করে দেশে ফেরা বল্লভের। দেশ বলতে ছোটবেলায় যে-মফস্বল শহরে সে ধুলোয় উড়িয়েছিল তার শৈশব, কৈশোর। কলকাতা থেকে খুব আহামরি দূরেও নয়, বাসে ঘণ্টা চারেকের ভাবনাপথ। দু-পাশের গাছপালা, মাঠক্ষেত, লোকালয়, ঘরবাড়ি আর স্টপেজগুলোর দোকানপাটের বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করতে করতেই পৌঁছে যাওয়া যায় হরিণবাড়ি। বাসের জানলার ধারে একটা সিট পেলে ভাবনায় কত গেরো দেওয়া যায় যা কলকাতার নিপীড়িত, মিছিলায়িত, সর্বংসহা জীবনে ভাবাই যায় না।

অতএব হরিণবাড়ি মানে তার কাছে প্রায় শূন্যে ভাসমান এক রূপকথার দেশ যেখানে আকাশ অনেক পেল্লাই, পৃথিবী অনেক সবুজ, জীবনে অনেক আলস্য। কলেজে পড়তে কলকাতা চলে যাওয়ার পর অনেকদিন দেশের বাড়ির জন্যে একটা আলাদা টান ছিল। কত চেনা লোকজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন আর রূপকথা ফেলে যাওয়ার যন্ত্রণা তো ছিলই, বেশি কষ্ট ছিল ইছামতী নদীর জন্যে। নদীর ধারে তাদের বসবাস ছিল বলে নদীর সঙ্গে ভারি সখ্য ছিল কিশোর বল্লভের। কত কথা হত দুজনের। স্কুলে যাওয়ার আগে অন্তত এক ঘণ্টা জলে ঝাঁপাতই।

অতএব কলকাতা থেকে ছুটি কাটাতে হরিণবাড়ি এলেই সে প্রথমেই ছুটে যেত নদীর কাছে। নদীর ধারে দু-দণ্ড পা ঝুলিয়ে বসে থাকলেই সেই ফেলে যাওয়া রূপকথাটা চুপিচুপি তার শরীরে ভরে আসত কীভাবে যেন।

এতদিন পরে দেশে ফিরতেই বল্লভ আবার রূপকথার মুখোমুখি। কিন্তু সেই রূপসি ইছামতী তার চোখের আড়ালে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে কী ছোট্ট আর শীর্ণকায়। তার সঙ্গে সেই আগের কথোপকথন ঠিক জমছিল না। বসে আছে মুখে দুঃখ মাখিয়ে, হঠাৎই কাছে পেয়ে গেল স্কুলের বন্ধু ব্রজসুন্দরকে। সে একটা মাধ্যমিক-স্কুলে ইতিহাস পড়ায়। ছুটির পর সাইকেলে করে ওপারে যাবে ব্রিজ পেরিয়ে, বল্লভকে দেখে চিনে ফেলে, আ রে, তুই!

—যাক, চিনেছিস তা হলে! বল্লভ নিজের পায়ের তলায় হরিণবাড়ি খুঁজে পায়।

— তোকে চিনব না। তুই কলকাতায় গিয়ে তবু একটা কেষ্টবিষ্টু হয়েছিস!

বল্লভ হেসে উড়িয়ে দেয়, কীই বা হয়েছি। নেতা তো হইনি, নেতা হওয়াই আজকাল সবচেয়ে ক্ষমতাবান চাকরি। হয়েছি সরকারি অফিসের মাঝারি আমলা।

— তবু তোর সঙ্গে কত হোমরাচোমরার জানাশুনো! তোর একটা চিঠি পেলেই উপরমহলে পাত্তা পাওয়া যায়।

বল্লভ নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে না। সে জানে আমলাদের ক্ষমতার কত দৌড়। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, তার পর বল, কেমন আছিস?

—আমাদের আর থাকা! সেই যেরকম দেখে গিয়েছিলি, সেইরকমই। একচুলও বদলাইনি। কিন্তু তুই কত বদলে গেছিস! কলকাতায় গেলে মানুষের কত যে বদল ঘটে!

—আমার কত বয়স হল বল দেখি! বয়স বাড়লে মানুষ এমনিই বদলায়। তুইও কি কম বদলে গেছিস! হরিণবাড়িই কি কম বদলেছে!

—হরিণবাড়ি আর কোথায় বদলাল! হরিণবাড়ি পড়ে আছে হরিণবাড়িতেই। বলে ব্রজসুন্দর রবীন্দ্রনাথের প্যারডি করার চেষ্টা করে।

বল্লভ হেসে বলে, বদলায়নি! স্কুলে পড়াকালীন তুই যে নদীর খেয়াঘাটে এসে কতক্ষণ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতিস— কখন খেয়ার নৌকো ওপার থেকে এপারে আসবে, আর তুই তাতে চড়ে ওপারে বাড়ি যাবি, সে-সব দিন কি ভুলে গেছিস! এখন খেয়া উঠে গিয়ে সেখানে ব্রিজ, সাইকেলে ব্রিজ পেরিয়ে কেমন পট করে পৌঁছে যাচ্ছিস বাড়ি!

ব্রজসুন্দর হেসে বলল, ঠিক বলেছিস তো! আসলে আমরা যারা এখানে পড়ে আছি, তারা গ্রামের এইসব পরিবর্তন ঠিক খেয়াল করতে পারিনে। যারা অনেকদিন পরে গ্রামে আসে তারা ঠিক বুঝতে পারে এই বদলানোটা। যাই হোক, কলকাতা যে-হারে বদলায় গ্রাম কি সেই ভাবে বদলাতে পারে!

কথায়-কথায় সন্ধে হয়ে আসে। ব্রজসুন্দরকে আবার নদীর ওপারে অনেকখানি যেতে হবে সাইকেলে। সে কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথা বলে নদীর মায়া কাটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুই তো শুনেছিস, দ্বিজেনকাকা রিটায়ার করে হরিণবাড়িতেই থাকে?

বল্লভ ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ, সে তো অনেকদিন হল। গেলবারে এসেই তো দেখে গেছি।

—আমি মাঝে-মাঝে দেখা করতে যাই। মাস দুয়েক আগে শুনলাম খুব শরীর খারাপ। এবার দেখা করতে গেলে তোর কথা খুব বলছিলেন। তোর সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা। বলছিলেন তবু গাঁয়ের একটা ছেলে অনেক উঁচুতে উঠেছে। তুই এসেছিস যখন একবার দেখা করিস। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবেন না। বলছিলেন কেউই আসে না তিনি কেমন আছেন তা জানতে।

— তাই নাকি! ঠিক আছে, কালকের দিনটা তো আছি। এক বার দেখা করে আসবখনে।

দ্বিজেনকাকা তার কথা বলেছেন শুনে খুব ভালো লাগল বল্লভের। একটু অহংকারও হল। দ্বিজেনকাকা খুব বড় চাকরি করতেন কলকাতার কোনো নামী সদাগরি অফিসে। অনেকদিন পরপর গাড়ি নিয়ে ঘুরতে আসতেন দেশের বাড়িতে। সঙ্গে বউ আর ছেলে। দ্বিজেনকাকার বউ এত ফরসা আর সুন্দরী ছিল যে, রাস্তা দিয়ে গেলে তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। কারো সঙ্গে কথা বলত না। শহরের মেয়ে গাঁয়ে কার সঙ্গেই বা কথা বলবে, এমন বলাবলি করত সবাই। তখন স্কুলের ছাত্র বলে বিস্ময়টা আরো বেশি ছিল। ভাবত কলকাতার মেয়েরা এমন রূপসি হয় বলেই বোধহয় তাদের ডানা-কাটা পরি বলে। দ্বিজেনকাকার ছেলেটাও ছিল ভারি নধর আর ফরসা।

দ্বিজেনকাকার চাকরিটা এমনই ছিল যে, তাঁর কাছে গ্রামের কেউ গিয়ে যদি কান্নাকাটি করত 'আমার ছেলের একটা চাকরি করে দিতেই হবে', তা হলে দ্বিজেনকাকা ঠিক একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারত। হরিণবাড়ির কত ছেলের চাকরি যে করে দিয়েছেন দ্বিজেনকাকা তার ঠিকঠিকানা নেই। সেই দ্বিজেনকাকা বল্লভের কথা তা হলে মনে রেখেছেন!

বল্লভের মগজে চকিতে ছুঁয়ে যায় এক আশ্চর্য তথ্য। তাদের ছোটবেলায় দুটো এক্সট্রা ঈশ্বর ছিল। ইছামতীর তীরে বসে চোখ চালিয়ে খুঁজত ওপারের ফাঁকা জলাভূমিতে এক ঈশ্বর। কোনোদিন কেউ তাকে চোখে দেখেইনি, কিন্তু লোকে বলাবলি করত ঈশ্বর নাকি ওপারের জলার উপর দিয়ে একা-একা হাঁটতে থাকেন সর্বক্ষণ। একমাত্র গভীর রাত্রে এলেই

তাঁকে দেখা সম্ভব। বল্লভরা কখনো রাত দশটা সাড়ে দশটায়ও এসেছে যদি কোনোক্রমে ঈশ্বরকে একবার দেখে ফেলা যায়। পাড়াগাঁয় সাড়ে দশটা মানে মধ্যরাত। তাদের কখনো মনে হত কোনো জটাজূটধারী সন্ন্যাসীপ্রতিম সৌম্যদর্শন একজন অন্ধকারে হাঁটছেন পলকা পালকের মতো। হরিণবাড়ির অন্য ঈশ্বর এই দ্বিজেনকাকা। গ্রামের লোকে বলাবলি করত দ্বিজেনকাকার নাকি অসীম ক্ষমতা ছিল। মন্ত্রিটন্ত্রিদের সঙ্গেও মিটিং করতেন। একটা টেলিফোন করলেই অনেক সুবিধে পাইয়ে দিতে পারতেন কাউকে। চাকরি তো খুব সামান্য ব্যাপার।

ব্রজসুন্দর চলে যেতেই দ্বিজেনকাকার কথা ভাবতে-ভাবতে বল্লভ আবার নদীতীরে একা। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতে আজো বেশ ভালো লাগছিল যদিও নদী তো আর সেই নদী নেই। আজ কেন যেন রূপসি চাঁদটাও নেই কোনো দুরূহ কোণে। সন্ধের পর আকাশে চাঁদ থাকলে নদীর জলে তাকিয়ে থাকাটা তাদের কাছে নেশার মতো ছিল। এখানে নদীটা তার শরীরে এমন মোচড় তুলে বেঁকে গিয়েছে যে, আকাশে চাঁদ থাকলেই কোথাও না কোথাও চাঁদটা ভাসমান হবে তার বয়ে যেতে থাকা জলে। সেই ভাসন্ত চাঁদ জলের ঘায়ে মূর্ছা যায় ঘনঘন। তখন চাঁদের শরীর ভেঙে শতেকখান। টুকরো চাঁদের শরীর দেখতে-দেখতে নেশা ধরে যেত বল্লভের শরীরে।

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরে টানা ঘুম দেয় বেলা পর্যন্ত। ঘুম ভাঙে রোদ্দুর ফনফনে হওয়ার পর। শরীরটা বোধ হচ্ছে কেমন ঝরঝরে। এইসব কারণেই তো হরিণবাড়ি তার এত প্রিয়। ভোর থেকেই কলকাতার ব্যস্ততার অসুখে আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আরো একটু বেলা হলে পায়ে-পায়ে রওনা দেয় দ্বিজেনকাকার বাড়ির দিকে। সেই দ্বিজেনকাকা যার নামে কত-কত গল্পগাঁথা ছড়িয়ে আছে হরিণবাড়ির পথে-পথে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিজেনকাকাদের পৈতৃক ভিটেয় পা পড়ে তার। বাড়িটা বিশাল আকারের। দোতলা হলেও তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল দেখার মতো। কিন্তু বহু বছর দেখভাল না করার ফলে কিছু-কিছু অংশ ধ্বসে পড়েছে ইতিমধ্যে। যেটুকু বর্তমান তাও জরাজীর্ণ। বল্লভের অবাক হওয়ার পালা, কেন না দ্বিজেনকাকা যখন পাকাপাকিভাবে হরিণবাড়ি থাকছেনই বাড়িটা কেন মেরামত করে নেননি আজও। কলকাতায় কোম্পানির যে-ফ্ল্যাটটিতে থাকতেন, এর-ওর মুখে শুনত যে, সে এক এলাহি ব্যাপার। বেল বাজত জলতরঙ্গের। মেঝে ছিল ইটালিয়ান টালির যা তখন ছিল রাজারাজড়াদের একচেটিয়া। একটা কুকুর ছিল। বাঘের মতো প্রতাপ। কেউ বাড়িতে গেলে তার সর্বাঙ্গ শুঁকে সার্টিফিকেট না দিলে থাকার হুকুম মিলত না।

সেই দ্বিজেনকাকার এমন ধ্বংসস্তূপে বাস করাটা বল্লভের পছন্দ হল না কোনোমতেই। বাড়ির গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই আরো দেখল, বাড়ির সামনে মন-ভালো-করা একটা গোলাপবাগান ছিল যেখানে এখন জংলা ঘাসের ভিতর চড়ুই চরছে। গেট খোলার শব্দে সেগুলো উড়ে গেল হুড়মুড়িয়ে। শুনশান বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন দ্বিজেনকাকা। কাশির দমক সামলাতে ব্যস্ত।

বোধহয় চোখে কম দেখছেন, গেট খোলার শব্দ পেয়ে ধমক সেরে বললেন, কে?

—আমি বল্লভ।

সে এগোনোর আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দ্বিজেনকাকা। তাঁকে দেখে সহসা মনে হল তা হলে বল্লভের বয়সও ইতিমধ্যে অনেকটা কেড়ে নিয়েছেন মহাকাল! দ্বিজেনকাকাকে

পথে দেখলে চিনতে পারা যেত কি না সন্দেহ। হাড়সর্বস্ব মানুষটার চেহারা যে এককালে নাদুসনুদুস, অফিসারমার্কা ছিল তা বহু রূপকথার দেশে বেড়িয়েও ভাবা যেত না।

কাছে গিয়ে বলি যেমন বলা নিয়ম, কেমন আছেন?

কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই কাশির দ্বিগুণ দমক। সামলাতেই অস্থির দ্বিজেনকাকা। থিতু হয়ে বললেন, যে-রকম দেখছ।

খুব ভালো যে দেখছি না তা আর না বলে জিজ্ঞাসা করি, অসুখে ভুগছেন নাকি!

দ্বিজেনকাকা হাসার চেষ্টা করে বললেন, রোগটার নাম অর্থাভাব।

এবার আমারই গলায় কাশি না বিষম, কী যেন ভর করার চেষ্টা করে, সামলে নিয়ে বসি কাছেই পাতা একটা মোড়া টেনে নিয়ে। কী করে এমন অসম্ভব কাণ্ডটা ঘটে গেছে এই মধ্যবর্তী সময়ে তা অনুমানের গলিঘুঁজি চষেও ব্যর্থ হই। অর্থাভাবে আক্রান্ত কোনো মানুষের আত্মজীবনী জানার মতো কষ্টকর আর কিছুই নেই। কী করা উচিত, কী বলা উচিত এই ভেবে কিছুক্ষণ কালক্ষয় হয়। অল্প-অল্প হাওয়া ছাড়ছিল যেমন সাধারণত বয় হরিণবাড়িতে। কিন্তু সে-হাওয়ায় গা তো জুড়োচ্ছিলই না বরং গুমোট লাগছিল বাড়ির বারান্দা। উপরে সিলিং ফ্যান না থাকায় আরো অস্বস্তি লাগছিল বল্লভের। কাছে কোনো হাতপাখাও নেই।

অনেকক্ষণ পরে মুখ খুললেন দ্বিজেনকাকা, কতদিন আছ এখানে?

— কাল সকালে উঠেই যেতে হবে। কলকাতায় এত কাজ যে দু-দিন না থাকলেই বাড়িতে এত ফোনাফোনি হতে থাকে যে—

— তা তো হবেই। তুমি এখন এত বড় অফিসার। সবার তো তোমাকে দরকার লাগবেই।

কথাটা খুবই অস্বস্তিকর বল্লভের পক্ষে। দ্বিজেনকাকা একসময় সারা এলাকার সম্ভ্রম কুড়িয়েছেন অফিসার হিসেবে। হরিণবাড়ি আসতেন গাড়ির ধুলো উড়িয়ে। যে ক-দিন থাকতেন গাড়ি থাকত তাঁর সঙ্গে। আর বল্লভ মাত্র একবার গাড়ি নিয়ে এসেছিল এদিকে অফিসের কাজ থাকায়। তার পর, যত বার হরিণবাড়ি এসেছে বাসেই এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই তার চেনা লোকজন বারে-বারে জিজ্ঞাসা করেছে 'তোমার গাড়ি কোথায়?' যেন বল্লভ গাড়ি ছাড়া এক পাও নড়তে পারে না। বল্লভ হাসিমুখে বলেছে, কেন, বাসে আসাই তো ভালো। বাসে দেখা হয়ে যায় কারো না কারো সঙ্গে। গল্প করতে-করতে চলে আসি বেশ।

আবার কথা ঘোরাতে বল্লভ বলল, কাকিমা কোথায়? ঘরে!

—হ্যাঁ। ঘরে ছাড়া আর যাবে কোথায়! সারাক্ষণ খিটিমিটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তো। বোধহয় শুয়ে আছে।

সকালের মুহূর্তগুলো কলকাতায় কাটে ভারি ব্যস্ততায়, কিন্তু হরিণবাড়িতে সময় চলে রয়ে বসে। অতএব এক জন অবসরপ্রাপ্ত অভাবী মানুষের সংসার যে বসে নয়, শুয়েই থাকবে সেটাই তো ভবিতব্য। একটু পরেই দ্বিজেনকাকা আবার বললেন, দেখি, বাবনটা আবার কোথায় গেল!

বল্লভ কিছুটা অবাক হয়ে বলে, বাবন এখানে এসেছে না কি!

দ্বিজেনকাকা ম্লান হাসলেন , হ্যাঁ, ও-ও তো এখানে আছে। বউ-বাচ্চা নিয়েই আছে। কী আর করবে কলকাতায় থেকে। চাকরি থেকে ওকে ছাড়িয়ে দিল যে! সেও তো ক-বছর হয়ে গেল।

বল্লভ তখন আর কথা বলতে পারছে না। তার বিস্ময়ের ডালা থইথই। বাবন দ্বিজেনকাকার একমাত্র ছেলে। লেখাপড়ায় তেমন চৌকস না হলেও বি.এ. পাশ করার সঙ্গে-সঙ্গে তাকে একটা মার্চেন্ট অফিসে ভালো মাইনেয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন দ্বিজেনকাকা।

বল্লভ অগত্যা কথা ঘুরিয়ে নেবে ভাবে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলেই ফেলল, আপনার সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না এরকম হল কী করে!

দ্বিজেনকাকা দেশে ফিরে এসেছেন স্থায়ীভাবে থাকতে এ-টুকুই জানত বল্লভ, কিন্তু জানত না অবসর নেওয়ার পর যে বিপুল পরিমাণ টাকা পেয়েছিলেন অফিস থেকে তা নিঃশেষ হল কোন অলৌকিকতায়। জানল বাবনকে যে সংস্থায় চাকরি করে দিয়েছিলেন দ্বিজেনকাকা তাঁর প্রভাব খাটিয়ে, তিনি অবসর নেওয়ার পর তারা কোনো তুচ্ছ কারণে ছাঁটাই করে দিয়েছে বাবনকে। বাবনের চাকরি যাওয়ার পর তাকে স্বনির্ভর করতে গিয়ে কীভাবে ফতুর হয়েছে তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। গ্র্যাচুইটি, লীভ স্যালারি বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চিত অর্থ প্রথমে খাটাতে গিয়েছিলেন শেয়ারে, সেখানে চোট খেয়ে বাকি টাকা লগ্নি করেছিলেন কোনো প্রোমোটারের সঙ্গে, সেখানেও বহু টাকা খেসারত দিয়ে শেষে টাকা খাটাচ্ছিলেন কোনো এক সঞ্চয়-সংস্থায় যারা অস্বাভাবিক রকমের সুদ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। সেখানেও টাকা মার যেতে দ্বিজেনকাকা এখন একেবারে ধারাপাতের শূন্য।

তখন অনেকদিন কলকাতায় একটা ভাড়া-বাড়িতে ছিল বাবন তার বউ-ছেলে নিয়ে। কোনো উপায় না করতেপেরে শেষে ফিরে এসেছে হরিণবাড়িতে।

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য হলেও তা গ্রীষ্মে জল উবে যাওয়ার মতোই সত্যি।

বল্লভ বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে পার করছিল কিছু অসহনীয় মুহূর্ত। তার পর একসময় জিজ্ঞাসা করল, বাবন আর কোথাও চেষ্টা-টেষ্টা করছে না!

দ্বিজেনকাকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কোথায় আর করবে! প্রথম-প্রথম কর্মখালির পাতা দেখত, দরখাস্ত করত, কোথাও ইন্টারভিউও দিত, কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে বুঝে গেল সুপারিশ ছাড়া চাকরি পাওয়া যাবে না। এখন বসে আছে বেকার।

বল্লভ বুঝে উঠতে পারছিল না দ্বিজেনকাকার এই অভাবী সংসারের কী ভবিতব্য! গ্রামবাংলায় এমন লক্ষ-লক্ষ পরিবার আছে যাদের ভয়ংকর অভাবের সামনে চোখ মেলে দাঁড়ানোই অসম্ভব। কিন্তু দ্বিজেনকাকার বরাতেও দুঃখের এত তৈলচিত্র ছিল তা কি কেউ ভাবতে পেরেছে কখনো!

কিছুক্ষণ পর দ্বিজেনকাকা আস্তে-আস্তে বললেন, দ্যাখো না তুমি ওর কোনো একটা হিল্লে করতে পারো কি না?

বল্লভ এতক্ষণে জীবনের কঠিনতম সমস্যার মুখোমুখি। দ্বিজেনকাকা এমন একটা সময়ে চাকরি করেছেন যখন কোম্পানির একজিকিউটিভদের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকত, রাজনৈতিক নেতারাই শেষ কথা ছিল না। সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যে তখনো এমন ভাঙন ধরেনি। তার পর এখন তো আমেরিকার ট্রেড-সেন্টার ভাঙার মতো ঘটনা ঘটে বদলে গিয়েছে জীবিকার রেখাচিত্র। কী আর বলবে বল্লভ। মাথা নিচু করে বলল, আপনি তো জানেন, চাকরি করে দেওয়া কী ভীষণ কঠিন। তবু যদি কোনো সুযোগ ঘটে—

শেষ বাক্যটা বলবে-না বলবে-না করেও বলে ফেলল, যদিও সে জানে কাউকে চাকরি

করে দেওয়ার দিন আর নেই। বড় রাজনৈতিক নেতারা পারলেও পারতে পারেন।

কিছুক্ষণ পর দ্বিজেনকাকার বাড়ি থেকে বাইরে এসে বড় করে একটা নিশ্বাস নিল বল্লভ। তার ভিতরে কোথাও ভাঙচুর হচ্ছিল বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা একটা ছবি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়ার কারণে। বাবনরা ঘর থেকে বেরোয়নি লজ্জায়। দ্বিজেনকাকার স্ত্রীও কিন্তু সামনে আসেননি একবারও। বল্লভের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল পরির মতো দেখতে সেই নারীকে একবার দেখতে। বেরিয়ে এসে ভাবছিল না দেখা হওয়ায় ভালোই হয়েছে। তাঁর সেই অপার সৌন্দর্য নির্ঘাত নষ্ট হয়ে গেছে ভয়ংকর দারিদ্র্য-দৈত্যের চাপে। তাঁর অহংকারের কুটোটিও নিশ্চয়ই অবশিষ্ট নেই।

সেদিন সন্ধের পর ইছামতীর তীরে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে বল্লভ। জলের ক্ষীণ স্রোত আর তেমন করে ডাকল না কৈশোরের ছোট্ট বল্লভকে। ফ্যাকাসে মুখ করে বয়ে যাচ্ছে রোজই যেমন যায়। বল্লভ মুখ তুলে তার নজর ন্যস্ত করছিল ওপারের জলাভূমিটার দিকে। অন্ধকারে খুঁজতে চেষ্টা করছিল সেই ঈশ্বরকে যিনি বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যান জলের উপর দিয়ে। কোথাও কি তাঁকে দেখতে পেল বল্লভ হয়তো এক লহমার জন্য পেল। মনে হল তাঁর শরীরটাও ক্ষীণ, দুর্বল আর ফ্যাকাসে।

বল্লভ পা ঝুলিয়ে বসে থাকে আঁধারের বিস্তৃত পটভূমিকায়। আকাশে একফোঁটাও চাঁদ নেই। জলে তার ছায়া পড়ারও প্রশ্ন নেই। জলের শরীরে কেবল মিশে যাচ্ছে চামচ-চামচ অন্ধকার।

বন থেকে বেরুল হুতি

মৃত্যুঞ্জয় সেন

শহরের বুক চিরে চলে গেছে মূল সড়ক। সড়কের বাঁ দিকে এক নদী। এঁকেবেঁকে নানা দিক ঘুরে-ঘুরে চলে গেছে। নদী ছেড়ে বাঁ দিকে আরো একটু এগিয়ে এলেই বনজঙ্গল শুরু। ঘন জঙ্গল মানুষের মনে রহস্য এঁকে দেয়। তবুও এই জঙ্গলের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটা বাড়ি। বাড়িগুলোও যেন রহস্য মেখে দাঁড়িয়ে আছে। টিন কেটে বাড়ির দেওয়াল। কাঠের জানলা। সিমেন্টের মেঝে। টিনের দোচালা-চারচালা বাড়িগুলো দিনের আলোতেও কেমন নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। বাড়িগুলো ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে মোড় নিয়ে পাকদণ্ডি ধরে ওপরে উঠেছে। মোড়েই বিনোদিনী টি-এস্টেট। টি-এস্টেটের ফ্যাক্টরি শেড। পুরনো, এখন পরিত্যক্ত। চা-বাগানের পশ্চিমদিকের অংশে নতুন চা-গাছ বসানো হয়েছে। চা-বাগান বাড়ানো হচ্ছে। নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে বিনোদিনী টি-এস্টেটের বর্তমান কর্তৃপক্ষ বাগানের পরিধি বাড়াচ্ছেন। নতুন-নতুন মেশিন এসেছে। সে-কারণে নতুন ফ্যাক্টরি শেডও তৈরি হয়েছে পশ্চিমদিকে। পুবদিকের ফ্যাক্টরি শেডটি এতদিন শুধু চা-বাক্স রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। সেই পুরনো ফ্যাক্টরিতে এখন পাঁচশো একুশ জনের বাস, সরকারি হিসেবমতো। নাম দেওয়া হয়েছে, রেসকিউ ক্যাম্প।

একটু আগেই ছিল মেঘলা আকাশ। সড়কের পাশে জঙ্গল-ঘেরা বাড়িগুলোও কেমন যেন নিস্তরঙ্গ ছিল। মেঘলা আকাশে হঠাৎ সূর্যের মুখ। সঙ্গে-সঙ্গে বনাঞ্চলটি জেগে উঠল। রোদের তাপে সজীবতা। এখন দুপুর গড়াচ্ছে। ঠিক সে-সময় বিনোদিনী টি-এস্টেটের ওপাশ থেকে গুলি ছোড়ার আওয়াজ। গুড়ুম, গুড়ুম।

বিনায়কের চোখে বিহ্বলতা। আতঙ্কে এদিক-ওদিক তাকালেন। জঙ্গলের মধ্যে একটা টিনের বাড়ির মধ্যে শয্যাশায়ী বিনায়ক। মাথা তুলে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করলেন।

পাশের রান্নাঘরে তখন দুপুরের রান্না করছিলেন লীলারানী। ষাট ছাড়িয়েছেন গত বছরে। চোখের জ্যোতি কমেছে। তবুও চশমা ব্যবহার করেন না। ডাল গলেছে কি না দেখার জন্য একটা খুন্তির মাথায় ফুটতে-থাকা ডালের কিছু অংশ তুলে চোখের কাছে এনে মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন তিনি। শব্দ শুনে বুঝে নিয়েছেন, এটা বন্দুকের গুলি। ইদানীং নানাভাবে নানা কারণে তাঁরা বন্দুকের গুলি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তবু আতঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। যত দূর চোখ যায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে জঙ্গল পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে তাকালেন লীলারানী। কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি বারান্দা থেকে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ঘরে-শুয়ে-থাকা বিনায়কের দিতে তাকালেন। বিনায়ক উঠে বসার চেষ্টা করছেন।

প্রায় ছুটে এসে বিনায়ককে জড়িয়ে ধরে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলেন লীলারানী। এতটুকু শিশুর মতো ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে বিনায়কের শরীর। কত হালকা, পলকা এই বিনায়কের শরীর। লীলারানী ভাবেন, অথচ বছর দুই আগে সত্তর ছুঁই-ছুঁই মানুষটি কত

শক্তপোক্ত ছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ চেহারা অন্য বৃদ্ধদের কাছে ঈর্ষণীয় ছিল। কিন্তু কালরোগে বিনায়ক এখন শয্যাশায়ী। ডাক্তারের মতে, যতদিন কাছে রেখে সেবা-শুশ্রূষা করা যায়, ততদিনই ভাল। সঙ্গে মামুলি ওষুধ।

বিনায়ক শুয়ে শুয়ে কাঁপতে লাগলেন।

তা দেখে লীলারানী ভয় পেলেন। বললেন, কী হল? অসুবিধা হচ্ছে।

কিসের শব্দ হল? গুলির না? এদের নিয়ে কি কোনো গণ্ডগোল শুরু হল? প্রশ্ন করলেন বিনায়ক।

বারান্দা থেকে তো কিছু বুঝতে পারলাম না। সে যাই হোক, তোমাকে এসব নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। এখন যা যুগ চলেছে! কেউ কি কারুর কথা শোনে? তা, তুমি কেন এ-রকম কাঁপছ? বিনায়কের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লীলারানী বিনায়ককে প্রশ্ন করলেন।

চোখ বুজে ফেলেছেন বিনায়ক। চোখ বুজেই উত্তর দিলেন, আমাদের নেতাদের কাজকর্ম দেখে রাগ আর চেপে রাখতে পারছি না। কাঁপব না তো কি হাসব? এসময় যদি আমাদের একটা ছেলে থাকত। বিনায়কের গলায় খেদ, আক্ষেপ।

চমকে ওঠেন লীলারানী। মনে-মনে ভাবলেন, সারাজীবন তো গেল এভাবে, তবে এতদিন পরে একটা ছেলের জন্য তাঁর এত দুঃখ কেন? তাই প্রশ্ন করলেন খুব হালকাভাবে, হ্যাঁ, ছেলে থাকলে কী করত তোমাকে, শুনি? আমাদের ভাগ্যে যা লেখা আছে, তাই হত।

না-না, তা বলছি না। আমাদের পুত্রসন্তান থাকলে তাকে আমি নেতা তৈরি করতাম। নেতার মতো নেতা। ধান্দাবাজ নেতা নয়। সে থাকলে শীতলাপুর অরণ্যের লোকগুলোকে বাঁচাতে আমিই তাকে পাঠাতাম। দরকার হলে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। তাতে সরকারের পুলিশ যদি তাকে গুলি করে মারত, তাও মেনে নিতাম। বলতাম, এ বীরের মৃত্যু। সে নেতা হত সমাজ-সংস্কারক, সমাজরক্ষক সমাজসেবক।

না-না, এভাবে বোলো না। কথাগুলো বলেই চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে লীলারানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বারান্দায় এসে লীলারানী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তার পর রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

২.

পাকদন্ডি ধরে পাহাড়ে ওঠার পথ। সে-পথ চলে গেছে গভীর পাহাড়ি অঞ্চলে। পথেই নজর-কাড়া একটি হোটেল। চারিদিকে নৈসর্গিক শোভা। হোটেলটি এ-কারণে পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কাঠ দিয়ে নির্মিত হোটেলের পিছনদিকে ঝুলন্ত বারান্দা। বারান্দা ধরে পর পর ঘর কয়েকটি। কোণের এক ঘরে দরজা খুলে বারান্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে নীচের চা-বাগানের দিকে তাকিয়ে রবীন ঘোষ: একটি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। দলের তরুণ তুর্কি নেতা। শীতলাপুর অরণ্যের অধিবাসীদের নিয়ে সরকারি ব্যবস্থার কারণে এ-অঞ্চলটি গত দশ-এগারো দিন সংবাদের শিরোনামে। এ-অঞ্চলে তাঁদের দলের তেমন বেস নেই, তবু এই ডামাডোলের বাজারে নিজেদের দলের অস্তিত্বের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করা যায় কি না তা দেখার জন্য এসেছেন তিনি। স্থানীয় নেতা ঘনশ্যাম রায়কে খবর দেওয়া হয়েছে, সন্ধের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

রবীন ঘোষ একটু আগে হোটেলের ঝুলন্ত বারান্দা থেকে বিনোদিনী চা-বাগান দেখছিলেন। এত দূর থেকে চা-বাগানটি দেখলে মনে হয়, সব-কিছুই শান্ত। চা-বাগানের টি-বুশ সুন্দর করে ছাঁটা। যেন বিস্তৃত সবুজ কার্পেট। স্নিগ্ধ রোদে সেই বুশগুলি হালকা আতরের রঙ নিয়েছে। দুপুরের আগেও ওই মস্ত বড় চা-বাগানের দক্ষিণদিকে কামিনিদের চায়ের পাতাসমেত কুঁড়ি তুলতে দেখেছেন তুর্কি নেতা। এখন তো শুধু দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলে না তারা। চা-গাছের একহাত ডাঁটাও তোলে। তিনি দেখছিলেন অদ্ভুত সবুজে-ঘেরা চা-বাগানটির চৌদিক। সবুজের সঙ্গে মিলিয়ে সেখানে নিবিড় নীরবতা। ওই চা-বাগানের একাংশ যে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে বোঝা যায় না। সেখানে ছিন্নমূল জনতার ভিড়। বুড়ো-বুড়ি, তরুণ-তরুণী, শিশু নিয়ে মোট পাঁচশো একুশ জন। ছোট-বড় মিলিয়ে পুরুষের সংখ্যা তিনশো পঁয়ত্রিশ, মহিলা একশো ছিয়াশি।

দলের কাজে এর আগেও রবীন ঘোষ এ-অঞ্চলে এসেছিলেন। তখন দেখেছিলেন, স্নিগ্ধ স্বচ্ছতা নিয়ে এখানকার প্রকৃতি কত উদার। আত্মিক উপলব্ধি ঘটে। বারেবারে মন চলে আসে এখানে। মনে হয়, এখানকার প্রকৃতি সর্বদাই ধ্যানস্থ। কিন্তু সে-ধ্যান এখন ভেঙে লুটেপুটে একশেষ। এখানকার বাস্তবে এখন বক্রতার হাতছানি। বাতাসে বারুদের গন্ধ। কিছু মানুষের নির্বুদ্ধিতার ফলে তাড়া-খাওয়া মানুষের মনে তৈরি হয়েছে গভীর ক্ষত। তাদের স্বপ্ন-জড়ানো অরণ্য থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। নিয়ে এসে ঢোকানো হয়েছে বিনোদিনী টি-এস্টেটের পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরির শেডের তলায়। বাস্তুচ্যুত লোকগুলো এখানকার প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হতে পারেনি। প্রতিবাদে তারা গর্জে উঠেছে। কিন্তু প্রশাসনের ঘেরাটোপে তারা বিপর্যস্ত।

কাঠের তৈরি ঝোলানো বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসার শব্দ। রবীন ঘোষ লক্ষ করলেন, তাঁদের লোকাল কমিটির সেক্রেটারি ঘনশ্যাম রায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ভিতরে যেমন বসেছিলেন তেমনই বসে থাকলেন রবীন ঘোষ। মুখে বললেন, আসুন, বসুন। তার পর দেয়ালের সুইচে চাপ দিলেন।

বেয়ারারা এসে চায়ের অর্ডার নিয়ে চলে যেতেই ঘনশ্যাম বললেন, আজ তো গোলাগুলি চলল। তাই আসতে দেরি হল।

গোলা গুলি? কখন? প্রশ্ন করতে-করতে উঠে পড়লেন বারীন ঘোষ। তার পর ঘনশ্যামের সামনে একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে বসে প্রশ্ন করলেন, কারণ?

কারণ হল লোকগুলো ক্যাম্পের বাইরে আসতে চেয়েছিল। পুলিশ ভেবেছে, বিদ্রোহ। আসলে এখানকার প্রধান বিরোধী দলের একটা চাল এটা। ওরা লোকগুলোর জন্য খাবার ব্যবস্থা করেছিল। ঘনশ্যাম ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন।

একটু অস্থির রবীন ঘোষ। অসহিষ্ণুও। বললেন, ওরা খাবার ব্যবস্থা করেছিল? মানে!

অভিযোগ উঠেছে, এখানকার প্রশাসন লোকগুলোকে ঠিকমতো খেতেও দিচ্ছে না। খিচুড়ি-মিচুড়ি দিচ্ছিল। তার ওপর পানীয় জলের তেমন ব্যবস্থা করেনি। থাকার জায়গাটাও তেমন নয়। ওটা তো ছিল ফ্যাক্টরি শেড। বাথরুম-টাথরুম কিছু নেই। অথচ বাইরের লোককে এসব দেখতে অ্যালাউ করছে না। তাই বিরোধী দলের লোকজন বড় রাস্তার উল্টো দিকে জঙ্গলের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থা করেছে। ওরা বাহাদুরি দেখিয়ে বিরিয়ানি-ফিরিয়ানির ব্যবস্থা করেছিল। অবশ্য পয়সা তো ওদের লাগেনি। শহরের ব্যবসায়িক সমিতিই সব জোগান দিয়েছে। এরা মুফতসে নিজেদের বাহাদুরি কুড়িয়ে নিচ্ছে।

ঘনশ্যামকে থামিয়ে দিয়ে রবীন ঘোষ প্রশ্ন করলেন, সে-সব পরে শুনব। এখন বলুন, আজকের গুলি ছোড়ার কারণ কী?

ভেতরে-ভেতরে ধিকিধিকি ক্ষোভের আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল ক-দিন ধরে। স্থানীয় মানুষদের চাপও একটা ছিল। জঙ্গল থেকে বিতাড়িত লোকগুলোকে যে আটকিয়ে রাখা হচ্ছে, এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এ-দিকে প্রশাসন তো ওদের সেটেলমেন্টের কোনো দায়িত্ব নিতে চায়নি। ফ্যাক্টরি শেডের মধ্যে লোকগুলোর খাবারও জুটছিল না ঠিকমতো। সে-কারণে আজ ওরা বিক্ষোভ জানায়। বাইরে তাদের জন্য রান্নাবান্না করে লোকে বসে আছে, এটা ভেতরের লোকগুলো জানতে পেরেছিল। শেষে ওরা গেট ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। শুনলাম, ভেতরের লোকগুলো নাকি চা-বাগানের মেসিনপত্র ভেঙে তার পার্টস দিয়ে যারা ডিউটি দিচ্ছিল গেটে, তাদের আক্রমণ করে প্রথমে। তার পর গেট ভেঙে ফেলে দেবার উপক্রম হতেই পুলিশ গুলি ছোড়ে। তার আগে অবশ্য কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়েছিল।

খুব আগ্রহ নিয়ে ঘনশ্যামের কথাগুলো শুনছিলেন রবীন ঘোষ। বললেন, তার পর?

যা দেখে এলাম, তাতে মনে হল ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে উঠল। গুজব রটেছে, ক-জন নাকি মারা গেছে। পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। দেখে মনে হবে যেন একটা রণাঙ্গন। কথাগুলো বলে থামলেন ঘনশ্যাম।

তা অবশ্য হতে পারে। একটু আগে এই বাইনাকুলার দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম জায়গাটা। দেখলাম, পুলিশে ভরে গেছে। দেখে মনে হল জায়গাটা হয়ে গেছে। সবুজ টি-এস্টেট, লালরঙের টিনশেড আর খাকি রঙের পুলিশের দল। তাই না? প্রশ্ন করলেন রবীন ঘোষ।

তা তো ঠিক। কিন্তু খবর নিতে পারলাম না, আদৌ কেউ মারা গেছে কি না, অথবা, গেলে ক-জন। আক্ষেপ ঘনশ্যামের।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রবীন ঘোষ বললেন, হুঁ, ব্যাপার তো বেশ সিরিয়াস। এমন চললে আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির তরফ থেকে এখুনি একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তার পর একটু নীরবতা।

ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নাড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন রবীন ঘোষ। বাইরের বারান্দার দিকে যেতে-যেতে বললেন, আচ্ছা, ওখানে যাওয়া যায় না এখন?

না না, এখন সম্ভব নয়। আসার পথে দেখলাম, পুলিশ সব গাড়ি শহরের দিকে নীচে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ভাব দেখে মনে হল, কারফিউ বা একশো চুয়াল্লিশ জারি করতে পারে। চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব ঘনশ্যামের।

কাঠের বারান্দার অন্য প্রান্তে গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে দুই তরুণ-তরুণী। দূরে পাহাড়ের আবছা কালো রং। সম্ভবত সেই পাহাড়ের কাছে বিনোদিনী টি-এস্টেটের দিকে ছিল তাদের নজর। আবছা আলোতে সেই চা-বাগান এখন মুছে গেছে।

বারান্দার রেলিং-এ তরুণ তুর্কী নেতা জোরে তার ডান হাতের মুষ্টিতে কিল মেরে একটা শব্দ করলেন। তার পর সেই তরুণ-তরুণীর দিকে তাকিয়ে ঘনশ্যামকে বললেন, সবই বুঝলাম। কিন্তু এত বড় ঘটনাটা যে ঘটল, তা তো এমনি-এমনি হয়নি! ভিতর-ভিতর এর প্রস্তুতি চলছিল। আপনিই বললেন।

তা তো নিশ্চয়। বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন ঘনশ্যাম।

আমি বলতে চাইছি, যখন কোর্ট থেকে এমন একটা ডিসিশন এল, তখন থেকে আপনারা কোনো স্টেপ নিলেন না কেন? সে-সময় যদি ওই হতভাগ্যদের সঙ্গে থাকতেন, তা হলে আমাদের পার্টির বেসটা একটু শক্ত হত। এতদিনের একজন কমরেড আপনি! আপনারা নিজেরা কিছু করলেন না, হায়ার অথরিটিকেও কিছু জানালেন না। কী ব্যাপার? বেশ রাগ-রাগ ভাব রবীন ঘোষের।

আমরা কিছু করিনি, কথাটা ঠিক নয়। করেছি। হ্যাঁ, তবে কোর্টের ডিসিশনের সঙ্গে-সঙ্গে নয়। যেদিন জানতে পারলাম শীতলাপুর ফরেস্ট থেকে ফরেস্ট অকুপায়ারদের বের করে দেওয়া হবে, সেদিন রাত্রে আমরা সভা করি। গোপন সভা। সেই সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি আর সত্য কর, দুজনে ওই জঙ্গলে চলে যাই পরের দিনে। ওদেরকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করি। তবে জঙ্গলে ওদের সঙ্গে আমাদের দলের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ওরা কতটা এক্সপেক্ট করেছিল, বলতে পারব না। আপনি তো জানেন, জঙ্গল অন্য দল নিজেদের কন্ট্রোলে রেখেছে বহুকাল ধরে। তারা যা বলে, জঙ্গলের মানুষরা তাই করে। আমরা এটা অন্তত বুঝতে পেরেছিলাম, তির-ধনুক, যা-যা ওয়েপন ওদের আছে, তা দিয়ে ওরা লড়বে। হাজার হলেও ওরাই তো আসল ভূমিপুত্র। বংশানুক্রম ধরে জঙ্গলেই ওদের বাস।

ঘনশ্যামের কথার মধ্যে রবীন ঘোষ বলে উঠলেন, তবে? আপনাদের আন্দোলন করার পক্ষে সয়েল রেডি ছিল। কেন ভয় পেয়েছিলেন আপনারা? কমরেড, জানেন তো, আমাদের ডিকশনারিতে ভয় বলতে কোনো শব্দ নেই। কথাগুলো বলতে-বলতে রবীন ঘোষ ঘুরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে হেলান দিলেন।

কাঠের বারান্দায় এক জন বেয়ারা এসেই চলে যাচ্ছিল। 'এই ভাই, এই ভাই' বলে রবীন ঘোষ ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। সে কাছে আসার পর বললেন, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। দু-কাপ চা পাঠিয়ে দাও তো।

বেয়ারা চলে যাবার পর আবার কথার সূত্র ধরে বলা শুরু করলেন রবীন ঘোষ। বললেন, কমরেড আপনি খবর রাখেন কি না জানি না, আমার কলেজ-লাইফে আন্ডারগ্রাউন্ড কাজের সময় এই শীতলাপুর ফরেস্ট সেন্টারটা বেছে নিয়েছিলাম। অবশ্য সেটা ওই বর্ডারের দিকে। তবে ওখানকার মানুষজনদের জীবন দেখেছি খুব কাছ থেকে। এত ইনোসেন্ট ও হেল্পফুল মানুষ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। আর ওই কোর্টের ডিসিশনের কথা বলছেন? হোপলেস। এখন তো আদালত কত কী রায় দিয়ে বসছে। সংবিধানের সেফগার্ডে থেকে যথেচ্ছাচার হচ্ছে কখনো-কখনো। এক কোর্টের রায়, অন্য কোর্টে নাকচ হয়ে যায়— কেন বলুন তো? ল তো সব জায়গায় সমান! জঙ্গলে বসবাস করলেই জঙ্গল নষ্ট করা হচ্ছে, এটা কি সব সময় মানা যায়? যায় না। এখন পরিবেশ পরিবেশ নিয়ে হইচই হচ্ছে। ব্যাপারটা একটা স্টেজ পর্যন্ত ঠিক আছে। তার বাইরে গেলেই ডেনজারাস। এইসব লোকগুলো, হাজার হলেও পোচার নয়। তারা কাঠ পাচার করেছে, শুনেছেন কখনো? এরা জন্তু-জানোয়ার মেরে তার শিং, হাড়, চামড়া বিদেশে পাঠাচ্ছে, শুনেছেন? শোনেননি। অন্তত জঙ্গলের অধিবাসীদের নিয়ে এ-ধরনের কোনো বড় রকমের অভিযোগ আমার জানা নেই। একটানা কথাগুলো বলে থামলেন রবীন ঘোষ।

ঘনশ্যাম এখন আলোচনামুখী। তিনি বললেন, ঠিক তাই। ওদের নিয়ে আমরা এখানকার প্রশাসন থেকে এর আগে কোনো বড় রকমের অভিযোগ শুনিনি। তা ছাড়া ওরা মূলত নিজেরা

নিজেদের মধ্যেই থাকত। টুকিটাকি প্রয়োজন ছাড়া শহরে ওদের যেতে দেখা যেত না। বক্সিরহাটেই ওদের যাতায়াত। সে-হাট কেবল ওদের জন্যে। সেখানে ওরা সংসারের টুকিটাকি, হাঁড়িয়া-টাড়িয়া বেচে-কেনে। শহরের লোকজন বা জঙ্গলের আশেপাশের গ্রামে ওরা কোনো ঝামেলা করেছে বলে জানি না। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন বলছে, কোর্টের অর্ডার অনুসারে আমাদের চলতে হবে। আমরা তাই ওদের জঙ্গল থেকে বের করে দিচ্ছি।

বেয়ারার আনা চায়ের কাপ হাত বাড়িয়ে নিলেন ঘনশ্যাম।

রবীন ঘোষ ঘনশ্যামের কাঁধে ডান হাত রেখে বললেন, তা হলে বলুন, এই আসল ভূমিপুত্রদের বিরুদ্ধে এমন চক্রান্ত হল কেন? ব্যাপারটা আপনারা অন্যভাবে দেখতে পারতেন। আসলে জঙ্গল তো সাফ হয়ে যাচ্ছে। সরকার তা বন্ধ করতে পারছে না। পারলেও করবে না। কারণ, ওখান থেকে পার্সেনটেজ আসে। কিন্তু এই আমরা, সাধারণ মানুষরা প্রতিবাদ করছি। বন-জঙ্গল লোপাট হবার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। চারিদিকে সমালোচনা। শহরে-শহরে 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' বলে শ্লোগান দিয়ে শহরবাসীদের উদ্দীপ্ত করা হচ্ছে। শহরের লোক গাছ বাঁচাতে আগ্রহী হচ্ছেন। কিন্তু বন যে এদিকে ফাঁকা। তাই বাহানা। জঙ্গলবাসীরাই জঙ্গল শেষ করে দিচ্ছে বলে কুম্ভীরাশ্রু পাত করছে সরকার। তা ছাড়া আর একটা বিষয় লক্ষ করেছেন কি কমরেড?

ঘনশ্যামের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে রবীন ঘোষ এখন ঘনশ্যামের মুখোমুখি।

ঘনশ্যাম জানতে চান 'সেই বিষয়টি' এমন ভাব করে বললেন, নাহ্, বলুন তো, কী সেই বিষয়?

আপনাদের এখানকার শহর ক্রমশ বেড়ে-বেড়ে নদীর এপাশে চলে এসেছে। জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। তা-ছাড়া এখন এই শহরে বাইরের লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। অনেকে এখানে সেটল করতে শুরু করেছে। কিন্তু বাড়তি জায়গা কোথায়? হয় শহরের আয়তন বাড়াতে হবে, না হয় আর-একটি নতুন শহর তৈরি করতে হবে। তা, যে-ব্যবস্থা নেওয়া হোক না কেন, বনজঙ্গল দখল না করে উপায় নেই। জঙ্গলবাসী বিতাড়িত হলে অনেকটা অ্যাডভানটেজে থাকবে সরকার। তার পর একটু থেমে রবীন ঘোষ বললেন, চলুন, ভিতরে বসি। আরও দু-চারটে কথা আছে।

ঘরে ঢুকে পর পর তিনটি সুইচ টিপে দিলেন রবীন ঘোষ। ঘর আলোয় আলোময়। অল্প-অল্প ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকছে। রবীন ঘোষ দরজার পাল্লার ওপরে তুলে-রাখা পরদাটা নামিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসলেন। বিছানার অন্য পাশে ঘনশ্যাম।

রবীন ঘোষ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা কমরেড, ওদের যখন জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা হল, তখন আপনারা কী করছিলেন?

আমরা কেন, অন্য দলেরও অনেকেই ছিল। পুলিশ কর্ডন করে রেখেছিল। এক্সট্রা-ফোর্স দেওয়া হয়েছিল সেদিন। শীতলাপুর ফরেস্টে অত পুলিশ, অত পুলিশি ট্রাক, ভ্যান দেখে মনে হচ্ছিল, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পুলিশ ছাড়া প্লেন ড্রেসে আরো অনেক লোকজন ছিল। তারাই ফটাফট লোকগুলোর ঘরবাড়ি ভেঙে ভেতর থেকে মালপত্তর বের করে ট্রাকে তুলে দিচ্ছিল। লোকজনদের জোর করে সেই ট্রাকে তুলে দিতেই ট্রাক হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল। ওরা বর্শা, বল্লম নিয়ে কোনো প্রতিরোধ করতে পারেনি। ওদের কোনো লিডার-টিডারও ধারেকাছে ছিল না।

আমরা অসহায় ছিলাম। আমি দেখেছি, ওরা নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ কিছুই মানেনি। টেনেহিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে এনে গাড়িতে তুলে দিচ্ছে। পরের দিকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে কালাদিবস পালন করেছিলাম। কথাগুলো বলে ঘনশ্যাম যেন তৃপ্তি পেয়েছেন, এমন ভাব তাঁর চোখেমুখে।

৩.

সকালের ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে নেমেই স্বরাজ দেখল, তার সামনে তরুণ দাঁড়িয়ে।

তরুণ বলল, তোমার ট্রেন পাক্কা পঁচিশ মিনিট লেট। আমি অবশ্য অনেক আগে প্ল্যাটফরমে চলে এসেছি। পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

নাঃ, কোনো অসুবিধে হয়নি। কাঁধে সাফারি ব্যাগ তুলতে-তুলতে স্বরাজ বলল।

এদিকে অবস্থা সাংঘাতিক। কাল ফায়ারিং হয়েছিল। একজন স্পট-ডেড। গুজব উঠেছে, দশ-বারো জন নাকি মারা গেছে। স্বরাজের সঙ্গে-সঙ্গে স্টেশনের বাইরে বেরোতে-বেরোতে তরুণ বলল।

জানি। একজন মারা গেছে। প্রায় ষাট ছুঁই-ছুঁই। গণেশ মুর্মু। আজকের কাগজে নিউজটা বড় করে দিয়েছে। কথাগুলো বলতে-বলতে স্বরাজ তরুণের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল।

কয়েক পা এগিয়ে স্বরাজ আবার বলল, তা, তোমার স্টোরির অবস্থা কী? কতটা এগোলে?

বেশ অনেকটা। আনোয়ারটা যথেষ্ট হেল্প করেছে। ওর ওখানেই উঠেছি। ওর মোটরবাইকটা নিয়ে এসেছি। চলো। তরুণ বলল।

মোটরবাইকে ওঠার আগে তরুণ বলল, চলো, আগে কোথাও বসে একটু চা খেয়ে নিই।

রাস্তার পাশে একটা রেস্টুরেন্টে চায়ের অর্ডার দিয়ে তরুণ বলল, গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত বিনায়ক বলে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে কাটালাম। শীতলাপুর ফরেস্টের হিস্ট্রি ভদ্রলোক মাকড়সার জালের মতো চেনেন। আর ওখানকার লোকগুলোর অনেকের নাম পর্যন্ত। এখন শয্যাশায়ী, সত্তর পেরিয়েছে হয়তো। একসময় ওই জঙ্গলে, ওই জঙ্গলবাসীদের সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন। বছরের পর বছর। আনোয়ার হেলথ সেন্টারের অফিসার হলে কী হবে, ব্যাটা এসব খবর জানত। ওর হিস্ট্রি বিষয়ে, বিশেষ করে লোকাল হিস্ট্রি জানার ব্যাপারে বেশ ইন্টারেস্ট। ও-ই বিনায়কবাবুর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আর আমাদের কাগজের তরফ থেকে এখানকার এই জঘন্য ষড়যন্ত্র নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে কভারস্টোরি তৈরি করছি জেনে উনি খুব সহযোগিতা করলেন।

একটু থেমে তরুণ আবার বলল, জানো তো, কাল যে-লোকটি পুলিশের ফায়ারিং-এ মারা গেল তাকেও উনি চিনতেন। প্রথমে একটা ভুল খবর ছড়িয়েছিল এখানে। বলা হয়েছিল, লোকটা আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে। কারণ তাকে হসপিটালে যখন আনা হয়েছিল তখন দেখা গেছিল — তার মুখটুখ পোড়া। সারা শরীরে পোড়ার দাগ। মুখটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। পরে অবশ্য জানা গেল, সে বহু বছর আগে আগুনে সাংঘাতিকভাবে পুড়ে গেছিল। সেদিন ফায়ারিং-এ তার মৃত্যু। বুলেট বাঁ-কানের পাশ দিয়ে ঢুকে মাথার ভেতর দিয়ে উলটো দিকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর সে-কথা বলতেই ভদ্রলোক, মানে বিনায়কবাবু বললেন, ওহ্, ওটা তো গণেশ, গণশা। গণশার এভাবে মৃত্যু হল। তার পর ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। মনে হচ্ছিল, উনি গণেশ মুর্মুর মৃত্যুতে ভয়ংকর শোকাহত হয়েছেন।

চা আর মাখন-লাগানো টোস্ট তরুণের সামনে ঠাণ্ডা হচ্ছে। সেদিকে তরুণ বা স্বরাজের নজর নেই।

হঠাৎ ইলেকট্রিক চলে গেল। তার পর তরুণের খেয়াল হল। বলল, টোস্ট খাও। গতকাল রাতে খাওয়া হয়েছিল?

আমি ট্রেনে কিছু কিনে খাই না। বিস্কুট আর মিনারেল ওয়াটার। ব্যাস। হাসি-হাসি মুখে বলল স্বরাজ। টোস্টে কামড় দিয়ে বলল, তার পর?

তার পর যা শুনলাম, তাতে আর কারোর কাছে না গেলে হবে। বাস্তুচ্যুত লোকগুলোর বর্তমান জীবনের থেকে পুরনো দিনের কথা জানতে চাই আমি। তা, ওঁর কাছ থেকে লোকগুলোর পুরো ইতিহাস জেনে নিলাম। এমনকী কোথা থেকে ওরা এখানে এল, তারো কাহিনী। শুনে আশ্চর্য হবে, এ-সব নিয়ে আমাদের কোনো ঐতিহাসিক তেমন ইন্টারেস্ট দেখাননি। এ একেবারে আনটেম্‌ড স্টোরি হবে। স্টোরির নাম ঠিক করেছি— বন থেকে বেরুল ছতি।

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে স্বরাজ বলল, বেশ নাম দিয়েছ।

শুধু নাম নয়। আরে, বিনায়কবাবুর কাছে থেকে খনির সন্ধান পেয়েছি। গদগদ তরুণের গলা।

কেমন, শুনি! বিস্তারিতভাবে জানার জন্য স্বরাজ বলল।

তরুণ বলল, বললাম তো যে, ভদ্রলোক দীর্ঘকাল ওই ফরেস্টের অধিবাসীদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। আর ওই-যে গণেশের মুর্মুর মৃত্যু হল, তা নিয়েও জানলাম ওঁর কাছে। একবার ওই শীতলাপুর ফরেস্টে দাবানল লেগে যায়। আগুনের হাত থেকে ফরেস্ট বাঁচানোর জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও ওদের সাহায্য নিয়েছিল। যে-গণেশ মুর্মু বন্দুকের গুলিতে মারা গেল, ওই—ওই সেদিন জঙ্গলের আগুন নেবাতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে নিজেই আগুনে দগ্ধ হয়। সেদিন, আগুন যাতে আর না ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই জন্য গণেশ একাই যে কত গাছ কেটে শুইয়ে দিয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। ছুটে-আসা আগুন থেকে সেগুলো সরিয়ে দেওয়াতে আগুন আর ছড়াতে পারেনি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা এ-জন্য ওকে হসপিটালে পাঠায় এবং পরে কিছু টাকা পুরস্কারও দিয়েছিল। ফরেস্ট -গার্ড করার অফারও লোকটা নেয়নি। বলেছিল, আমরা তো গার্ড এমনিই দিই। নতুন করে আবার কিসের গার্ড। আপনাদের লোককে আমরা সাহায্য করব। গণেশ নাকি বলত, এই জঙ্গল আমাদের মাতৃভূমি, জন্মভূমি। একে বাঁচানোর দায় তো আমাদের। আর, বুঝলে স্বরাজ, জঙ্গলের যে-সব মানুষদের নিয়ে এত ব্যাপার, তারা মনে করত, অরণ্যের সব গাছপালা তাদের পূর্বসূরি। তাদের পূর্বপুরুষেরা কিছুতেই তাদের ছেড়ে থাকতে পারে না। তাই তাদের মৃত্যুর পর তারা ওখানেই গাছ হয়ে জন্ম নেয়। সে-কারণে গাছগুলো ওদের পরম আত্মীয়। গাছেদের ওরা দেবতা হিসেবে পুজো দেয়। বিনায়কবাবু জানালেন, উনি নিজে জেনেছেন, ওইসব জঙ্গলের মানুষেরা কত ভাবে আমাদের মতো মানুষদের সাহায্য করেছে। হাতির আক্রমণ থেকে একবার পাত্রদহ বিদ্যুৎ-প্রকল্পের এক সিনিয়র একজিকিউটিভকে বাঁচিয়েছিল। গভীর রাতে শহর থেকে ওই প্রকল্পের ড্যামের দিকে ওদের ফরেস্টের মধ্য দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। পথে এক কালভার্টের ওপরে হাতির পাল তাঁর গাড়ি থামায়। তার পর আক্রমণ। কিন্তু হাতির শব্দ শুনে ওই জঙ্গলের লোকজন

বেরিয়ে আসে এবং সে-যাত্রা সেই ভদ্রলোক প্রাণে বেঁচে যান। এর পর ওই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় প্রতিবার সেই অফিসার ভদ্রলোকটি ওদের কাছে গিয়ে, কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে তবে ফিরে যেতেন।

এ-পর্যন্ত শুনে স্বরাজ বলল, বাঃ, দারুণ মজার ব্যাপার তো। ওদের ভালো ছবি আমাকে তুলতেই হবে।

টোস্টের শক্ত অংশটা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে-ফেলতে তরুণ বলল এরকম বহু ঘটনা বিনায়কবাবুর কাছ থেকে জানতে পেরেছি। একবার একটা ফ্যামিলি অধিকরাত্রে এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কোমাজ চা-বাগানের দিকে যেতে-যেতে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। ওরা প্রথমে পাত্রদহের দিকে চলে গেছিল। তার পর সেখানকার গেট-কিপারের কাছ থেকে পথের হদিশ নিয়ে ফিরে এসেও সেই কোমাজ চা-বাগানের দিকে যেতে পারছিল না। গাড়ি সারারাত জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল। ব্যাপার হল, ওই চা-বাগানে যাবার কোনো স্থায়ী রাস্তা তখন ছিল না। কারণ তার কয়েকমাস আগে ওখানে বন্যা হয়েছিল। বন্যায় সব রাস্তা ধুয়েমুছে একাকার। এবং মাঝে-মাঝে বড়-বড় ঝোরা বা নালার ওপর দিয়ে যে-সব ব্রিজ ছিল, তাও ভেঙে গেছিল। সে-রাতে ওই নিশি-পাওয়া গাড়ির যাত্রীদেরও ওই জঙ্গলের লোকেরা উদ্ধার করে। সেই গাড়ির যাত্রীরা সে-সময় এত আতঙ্কিত আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল— তা নাকি কল্পনার বাইরে। তা হলেই বোঝো স্বরাজ, ওইসব লোকগুলো কত হেল্পফুল ছিল। ভাবা যায়! শীতের রাতে জঙ্গলের মধ্যে পথ-হারানো মানুষজনদের উদ্ধার করা যা-তা ব্যাপার নয়। সমতলে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা মানুষরা কি এসব কল্পনাও করতে পারবে?

মাথা নাড়ল স্বরাজ। বলল, ঠিকই তো। কে আর ওদের খবর রাখে! সে-হিসেবে তোমার স্টোরি ভাল হবে মনে হয়।

এই যে ওদের জঙ্গল থেকে উৎখাত করা, এ বোধহয়, সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না। যে-কেউ মানবাধিকার কমিটির কাছে এ-বিষয়ে আবেদন করতে পারে। তরুণ বলল।

হ্যাঁ পারে। পারতেই পারে। তোমার লেখায় সেটা হাইলাইট কর। চায়ের কাপে হাত রাখে স্বরাজ।

আরো অনেক ব্যাপার আছে। জঙ্গলে ওরাই চোরাকারবারিদের রোখে। ওরাই চোরাকারবারিদের গতিবিধি ফরেস্ট-গার্ডদের জানায়। বিনায়কবাবুর কাছে এও জানলাম, অনেক সময় আহত জন্তু-জানোয়ারদের চিকিৎসাও করে ওরা। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা নাকি সত্যি। জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষী, সবই যেন ওদের ঘরের সদস্য । মনে হতে পারে, এটা বেশি বেশি। কিন্তু বিনায়কবাবুর ধারণা, বংশপরম্পরার এসব হয়ে আসছে, তাই ওরা মানে। এমনকী, ওরা অনেক গাছকে নিজেদের রান্না খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে । অর্থাৎ সে-গাছটি ওদের মতে দেবত্বপ্রাপ্ত, দেবতাকে না খাইয়ে নিজেরা খেতে পার না। কথাগুলো বলে তৃপ্তির হাসি হাসল তরুণ।

রেস্টুরেন্টে চা-টোস্টের দাম চুকিয়ে মোটরবাইকে ওঠার আগে তরুণ প্রশ্ন করল, তুমি কি নাইট-জার্নিতে টায়ার্ড? টায়ার্ড না হলে আনোয়ারের অফিস ঘুরে বিনায়কবাবুর ওখানে যেতাম। বিকেলে অন্য একটা কাজ করব ঠিক করেছি।

না, না আমি একটুও টায়ার্ড নই। চলো, তোমার আনোয়ারজির সঙ্গে আলাপ করে

আসি। স্বরাজ বলল।

আনোয়ারের অফিসে ওদের ঢুকতে হল না। অফিসবাড়ির সামনে আনোয়ার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিল। তরুণদেরকে দেখেই অন্যদের কাছ থেকে সরে এসে তরুণকে প্রশ্ন করল, তুমি কি বিনোদিনী টি-এস্টেটের ওখান থেকে আসছ? লেটেস্ট খবর কী?

অবাক হয়ে তরুণ বলল, বাহ্, তোমায় বলে গেলাম, আমাদের কাগজের ফোটোগ্রাফারকে রিসিভ করার জন্য স্টেশনে যাচ্ছি, আর তুমি বলছ বিনোদিনী টি-এস্টেটে গেছিলাম কি না! বেশ তো!

কারণ আছে। তা হলে তুমি ব্যাপারটা জানো না। আনোয়ার বলল।

কী কারণ? এনি নিউজ? একটু ব্যাগ হয়ে প্রশ্ন করল তরুণ।

হ্যাঁ, খবর আছে। কাল, গোলাগুলি চলার সময়, ওখান থেকে কয়েকজন বনবাসী পালিয়েছে। আমাদের এখানে যে-রাজনৈতিক দলের তেমন কোনো বেস নেই, তারাই কাল রাত থেকে আন্দোলনে নেমেছে। হিসেব করে দেখা গেছে, এগারো জন নেই। মানে মিসিং। নেতারা বলছে, তাদেরও হত্যা করা হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়। প্রশাসন বলছে, পালিয়েছে। সম্ভবত, আগামীকাল বন্‌ধ ডাকবে ওরা। প্রধান বিরোধী দল তো বিচার-বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছে। আজ সকালে টিভির নিউজ।

৪.

লীলারানীর কাছে বিনায়কের উধাও হয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত শুনে তরুণ বিমর্ষ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তরুণরা বিনোদিনী টি-এস্টেটের পূর্বের রাস্তা দিয়ে টি-এস্টেটের ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে জেনে এসেছে, এগারো জন লোক উধাও হয়ে গেছে। তাঁরাও বিশ্বাস করেন না, এত জন লোক সেদিন ফায়ারিং-এ মারা গেছে। তবে ক-দিন ধরে তাঁদের চা-বাগানে কাজ প্রায় মাথায় উঠেছে। বহু টাকার লোকসান ঘাড়ে চেপে যাবার ভয়ে আছেন তাঁরা।

শীতলাপুর, ফরেস্টের কয়েকজন অধিবাসীর উধাও হবার ঘটনার সত্যাসত্য জানার পর তরুণ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে-সময় স্বরাজ বলল, যা হবার হোক। একটু সন্ধে হলে সব ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। দেখছি তো, পুলিশ ছোটাছুটি শুরু করেছে। আমরা বরঞ্চ এ-সময়ে শীতলাপুর ফরেস্টে ঢুকে লোকগুলো যেখানে থাকত, সেখানকার কিছু ফোটো তুলে আনি। তোমার লেখা কভার-স্টোরির সঙ্গে ওখানকার ফোটো থাকলে ভালই হবে।

মোটরবাইক ঘুরিয়ে তরুণরা শীতলাপুর ফরেস্টে খোঁজ নিতে-নিতে বাস্তুচ্যুত বনবাসীদের ঘরদোর-ভেঙে-ফেলা অঞ্চলে এসে পৌঁছেই অবাক হয়ে গেল। যে-বিনায়ক বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না, যিনি বহুকাল শয্যাশায়ী, যাঁর হঠাৎ উধাও হওয়ায় তাঁর স্ত্রী শোকে মুহ্যমান, তিনি সশরীরে উপস্থিত। কাঠ দিয়ে তৈরি একটা মাচাতনে অর্ধ-শোয়া অবস্থায়। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার, বিনোদিনী টি-এস্টেটের ক্যাম্প থেকে পালানো লোকগুলি আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে। তরুণরা তাদের কাছে যেতেই দু-তিনজন বনবাসী হাতে কুঠার নিয়ে রে -রে করে তেড়ে এল। প্রশ্ন করল, কী চাই আপনাদের? যান, পালান শিগগিরই। না গেলে এখানে পুঁতে ফেলব। লোকগুলোর চোখ দিয়ে আগুনের গোলা বেরুচ্ছে।

তরুণদের চিনে ফেলেছেন বিনায়ক। তিনি লোকগুলোকে থামতে বললেন। তাদের উদ্দেশে

বললেন, ওরা আমার লোক। রিপোর্টার। আমাদের খবর ছাপাব বলে ওদের আসতে বলেছি। প্রশাসন এখনকার লোকজনের ওপরে যে-বর্বর অত্যাচার করেছে তার খবর নেবে ওরা। তার পর তরুণদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এসো তোমরা। তরুণের সঙ্গে স্বরাজকে দেখে বললেন, উনি? ওকে চিনতে পারলাম না তো।

স্বরাজের দিকে ফিরে তরুণ বলল, ও স্বরাজ। আমাদের ফোটোগ্রাফার।

স্বরাজ বিনায়কের দিকে জোড়া-হাত তুলে নমস্কার জানাল।

বিনায়ক এবার শুয়ে পড়েছেন। শুয়ে-শুয়েই বললেন, বাড়িতে আর থাকতে পারলাম না। এরা আমার আত্মার চেয়ে প্রিয়। এ-দুনিয়ায় এখনো কিছু নিষ্পাপ লোক আছে। ওদের বিপদের দিনে আর নিজের অসুখকে অসুখ ভেবে বিলাসিতা করলাম না। চলে এলাম।

তরুণ মাথা নিচু করে অস্পষ্ট স্বরে বলল, ঠিক করেছেন। এই স্বরাজ, আগে এই ফোটোটা নাও।

স্বরাজ বিনায়কের ফোটো তোলার জন্য উদ্যত হতে বিনায়ক বললেন, না। আমার ছবি তুলো না। আচ্ছা, তোমার লেখাটা তৈরি হয়েছে? কী নাম দিয়েছ?

তৈরি হচ্ছে, নাম ঠিক করেছি। নাম দিচ্ছি, বন থেকে বেরুল হুতি। তরুণ বলল।

নামের সঙ্গে জুড়ে দাও, লেখো: বন থেকে বেরুল হুতি, হুতি বলে তোদের জুতি। কথাটা বলে বিনায়ক চোখ বন্ধ করলেন।

ক্রোড়পত্র

ক্ষীর

আবুল বাশার

মেয়ে বিক্রির গল্প করছিল ওরা। শিবাজি গলার শিরা ফুলিয়ে বলবার চেষ্টা করছিল, শোনপুরের মেলায় এখনো বাস্তবিকই মেয়ে কিনতে পাওয়া যায়।

— যায়?

— আলবাত যায়, একশোবার যায়। বলছিল শিবাজি গোস্বামী।

অলক দুম করে বলে বসল, আমি তা হলে একটা মেয়ে কিনব, কিনবই, কেউ আমাকে ঠেকাতে পারছে না বলে দিলাম। কত দাম?

— তিন-চার হাজার।

— ঠিক করে বল।

— দুই-আড়াইতেও নাকি পাওয়া যায়।

— মাত্র দু-হাজার টাকায় একটা আস্ত মেয়ে?

— অবাক হচ্ছিস তো! আরে ভাই ভারতবর্ষে সব হয়।

বনমৌলি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল, কক্‌খোনো না।

অনন্য তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, মৌলির লেগেছে বোধহয়।

অভিনন্দন খ্যা-খ্যা করে বেমক্কা হেসে দেয়। এই হাসিটাই বড্ড খারাপ।

— তুমি হাসছ অভি! কেন হাসছ, এটা হাসির কথা? তখন থেকে শিবাজি বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে! তনুশ্রীও তখন থেকে মিটকে-মিটকে হাসছে। আজ তোদের কী হয়েছে, আলোচনার বিষয় ফুরিয়ে গেছে বোধহয়! এই আলোচনা এখনই বন্ধ কর, না হলে আমি উঠে যাব।

— ব্যস।

— আবার কী!

— মানে?

দু-তিন জনের গলায় 'ব্যস, আবার কী, মানে'—ধ্বনিত হয় জড়িয়ে-মড়িয়ে এবং শিবাজি বলবার চেষ্টা করে, সে মোটেও মিথ্যে বলছে না। শোনপুরের মেলায় সত্যিই মেয়ে কেনাবেচা হয়।

— হয় তো হয়, তাই নিয়ে আলোচনা! তোরা মজা পাচ্ছিস? নিশ্চয় পাচ্ছিস। বলে বনমৌলি তেরছে তাকায় শিবাজির দিকে।

শিবাজি সামান্যই লজ্জা পায় এবং আমতা-আমতা করে কী একটা বলতে চেষ্টা করে, পারে না।

অনন্য এদের মধ্যে হাই ইন্টেলেকচুয়াল এবং গম্ভীর প্রকৃতির। সে মজা পাচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। অভিনন্দন দাঁত বার করেই রয়েছে, অবশ্য ওর দাঁত আপনা থেকেই হামেশা ঠোঁটের বাইরে চলে আসে, মুখ-বিবরে আঁটে না। ফলে তার চেহারা সর্বক্ষণ নির্লজ্জভাবে হাসি-হাসি দেখায়।

শিবাজিই আজকের মৌলিকে উত্যক্ত করার ফুঁপি। তার উপরই বিশেষ রেগেছে বনমৌলি।

তনুশ্রীর উপরও মৌলির চাপা রাগ চোখে-মুখে ছটফট করছে।

অলকের চোখে চোখ রেখে চোখ মটকায় অভিনন্দন, যার অর্থ: মৌলি খেপেছে, এবার তক্কো হবে পেল্লাই। আসর জমে উঠবে। তা ছাড়া মজা তো পাচ্ছেই তারা।

এরা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে সবচেয়ে কম কথা বলে মাসুদ রেজা। রেজাকে সবাই এরা রাজা বলে ডাকে। রাজা কোনো কথাই বলছে না, চুপচাপ শুনছে।

— শোনপুর জায়গাটা কোথায় রে শিবাজি? অলকের আমুদে জিজ্ঞাসা।

— বিহারে। শিবাজির জবাব।

— তুই যাবি? অলক জানতে চায়।

— সত্যিই যাব। মেলার ছবি তুলব। এখানকার একটা হাফ-কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনে স্টোরি-ফিচার করব। সব কথা বলে পাক্কা করে রেখেছি। বলে ওঠে শিবাজি।

অনন্য তনুশ্রীর চোখে অন্যমনস্ক দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, ওই স্টোরি চার বছর আগেই ছাপা হয়ে গেছে। অতএব এই রকম একটা বাসি চেষ্টার মানে হয় না।

অভি দড়াম করে বলল, হয়।

অনন্য অভির দিকে চাইল। শান্ত চোখে। নিজের মুখের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, কী করে হয়? শিবাজি তো সব সময় আমাদের পুরনো স্টক অভিনন্দন। ইসে এবং ইসে।

এই 'ইসে এবং ইসে' কথাটা কোনো রহস্য আড়াল-করা সাংকেতিক কিছু, হয়তো অনন্য মদ্যপানের ব্যাপারে বলছে বা আর কিছু — রাজা বাদে সবাই চকচকে করে হাসছে। অভি দাঁত আরো বার করে ফেলেছে।

তনুশ্রী তার চোখে দুষ্টু আলো খেলিয়ে জানতে চাইল, মানে?

অনন্য চোখের রহস্যঘনতা পলকে উধাও করে দিয়ে গলা গাঢ় করে বলল, ও আর কবে নতুন কথা বলেছে! তোমরা হয়তো জানো না, আলাউদ্দিন খিলজির আমলে এই বাংলায় তিনটি ছাগলের বিনিময়ে হাট থেকে একটা মেয়ে কেনা যেত, মানুষ কিনত। শোনপুর হচ্ছে তারই হ্যাঙওভার। বা রেস্ট অফ দি সিসটেম। বা...

— থাক। অত সমাজতত্ত্বের দরকার নেই অনন্য। তোমরা মেয়ে কিনতে চাও কেনো, কিন্তু দু-হাজার টাকায় মেয়ে হয় না। এটা বাজে কথা। বলে মুখে মৃদু একটা ঝামটা দেয় বনমৌলি।

অভিনন্দন বলল, শিবাজি সংবাদ-ফিচারফটো সহ করবে, তা করুক। আগে হয়েছে, এখনো হবে। তবে তার চেয়ে বড় কথা, মেয়ে কেনা। ভাবছ না যে, ব্যাপারটা কী রোমাঞ্চকর!

— তাই বল!

— বলব কী বনমৌলি, আমরা যাচ্ছি। আমরা এনে দেখাব।

— দেখাবে বইকি! তোমরা বড় টাকার পণ নিয়ে যথাসময়ে বিয়ে করবে, তা-ও জানি।

— তোমার বাবাও নিশ্চয় সেটা দেবে।

— তোকে! তোর মতো ছেলেকে, অভি? কক্‌খোনো না। রেগে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে বনমৌলি। আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়।

অনন্য হাত তোলে। শোরগোল বাধে। তনুশ্রী বলে ওঠে, এটা কেমন হল ভাই! স্রেফ একটা মজা, তাই তো? না কী? তোমরা থামো, মৌলি চলে যাস নে।

মৌলি পা বাড়িয়ে থমকায়, গোলমাল থেমে যায়, অভি, শিবাজি, অলক হিহি করছিল,

মাসুদও হেসে ফেলেছে। তনুশ্রীও হইচই করার মতো করে হাততালি দিয়ে উঠেছিল। তালি দিয়ে হাসি থামাতে গিয়ে হেসে ফেলছিল। শিবাজি-অভি তেরিয়া হয়ে কী সব বলাবলি করছিল।

মৌলি বলল, আমার বাবা পণ দেবে, এটা রীতিমতো অপমানজনক কথা। আমি এতে নেই।

— কীসে নেই? অনন্যর কপট গম্ভীর মৃদু কৌতুকমেশা প্রশ্ন।

মৌলি বলল, এই ধরনের মেয়ে কেনা, পণ ইত্যাদি।

— পণের কথা তুমিই তো তুললে।

— বেশ তো। আমি চলে যাচ্ছি।

— যাবে কেন? আমরা কেউ মেয়ে কিনছি না। ভাড়াও করছি না। তুমি নিশ্চিন্তে বসতে পারো। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে, এ-দেশে এখনো মেয়ে বিক্রি হয়। চাইলে কেনা যায়।

— হতে পারে।

— তার মানে তুমি বিশ্বাস করছ না?

— করছি না ঠিক নয়, তবে...

— তবে?

আলোচনার টেবিলে ফিরে এল বনমৌলি। টেবিলে হাতের ভর রেখে অনন্যর দিকে ঝুঁকে বলল, এই আলোচনাটা ভালো নয়, আমার ভালো লাগছে না।

শিবাজি বলে উঠল, আমি কিন্তু কিনছি মাসুদ। অ্যাই, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি। ও.কে.? কিনবই কিনব। শস্তা, কচি এবং সুন্দরী।

— অসভ্য! বলে ওঠে মৌলি।

— আমার সভ্যতার দরকার নেই। শিবাজির মন্তব্য।

— তুই মেয়ে কিনলে, আমি পুলিশে খবর দেব। একটা মেয়ে দু-হাজারে হয় না। দৃঢ় ঘোষণা মৌলির।

— তিন হাজারে হয়। বলে শিবাজি।

— তিনটে ছাগলের দাম কত? অলক বলে ওঠে।

— তোর পকেটে কত টাকা আছে রে! মৌলির আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তি।

— দশ।

— ওই তো মুরোদ।

— কেন তুই হবি নাকি!

— মানে!

— বিক্রি হবি? তা হলে আর শোনপুর যেতে হয় না। তোকে টাকা ধার করে কিনব বনমৌলি।

— তাই নাকি!

— অবশ্যই।

শিবাজির চোখে এবার আগুনের চোখ রাখে মৌলি। তার পর টেবিল থেকে হাত তুলে টেবিলের আধখানা কিনারা গোল হয়ে ঘুরে শিবাজিরই কাছে আসে। এবং গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসে।

সবাই তো হতভম্ব। চমকে ওঠে মাসুদ। অনন্যও হতবাক। অভিনন্দনের চোখমুখে একটা কেমন ফ্যালফেলে দৃষ্টি। অলক মাথা নামায়। চড় মেরে দ্রুত একটা চেয়ারে ছুটে এসে বসে

পড়ে মৌলি। তার পর মুখের উপর আঁচল চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে।

শিবাজি চড়-খাওয়া গালে একটা হাত রেখে বলে, মজাটাও বুঝলি না মৌলি, তোকে কেনার মতো ছেলে এখানে নেই।

— আমি ধারে বিক্রি হব! ধারের টাকায় কিনবি আমাকে! চোখের উপর থেকে আঁচল সরিয়ে বলে ওঠে বনমৌলি। তারপরই বলে, পারলে নগদে পারচেজ করে দেখা! বেশ, দু-হাজারেই বিক্রি হব। নে, কিনে নে। পারবি? আছে টাকা? ক-টাকার টিউশন করিস রে!

অলক বলল, তুমি অন্যায় করলে মৌলি। তুমি অত সিরিয়াস না হলেই পারতে। তুমি শিবাজিকে মারলে কেন?

— ছাগলের সঙ্গে মেয়ের তুলনা! গলায় ক্ষোভ মৌলির।

— তুই পাগল বনমৌলি। বলে ওঠে অনন্য।

— তুমিই একা সিরিয়াস এবং ইন্টেলেকচুয়াল। তাই না?

— নিশ্চয়। আমার তথ্যে ভুল নেই। শোনপুরে মেয়ে নিলাম হয়।

— আমি তো বিক্রি হতেই চাইছি। কিনে নাও। তবে নগদে। পারবে?

তনুশ্রী বলল, কাউকে কিছু কিনতে হবে না ভাই! শোনপুরেও কেউ যাবে না। তুই মৌলি শিবাজির কাছে ক্ষমা চেয়ে নে।

— না। আমি তো বিক্রি হতেই চাইছি। বলে ওঠে মৌলি।

— এটা তোমার একটা দুর্বোধ্য জেদ। বলে ওঠে অনন্য।

বনমৌলি বলল, বেশ তাই। কিন্তু আমি রাজি ছিলাম। আমার বাবা-মা ডাক্তার। আমি বাপ-মায়ের একমাত্র কন্যাসন্তান। আমার চেয়ে চোদ্দো বছরের ছোট একটা ভাই আছে। ব্যস। আমি দু-হাজার টাকায় বিক্রি হব। আজ যে-কোনো কারণে হোক, মন ভাল ছিল না। ওইসব ন্যাকামি-মস্করা ভালো লাগছিল না। এমন করে... শিবাজি বার বার মেয়ে কেনার জন্য এমনই করছিল যেন একটা সামন্ত, চোখেমুখে এমন একটা ভাব...আমার ভালো লাগছিল না।

— বেশ তো। কেনো তা হলে। অনন্য উঠে দাঁড়াল। এবং নিজের কথার রেশ টেনে বলল, কারো কাছে দু-পঞ্চাশের বেশি নেই, থাকলে আজ তোমার কী হত বনমৌলি! চলো। আসর ভেঙে দাও। তুমি মাফ চাইলেই ভাল করবে, হাজার হোক আমরা বন্ধু।

— না। বলে ফুঁসে ওঠে বনমৌলি, এতই সে রেগেছে।

মাসুদ এবার ধীরে-ধীরে পাঁচশো টাকার চারখানি নোট বার করে টেবিলে রেখে দিয়ে বলে, আমি তা হলে মৌলিকে কিনে নিচ্ছি অনন্য।

সবার চোখ বড়-বড় হয়ে ওঠে। শিবাজির চোখমুখে অদম্য কিন্তু চাপা একটা হাসি ফুটে ওঠে, আবেগে বুক ফেটে পড়তে চায়। কিন্তু সেই হাসি মুহূর্তপর হঠাৎ-ই ছাই হয়ে যায়।

মাসুদ টেবিলের উপর অত্যন্ত নতুন পাঁচশো টাকার চারখানি নোট রেখে তর্জনি দিয়ে চেপে রেখেছে। বনমৌলিকে দেখছে না, অন্য সবার মুখে এক-এক করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে।

তনুশ্রী অনন্যর উঠে দাঁড়ানো দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঝপ করে বোকার মতো চাউনি ফুটিয়ে বসে পড়ল।

দাঁড়িয়ে ওঠা অনন্য ধীরে-ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল। এই বন্ধুচক্রের সেই হয়তো নেতা, অঘোষিত-অলিখিতভাবে। প্রথমে সে রাজার তর্জনিলিপ্ত সবুজ টাকার নোটগুলি দৃষ্টি তেরছে

দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ দেখার পর অশ্বগ্রীব মাসুদকে দ্যাখে — দ্যাখে তার কাত করে বাঁকানো ঘাড় এবং চেয়ারে বসাভঙ্গি, রাজা সামান্য বেঁকে গেছে। শাদা শার্ট এবং কালো প্যান্ট রাজার প্রিয় পোশাক।

মাসুদ, মৌলি বাদে সবাইকে একবার দ্রুত দেখে নিয়ে দৃষ্টিকে আঙুলের ডগায় নিবদ্ধ করেছে, যেন সেই দৃষ্টি দিয়ে ঘূর্ণমান চক্রের মধ্যবর্তী মাছের চোখ বিদ্ধ করা যায়।

মাসুদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আঙুল এবং চোখ বার কতক দেখে নিতে থাকে অনন্য। অনন্যই একমাত্র বন্ধু যে-কিনা মাসুদকে রাজা না ডেকে রেজা-ই ডাকে। ইন্টেলেকচুয়াল বলে নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে চায়, না কি মাসুদকে সূক্ষ্মভাবে মুসলমান শনাক্ত করতে চায়? মাসুদের মনে হয়েছে, উচ্চারণের শুদ্ধতাই একমাত্র উদ্দেশ্য না-ও হতে পারে।

অনন্য যথেষ্ট ভারী গলায় বলল, তুমি কি মজা করছ রেজা?

মাসুদ দৃষ্টি না সরিয়ে হালকা মাথা নেড়ে বলল, মোটেও না। তোমাদের কারো কাছে এর চেয়ে বেশি থাকলে পিঠ মারতে পার, আমি সরে দাঁড়াব। আমার কাছে এই দু-হাজারই আছে, মেসের খোরাকি বাবদ দিতে হত।

— দেবে না?

— দেবো, পরে দেবো। অবশ্য কী করে দেবো জানি না।

— না দিতে পারলে 'মিল' বন্ধ হয়ে যেতে পারে?

— পারে। কারণ অন্যরা আমার চেয়েও হাড়-হাভাতে, এক মাসের জন্য আমার 'মিল' টানতে পারবে বলে মনে হয় না। পারলেও করবে না।

— কেন?

— ওরা কৃপণ এবং স্বার্থপর। খুব ইয়ে...হিসেবি...অবশ্য এক জন বোধহয় ভালো। জানি না ঠিক। আসলে কী জানো...বলে চুপ করে রইল রাজা।

— হ্যাঁ, বলো! অনন্য জানতে চায়।

এবার মাসুদ আঙুল থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে অনন্যর চোখে সেই দৃষ্টি মেলে দিয়ে গলায় কেমন একটা শব্দ করে হেসে ফেলে। বলে, আসলে এটা একটা দাঁও। গতকাল এই টাকা মানি-অর্ডারে এসেছে। ভাগ্যিস পকেটে ছিল।

প্রত্যেকে মাসুদকে দেখছিল। শিবাজি একবার অলকের সঙ্গে শঙ্কিতভাবে দৃষ্টি-বিনিময় করে মাসুদের অভিব্যক্তিতে মন দিল। তনুশ্রী কাঁটা হয়ে দাঁতে উড়নির প্রান্ত ধরে স্থির, তার ভ্যাবলা চাউনি ছটফট করে চলে যাচ্ছে এর মুখে, তার মুখে এবং মৌলির তপ্ত মুখমণ্ডলে। বনমৌলি ঘামতে শুরু করেছে, মাসুদের কথার যে-জোর এবং দৃষ্টির নিবদ্ধতা, তাতে সে ভয় পেয়েছে। রীতিমতো ভয়ই পেয়েছে। তার ঠোঁট শুকিয়ে উঠেছে। সে আঙুলে জড়াচ্ছে আঁচল এবং চোখ বন্ধ করছে ঘনঘন এবং অর্থহীনভাবে শূন্যে কোথাও জানলার দিকে চাইছে।

অনন্য একবার একঝলক মৌলিকে দেখল। অভিনন্দনের দাঁতের দিকে চেয়ে নিয়ে তনুশ্রীকে অবলোকন করল এবং যেন তার উদ্দেশ্যেই বলল, তা হলে মজাটা আর মজা রইল না তনুশ্রী! একেই বলে হাসতে-হাসতে কপাল ব্যথা! তবে দু-হাজার টাকায় সত্যিই কি কিছু হয়? কেনা যায় এভাবে? তা ছাড়া কিনে নিয়ে গেলেই তো হল না! কোথায় রাখবে, কী খাবে!

এই পর্যন্ত বলে মাসুদের দিকে চোখ ফেরায় অনন্য। এবং জানতে চায়, মেসে জায়গা হবে রেজা? তোমার মেসে?

— না। ওটা ছেলেদের মেস।

— তা হলে কোথায় রাখবে মৌলিকে? অনন্য প্রশ্ন করেই শিবাজির দিকে চাইল।

শিবাজি বলল, সেটা রাজাকেই বুঝতে দাও। ওর জিনিস, এখন রাখা-ফেলে দেওয়া ওর ব্যাপার।

— জিনিস। প্রায় চমকে উঠল তনুশ্রী।

অলক অল্পই কিতকিতে হেসে বলল, জিনিসে আপত্তি তনুশ্রী! কিন্তু সেটাই সই, কেন না বনমৌলি নিলামে উঠেছিল স্বেচ্ছায়।

— তোমাদের লজ্জা করছে না! তেরিয়া প্রশ্ন তনুশ্রীর।

অলক বলল, কিসের লজ্জা!

— নারী-বিলেস, না? রোমাঞ্চ! শোনপুর! তোমরা কারা?

— মানে!

— এটা প্রহসন হচ্ছে নাকি! তোমরা সেই আদ্যিকালের পুরুষ, সেই...

— আহা! তুমিই তো তখন হাসছিলে মিটকি-মিটকি। এখন তোমার গায়ে লাগছে কেন? যা হবার তা তো হয়ে গেছে।

— না হয়নি। তুমি ওই টাকা পকেটে তুলে নাও রাজা। যাও, মেসে গিয়ে খোরাকের টাকা জমা করো, নইলে খেতে পাবে না। পেট শুকিয়ে তো মেয়ে কেনা যায় না। মেয়ে কারা কেনে?

— তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ নাকি!

— দিচ্ছি বইকি।

— কেন দিচ্ছ?

— এটা অন্যায় বলেই দিচ্ছি। ইট ইজ অ্যাবসার্ড। হয় না। হতে পারে না।

— তুমি বলছ পারে না। মৌলি কিন্তু বলেনি। ও সিরিয়াসলি নিজেকে বিক্রি করেছে।

— ওর মাথা খারাপ হয়েছে। চাল নেই, চুলো নেই। মেয়ে কেনা, বললেই হল! আমি ভেবেছি, 'জাস্ট ফান'। অ্যাই মৌলি, তুই কথা বলছিস না কেন?

বনমৌলি এবার একটুখানি কেঁপে উঠল। অলক তনুশ্রীর সঙ্গে এখনো লড়তে চায়। মৌলি জানলা দিয়ে আরো দূরে দৃষ্টি চালিয়ে দেয়।

অভিনন্দন বলে উঠল, যা বাবা, সবই তো গুবলেট হয়ে যাচ্ছে। এটা তো শব্দজব্দ ছাড়া কিছুই না তা হলে, স্রেফ ভাঁওতা! ভাবলাম, মৌলি সত্যি-সত্যিই...যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি ভাই রাজা, হাত তুলে নাও।

মাসুদ টাকার নোট আঙুলে আরো সুন্দর করে চেপে ধরে বলল, তা হলে কী সাব্যস্ত হল! পণ নিয়ে বিয়ে, মৌলির বাবা দেবেন এবং তোমাদেরই মতো কেউ নেবে! তোমরা নও, অন্য কেউ। আমরা বড্ড বেশি বিলাসী এবং প্রচণ্ড সিরিয়াস, তাই না? তনুশ্রীরও উচিত হয়নি, মজাকে অসহ্য ভেবে কথা বলা। আমরা খুব জানি, আমরা কী!

অনন্য এবার হঠাৎ-ই রেগে গেল এবং বলল, তুমি তা হলে লোভে পড়ে গেছ রেজা! কিন্তু ভেবে দেখলে না, কাকে কিনতে চাইছ তুমি?

— দেখেছি।

— দ্যাখোনি! দেখলে তনুশ্রীর কথামতো...আচ্ছা, তুমি সত্যিই কী করবে বলতে পারো? সত্যিই তো, চাল নেই, চুলো নেই আর তা ছাড়া...

— অনন্য, আমি জানি। লোভটা আমার নয়, তোমার।

— সবই তুমি জানো দেখছি। কিন্তু তুমি তো মুসলমান। তাই না?

মৌলিরা ব্রাহ্মণ। আমিও অবশ্য 'মণ্ডল', দোখনে মণ্ডল। আমার লোভে ফল নাই রেজাবাবু, সব বুঝেই তনুশ্রী...

— এখন তো গুজরাট-ম্যাসাকার হয়েছে। জাতের কথা ওঠাই স্বাভাবিক। আমি জানতাম। তুমি অনন্য, গত সপ্তায় 'দেশ' পত্রিকায় 'গুজরাট' নিয়ে কবিতা লিখেছ। মহৎ সব উপলব্ধির ব্যাপার। আমাকে মুসলমান ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছ না। তোমার কলম এবং তোমার মুখ এতটাই আলাদা বন্ধু।

— তুমি গরিব, এই কথাই বলতে চাইছি রেজা। তোমাদের ওয়েভ-লেংথে মিলবে না। তাই...

— কী? কী বললে, কিসের লেংথ?

— ওয়েভ-লেংথ।

— সেটা কী বস্তু?

— তা-ও জানো না?

— না। বলে টেবিলের উপরই চোখকে স্থির ধরে রাখে মাসুদ।

— তুমি শোনোনি কথাটা! বিস্ময় প্রকাশ করে অনন্য।

— না।

— এটা একটা চালু কথা। আকছার বলে লোকে।

— কোথাকার লোক তারা?

— মানে হয়! আবার বিস্ময় ঘনায় অনন্যর কণ্ঠে।

মাসুদ জানতে চায়, কথাটার বাংলা মানে করো।

— তুমিই করে নাও।

এবার অলক-অভিনন্দন-শিবাজি-তনুশ্রী একসঙ্গে হেসে ওঠে। হাসির মধ্যেই অলক বলে ওঠে, রাগটা কার কীসে, বোঝা যাচ্ছে না। যাকে নিয়ে কথা সে-তো কিছুই বলছে না। ছিল নিলাম, এখন গড়াচ্ছে স্বয়ম্বরার দিকে। মুসলমান না তফসিলি, বামুন না কায়েত! ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল! না কি উলটোটা? যাক গে, দাঙ্গা বেধে না গেলেই বাঁচি।

আবার হাসি।

— 'ওয়েভ-লেংথ' কথাটা টু মাচ ইন্টেলেকচুয়াল। আমি বুঝি না, বুঝতেও চাই না। শুনে থাকলেও মনে রাখিনি। বলে উঠল মাসুদ।

— তার মানে তুমি গুমোর করছ! অনন্য বলল।

— গুমোর কিসের! দরিদ্র মুসলমানের গুমোর!

— আমিও নিজেকে দোখনে 'মণ্ডল' বলেছি রেজা! তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

— মণ্ডল হলেও তুমি হিন্দু। এবং ভাল ছাত্র। তুমি এস.সি. কোটায় চান্স না নিয়েই পড়াশোনা করছ। চাইলে তুমি মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে ঘরেও যেতে পারো।

— তুমি পারো না?

— না।

— কেন?

— ওই যে বললে, ওয়েভ-লেংথ।

তনুশ্রী এবার বলে উঠল, তুমি কিন্তু রাজা বড্ড বাঁকা-বাঁকা কথা বলছ! আমরা কেউই কমিউনাল নই, জাতধর্ম তোলাটা কি.....

— কে তুলেছে তনুশ্রী! আমাকে হঠাৎ মুসলমান বলা হল কেন?

— তুমি মুসলমান বলেই অনন্য বলেছে এবং নিজেকে সে এস.সি. বলেছে।

— কেন বলল?

— স্টপ, স্টপ ইট! প্লিজ! বলে উঠল শিবাজি। তারপর দু-হাতের দু-আঙুল নিজের দু-কানের লতি আলতো করে ছুঁয়ে বলল, আমারই ঘাট হয়েছে অনন্য। আমি বা অলক, কেউই শোনপুর যাচ্ছি না। মেয়েও কিনছি না। তুমিও বাসনা ত্যাগ করো রাজা!

চোখমুখে আশ্চর্য আহত ভাব ফুটে উঠল মাসুদের। ঘাড় গোঁজ করে চুপচাপ বসে রইল সে। বাসনা ত্যাগ করো, কথাটা মারাত্মক হল।

সবাই চুপ।

মাসুদ তাজা নোট চারখানা আঙুল দিয়ে নিজের দিকে টেনে নেয়। ধীরে-ধীরে। এবং দু-আঙুলে তুলে টাঙিয়ে ধরে চোখের উপর শূন্যে, তার পর আঙুল দিয়ে টোকা বাজায় টাকার গায়ে, ফুঁ দেয় — অতঃপর পকেট থেকে একটা পার্স বার করে তাতে রেখে, পার্সকে প্যান্টের পিছনে পকেটস্থ করে।

উঠে দাঁড়ায় মাসুদ। তার পর অনন্যর দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, হাত বাড়াও অনন্য। তুমি বস্তুত বুদ্ধিমান, আমার চোখে তোমার যোগ্যতা সন্দেহাতীত। তোমার 'ওয়েভ-লেংথ' আমার নয়, তোমার ভালো রেজাল্ট; আরো ভালো করবে তুমি। তোমার মতো মেধাবীকে 'মণ্ডল' পদবি দুঃখই দেয়, কারণ ওটা তোমার পক্ষে অবাঞ্ছিত অ্যাপেন্ডিকস্। হাত বাড়াও।

অনন্যকে করমর্দন করে মাসুদ বলল, আমি হলাম মুসলমান মণ্ডল। পুরো নাম মুহম্মদ মাসুদ রেজা মণ্ডল। আমার দু-জন দাদিমা। এক জন শাদা — এক জন কালো। গাঁয়ের লোক এই দুই দাদিমাকে বলে, কালো জিন, সাদা জিন। দাদিমা, যিনি কালো, তেনাকে আমার দাদামশাই অর্থাৎ ঠাকুরদা বিহারের কোনো মেলা থেকে সত্যিই কিনে এনেছিলেন। পাঁচশো টাকায়।

বনমৌলির চোখমুখ অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছিল। মাসুদের কথায় এবার সে চমকে উঠল। দৃষ্টি ঈষৎ বাঁকা করে তপ্ত-বিষণ্ণ চেহারায় মাসুদকে দেখছিল।

শিবাজি অবাক হয়ে বলল, পাঁচশো মানে তো সেকালে অনেক টাকা!

— নিশ্চয়। অনেক টাকা। সত্যিই তো দু-হাজার টাকায় এই কলকাতায় এ-সময় মানুষ কেনা যায় না। আমি কি পাগল নাকি! কেউ নিজেকে বেচে দিতে চাইলেই কিনে ফেলা যায়? এই কফি-হাউস দাসদাসীর হাট তো নয় অলক। তা ছাড়া মজাটা অন্যখানে তনুশ্রী। তোমরা একটু চমকাবে বইকি!

— কালো জিনের কথাটা থামালে কেন? অভিনন্দনের জানতে চাওয়া।

মাসুদ বলল, ধলা দাদি মুসলিম সন্দেহ নেই, দাদাজির প্রথম বউ। কালো জিন খুব সম্ভব হিন্দুই।

— খুব সম্ভব কেন? অলকের জানতে চাওয়া।

মাসুদ বলল, কালো দাদি নিজের ধর্ম জানেন না। উনি সিঁদুর-শাঁখা পরেন। নামাজের

সুরা-পারা কিছুই মুখস্থ করতে পারেননি। উনি আমাকে এই কলকাতায় বিদ্যা-উপার্জনের জন্য পাঠিয়েছেন। বাড়ি রাজি হচ্ছিল না। কালো জিনের ছেলেপুলে হয়নি, আমিই ধরো তেনার সন্তান। যাক গে। আসল কথাটা এবার বলি।

থামল দু-দণ্ড, তার পর মাসুদ বলল, বাজারে পাঁচশো টাকার জাল নোট বেরিয়েছে। এগুলো জাল। আমি এতদূর ফাঁকি দিয়ে বনমৌলিকে কিনতে পারব না ভাই। তার মানে এখানে ওকে কেনার লোক, এই টেবিলে কেউ নেই। আমি মৌলিকে গ্লানিমুক্ত করে দিলাম। তার বদলে সে আমাকে প্রসন্নমনে একশো টাকা ধার দিক। না হলে আমি খেতে পাবো না, আমার 'মিল' বন্ধ হয়ে যাবে। চারখানা নোট মানি-অর্ডারে ফেরত পাঠিয়ে বলতে হবে, জাল। ব্যস। আমি চলি। দে মৌলি, টাকা দে। বলে বনমৌলির চোখের উপর হাতের তালু মেলে ধরে মুহম্মদ মাসুদ রেজা মণ্ডল।

সমস্ত ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে, মৌলি এখনো ঘাবড়ানো অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। একটা চাপা অসোয়াস্তি তাকে পীড়া দিচ্ছিল। মাসুদের তালু তার চোখের উপর প্রসারিত। ফরসা-রক্তাভ হাতের তালুর চন্দ্রস্থানে একটা নীলাভ বড় তিল।

থতোমতো গলায় মৌলি বলল, আমার কাছে নেই অত। দাঁড়াও। তুমি আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যাবে? তা হলে দিতে পারি।

— কোথায়?

— একটা দোকানে। এসো। বলে পা বাড়ায় বনমৌলি।

তনুশ্রী বলল, ধার আমিও দিতে পারি। নেবে, মাসুদ?

অনন্য বলল, কাউকে দিতে হবে না, আমিই দিচ্ছি। বলে কাঁধের কাপড়ের থলেয় হাত ঢুকিয়ে একটা পার্স বার করে তা থেকে একটা একশো টাকার নোট তুলে নিয়ে মাসুদের সামনে বাড়িয়ে ধরে অনন্য।

বনমৌলি বলে ওঠে, টাকাটা রাজা আমার কাছে চেয়েছে!

— আমি দিলে ক্ষতি কী হচ্ছিল! অনন্য জানতে চায়।

— সে তো তনুশ্রী দিলেও চলত, তুমিই বা পিঠ মারছ কেন? বলে ওঠে মৌলি।

অনন্য বলল, দোকানে যেতে হবে কেন! আমি দিচ্ছি, রেজা টাকা নিয়ে চলে যাক।

— চলে যাবে মানে! অবাক হয় শিবাজি।

— ওর ট্রেন ধরার ব্যাপার আছে না! বলে অনন্য।

মৌলি বলল, তা হলে ভালোই হল। আমি ওকে শেয়ালদার দিকেই নিয়ে যাচ্ছি। দোকানটা ওইদিকেই। এসো রাজা।

মাসুদ তার পেতে রাখা শূন্যে ভাসমান হাতটা নামিয়ে নিয়ে বলে, আমি অন্য কোথাও ধার পেয়ে যাব অনন্য। গুডবাই, পরে দেখা হবে। বলেই চেয়ার টেনে সরিয়ে পথ করে নিয়ে মাসুদ দ্রুত ধেয়ে চলে যেতে চায় কফি-হাউসের দরজার দিকে।

মৌলি ডেকে ওঠে, দাঁড়াও রাজা, যাবে না।

— যেতে দাও বনমৌলি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। দ্রুতই বলে ওঠে অনন্য।

মৌলির ডাকে থমকে-দাঁড়িয়ে-পড়া মাসুদ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে কফি-হাউসের দরজার দিকে চলে যায়। একবার পিছনে ফিরেও দেখে না।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে পথে পড়ে মাসুদ। মাসুদ অদৃশ্য হতেই অনন্য বলে ওঠে,

আশ্চর্য! জাল টাকা নিয়ে মজা করল রেজা! কী ধুরন্ধর বুদ্ধি, এ তো স্বয়ং আলাউদ্দিন খিলজি। না, ও বেটার তারিফ করতেই হচ্ছে তনুশ্রী!

তনুশ্রী বা অন্য কেউ কোনো জবাব দিল না। অভিনন্দন তখন দাঁত বার করে বলল, শোনো হে অনন্য। নোটগুলো জাল না হতেও পারে।

— কী বলছিস অভি!

— হ্যাঁ বেরাদর, জাল মনে হয়নি আমার। রাজার মতো সেনসিটিভ বন্ধু আমাদের একটিও নেই। ওর নানাজি নীলরতনের ডাক্তার ছিলেন। হাই-ফ্যামিলি ওদের। রাজা মোটেও গরিব নয়।

এই পর্যন্ত বলেছে অভিনন্দন, ওর কথা শেষ না হতে দিয়েই বনমৌলি বলে উঠল, তোমার সঙ্গে কাল কথা হবে অনন্য। আয় তনুশ্রী। আমার সঙ্গে যাবি? বলে এক নিমেষ অপেক্ষা না করেই মৌলি কফি-হাউসের বাইরে চলে আসে। পিছু-পিছু, ডাকতে-ডাকতে ছুটে আসে তনুশ্রী।

বাইরে এসে মৌলিকে আর পায় না সে। তার কিছুটা নেমে আসতে দেরি হয়, কারণ সে স্থূলাঙ্গী, সিঁড়ি দ্রুত ভাঙতে পারে না, হাঁসের মতো হাঁটে।

বনমৌলি একটা গলির মধ্যে দেখতে পায় রাজাকে। একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত দড়ি থেকে শস্তা ছোট চারমিনারে আগুন নিচ্ছে। আপন মনে।

পিছন থেকে এসে আচমকা ডেকে ওঠে বনমৌলি রাজার নাম ধরে। রাজা দড়ি ছেড়ে দিয়ে চমকে উঠে পিছনে চায় এবং বোকার মতো নিঃশব্দে হেসে উঠে বিস্ময় প্রকাশ করে, তুমি!

— তুমি সিগারেট খাও?

— হ্যাঁ। অল্প, দু-একটা।

— এত শস্তা খাও কেন? শরীর খারাপ করবে না?

— না।

— তুমি সরাসরি 'না' বলছ?

— হ্যাঁ। আমার করে না।

— কম খাও বলে?

— হয়তো।

— তুমি মিথ্যা কথা বলো?

— একটু-আধটু। কিন্তু তুমি এলে কেন? অনন্য তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

— ওর সঙ্গে রোজই তো কথা হয়। কাল হবে। তা ছাড়া রাত্রেও হতে পারে। ও আমার ভাইকে পড়ায়।

— ও। বলে দোকান ছেড়ে পথে নামল মাসুদ। পিছনে হেঁটে এসে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে বনমৌলি।

— তুমি কফি-হাউসে মিথ্যা বলেছ? হঠাৎ প্রশ্ন মৌলির।

কথা বলছে না মাসুদ।

— তোমার নোটগুলো জাল কী করে বুঝলে? ফের প্রশ্ন।

মাসুদ মৌলির মুখের দিকে পাশ থেকে চেয়ে দেখে বলল, পঞ্চম বর বলেছে।

— পঞ্চম বর?

— বর পদবি, পঞ্চম নাম। মেসে থাকে, আমাদের সঙ্গে।

— কী বলেছে?

— চলবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর মৌলি বলল, নোটগুলো ভালো করে দেখেছ?

— আমি টাকা চিনি না।

— বর চেনে? জাল ধরতে পারে?

— বলল তো!

— কী বলল?

— চলবে না বলল। বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলল।

— আর কাউকে দেখাওনি? কথা বলছ না কেন?

মাসুদ চুপ করেই থাকে। তার পর হঠাৎ বলে, ভেবেছি।

— কী ভেবেছ?

— নোট যদি চলে, ভালো। নইলে কালো জিনের কাছে রিটার্ন যাবে। রাঘব মোদক বলেছে, নোট ঠিক আছে।

— আমাকে দাও।

থমকে পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ। পথেরই উপর কিছুটা মুখোমুখি মতন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মৌলির চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলল।

তার পর মাসুদ বলল, কালো জিনকে ধাক্কা দেওয়া দরকার। ও আমাকে জোর করে কলকাতায় এম.এ. পড়তে পাঠাল, নিজে একটা গো-মূর্খ। সারা জীবনে এক লাইন সুরা মুখস্থ করতে পারেনি। তাই নিয়ে দুঃখের শেষ নেই। ওর জন্যই নয় বছর আমাদের ফ্যামিলি একঘরে ছিল, আমার ছেলেবেলায়।

— আমাকে সব বলবে?

— কী বলব?

— তোমার কথা।

— আমার কথা! আমার আবার কী কথা?

— কালো জিন, ধলো জিন।

— ধুর!

— ধুর কেন? জানাতে তোমার লজ্জা করবে?

— না, না। লজ্জা কিসের! আমার নিজের কেমন সন্দেহ হয়।

— কাকে? কী সন্দেহ?

— কালো দাদিমাকে।

— বলো না আমাকে। আচ্ছা, আমাকে দেখাবে?

— কী দেখাব?

— তোমার কালো জিন, ধলো জিন।

এবার হাহা করে হেসে উঠে, নির্জন পথে চমকে উঠে চুপ করে গেল মাসুদ। তার পর হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দিল। তার সঙ্গে ছুটতে পারছে না মৌলি।

— আস্তে চলো, প্লিজ।

গতি কিছুটা কমিয়ে দেয় মাসুদ। পিছন থেকে প্রায় উড়ে এসে পাশাপাশি হয় মৌলি।

— নোট ফেরত গেলে কালো দাদিমা ধাক্কা খাবে, অন্যরা খাবে না?

— কালো দাদি কাঁদবে। অন্যরা মজা পাবে।

— কেন?

— আরে ভাই, আমার কিছু ঘাট হয়েছে কিনা।

— কী ঘাট হয়েছে?

— আমার একটা অসামান্য সুন্দরী মামাতো বোন ছিল। ছিল নয়, এখনো আছে। আমার বাবা-পক্ষ, মা-পক্ষ, তামাম গুষ্টি উঠে পড়ে লেগেছিল সুহানার সঙ্গে বিয়ে দিতে। কিন্তু 'সুহানা' তো বোন।

— বুঝেছি।

— কিচ্ছু বোঝোনি।

— কেন?

— 'বোন' একটা অনুভূতি। সুহানাকে আমি 'বোন' ছাড়া ভাবতেই পারি না। এদিকে 'বোন'টা আমাকে, লাগাতার প্রচারে, ছেলেবেলা থেকে, 'বর' ভেবে বড় হয়েছে। কী কাণ্ড!

— তার পর?

— যাক গে।

— যাক গে কেন, বলোই না।

— 'বোন' একটা অনুভূতি।

— নিশ্চয়।

— আমি যতই বলি, 'বোন', সুহানা 'বোন'। ওকে বিয়ে করা যায় না। সবাই ততই বলতে থাকে, 'বোন' তো কী হয়েছে! ভাই-বোনে বিয়ে জায়েজ, অর্থাৎ আপন বোন বাদে, অন্য বোনেদের যে-কারো সঙ্গে বিয়ে সিদ্ধ, ধর্মসম্মত। তা ছাড়া সুহানা রাজাকেই 'বর' বলে জেনেছে। আমি সুহানাকে একদিন ডেকে বললাম, 'তুই কী মনে করেছিস আমাকে?'

— বললে!

— কেন বলব না! বললাম, 'বোন' একটা অনুভূতি, তুই বুঝিস! এ বিয়ে হবে না।

— মুখের উপর বলে দিলে!

— হ্যাঁ।

— সুহানা তখন কী বলল তোমাকে?

— সে-একটা কান্না বটে! নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দিলে। শুকিয়ে যেতে লাগল।

— তার পর?

— তোমার দোকানটা কোথায়?

— আছে। চলো।

— সত্যি বলছি, কালো জিন ছাড়া কেউ তো বুঝল না। ওই দাদিমা প্রতিবাদ করে বলল, ছেলে চাইছে না, বোনকে বিয়ে করবে না, কেন তোমরা জোর করছ! এই কথা যেই বলল কালো দাদি, ওমনি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা সংসার, তাকে মুহূর্তে 'হিন্দু' ঠাউরে বসল সবাই। মা পর্যন্ত বলল, আপনি 'হিন্দু' বলেই এ-কথা বলছেন। আপনি 'হিন্দু' বলেই নামাজের সুরা আপনার কণ্ঠস্থ হল না। ব্যস!

অনেকক্ষণ ফের চুপচাপ মাসুদ। কথা কম বলে বন্ধুচক্রে, কিন্তু কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একান্তে বেশ সুন্দর কথা বলতে পারে। শুধু তাই-ই নয়, আজ তো কফি-হাউস থেকেই খাপ খুলেছে। কোথাও একটা চাপা অপমানবোধ ওকে ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত করে তুলেছে। তাকে 'মুসলমান' বলায় হয়তো দুঃখই পেয়েছে। তনুশ্রী এবং অনন্য মাসুদকে মুসলমান হিসেবেই দেখে।

ভাবছিল বনমৌলি। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বার বার রাজাকে চোখ তুলে দেখছিল, অবাক হচ্ছিল এবং কথা বলতে চাইছিল। এবং মনে-মনে সে রাজার কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

— তার পর বলো। তাগাদা লাগায় মৌলি।

— কী বলব? বলে চুপ করে যেতে চায় রাজা।

হঠাৎ-ই রাজা বলল, অনন্যর কাছে টাকা নিলেই ভালো করতাম বোধহয়। আমরা সব সময়ই কিছু না কিছু ভুল করি। খেয়াল করি না, কী বলছি।

— আমাকে বলছ!

— না, তোমাকে নয়। আমি নিজেকেই বলছি।

— কী ভুল বলেছ তুমি?

— আমার চুপ করে থাকা উচিত ছিল। রোজ আমি নিজেকে বলি, চুপ করে থাকো। কালো দাদিমা এত চুপচাপ থেকেও যখন একটা-দুটো কী বলত, তখনই কোনো-না-কোনো ভাবে দুঃখ পেত। তাকে আমাদের ফ্যামিলি 'হিন্দু' করে রেখেছিল, গ্রামের মানুষও ভাবত মেয়েটা 'হিন্দু'। এটা এক ধরনের খেলা চলছিল সংসারে। দাদামশাই কালো জিনকে কি বিয়ে করেননি, অমনিই রেখে দিয়েছিলেন? তাই বা কেমন, কী করেই বা হয়!

— কালো দাদিমাকে তুমি কখনো প্রশ্ন করোনি?

— করেছি।

— কী বলতেন উনি?

— বলত, সমাজ করে আমাদের বিয়ে হয়নি কিনা, তাই। গোপনে হয়েছে। শুনে মনে হত, ওই বিয়েতে সাক্ষী-সাবুদ ভালো মতন জোগাড় হয়নি। কাজটা পাকা কাজ ছিল না। আচ্ছা, তোমাকে এইসব বলছি কেন?

— আমি তো শুনতেই চাইছি রাজা!

— আসলে কতকগুলো নারী-আচার করত কালো দাদি, তাই দেখে ভাবা হত, ওইসব হিন্দুয়ানি কোথায় পেল মেয়েটা! সুন্দর আলপনা দিত কালো জিন। ঘটা করে সিঁদুর পরত, শাঁখা-পলা পরত। এই দাদিমায়ের কোনো বাবা-মা সম্পর্কিত পূর্বস্মৃতি ছিল না। কোথাকার মেয়ে জানা যায় না। খুব অদ্ভুত একটা জীবন। স্পষ্ট কোনো স্মৃতি নেই, ঘর-দোর, বাপ-মা, গ্রাম সম্পর্কে গল্প নেই। আমার আজকাল অন্য রকম মনে হয়।

— কী মনে হয়?

— তুমি শুনে কী করবে, তোমার কোনো কাজে লাগবে না। তা ছাড়া একটা ধারনার কথা না বলাই ভালো। দাদিমা আজো বলে না, তার অতীত কী। ওকে কোনো দালাল হয়তো মেলায় এনে বেচে দিয়েছিল। দাদামশাই বলতেন... না, থাক।

— থাকবে কেন?

— কথাগুলো কাউকে বোলো না।

— না।

— কথা হচ্ছে, আমি জীবনটাকে একেবারে অন্যভাবে বুঝেছি বন। এ ঠিক ভাসা-ভাসা কিছু নয়। তোমাদের সঙ্গে কিছুই মিলবে না। ওই যে, ওয়েভ-লেংথ-এর কথা উঠল তখন, সেটা তো ভাববার কথাই বটে। যদি ধরো, ওয়েভ-লেংথ অব ইমোশনস বলি, তা হলে সেটার বাংলা করতে হবে, 'আবেগ-তরঙ্গের সাম্য' বা সমতা। খুব শক্ত কথা। তাই ওই প্রসঙ্গে যেতে ইচ্ছে করে না। অনন্যর সঙ্গে তর্কেও আমার রুচি নেই। বুঝি একটা কথা, জীবন অপরিমেয়, অনন্য বই পড়ে কথা বলে এবং লেখে, ও জীবনের বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। না হলে আমাকে 'মুসলমান' বলে ছাপ দিত না, এইভাবে চিহ্নিতকরণ মস্ত সাম্প্রদায়িকতা।

— স্যরি! আমি তোমাকে কিছু বলিনি রাজা!

— এই যে, লোকে বলে, সব ব্যাপারে 'সিরিয়াস' হওয়া ঠিক নয়, বলে না? কিন্তু হঠাৎ তুমি 'সিরিয়াসলি রি-অ্যাক্ট' করলে। না করলেই পারতে, আমিও চুপচাপ থেকে চলে আসতে পারতাম। কিন্তু হল না — না তোমার, না আমার। এবার ভেবে দ্যাখো...

— হ্যাঁ। বলো, বলো!

— শিবাজি আজ কিছুদিন ধরেই শোনপুরের মেলার কথা বলছে। এটা ওর এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন। মধুমন্তী বলে একটা মেয়ে ওকে সম্প্রতি বিদীর্ণ করে ল্যাং মেরে কেটে পড়েছে। তাই এটা ওর একটা ফ্যান্টাসি, নেশার মতো করে ভাবছে। এই ওয়েভ-লেংথে আমরা কেউ নেই। ওই অলকও নেই। তাই না?

— হ্যাঁ।

— তুমি নারীবাদীদের মতো দুম করে জেহাদ করে নিলামে চড়ে বসলে। তুমি ভালো করেই জানতে, তোমাকে কেউ কিনতে পারবে না। কিন্তু মজাটা এই, আমার কাছে দৈবাৎ জাল নোট ছিল বা সেগুলো জাল না হতেও পারে। এর কারণ, জাল নোট সবাই চেনে না। পঞ্চম বর অথবা রাঘব মোদক, কে ঠিক — এখনো স্থির করতে পারিনি। খবরের কাগজে জাল নোটের ব্যাপারে মাসখানেক আগে একটা বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েছে। ফলে, আমি এই নোট নিয়ে কী করব বুঝে পাচ্ছি না।

— আমাকে দেবে।

— পাগল!

— কেন? আমি তো ওগুলো দেখিয়ে নেব।

— কোথায়?

— লোক আছে।

— খেলাটা কিন্তু কফি-হাউসের টেবিলেই শেষ হয়ে গেছে বনমৌলি।

— না, না। তরঙ্গ এখনো বইছে। ইটস আ ভেরি বিগ লেংথ রাজা। সব ঢেউ সবার কাছে সমান নয়।

— আমি সেই কথাই বলছি।

— আমিও তাই-ই বলছি।

রাস্তার এই জায়গাটা অসম্ভব আলোকিত; এখন সন্ধ্যা নেমেছে। গলিগুলোর এটা চৌমাথা মতন। এখানে টিউব আলো ধবধব করছে। গলিগুলো মিটমিটে। আলোয় চমকে উঠল ওরা। দু-জনই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল, লোক নেই জায়গাটায়। তবু ওরা হেসে ফেলে

সাবধান হয়ে এদিক-ওদিক দেখল।

মুখে হাত চেপে ফিশফিশে গলায় মৌলি চোখের চাঞ্চল্য খেলিয়ে হেসে ফেলে সাবধান হয়ে এদিক-ওদিক দেখল।

— কী হল তাতে!

— হল এই যে, টাকা বার করো। কুইক, ভেরি কুইক।

— মানে!

— আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও।

— তোর টাকা!

— নয় তো কার। তরঙ্গ এখনো বইছে রাজা। তুমি দিতে বাধ্য।

— ছিনতাই করবি?

— ইয়েস।

— খেতে পাবো না মৌলি।

— চাল নেই, চুলো নেই, কেনবার সময় মনে ছিল না?

— আমি জাল নোট দিয়ে তোকে কিনতে পারি না বন।

— তুমি নিশ্চিন্ত নও।

— কী?

— জাল কি না।

— সেই কথাই তো বলছি।

— আমিও সেই কথা বলছি। তোমাকে নিশ্চিত হতে দিলে তরঙ্গ থেমে যাবে। তোমাকে আমি ভীষণ চিনেছি। তুমি পলাতক, পালিয়ে বেড়াও। অ্যাই, বার করো, বার করো। দাও, দিয়ে দাও।

— এ কিন্তু ঠিক হচ্ছে না বন, ঠিক হল না! কাতর গলায় বলতে-বলতে পার্স বার করে মাসুদ।

চারখানা সবুজ নোট দু-আঙুলে তুলে নিয়ে বলে, তুমি কিন্তু চাঁদ, আমি বামুনও নই।

— আমিও তাই বলি। বামুন কথার দুই অর্থ। কিন্তু তুমি বেঁটেও নও, ব্রাহ্মণও নও। একটু বেশিই লম্বা তুমি। দাও, এই জায়গাটা মনে রেখো। দাঁড়াও, আগে টাকাটা ঠিক করে রেখে দিই। এবার চলো। তোমাকে একশো টাকা নিশ্চয় দেব। ধারে কিন্তু, পরে শোধ দেবে।

— কালো জিনকে পাঠাতে হত টাকাটা।

— না, কালো জিনই তো নিচ্ছে রাজামশাই।

— তুমি কালো নও।

— তামাটে।

— ধ্যাৎ।

— সাহেবরা তো সেই কথাই বলে। ভারত-এশিয়ায় কেউ শাদা নয়, সব কালো।

— তা হলে তো গল্পটা হয় না বন।

— কোনটা?

— আমার দুই দাদিমা। তা ছাড়া সুহানা তো টকটকে ফরসা।

— আর একবার বলো।

— কী বলব?
— ওই যে, 'বোন' একটা অনুভূতি। তোমার মুখে ভীষণ ভালো লাগল, বলো না একবার।
— 'বোন' একটা অনুভূতি।
— হ্যাঁ, আর একবার।
— আবার কেন?
— শোনো, ওই কথাটা মাঝে-মাঝে বলবে। কেমন?
— বোনটা পাগল হয়ে গেছে।
— কেন?
— আমারই জন্যে মৌলি।
মৌলি চমকে উঠল। তার পর দ্রুত হাঁটতে লাগল।

২.

রাজাদের বন্ধুচক্রটা নিতান্ত শিথিল ধরনের। অনন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। অভিনন্দন পড়ে কম্পারেটিভ লিটারেচার। অলক ইতিহাস। শিবাজি ইংরেজি। তনুশ্রী এবং বনমৌলি বি.এ. পড়ে। তনুশ্রী অর্থনীতি, মৌলি বাংলা। অনন্য জি.এস হওয়ার সুবাদে এবং কলেজ সোশালের সময় নাটক করতে গিয়ে তনুশ্রী ও মৌলিকে আকর্ষণ করেছিল।

সেই থেকে এরা মোটামুটি একসঙ্গে ওঠা-বসা করে। এই দলে রাজা এসেছে সব শেষে। নাটকে সে শেষ মুহূর্তে এসে জুটে পড়েছিল। নেপথ্যে থেকে তাকে নানান জীবজন্তুর ডাক ডাকতে হয়েছিল। কারণ অনন্য তখন 'হরবোলা' খুঁজছিল। কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজা 'হরবোলা' নামে খ্যাত হয়ে পড়ে। কিন্তু নাটকের বাইরে তাকে নানাভাবে চাপ দিয়েও কেউ পাখি বা জন্তুর ডাক ডাকাতে পারেনি।

মাসুদ বলেছিল, থিয়েটারে অনন্যর কাজ চলছিল না বলে করে দিয়েছি, তা-ও পরদার আড়াল থেকে। কারো সামনে বসে আমি কখনো কিছু ডাকি না। কারণ আমি হরবোলা নই, হতেও চাই না।

এতই গম্ভীরভাবে বন্ধুদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল রাজা যে, কেউ আর চাপ দিতে সাহস পায়নি। ফলত, ওর হরবোলা খ্যাতি দ্রুতই বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

তাই বলে সে কিছু ডাকে না, কখনোই ডাকে না, তা নয়। মন খারাপ হলে সোনারপুরের কাঠপোল পেরিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে একাকী ডাক ডাকে। একা ডাকে, একাই শোনে।

ওর একটা ধারণা, অদ্ভুতই বটে, সে মনে করে, নানান বিচিত্র ডাক ডেকে মরা ডালে ফুল ফোটানো যায়। যে-গাছটা মরতে বসেছে, তার কাছে চলে আসে মাসুদ। সে গুঞ্জনধ্বনি শুরু করে দেয়। গানও করে। একটা ছোট সাইজের মিহি আড়বাঁশি আছে, সেটি সে বাজাতে পারে।

সবটাই তার একান্ত ব্যাপার। ইদানীং সে একটা বারোমেসে সজনে গাছকে নিয়ে পড়েছে। ওটা রয়েছে একটা ফলন্ত নদীর হঠাৎ-ওঠা পৃথিবীর চামড়ার উপর উচ্ছ্বিত জলধারার বিশেষ একটি কিনারে এবং ভেঙে পড়ে শুয়ে গেছে। শস্যপ্রান্তরের ভিতরে সেই জলস্রোত এবং বৃক্ষ।

ফল্গু নদীর গল্প এখানে বিস্তর। নদী এখানে পাতালে ঢুকেছে। এবং হঠাৎ কোথাও খানিকটা বয়ে যাচ্ছে মাটির উপর। বুদ্ধি দিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, একটা নদী কীভাবে মরে যায়।

গল্পটা এই যে, নদী একটা ছিল, তার চিহ্ন আছে। নদীকে মরতে দেখা মানুষের মৃত্যুর চেয়ে করুণ। মাঠের মধ্যে এসে কতবার মনে হয়েছে মাসুদের।

চেষ্টাটা তার নিজেরই কাছে বেখাপ্পা এবং হাস্যকর। তবু সে নাচার। এখানে এসে পড়তেই হয়। গুজরাটের সংখ্যালঘু-নিধন-যজ্ঞ তাকে এতই ভীত এবং বিষণ্ণ করেছে যে, বার বার সে ফল্গুস্রোতের অর্ধমৃত স্বজনের কাছে এসেছে। রেলপথে প্রায় প্রতিদিনই সে কোনো-না-কোনোভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

সব চেয়ে যা তাকে বিমূঢ় করেছে, তা হল, ট্রেনের মধ্যে অতি প্রকাশ্য, উগ্র আলোচনা, সম্প্রদায় তুলে মানুষের কথা বলা। 'মুসলমানরা এই, মুসলমানরা ওই' — 'ওদের তোষণ করা হয়', 'ওদের বড্ড বাড় বেড়েছে', 'ওরা এখানে আছে কেন!'

এই ধরনের কথা সে কখনো আগে শোনেনি। মুর্শিদাবাদের যে-গ্রামে ওর বাড়ি, সেখানে এ-কথা কখনো বলা হয় না। তারও কারণ ওখানে মুসলমানরাই সম্প্রদায় হিসেবে সংখ্যাগুরু। বরং সেখানে হিন্দুরাই কখনো-কখনো অপমানিত হয়। গঞ্জের বাবুরা ভয়ে-ভয়ে থাকে। মুসলমানদের মনে-মনে ঘৃণা করে এবং ভয়ও পায়। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি।

মুর্শিদাবাদে একটা চালু কথা, ছড়া-স্লোগানের মতন মানুষকে বলতে শুনেছে; ওই জেলাটা নাকি আড়াই দিন স্বাধীনতার সময়, পাকিস্তানে ঢুকে গিয়েছিল, যেমন খুলনা ঢুকে এসেছিল ভারতে — তখন মুসলমানরা পাকিস্তানি ঝাণ্ডা উড়িয়ে স্লোগান-মিছিল হাঁকিয়েছিল:

হাতমে বিড়ি মুহ্‌মে পান
নারা-এ তকবির, পাকিস্তান —
হাতমে বিড়ি, মুহ্‌মে পান
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।।

খুব ছেলেবেলা থেকেই ওই স্লোগানে যে-চিত্র ফুটে উঠত, পান-বিড়ি খাওয়া জবজবে মুখ উন্মত্ত-উগ্র মুসলমানের, তাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেছে মাসুদ। তার পক্ষে কাউকে বোঝানো কঠিন, এই ঘৃণা তার আজো শেষ হয়নি কেন। এই উগ্র-উন্মাদনার শরিক হওয়া তো অগাধ ?? পড়া, পরন্তু সে এই উন্মত্ততার জন্য ভয় পেয়েছে, কষ্ট পেয়েছে, বিষণ্ণ হয়ে গেছে। এমনকী সে ওই সমাজে বাস করে মনঃপীড়ায় মাঝে-মাঝে অসুস্থবোধ করেছে।

কলকাতায় এম.এ পড়তে এসে তার অভিজ্ঞতায় এক উলটো বিষ-বিষ্ঠা পড়ল, কে কম, কে বেশি সে আর স্থির করে উঠতে পারল না। গুজরাটের ঘটনায় তার সমস্ত আস্থা-বিশ্বাস-প্রীতি-প্রসন্নতা গু হয়ে গেল। তার শরীরে সবসময় একটা চ্যাটচেটে অনুভূতি।

মানুষ কী, আদতে মানুষ কেমন জীব — এই একটা মৌলিক প্রশ্ন তাকে তাড়িয়ে ফিরতে লাগল। সে কি পশুই আলটিমেট? সে মুখ্যত মাংসাশী-নরখাদক এবং আপন প্রজাতি-ভক্ষণকারী ডাইনোসর? কী এই মানুষ?

গুজরাটময় পৃথিবীতে, আফগানময় পৃথিবীতে, কাশ্মীরময় পৃথিবীতে, পেন্টাগনের বাণিজ্য-সৌধের গলে-পড়া পৃথিবীতে — লাদেন-তালিবানময় পৃথিবীতে — যুদ্ধ-ধ্বংস-সাম্প্রদায়িকতা-বিষ-বিষ্ঠার পৃথিবী — কালো-শাদা বিদ্বেষী দুনিয়ায় মানুষ জীব হিসেবে কোথায় মৌলিক? কী তার অনন্যতা, কীসে সে আলাদা, কী ভাবে মানুষ নিজেকে মানুষ মনে করে?

— অ্যাই রাজা? শুনছ?
— হুঁ।

— হুঁ কী? কী ভাবছ বলো তো।

— 'হাতমে বিড়ি, মুহমে পান।'

— মানে!

— মানে আর কী। এক দল লোক, হাতে ধরানো বিড়ি, মুখে চপচপে পান, পিক ফেলে বেড়াচ্ছে পচপচ করে, ফু-হু-চু-দ্রু-ভোৎ-ফোৎ করছে। তলোয়ার-লাঠি-সোটা নাচাচ্ছে মাথার উপর। চপর-চপর করে খাচ্ছে।

— ধ্যাৎ!

— হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। তুমি বুঝবে না বনমৌলি।

— কী বুঝব না?

— নাটকে তুমি অনন্যর প্রেমিকা সেজেছিলে!

— তো?

— তুমি অভিনয় করছিলে আর ও-বেচারি বিহেভ করছিল, তোমাকে সত্যি করে চুমু খেয়েছিল, দর্শকদের দিকে পিঠ রেখে। তুমি কাউকে সে-কথা বলতে পারনি!

— বাজে কথা!

— অভি আমাকে বলেছে।

— অভি কী করে জানল?

— অনন্যই অভিকে বলেছে।

— কবে?

— এরই মধ্যে কবে যেন।

— এ-কথা হঠাৎ, এতদিন বাদে?

— গল্প করেছে।

— কেন?

— এইসব গল্প মানুষ কখন করে?

— কখন?

চুপ করে রইল মাসুদ। সে তার মেসের খাটে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। মেস খালি। সে একা। খাটের প্রায় গা-লাগা চেয়ারে বসে রয়েছে বনমৌলি।

মাসুদের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতি, আণ্ডারওয়ারের কতক অংশ ধুতির ফাঁক দিয়ে বাইরে ঠেলে এসেছে। গেঞ্জি ছাপিয়ে কাঁধের কাছের লোমগুলো চোখে পড়ছে মৌলির। ওখানে বাঁ-হাতের হালকা স্পর্শ দিতেই কেঁপে উঠে কাত হয়ে গেল রাজা। নিজেকে কুঁকড়ে ছোট করে নিয়ে বলল, আমাকে অনন্য আজ একটা জায়গায় একা দেখা করতে বলেছে, কী নাকি কথা আছে!

বনমৌলি চমকে উঠে তার হাত নিজের দিকে গুটিয়ে নিয়েছে চকিতে। গলার কাছে আধমুঠি মতো করে গুটানো হাতে রেখে জানতে চাইল, কোথায়?

— আমি কলকাতার ৯৯ শতাংশ চিনি না। পথ মনে থাকে না।

— যাবে কী করে? আমি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি।

— না। আমি বলেছি, যেতে পারব না।

— যেও না।

— ও আসবে। আমরা দক্ষিণের একটা ছোট স্টেশনে যাব। কথা হবে। ওকে আমি কোন্ স্টেশন বলিনি। যে-কোনোও স্টেশনে নেমে যাব। তা-ও আমিই ঠিক করব। হঠাৎ করে নেমে পড়ব।

— তুমি ভয় পাচ্ছ?

— যদি দেখি, সঙ্গে কেউ আছে, তাহলে আর বার হব না।

— ও তোমাকে অপমান করবে মনে করছ?

— বলা তো যায় না।

— কেন অপমান করবে তোমাকে!

আবার চুপ করে রইল মাসুদ। তারপর দু-পায়ের ফাঁকে কাপড় সামলাতে-সামলাতে চিত হল খাটে। চোখ দুটোর চাউনি কিছুক্ষণ অপলক রেখে দিল সিলিং-এ। ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

সেই চিকচিকে জলে দৃষ্টি রেখে মৌলি বলল, আমি নাটকে অ্যাকটিং করেছি, বিহেভ তো করিনি রাজা!

— ও করেছে।

— তার আমি কী করব!

সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে মৌলিকে একবার দেখল মাসুদ। তার পর আবার চোখ স্থির করল আগের ভঙ্গিতে। চুপ করেই রইল।

— মানুষ একটা রিসোর্স-ওরিয়েন্টেড অ্যানিম্যাল। জমি-মেয়েমানুষ-ধর্ম, এই হচ্ছে তার ওরিয়েন্টেশন। এটা তার আদি এবং প্রাথমিক ব্যাপার। এই ব্যাপারে তার অনন্ত উৎসাহ। আজো। হঠাৎ বলল মাসুদ — চুপ করে থেকে একসময়।

তার পর দু-দণ্ড চুপ থেকে বলল, মানুষের গল্প কখনো নতুন হয় না। মৌলিকভাবে মানুষ একঘেয়ে।

— কী সব ভাবছ!

— একদম ঠিক ভাবছি বনমৌলি। তুমি একটা রিসোর্স বা সম্পদ, তাই তোমাকে দখল করাটা আমাদের কাজ। পটিয়ে-পাটিয়ে বা জোর করে। তুমি মাত্র দু-হাজার টাকায় বিকিয়ে গেছ, এ-জিনিস লোকে সইবে না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি। বলে খাটে উঠে বসল মাসুদ। বসে রইল চোখ বুজে। তার পর খাট ছেড়ে নামল।

ঘরের কোণের পড়ার টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা লম্বা শাদা খাম বার করে আনল। মৌলির বসা-চেয়ারের সামনে বসে খামের মুখ হালকা আঙুলের চাপে ফাঁক করে চারখানা সবুজ পাঁচশো টাকার নোট এবং সঙ্গে একটা চিরকুট টেনে বার করল।

চিরকুটটা মৌলির হাতে দিয়ে বলল, কুরিয়ারে এসেছে, পড়ে দ্যাখো।

মৌলির চোখ বড়, আরো বড় হয়ে চিরকুটে নিবদ্ধ হয়। তাতে লেখা, 'ফেরত দাও। সঙ্গে পাঁচ টাকা বেশি দেওয়া গেল। না দিলে পস্তাবে।'

ধীরে থরথরিয়ে সমস্ত দেহ কাঁপতে শুরু করল মৌলির। সারা মুখ ছাই হয়ে গেল। ঠোঁটের উপর ঘাম জমল। কপাল মৃদুভাবে সিক্ত হয়ে উঠল। তার পর অকস্মাৎ ক্রোধের সঙ্গে সারা মুখে শোণিত ফিরে এসে দপদপিয়ে উঠল। রাজার চোখে চোখ মেলল মৌলি। এবং কাঁপা গলায় বলল, এ অন্যায়, এটা নোংরামি। এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

— কী করবে?

— কী করব মানে!

— দাঁড়াও, রেগেমেগে তো কিছু হবে না। আগে ভাবো কে চিরকুট লিখে টাকা পাঠিয়েছে। তা ছাড়া, ব্যাপারটাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি কি না ভেবে দেখতে পারো।

— না, বলে দু-চোখ বন্ধ করে একটা দম নেবার চেষ্টা করে মৌলি।

সহসা চোখ খুলে মৌলি বলল, তুমি কোথায় ফেরত দেবে আমাকে! এ কার হাতের লেখা! বলে চিরকুটে চোখ নামায়।

— অনন্যর নয়?

— না।

— শোনো, এ-লেখা অলক-অভি-শিবাজিরও নয়।

— কী করে বুঝলে? সবার হাতের লেখা পরীক্ষা করেছ?

— অভি বলেছে।

— কী বলেছে?

— আমাদের বন্ধু-সার্কেলে কারো হাতের লেখা এ-রকম নয়।

— অভির নিজের হস্তাক্ষর?

— না মৌলি। সে তো নয়ই। অভির ধারণা, বাইরের কাউকে দিয়ে লেখানো হয়েছে।

— সরাসরি লিখলেই তো পারত!

— তাই কি হয়! দ্যাখো, সে সামনে আসার ভরসা পাচ্ছে না।

— এ অত্যন্ত নিম্নমানের ব্যাপার।

— তা বই কী। ক্ষুধার্ত প্রেম নিম্নমানেরই হয়, সেটা ওত পাতে। ওই যে বলে না, প্রেম আর যুদ্ধ আসলে কোনো নীতির তোয়াক্কা করে না। ছলে-বলে-কৌশলে জেতাটাই আসল।

— তুমি বিশ্বাস কর?

— কী?

— প্রেম আর যুদ্ধ...

— লোকে বলে...ঠিকই বলে, প্রেম হচ্ছে লড়াই, দখল করার যুদ্ধ।

— তুমি ঠিক করে কথা বলো।

— কৃষ্ণ তার মামির সঙ্গে প্রেম করেছিল, সমাজের নীতি-ফিতি মানেনি। আয়ান ঘোষ বেটাও নপুংসক, তার ওই অক্ষমতা নাকি পূর্বজন্মের অভিশাপ। নারায়ণের তপস্যা করে পূর্বজন্মে আয়ান বর চাইল, তোমার স্ত্রী লক্ষ্মীর মতো, হে ঠাকুর, আমার একটা বউ হোক! তাই শুনে ঠাকুর নারায়ণ চটে গেলেন। কী, এত বড় আস্পদ্দা! লক্ষ্মীকে চাইছে, আহাম্মক! যা, পরজন্মে তুই নপুংসক হবি, বউটা তোর বাগে থাকবে না। এই হল গে কথা।

— বাজে কথা।

— বাজে কথা নয় গো মেয়ে। আয়ান শাপে পড়ে 'ডিজএব্‌ল্‌ড' হয়ে সারাজীবন ফ্যা-ফ্যা করে গেলেন, রাধিকাকে বিহার করলেন কানাই। ঘটনা জাস্টিফায়েড হয়ে গেল। তাই না? লক্ষ্মীকে চাইলেই কি পাওয়া যায়, বলো? শাপ লাগবে না!

— কী বলতে চাইছ!

— তুমি গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী; তাই এত কামড়াকামড়ি বেঁধেছে। তিনটে সরল

বাক্যই তো।

— কী বাক্য?

— লক্ষ করলে না! চিরকুটে তিনটে সরল বাক্যই তো লেখা আছে। 'ফেরত দাও। সঙ্গে পাঁচ টাকা বেশি দেওয়া গেল। না দিলে পস্তাবে।' কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, পস্তাতে হবে কেন? পূর্বজন্মে কি শাপগ্রস্ত হয়েছি?

— তুমি পূর্বজন্ম মানো?

— মানলে কত কিছুই উপভোগ্য হয় মৌলি। ধর্ম মানি না, কিন্তু ধর্মের গল্পগুলি উপভোগ করি। যেমন ধরো আয়ান ঘোষ অসমর্থ ছিলেন, স্ত্রী-গমন করতে অপারগ ছিলেন, এর জাস্টিফিকেশন হচ্ছে, তেনার কপালে পূর্বজন্মের আরাধ্য ঠাকুরের দেওয়া অভিশাপ। নারায়ণকে আমার কেমন যেন মিসচিভাস ঠেকে; শুনেছি, কোথাও-কোথাও বলা হয় সরস্বতী নাকি তেনার উপপত্নী ছিলেন। একেই বলে বরাতজোর, সরস্বতী নারায়ণের প্রেমে রক্ষিতে হতেও তৈরি ছিলেন! চাট্টিখানি কথা!

— তুমি উপভোগ করো?

— করব না!

— না।

— কেন?

— তুমি মুসলমান। ইসলামে এইসব নেই?

— আছে। অন্যের বউকে দখল করার কেচ্ছা আছে, মৃতা কোনো নারীকে কবরে ঢুকে গমন করার গল্প আছে। কী নেই! সব আছে। সমকামিতা আছে। খোজা আছে। জারজ আছে। বৈধ-অবৈধ আছে। বলাৎকার আছে। সব একঘেয়ে, মানুষের নতুন গল্প হয় না। মানুষের মৌলিকত্ব হয় না। মানুষ যৌগিক, তার কোনটা প্রধান যৌগ জানা নেই।

— মনুষ্যত্ব?

— ভুল। ওটা কল্পনা। যেমন ধরো, 'কাক' শব্দটা কাককে, 'টিয়া' শব্দটা টিয়াকে বোঝায়। 'মনুষ্যত্ব' শব্দটা মানুষকে বোঝায় না। 'মানুষ' কথাটাও মানুষকে বোঝায় না। 'মানুষ' শব্দটা অমানুষকেও বোঝায়। মানুষের আকৃতিটা মানুষ, এটাকে হিন্দি-উর্দুতে বলে 'আদমি'। মানুষের প্রকৃতিকে নির্দেশ করার জন্য বলা হয়, 'ইনসান'। আদম থেকে 'আদমি'। 'ইনসান' থেকে 'ইনসানিয়াত'। মানে, মনুষ্যত্ব। বাংলায় এ-ক্ষেত্রে শব্দের অভাব। আদমি এবং ইনসানের পার্থক্য বোঝানোর মতো শব্দ নেই। আমার এই দেহটাও মানুষ, সে হচ্ছে আদমি, অর্থাৎ আদি মানব। এর হওয়ার কথা 'ইনসান'। এক জ্ঞানী বাউল বলেছিল, মানুষের স্বত্বই মনুষ্যত্ব। এবং বলেছিল, মান এবং হুঁশ নিয়ে মানুষ। হুঁশ হল চৈতন্য, মান হচ্ছে মর্যাদাবোধ। তাই-ই যদি হয়, তা হলে গুজরাট-আমেদাবাদে-গোধরায় নরমেধ-যজ্ঞ হয় কেন?

— সে-তো রাজনীতি।

— রাজনীতি মানে কী? নীতির রাজা। শ্রেষ্ঠ নীতি। গুজরাটের শ্রেষ্ঠনীতি নরমেধ। তাই না? তা হলে দেখা যাচ্ছে, ঘাস মানে ঘাস, গোলাপ মানে গোলাপ। রেল মানে রেল। নদী মানে নদী। সমুদ্র মানে সমুদ্র। নরুন মানে নাক নয়। নরুন। কিন্তু রাজনীতি মানে কী? নেতা মানে কী? মাথা মানে মাথা। নেতা মানে কি নেতা? ধর্ম মানে কি ধর্ম? তাই মানুষ মানে মানুষ নয়। 'মানুষ' কথাটা মানুষের কল্পনা। বাস্তব নয়। যেমন ঈশ্বর একটা কল্পনা, তাকে কেউ-কেউ

কখনো-কখনো অনুভব করেছে বলে শুনেছি। যারা করেছে, তারাই জানে ঈশ্বর কী। তেমনই 'মানুষ', অনুভব করতে পারলে ভালো। পাওয়া যায়।

— তুমি পাওনি কখনো?

— কালো দাদি মানুষ ছিল। এখন কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এক বছর হল, কথা বলে না। আগে কম বলত। এখন আর বলেই না। গুজরাটে ধর্ষিতা-মৃতা মায়ের শিশুরা মাকে ধর্ষণে-মরণে দেখেছে এবং এখন কথা বলতে পারে না। মন্ত্রীরা কথা বলে। সব সময় কথা বলে।

— তুমি আর কথা বোলো না, প্লিজ! তোমার কষ্ট হচ্ছে। বলে বনমৌলি একটা হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে নিজেকে সংবরণ করে, অন্য হাতে বিধৃত চিরকুট। সেদিকে তেরছে চেয়ে থাকে। ক্রমাগত বাক্য তিনটি সরল থেকে জটিল হয়। আকারে সরল হলেই কি ভাব সরল হয় বাক্যের? সত্যিই তো, রাজাকে পস্তাতে হবে কেন? মাসুদ কি বিনষ্ট হবে?

ভেবেই শিউরে উঠল মৌলি। পরক্ষণেই সে ভাবল, এ কিছু নয়। এই চিঠি-চিরকুট একটা সরল বদমায়েশি বা দুর্বল লোভ অথবা ঈর্ষা। সাহস নেই। কিন্তু কুটিলতা অনেক। নির্ঘাত এ লোক অনন্য। অনন্যই এখন রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

— মানুষ প্রতিযোগী জীব। তীব্র, সুতীব্র ভয়ানক প্রতিযোগিতা। এমনকী হিংস্র প্রতিযোগিতা।

— চুপ করো।

— আমি পারি না।

— কী পারো না?

— চাপ।

— কীসের চাপ?

— এই স্নায়ুর।

— তুমি তো এত কথা বলতে না।

— গুজরাটের পর বলছি।

— কেন বলছ?

— কাউকে তো বলতে হবে।

— কী বলবে?

— আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। গত রাতে পাঁচবার দেখেছি। পাঁচ রকম।

— পশ্চিমবঙ্গে তো দাঙ্গা হয়নি রাজা! ভয় কেন পাচ্ছ?

— তোমার লজ্জা, আমার ভয়।

— হ্যাঁ। ঠিক কথা। কিন্তু একটা জিনিস, মানে ঘটনা, তোমাকে বলা দরকার। আমাদের পরিবারে আমার বাবার দূর-সম্পর্কের এক দাদা তার মেয়েকে সঙ্গে করে বাংলাদেশ থেকে চলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভয়ে।

— ও, তাই?

— হ্যাঁ, রাজা। আমি সেই জ্যাঠামশাইকে ভয় পেতে দেখি। মাঝে-মাঝে দুঃস্বপ্নে ঘুমের মধ্যে গোঙায়। জ্যাঠা একজন হাতুড়ে ডাক্তার, বাংলাদেশে ভাল পসার ছিল। এখন বাবার কম্পাউন্ডারি করে, মানে করেন। এখনতো কম্পাউন্ডার বলে না, অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে। বাবা সেইভাবেই বলেন, 'আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট'। জ্যাঠা তোমাদেরই এদিকে একটা ক্লাবে সন্ধ্যার দিকে সপ্তায় তিন দিন ডাক্তারি করতে আসেন। ওঁর এখনো সিটিজেনশিপ হয়নি। এ-ব্যাপারে

অনন্য ওঁকে সাহায্য করবে বলল পরশু।

— ও।

— রেশন-কার্ড করিয়ে দেবে বলেছে। তা-ছাড়া বোনটার বিয়ের ব্যবস্থাও দেখবে বলেছে। মা, সত্যি বলতে কী, জ্যাঠার সামনে দাঁড়াতে পারে না। খুব অসোয়াস্তি হয়। বাবা-মেয়ে কখনো পরিষ্কার করে সব ঘটনা বলে না। আমার সন্দেহ হয়, পারুল রেপড হয়েছে। শুধু মেয়েটা মাঝে-মাঝে একলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদে। আর জ্যাঠা তাঁর পূর্ব-পসারের গল্প করে। ওঁর পেশেন্টরা শতকরা নব্বুই ভাগই মুসলমান ছিল, সে-কথাও বলেন। বাড়িতে সেই সব বলাবলি হয়, সেই আলোচনায় অনন্য থাকে।

— ও।

— সেই আলোচনা ক্রমে-ক্রমে একটা নেশার মতন হয়েছে। অনন্য উত্তেজনা পুইয়ে চলেছে। আমি তার ওই ধরনের গল্প করা, আশ্বাস দেওয়া এবং চুকচুক করা একদম সহ্য করতে পারি না। এদিকে তুমি... বলে থেমে গেল বনমৌলি।

মাসুদ একটা অদৃশ্য চাবুকে সিধে করল তার শিরদাঁড়া। মৌলির কথা বলায় এমনই ব্যথা আর করুণা এবং লজ্জা মিশে ছিল যে, মাসুদের নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল, তার মুখের রং সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

খাটের উপর থেকে আবার নেমে পড়ল মাসুদ। নিজেকে সে অপরাধী ভাবতে শুরু করেছে। অথচ সে কখনো বাংলাদেশ দেখেনি। বাংলাদেশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। জ্যাঠার ঘটনায় তার কোনো হাত নেই, পারুল ধর্ষিতা হয়ে থাকলেও তার কিছু করার ছিল না।

বনমৌলিদের বাড়িতে তা হলে শান্তি নেই। ওই বাড়িতে জ্যাঠা এবং তার মেয়ে আশ্রয় পেলেও তারা সুখী নয়। তারা থিতু হতে পারেনি। জ্যাঠার কম্পাউন্ডারি করতে নিশ্চয় ভালো লাগে না, কারণ মানুষটা নিজেকে ডাক্তার মনে করে। মানুষটা এখনো গোপনচারী, এখানকার প্রধান জীবনস্রোতে মিশে যেতে পারেনি। তার রেশন-কার্ড দরকার, জমি দরকার, বাসস্থান দরকার, পসার দরকার, পারুলের বিয়ে দরকার। হবে, হবে। অনন্য যখন চেষ্টা করছে, তখন হবে।

— অনন্য কী বলে? তুমি শুনেছ মৌলি?

— হ্যাঁ। কেন শুনব না!

— জ্যাঠাকে তোমার বাবা কী বলেন?

— কী বলবেন! বলেন, আরো ভালো করে শিখতে।

— ডাক্তারি?

— জ্যাঠা লজ্জা পান?

— কেমন একটু আড়ষ্টভাবে বাবার কাছে বোঝবার চেষ্টা করেন। আসলে নিজেকে ডাক্তার ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন কিনা! কম্পাউন্ডার বললে, কোনো রুগি যখন বলে, ওষুধ কখন খাবে না খাবে বুঝে নেবার সময় কোনো পেশেন্ট যখন...।

— বুঝেছি।

— কম্পাউন্ডারবাবু বলে যখন সম্বোধন করে কেউ, মানে কোনো রুগি, তখন জ্যাঠা রেগে যান।

— কী বলেন?

— 'ওহে, আমি কম্পাউন্ডার নই, আমিও ডাক্তার', পেশেন্টকে বলেন।

— শুধরে দেন।

— হ্যাঁ।

দেওয়ালে টাঙানো একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো মাসুদ। একটা খোঁচে আয়নাটা ঝুলছে। ওর গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। হাতের তালু গালে আলতো ঘষে দাড়ির খোঁচার আন্দাজ নেয় সে। সকাল ন-টা বাজছে।

— বাবা তখন অবাক হন, বিরক্তও হন। সামান্য। বলে ওঠে মাসুদ।

— আগে তাই হতেন। এখন বিরক্তই হন।

— জ্যাঠার নাম?

— মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি। তুমি শেভ করবে?

— হ্যাঁ।

— আমি করে দেব?

— তুমি! সে কী, তুমি কেন!

— আমি পারি। বাবার শেভ আমিই করে দিই।

— পাগল না কি!

— এতে পাগলের কী আছে!

— কেটে ফেলবে না?

— না।

— ঠিক বলছ?

— আরে বাবা, তোমার কাটলে আমারই বেশি লাগবে।

এবার মনে-মনে চমকেই উঠল মাসুদ। চমকে উঠে ঘাড় বাঁকিয়ে গালে হাত রেখে রাজ্যের বিস্ময় মুখমণ্ডলে জমা করে অপলকে মৌলিকে দেখতে থাকে। এ-এক নিশ্চয় খুব আশ্চর্য মেয়ে।

অপরপক্ষে মৌলি অমন একটা মুখ-ফসকানো কথা বলে ফেলে লজ্জাই পেয়েছে। এই অবস্থায় মাসুদের দিকে চেয়ে থাকতে না পেরে চোখ নামিয়ে চিরকুটটা দ্রুত তার কাঁধে-বওয়া সরু ফিতের ব্যাগের মধ্যে — যা এখন খাটে পড়েছিল সেটাকে কাছে টেনে নিয়ে চেন টেনে ঢুকিয়ে দেয় দ্রুত এবং হাতের নখ, আঙুলে খুঁটতে থাকে, নখ বা নখের দর্পণ দেখে।

কিছুক্ষণ মৌলিকে মূঢ়-বিস্ময়ে চেয়ে দেখার পর মাসুদ পাশের ঘরে গিয়ে শেভ করার যন্ত্রপাতি, ক্রিম ইত্যাদি নিয়ে আসে। বলে, নাও, হাত লাগাও।

দাড়ি কাটার সব কিছু হাতে তুলে পরখ করে নেয় মৌলি।

— তোমার রেজার ভালো নয়। তোমাকে আমি একটা ভালো কিনে দেবো। ঠিক আছে?

— হুঁ।

— এইরকম হুঁ বলবে। 'না' বলবে না। 'হ্যাঁ' বলবে না। কখনো 'অ্যাঁ' করবে না, কাটলেও।

— এই যে বললে কাটবে না!

— কথা বললে কাটবে। মুখ-ব্যাদান করলে কাটবে। ছটফট করলে কাটবে।

— আমি করছি?

— করছ। নাও, জল আনো।

— আমার একটা ছোট খুরি আছে, মানে বাটি। ফিটকিরি আছে। আফটার-শেভ লোশন আছে। এই ব্রাশটা খারাপ?

— না।

— তুমি খুব গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ বন।

— শেভ করার সময় গম্ভীর থাকতে হয়, এমন গম্ভীর যাতে মনে হয় পৃথিবী কথা বলছে না। কেমন?

— হ্যাঁ।

— বাবাকে এইসব বলে থামাতে হয়। যখন শেভ করে দিই, জ্যাঠা ফ্যালফ্যাল করে দ্যাখে। কেন জানো?

— কেন?

— বাবাকে দেখে জ্যাঠাও একদিন আব্দার করে বললেন, আমারটাও দিতে পারো না মা? তাই শুনে বাবা তো ক্ষেপে আগুন। বলল, তুমি কি খেপলে নাকি মোহিনীদা, আমার মেয়ে কি সেলুন খুলেছে? ব্যস, হয়ে গেল। কী লজ্জা যে পেলেন জ্যাঠামশাই। তার পর আমি দিতে চাইলাম, কিছুতেই উনি নিলেন না। জ্যাঠা কেবল মৃদুস্বরে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, সেলুন বলছ ভাই, মেয়ে বলেই বলেছিলাম। সে-কথা বিড়বিড় করে বললেন জ্যাঠা জিভের তলায়। সারা সপ্তাহটা উনি দাড়ি না কামিয়ে রইলেন, পরের সপ্তাহেও চার দিন বাসি দাড়ি-গোঁফ নিয়ে কম্পাউন্ডারি করলেন। বাবার অবশ্য একটা নরম যুক্তি ছিল, সবার শেভ করে বেরালে মৌলি পড়বে কখন, অনার্সের ছাত্রী। ওকে তুমি শেভ করবে বুঝি? তাই শুনে মায়ের কী হাসি। মা হেসে ফেলে বলল, পাশের বাড়ির অধ্যাপিকা শুনেছি 'শেভ' করে ইউনিভারসিটি যান। ওনার মুখে ব্যাটাছেলের মতন গজায় দেখেছি।

— মা বললেন?

— হ্যাঁ। খুরিতে আঙুল ডুবিয়ে জল নিয়ে মৌলি মাসুদের মুখে মাখাতে থাকে। ওরা দরজা আধখোলা রেখে কামান দিচ্ছিল। ব্রাশ ঘষতে থাকে মৌলি মাসুদের মুখে। ঘষতে-ঘষতে বলে, মায়ের ওই! কথা গড়াতে ওস্তাদ, খেই থাকে না। এতে হল কী, জ্যাঠা আরো অপমানবোধ করলেন। পারুলের চোখে জল চিকচিক করে উঠল। আশ্রিত মানুষের অভিমান বেশি; সংখ্যালঘু বলেই হয়তো এপারে এসেও স্বাভাবিক হতে পারেন না, যেন চোরের মতন রয়েছেন। বাবাও ঠিক বোঝে না সব। আসলে হাতুড়ে ডাক্তার দু-চক্ষে দেখতে পারে না বাবা। কিন্তু হয় কী....নাও, মুখ তোলো।

— অ্যাঁ।

— 'অ্যাঁ' নয়, কোনো 'অ্যাঁ' নয়। ক্ষুর ধরলে একদম 'অ্যাঁ' করবে না। ভাববে, তলোয়ার দিয়ে দাড়ি 'চাঁছা' হচ্ছে, নজরুলের 'কৈফিয়ত' মনে আছে? ভাববে, দিস ইজ আ সোর্ড অব...

— গুজরাট!

— না রাজা। সেটা সোর্ড অব কাশ্মীরও হতে পারে। ওখানকার হিন্দু পণ্ডিতদের খুন করা হয়েছে।

— বনমৌলি!

— বলো। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মেরে তাড়ানো হয়েছে। তুমি কাগজে পড়েছ।

— হ্যাঁ।

— এইসব আলোচনা বাড়িতে হয়। অনন্য করে। জ্যাঠা করেন, বাবাও করে। মা-ও বলে, বাংলাদেশটা আর হিন্দুর থাকবে না। হিন্দুশূন্য হবে। ধীরে-ধীরে সব চলে আসবে ভারতে। ভারতমুখী হিন্দুস্রোত কখনো থামবে না হিন্দুশূন্য হওয়ার আগে! এ-কথা অনন্য বাবার মাথায় সেঁধিয়ে করিয়ে দিয়ে থাকলে আমি তো কিছুই বলতে পারিনি। বলতে গেলে, জ্যাঠা বলেছে, 'তুমি 'বিটি' থামো তো'। এই 'বিটি' কথাটা বাংলাদেশি বোধহয়, জ্যাঠা অনেক মুসলমানি লব্‌জ বলেন হামেশা। জেঠিমা, শুনেছি, দর্জির কাজ করেন ওখানে। মোটা হাতের কাজ। ওই এলাকার গরিব মুসলমানরা পরে। ঈদের জামা কাপড়, জেঠিমার সেলাই-ছাঁট। অনন্য অবশ্য বলে, ওটা সংবিধান বদলে ইসলামি রাষ্ট্র হয়েছে। হিন্দুর থাকার কথা নয়।

মাসুদের ফেনায়িত মুখে, 'হুঁ', ছাড়া কথা নেই। তার গালে রেজার চলেছে।

— ওখানে একটা আইনের নাম, 'শত্রু-সম্পত্তি আইন'। জ্যাঠারা পুরোপুরি চলে এলে ওদের বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি সরকারি খাতায় জমা পড়বে।

— হুঁ।

— হিন্দু-মুসলমান তা হলে শত্রু?

— হুঁ।

— কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা মুসলমানের শত্রু?

— হুঁ।

— জেঠির সেলাই-ছাঁট মুসলমানরা ঈদে পরে নামাজ পড়ে। জ্যাঠার ওষুধ খেয়ে বেঁচেছে।

— হুঁ।

— তা-ও শত্রু?

— হুঁ।

— পারুলকে ধর্ষণ করেছে তা-সত্ত্বেও?

— হুঁ।

— অনন্য কি শত্রু?

— না।

আর 'হুঁ' বলতে পারল না মাসুদ। ওর গাল কেটে গেল 'খচ্' করে। সাদা ফেনার মধ্যে ফুটে উঠল গোলাপি রক্তবিন্দু, প্রসারিত হতে-হতে গাল ভরে গেল। মাসুদ একটুও কষ্ট-মাখা কোনো শব্দ প্রকাশ করল না।

মৌলির হাত থেমে পড়েছিল, সে জিভ বার করে ফেলেছে দেবী কালিকার মতো, চোখে-মুখে লজ্জা-অপরাধ-পস্তানি। মাসুদ বোকার মতো হাসছে। খাটের উপর বসে, হাঁটুতে মেঝেয় ভর-রাখা মাসুদের 'কামান' দিচ্ছিল বনমৌলি। বোকা হাসির সঙ্গে মুখটা মাসুদ আস্তে করে মৌলির কোলে গুঁজে দিয়ে কী একটা বলল, মৌলি বুঝতে পারল না। চিত্রার্পিত মৌলির রেজার-ধরা হাত শূন্যে স্থির।

দরজা ঠেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনন্য। রক্তফেনায় ভরে যাচ্ছে বনমৌলি। কখন অনন্য ছায়ার মতো এসে দাঁড়াল, টের পায়নি ধারালো রেজার।

উত্থান

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায় — এমনতরো দু-পদী পদ্যখানি সেই কোন্ কালের জঠর থেকে আস্ত উলটে এল আজ চোখের সামনে। সেই কথাটি এতকাল নেহাতই একখানি ভেসে যাওয়া পট হিসেবে মনে-মনে দুলত। যেমন দুল-দুল করত বাসুদেব মণ্ডলের বাপ বট মণ্ডলের মা জননী রেবতীর গলায় তুলসীকাঠের কণ্ঠি। সেই বুড়ি বাসুদেবের ছেলেকালে কত না বৃষ্টি-ঝরা আর জ্যোৎস্না-বওয়া আকাশ সাক্ষী রেখে বক-বকম আউড়ে যেত পুরনো মেটে হাঁড়ির তেঁতুল। বুড়ি ঠাকুরমা বলত, পুরনো ঘি ডললে যেমন বুকের জমা শ্লেষ্মা বিদেয় হয়, তেমনি এই সব কথা শুনতে-শুনতে বুক জোড়া আঁধার খসে যায়। তাই বুড়ি কুঁড়োজালির ভেতরে কাঁপা হাতে মালা ফেরানো বাইতে-বাইতে কত না সব প্রাচীন তেঁতুলের তত্ত্ব আওড়াত। সেই সব বলা-কওয়ার মধ্যে যেমন সেই কবেকার ১৬৩৬ সালের দয়ালু ডাক্তার বাউটন সাহেব, তেমনি ছিল নবদ্বীপের টুলো পণ্ডিত নিমাই কেমন করে চৈতন্য হলেন। চৈতন্য হয়ে কেমন করে নদে জেলা হরিনামে ছয়লাপ করে ভাসিয়ে-ভাসিয়ে একেবারে চৌপাট করে ছাড়লেন। তবে ওই হরিনাম ইত্যাকার ব্যাপার বিষয়ের মধ্যে বুড়ির একটি কথা ভারি টন্‌কো। সেটি হল নিমাই পণ্ডিত, পণ্ডিতি ভুলে কী করে চৈতন্য হলেন আর চৈতন্য হয়ে আ-চণ্ডাল মানুষকে একটি পোক্ত সুতোর ঘেরে কেমন করে বেঁধে দিলেন। হিন্দু-মুসলমান ছোটো-ছোটো জলা, সব ভেসে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড আ-মাপা সমুদ্দুর হয়ে গেল। সেই কারণেই বুঝি ওই নদে ভেসে যাওয়ার কথাটি লোকের মুখে-মুখে উঠে পড়েছিল। হরিনাম বা কৃষ্ণনাম এগুলো তাবত ইতিহাসের মাতনের এক-একটি পাক। সেই পাকটি একেবারেই বাইরের। আসল পাকটি ভেতর-মহলের, যেখানকার সুলুক জানলেও সুবিধাবাদীর সুযোগ নেওয়া খপ্পরে পড়ে খোল কত্তালের ধুন্ধুমারগুলোই হইহই করে ওঠে। সেই জন্যেই বাউটন সাহেবদের কথা ইতিহাসের গোদা-গোদা বইতে লেখা হয় না। সেই ফেরে পড়েই চৈতন্য মশাইকে হরিবোল-হরিবোল নামাবলী দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। তা না হলে যুগ-যুগ ধরে সামন্তধর্মের চাকাটি ঘুরবে কেমন করে! এর নাম কিনা ধর্মের কল বলে কথা।

কিন্তু সেসব যা হোক্ এখন যে সত্যি-সত্যিই নদে জেলা ভেসে যাচ্ছে। সেই ট্রাক ড্রাইভারের মুখে মালদা জলে যাওয়ার সমাচার থেকে ধরে কোটরগত ভূতুম পেঁচাটির তেঁতুল কপচানোর কথা সবই কেমন সত্যি হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। এই ১৯৭৮-এর ঠিক আটাত্তর বছর আগেকার বন্যা এখন এসে বুঝি পৌঁছে গেল এক মহাপ্লাবনের দোরগোড়ায়। কুটুরে পেঁচাটির কথায় — হরির দেশে এবার মা দুর্গতিনাশিনীকে ডাকার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

হাইরোড থেকে ব্লক অফিস আসতে রাস্তার দু-ধারে ধু-ধু সমুদ্দুর। সাইকেল আর ছাতা এক লণ্ডে সামলানো যায় না বলে একসময় বাধ্য হয়েই ছাতা মুড়ে সাইকেলের ক্যারিয়ারের সঙ্গে বাঁধতে হল রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া এক টুকরো তার দিয়ে। তারপর লুঙিখানা তুলে ফেত্তা দিয়ে বেঁধে খপাখপ সাইকেল বাওয়া। বুকের ভেতরে বসে ঠাকুরমা রেবতী কুঁড়োজালি ফেরায়, শান্তিপুর ডুবু ডুবু — নদে ভেসে যায়। বাপ বট মণ্ডল তুমুল বৃষ্টির রাতে জড়িয়ে-জড়িয়ে

তাড়ির খোয়ারি কপচায়, বড় পুত্তুর না ঘোড়ার মুত্তুর! এ-শালা কোথায় সংসার ধম্মো করবে, চাষ কম্মো করবে তা নয়, কমুনিস্টি মারাচ্ছে। ওরে গুয়োর ব্যাটা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। মরতে বসলে তখন কোনও ইস্টিই এসে বাঁচাবে না — হুঁ।

সোঁ-সোঁ শন-শন হাওয়া কাটছে। সারা শরীরের এপাশ-ওপাশ নয়, একেবারে মাঝখান বরাবর হাড়মজ্জায় বিঁধে যাচ্ছে বৃষ্টির সূঁচ। জলের তোড়ে সাইকেলখানা তুচ্ছ তুলো হয়ে যাচ্ছে থেকে-থেকে, আবার মনের জোরে আরও খানিক চাপান দিয়ে অনেক ফয়জত করে তুলোকে কাষ্ঠ ভাবতে হচ্ছে। পায়ের গুলোজোড়ায় যেন সাড় নেই কোনও। রপটানি হতে-হতে পা দু-খানা যে আছে, এমন মনে হওয়াটাই আশ্চর্য। চাকলা-ওঠা মাথার মাঝখানে দু-পাশ থেকে টেনে চুড়োবাঁধা গুঁটলি খুলেটুলে একেবারে ছত্রাকার। চুলে-দাড়িতে মাখামাখি জড়াজড়ি। এমনকী একটানা চোখ খুলে রেখে সাইকেল চালানোও দায় হয়ে যাচ্ছে। এখনও — এই বয়েসেও পাটভাঙার পাথুরে বুকে মাঝে-মাঝে সেই ছেলেকালের পালাগানের বিবেক ফুকরে উঠছে — হায় বিধি, বুকে আমার শেল হেনেছে কে?

কে আবার, এই অনাছিষ্টি বৃষ্টি! এই পাগল-পাগল বাতাসের তোড়! আকাশের মনের কথা কি কেউ পড়তে পারে! সত্যি-সত্যিই আকাশের মন আছে কি!

ডানহাতি মাঠের সমুদ্দুর বেয়ে একটি চৌকি দমাস্-দমাস্ নাচতে-নাচতে ছুটে যাচ্ছে। তার কানায় একটি বাজ পাখি বসে আছে। বাজ পক্ষী ভাসতে-ভাসতে দুলতে-দুলতে এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে গম্ভীর নিরীক্ষণ করছে। তা হলে আশ্চর্যের আর বাকি রইল কী! আকাশে যে পাখির বিচরণ, সে আজ নীচে নেমে এসেছে। অর্থাৎ কিনা, আকাশেও তার টেকা দায় হয়ে গেছে। অথবা এই নীচেকার মাটি-ময়দান সবটাই এখন আকাশ হয়ে পড়েছে।

চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ফলে বারে-বারেই সেটি খুলে জামার হাতায় ঘষে স্পষ্ট করে নিতে হচ্ছে। সেই ফাঁকেই নতুন করে মুছে নেওয়া চশমার এপার থেকে চোখে পড়ল ভাসতে-ভাসতে চলে যাওয়া বাজ পক্ষীটি কীরকম এক ঝলক মিচকি হেসে গেল এক চক্ষু টিপে। সে চলে গেল, কিন্তু তার হাসিটি রয়ে গেল।

চলতে-চলতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভেসে যাওয়া বাজ পক্ষীর তেরছা হাসির লেজটুকু আর একবার দেখতে চেষ্টা করেন বাসুদেব। ঢেউ খেলন্ত মাঠ-সমুদ্রে তার হাসিটি কিন্তু গুলে যায় না। এমনকি জলের টুবু টুবু কিনার-নেই-কিনার থেকে হঠাৎ চাগাড় দিয়ে উঠে পড়া আকাশেও সেই চোরা হাসির ছোঁয়াচ পেয়ে বসে। জল-ঝমাঝম মাঠঘাট পেরিয়ে, আকাশ উজাড় ঘটমণ্ডল কোন্ ভোজবাজিতে আবার ভরে নতুন করে মেঘ গুম-গুম করে ওঠে। কেঁচে গণ্ডূষ করে আকাশের ছানাপোনারা। হিম-কালো করমণ্ডলে ঝাঁ-চকচকে করাত চালু হয়েই থাকে। চড়-চড়-চড়াৎ চিরে ফেলে ঘটোৎকচের পা। শিবানী নাট্য অপেরার ভুঁড়ো অধিকারী রতন আড্ডি মশাই স্টেজ থেকে বেশ তফাতে হু-হু শীতের মাঠের মধ্যিখানে গিয়ে হা-হা-হা অট্টহাস্য করেন আর ঢুকু-ঢুকু খেজুর রসের গেঁজলা শুদ্ধ চুমুক মারেন।

বুড়ি রেবতী কুঁড়োজালি ভুলে দুলে-দুলে ছড়া কাটে, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান / শিবঠাকুরের বে হবে তিন কন্যে দান।

রতন আড্ডি হাঁক পাড়ে, দাবানল জ্বলছে, দা-বা-ন-ল। হুঁ, এই আমার বুক বেয়ে নামছে রে। আর উদিকে মেরুদণ্ড খামচে ধরছে রে। কুলকুণ্ডলিনী নাইকুণ্ডলিনী সব এক হয়ে যাচ্ছে। কে জানে কালী কেমন, ষড়দরশনে না পায় দরশন।

রেবতীবালা চোখ মটকায়, সাত দিন সাত রাত্তির বিষ্টি পড়ে, ঝমর-ঝমর আগুন ঝরে। নাগাড় জলে মাঠ ভাসে। ভাসার কোনো ঠিকঠিকানা থাকে না। ডাঙা জমি নদী হয়ে যায়। ডুবো নদী প্যাঁচ কষে।

— হুঁ, সাতমন নয়, পাক্কা পাঁচমন, দশ ছটাক, তিন কড়া, দু-ক্রান্তি তেলে কদম্বগাছির বুলুরাণীকে আমি রাধা নাচিয়ে তবে ছাড়বো। রাধেকেষ্ট বল্ মন আমার — রাধেকেষ্ট বল্।

— ন-দিনের দিন বেলা-কত-যেন গতে আমাবস্যে গত হয়। তার পর থেকেই জলের গড়নে টান ধরে। চোরা-চোরা বালির পায়ে-পায়ে জল ভাঙতে শুরু করে। পোয়াতির জল ভাঙলে দাই বাখারিতে হাত বুলোয়, ধন আমার, মানিক আমার। পোয়াতি হাই তোলে, কই গা, ব্যতা তো এখুনো উঠচে না। দাই পটেশ্বরী দাসী দিব্যু চোখ মারে অবলা কুমারীর পানা, আমি কোনো কম্মের নইকো ঠাকুরঝি, ভালো করে চাড্ডি ভাত বাড়ো আমি ন্যাদস পোয়াতি।

— ডি এল. রায়, ফুঃ ফুঃ। দাবানল জ্বলছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক মারছে। পাক দিয়ে সুতো লম্বা করো। লম্বা করো। লম্বা করো।

বাসুদেব মোড়লের বাপ বট মোড়ল বলল — তা ছেলে বলব, না ব্যাটা বলব জানিনি। ওরে বাপ, আমি মল্লে মাথা ন্যাড়া না করিস্ — একটা তিল-কাঞ্চন ছেরাদ্দ অন্তত করিস্।

বৃষ্টি আর হাওয়ার তোড়ে বাবার কথা মাঝে-মাঝে ঝাপসা হয়ে যায়। সেই যেন সেকালের কানে-ফোন রেডিয়ো। থাকে-থাকে কথা গান নড়ে যাচ্ছে, বিচ্ছিরি ঝোড়ো ফ্যাঁসস্ হয়েই চলেছে। কিন্তু ভোর থেকে রাত অবদি বকবক, গান — হয়েই চলেছে।

বক-বকম্ বক-বকম্ কথা কিংবা গান বট মণ্ডলের, হ্যাঁ, তিল-কাঞ্চন আর দ্বাদশটি বাউন-ভোজন। দক্ষিনে বলতে একটি হত্তুকি, পৈতে আর একটি সিকি। এটুকু যদি জন্মদাতা বাপের জন্যে করতে না পারিস্ তো তোর কপালে দুগ্গতি আছে।

— কি দুগ্গতি শুনি?

— তোর ছেলে হয়ে জন্মাবো। আঁতুড়ঘরেই মুখ দিয়ে মালের গন্ধ পাবি। গুরুতেই যদি এই হয় খালে পরে কী হবে!

বৃষ্টির ছর্‌রা ছুটছে চারধার থেকে। কোথা থেকে, কোন মুখ থেকে তাড়া হচ্ছে তা বোঝে কার বাপের সাধ্যি। তবে যা হচ্ছে তা যে একটি হেস্তনেস্ত সেটা তো সাফ কথা। যা হচ্ছে তা যে এতখানি বয়েস অবধি দেখা হয়নি সেটিও তো মস্ত সত্যি। কোথাকার জল কোথায় এসে আবার কোথায় চলে যাচ্ছে সংসার চৌপাট করে।

ডান দিকের নয়ানজুলি থেকে একটি জল-দাঁড়াশ সরসরিয়ে রাস্তা পেরোয়। গা-গতরে বেশ ভারী সাপটি। তার সেই চলে যাওয়া কিংবা পলায়ন বসে-বসে তরিবত করে দেখে গলাফুলো ব্যাঙ একজোড়া। তাদের মাথার ওপর কচুপাতার ছাউনি। সাপটি এধারের জলা ছেড়ে ওধারে পালায় বোকার মতন। মুখের সামনে উজিয়ে-আসা-খাদ্য ফেলে এক জল থেকে আর এক জলে যায়। যে-প্রাণীটির জলেই সুখ সে কি না জল দেখে ভয় পাচ্ছে!

পরপর সার দিয়ে ক-টা ট্রাক এগিয়ে আসে ভারি সামলে-সুমলে — আস্তে-সুস্থে। তাদের ড্যাবা-ড্যাবা আলোর চোখজোড়া এই দিনমানেও জ্বলছে। একজন খালাসি জানলা দিয়ে কোনওমতে একবার মাথা বার করে বলে যায়, সামনে গাছ পড়েছে, গাছ — গাছ।

চিৎকারটা বৃষ্টির ধামসা শব্দের মধ্যে দিয়ে কানে আসে। বাসুদেব রাস্তার এক পাশে

সাইকেলে দু-পা নোঙর করে চশমা খুলে ভিজে জামায় বৃথাই মোছেন। সামনেটা আরও ঘোর, আরও রহস্যজনক হয়ে আসে।

আর একটি ট্রাক সরু গলায় চিকরে যায়, সামনে কা হাল ক্যায়সা হ্যায় দাদু?

বাসুদেব ভেবে পান না কী উত্তর দেবেন কথাটার। ওরা যাকে সামনে বলছে সেসব এখন ফেলে-আসা পেছনে। তা হলে এখনকার ওই সামনের হালই বা কেমন!

সাইকেলে পা চালু হয় আবার। চশমাটা আবার সেই আগের মতন ঝাপসা হয়ে যায় থেকে-থেকে।

মাথার আকাশ বরাবর একটা প্লেন গড়িয়ে যায় গুড়-গুড় মেঘডাকের পাল্লাদারি করে। কে জানে অত ওপরে কেমনধারা বৃষ্টি হচ্ছে! ওখানকার মেঘের রমরমা যে কেমন তা এই নীচেকার আসমান থেকে কেমন করে আন্দাজ হবে! বোঝা কি যাবে ওই প্রকাণ্ড বাজ পক্ষীটির চারধারের হাল-হকিকতই বা কেমন! কেমনতর অবস্থা সাঁতরে কোথা থেকে কোথায় তাকে যাত্রা করতে হচ্ছে। কোথাকার মাটি কোন বাগে গিয়ে আকাশ হচ্ছে। কোথাকার আকাশে নতুন করে মেঘের চাক-চাক মাটি বাঁধা হচ্ছে!

এতক্ষণ বৃষ্টি আর সাইকেল বাওয়ার খেয়ালে মনে হয়নি এই সবের বাইরে বাড়তি কিছু থাকতে পারে। সেই বাড়তি আর কিছু মেঘ কিংবা বৃষ্টি ঝরনের চেয়ে পুরোদস্তুর আলাদা। তার গড়নটি এমনই আন্‌কা যে আর কোনও জুড়ি এসে তার পাশ থেকে দোহার দিয়ে উঠতে পারে না। আসলে একটানা একই ধারার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ করে কিছু একটা আন্‌রকম ঘটলে তার মজাটাই আলাদা হয়ে যায়। সেই মজার রকম অথবা বাড়তি আর কিছু টের পাইয়ে দেয় চোরা শোঁওও-শোঁওও, দাউ-উ, দাউ-উ।

দু-ধারের জলে টুবু টুবু মাঠ না আকাশে কিংবা ধরা যাক অথই-থই সমুদ্রে কেমন একটি কানে-হাত-চাপা রাবণের চিতা জ্বলছে। মনের কথা মনেই থাক। পঞ্চায়েত সমিতির মার্কসবাদী সভাপতি মশাইয়ের জন্যে পঞ্চজনার সাক্ষাতে এসব চিন্তা মনের বাইরে আনাও অপরাধ। কিন্তু ঠাকুমা বুড়ি যে মনে-মনে নুড়িতে-নুড়িতে খুট-খট্টাশ্ করে বলে, দু-কানে হাত চাপা দে, চাপা দে। হুঁ, টের পেলি, কেমন ধারা রাবণের চিতে জ্বলছে!

জলভাসি মাঠের অন্তঃপুরের তলে-তলে ভয়ঙ্কর তরল আগুনের পাছায় ঢাকের কাঠি পড়েছে। গুম-গুম-ডি-ডিছমা-ডিম্, গুম-গুম-ডিডিম্-ডিডিম্। দে আগুন পাছায় আগুন, দে দে রে গুম্‌সো আগুন। হুড়ো তাল পাতাল পাতাল, পাগলের গুষ্টি মাতাল। হুঁ উঁ উঁ, হুঁ উঁ উঁ। শোঁওও, শোঁওও।

মাঠের পেট গুলিয়ে স্রোত বইছে। বাসু মোড়লের বুকের পাটা দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে কলকল খলখল বান বইছে নদে জেলা উজোড় করে। বুড়ি ঠাকুমার অষ্টপহর নামকেত্তন শোনার বাসনাকে ছয়লাপ করে দিচ্ছে।

পাকা সড়ক বেয়ে এক জোড়া গরুর গাড়ি ধিকিধিকি এগিয়ে আসছে। ছইয়ের নিচে গাদাগাদি মেয়ে-মর্দ। বোঁচকা-বুঁচকি। ভারি সুখী-সুখী আল্লাদি-আল্লাদি গলার ডগা বাড়ানো ছাগলছানা।

— কে গা তোমরা? কোত্থেকে আসছো?

প্রশ্ন হয় ভিজে জাব বাসুদেবের তরফে।

জবাব আসে সরু পিনপিনে গলার একজন বেটাছেলের তরফে, আর কোত্থেকে। যমের দক্ষিণ দোর থেকে।

— যাওয়া হচ্ছে কোথায় গো?

— যমের দক্ষিণ দোরে।

সাইকেলের দু-ধারে নোঙর পড়ে। — সে আবার কী কথা!

— ওই রকমই কথা। ঘরদোর বলতে আস্ত কিছু নেই। মেটে দেয়াল জলে নেমে ডাঁড়িয়েছে। ছাগলটি ভেসে গেছে। একখানা তক্তপোশ, একটি ধামা, গোটা পাঁচ চুবড়ি। এমনকি নিড়েন-কোদালও রক্ষে পেলনি।

— বলো কি!

— ওই রকমই বলি। জল নাকি জীবন! অ্যাঁ, জল নাকি জীবন!

ছইয়ের তল থেকে একটি কচি ছানার কণ্ঠ বলে — বাবা, অ বাবা, বড্ডো জলতেষ্টা নেগেছে যে।

— চোপ্ চোপ্ গুয়োর ব্যাটা।

একটি মেয়ে কণ্ঠ অমনি, ছিঃ ছিঃ। মুখ না পাইখানা।

— হুঁ, ছোঁচাতেও জল লাগে কিন্তু।

— ছেলেটার যে তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

— ফাটুক গে, ফাটুগ গে। আমারও বুক ফাটছে। সংসারটা এক কতায় দিয়ে এলুম জলে। এক কষ্ট করলুম, এত খাটলুম খুটলুম জলের নাম শুনলে আমার বমি আসছে। উঁ হুঁ হুঁ হুঁ —

বাসুদেব কী বলবেন ধরতে পারেন না। এমন ধাঁচের কথাও বুঝি এই জলের দৌলতে। কথার শেষটুকু কান্নার দিকে গড়িয়ে যায়। এমনকি মানুষের কান্নার পাট তুলে কেমনতর অবাক এই জল হুলুস্থুল মাটি আর আকাশ গুমরে ওঠে। একটি মানুষের হাহাকার হরেক হয়ে যায়। সেই কাঁদন শোনবার জন্যে কারও অপেক্ষা করার ফুরসত হয় না। হবে কী করে, সংসার তো আপনি আর কোপনি নয়।

একটি গো-গাড়ি সংসার বোঝাই মানুষ, ছাগলছানা সমেত বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাসের জোড়া আগল ঠেলে এগিয়ে যায়। পেছনে-পেছনে আর একটি। তাতেও ছই আছে। আর সেই ছাদনার তলায় সামনের দিকে মুখ বার করে একটি বৃদ্ধ মহাসুখে ডাবা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে। জোলো বাতাসের দিকে কড়া তামাকের গন্ধ ধাওয়া করছে।

মানুষ ইত্যাদি সমেত গো-গাড়িজোড়া চলে গেছে না জানি কতক্ষণ। বাসুদেবের নোঙর করা পা-জোড়া পাকা সড়কের লিকের মধ্যিখানে কত সময় যে থমকে আছে। সময়টুকু ভয়ঙ্কর অনেকখানি না হলেও একেবারে চোখের পলক নয়। চুলে-দাড়িতে শুধু জল নয়, সেই ট্রাকগুলোর চাকার কাদাও যে ঝাপটা দিয়ে গেছে তা দেখবার জন্যে কে বা দাঁড়িয়ে থাকবে। এমনকী সদ্য-সদ্য বিয়ে হওয়ার পর তখনকার কাণ্ডকারখানা মোতাবেক সুভদ্রাও এসে বলে ওঠে না, দ্যাখো কাণ্ড। আস্ত একটি সঙ যে।

— ছি, আমি না তোমার সোয়ামি।

— সুভদ্রার সোয়ামি কখনও কেষ্ট হয় না কি। মহাদেবও হয় না।

— তোমার মাথায় দেখছি রাজ্যের ভগবান পোরা।

— ভগবান! তা হবে। আবার অবতারও যে।

— অবতার!

— হ্যাঁ, এই যেমন তুমি।

— বটে!

— তাই নয় তো কী। সংসারধম্মো করা কেন এমন মানুষের।

— ধম্মো-টম্মো জানিনি বাপু। তবে সংসারটা খানিক জানি।

— জানো না কি!

— কেন, তোমার সন্দ হয় নাকি!

— এই কদিনে সন্দ-মন্দ কী বুঝবো বলো দিকি।

— তা হলে আমি সংসার জানি না এটা কেমন করে বুঝলে শুনি?

— এর নাম মেয়ের জাত। পেট থেকে পড়েই সব আটঘাট বুঝে ফেলে, হুঁ।

— বটে!

— হ্যাঁ, বটে না বটে। হাঁড়ির একটি ভাত টিপলেই যে ধন্তে পারা যায় ভাতের হাল কেমন।

— তা কেমন বুঝছো ভাতের ধরন?

— ওই যে বললুম।

— কী বললে?

— সঙ।

চৌরাস্তার মোড়ের ডানহাতি পেট্রল পাম্পে উরুত-ডোবা জল। গোটাকয় লরি দাঁড়িয়ে। পাম্পের অফিস ঘরে রেডিয়োয় গান হচ্ছে। পাম্পের লাগোয়া ধাবিটিতে জনমনিষ্যি নেই। দড়ির চারপাইগুলো জলের বুকে সরের জালিকাটা হয়ে আছে। মস্ত উনোনে আঁচ নেই। প্রকাণ্ড চাটুখানা আড় করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা।

সোজা যে-রাস্তাটি হিমালয়মুখো তার মাঝখানে সেই একই রকম জলের ঢেল-খেল। রাস্তার দু-ধারে সার সার ট্রাক দাঁড়িয়ে। একটি ট্রাকের সামনে তেরপল খাটিয়ে ক-জনা হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে লুডো খেলছে। একপাশে স্টোভ জ্বালা। তাতে খিচুড়ি ফুটছে।

ব্লক হেলথ সেন্টারের লজ্‌ঝড়ে জিপটা ওধার থেকে কোঁত পাড়তে-পাড়তে এগিয়ে আসে। ড্রাইভারের পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে ছোকরা ডাক্তারটি বলে ওঠে — কৃষ্ণনগর যাচ্ছি কলেরা ভ্যাক্সিন আনতে। অবস্থা খুব খারাপ।

বাসুদেব কী বলবেন বুঝতে পারেন না। বন্যার পেছু পেছু মারক ব্যাধি আসে। যাত্রায় মারামারি যুদ্ধুর ঠিক পরে বিবেকের গান — ও তোর মরণ যে ঘোর ঘনিয়ে এল বুঝবি কবে আর...প্যাঁ পঁড় প্যাঁ পঁড় পঁড়। ওঁওও-ওঁওও, ঝম্ ঝম্ ঝনাৎ — ঝনাৎ — ঝন-ন্-ন্-ন্ —

গঙ্গার দিকের আকাশে কড়কড়াত বাজ পড়ে। ব্লক অফিসের মাঠে হাঁটু জল। জলে স্রোত খেলছে। তার ফাঁকে-ফোকরে কচুরিপানা ভাসছে।

একখানা সাদা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে। সামনে জাতীয় পতাকা না থাকলেও গাড়িটা চেনা। গদা-দা এসেছেন। গদা-দা — মানে অমৃতেন্দু মুখার্জি। নদে জেলার তরফে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন পুরোদস্তুর মন্ত্রী।

২.

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮-এর বন্যা আজ ক-দিন ধরেই ঘোষিত তাণ্ডব হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। খবরের কাগজ আর রেডিয়োর দৌলতে ভারতবর্ষের এই ভূখণ্ডের সমাচারটি নির্মমভাবে সত্যি হয়ে গেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার এই ব্লকে যেমন বন্যার তাণ্ডব নেই ঠিক তেমনই নেই কলকাতা থেকে শহর মফস্বলে নেমে-পড়া টেলিভিশন বাক্স। এমনকি সংযুক্তাদের শ্যামনগরের বাড়িতেও নেই।

অদূরে নদীয়া জেলার ব্লকটি প্রথমত গঙ্গাবহুল আর মরা যমুনার খাত সমেত। তাছাড়াও আছে প্রকাণ্ড কিছু বিল জাতীয় জলাশয়। খালও রয়েছে কিছু। ফলে সেই এলাকার বেশিরভাগটাই জলের খোরাক হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে আর. টি. মেশিনে ওখানকার মানুষজনের ঝোড়ো কণ্ঠস্বর আছড়ে পড়তে-পড়তে পিছিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের তোপের মুখে পড়ে। সংযুক্তা এই সব শুনতে-শুনতে — যেহেতু এই ব্লকে জমা জলের সমস্যা বা ওয়াটার লগিং — তবু সেই অজুহাতে কেবলই নিজের অজান্তেই নিজের কাছে কেমন যেন নির্বোধ অপরাধী হয়ে পড়ছে। এই মনোভাব তো আর কারু কাছে বলবার নয়।

অফিসের টেবিলে রাজ্যের ফাইল দেখতে-দেখতে কান চলে যাচ্ছে খুলে রাখা ওয়্যারলেস যন্ত্রে। চোখ উঠে পড়ছে খুলে রাখা জানলার বাইরে। সেই একই রকম আর একটানা মেঘলা আকাশ আর অবিরত বৃষ্টি। বৃষ্টির প্রবল রূপটির রকমফের থাকলেও কেন যে একঘেয়েমি আসছে না সেটাই রহস্যের। ওয়্যারলেস সেটের বেঁধে রাখা রেডিয়াস ছাড়িয়ে মাঝে-মধ্যে যে অদূরবর্তী জেলার খবরও নিয়ম ভেঙে বয়ে আসছে সেই ব্যাপারটা হয়তো আপাত একঘেয়েমিকে টিকে থাকতে দিচ্ছে না। সংযুক্তা কাজের মধ্যেও এমন সব আজগুবি উদ্ভট কথা যে কেমন করে ভাবতে পারছে সেটাও নিজের কাছে মাঝে-মাঝে ভারি বিচিত্র ঠেকছে। বিচিত্র মনে হচ্ছে এরই মধ্যে শ্যামনগর-বাবা-জ্যাঠামশাই ইত্যাদি।

তার টি. সেট কথা বলে — হ্যাঁ-বড়বাবু-বড়বাবু-এস.ডি.ও. সাহেব সন্দেশখালির দিকে রওনা হয়েছেন — ওভার।

অপরপক্ষে নীরবতা আর শোঁ শোঁ ঝড়। ওদিকটা এই বে-এলাকার মধ্যে আসতে পারছে না।

— হ্যাঁ, বনগাঁ এস.ডি.ও. কনট্রোল, কলিং ডি.এমস্ কনট্রোল। আলিপুর ডি.এমস্ কনট্রোল। জলদগম্ভীর স্বরক্ষেপ — হুঁ, বলছি, বলুন।

— হ্যালো — কে বললেন স্যার কাইন্ডলি —

— অ্যাসিস্ট্যান্ট নাজিরের গলা চিনতে পারছিস না সুখময়! চাকরি আছে কী করে তোর!

— হ্যালো — অরুণদা — হ্যালো। সরি অরুণদা — সরি। হ্যালো —

— চেঁচাচ্ছিস কেন। শুনতে পাচ্ছি। ওভার।

— এস.ডি.ও. বারাসতের কোনও একস্ট্রা নৌকো নেই। হ্যালো — নৌকো নেই। আলিপুর থেকে যদি চারটে ট্রলার —

— ক-টা? ওভার।

— চারটে। ফোর — ফোর। ওভার। ফলো করেছেন? ওভার।

— হ্যাঁ, ফলো করলাম। ট্রলার ধরতে চারজন ম্যাজিস্ট্রেট গেছে। কী হবে জানিস। ওভার।

— হ্যালো, এদিকে অবস্থা খুব খারাপ হচ্ছে। খুব ডেঞ্জারাস। হ্যালো —

— আবার চেল্লাচ্ছিস। বললাম তো — ম্যাজিস্ট্রেট নৌকো ধরতে গেছে। ওভার অ্যান্ড আউট।

ইথারের অবয়বহীন পাটাতনে শোঁ-শোঁ ঝোড়ো গর্জন ঠেলে আসে। জানলার ওপারে পুকুরজলে এই বৃষ্টিতেও মাছ ঘাই দেয়। জলের প্রাণী এবার বুঝি জলকেই ভয় পেতে আরম্ভ করল। সংযুক্তা জানলার ওপারে বৃষ্টি আর টেবিলের ফাইলে চোখ চালাতে-চালাতে কিছুতেই মেলাতে পারল না কী করে জেলা-সদর আলিপুর থেকে বনগাঁয় বন্যাত্রাণে ট্রলার যাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে চাহিদা যখন জরুরি এস.ও.এস.-এর মতন, তখন এ-ব্যাপারটা সম্ভব হবে কেমন করে এটাই প্রশ্ন থেকে যায়।

দরজা ঠেলে প্রথমে — আসছি ম্যাডাম, আর সঙ্গে-সঙ্গে এসে-পড়া আরও একবার অভিজ্ঞতার নিয়ম হয়ে যায়। গ্রামসেবিকা তন্দ্রাদি, যাঁর সরকারি পরিচয় এল.জি.এস. টেবিলের ওপারে। পঞ্চাশের এধার-ওধার তন্দ্রাদি সবসময়ে ফিটফাট। চামড়ায় উপযুক্ত টান পড়লেও এই তিন-বছরি বিধবা ভদ্রমহিলা ভারি ছিমছাম থাকেন। ফলে ডান হাতে ঘড়ি আর বেশ দামি ব্রা ব্লাউজের শোভা হয়ে থাকে। সঙ্গে বাড়তি পারফিউম। তন্দ্রাদির ঠোঁটের ওপরে না-হালকা না-পুরু গোঁফের আভাস।

— ম্যাডাম।

— বসুন তন্দ্রাদি।

— বলছিলাম কি, আপনার সেই এনকোয়ারিটা সকাল থেকে ভিজে-ভিজে ঘুরে-ঘুরে —

কথা শেষ না করে তন্দ্রাদি তাঁর আধো-আধো স্বভাবমতন প্রায়ই ঢোঁক গেলেন আর হাঁফানোর ভঙ্গি করে যান।

— হ্যাঁ, ওই কাস্ট সার্টিফিকেটের কেসটা।

— হ্যাঁ ম্যাডাম, ঘুরতে-ঘুরতে — ইসস্ কি কাদা। জল জমে গেছে এই অ্যান্তোখানি। পারলে হাঁটু খুলে দেখানোর ভঙ্গি করেন তন্দ্রাদি। চোখ নামায় ফাইলে সংযুক্তা।

— কী, পেলেন?

— ছেলেটা, মানে অ্যাপ্লিক্যান্টকেই পেলাম না। ওর বাড়ির লোকজন বলল, সে রেসকিউ অপারেশনে চাকদায় গেছে।

— রেসকিউ!

— হ্যাঁ ম্যাডাম, ওদিকে তো ভীষণ অবস্থা।

সংযুক্তা কানে টেনে নেয় খুলে রাখা আর. টি. সেট। — হ্যালো — হ্যালো — আলিপুর কনট্রোল —

— রাণাঘাট ... রাণাঘাট এস. ডি. ও. কনট্রোল —

— স্যার, চূর্ণী কালীনারাণপুর ধুয়ে দিয়েছে — ওভার —

— কী করে দিয়েছে? ওভার —

— ধুয়ে স্যার — মানে ওয়াশ — হ্যালো ... হ্যালো ...

— হ্যালো, বারাসাত এস.ডি.ও. কনট্রোল। স্যার — আমি ও.সি. ইলেকশন — বসাক স্যার।

— এখন ইলেকশন কি অ্যাঁ! চাদ্দিক জলে ভাসছে, ইলেকশন!

— হ্যালো স্যার, এখানে তিনটে বসাক আছে স্যার ... হ্যালো ... হ্যালো ...

— ক-টা?

— তিনটে স্যার। একটা ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইজ, একটা কমপেনসেশন, আর একটা —

— চোপ্... চোপ্।

— তা হলে কি বলব স্যার?

— ওভার অ্যান্ড আউট।

এত কিছুর মাঝখানেও অতি সাধারণ আর কি আশ্চর্য এক টুকরো খবর। এই উত্তর চব্বিশ পরগনার কোন এক নিপাট গ্রামদেশ থেকে একটি ছেলে চলে গেছে নদীয়া জেলার চাকদা অঞ্চল। সেই ছেলের শিডিউল্ড কাস্ট সার্টিফিকেটের তদন্তকারী সরকারি লোক তার বাড়ি গিয়ে ফেরত এসেছে। ওই সার্টিফিকেট পেলে ছেলেটির সামনের জীবন অনেকটাই বুঝি সরল হবে। সে-কথা আর সবাই বলে। বলে ছেলের পরিবার-স্বজন। তাই সেই পরশমণিটি হাতে পাওয়ার আগের সব ধাপগুলোতে ছেলেটির কি আকুলি-বিকুলি। শস্তায় দু-বার করে সাইকেল ঠেঙিয়ে এসে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে দুপুর থেকে বিকেল। ব্লক অফিসের সামনে চায়ের দোকানে গরম দুধজল বড়জোর একবার। চোখ চেয়ে থাকা বাসের দিকে। বাস থামে। কিছু না কিছু মানুষ নামে-ওঠে। কিন্তু এনকুয়ারি-দিদিমনি নামেন না। দিদির কাজ কি কম! কত-শত দরখাস্ত ওঁর ঝোলা ব্যাগে। সে-ব্যাগের গায়ে গোল-গোল আয়নার বড়-বড় তারাবাজি। তাতে রোদ ঠিকরোয়। বৃষ্টি ঝিলমিল করে। দিদিমনির এ-গ্রাম সে-গ্রাম চষা তদন্তের কাজ আরও অফুরান হয়ে যায় প্রতিদিন। কখনও সে এসে তাঁর টেবিলের ওধারে মায়া-মায়া মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি দিদি কিছু বলেন। কিন্তু দিদির পা থেকে মাথা অবধি সাজগোজের গমক ভেঙে খুব কমই তাঁর চোখ যায় ছেলের মায়ার দিকে। সে ভাবে — আহা দিদি কি দুখিনী। দিদির বুঝি তার মতো একটি ছেলে নাই। দিদির রামচন্দরটি কি অকালেই না সটকান দিয়েছে। এই অফিস বুঝি তাঁর চৌদিকে আশ্চর্য এক অশোকবন।

সেই অপেক্ষা করতে-করতে এলে-পড়া ছেলেটির দরজায় যেদিন সাজুনি দিদিমনির পা পৌঁছল, সেদিন সে ঘরে নেই। এই পড়শি জেলার এক গ্রাম ঘরের মাথায় টালির চালে বৃষ্টির নৃত্য ফেলে রেখে, এলাকার বিপুল ওয়াটার লগিং-এর প্রায় নিছক শাসানি তুচ্ছ করে সে গিয়ে আছড়ে পড়েছে নদীয়ার বান-গর্জনের বুকে। হয়তো সে একা নেই। হয়তো তারা একটি দলে মিলে আছে। কিন্তু যে ছেলে এতকাল যেটির জন্যে পড়ে-পড়ে রগড়ে মরছিল সেটিকে এক দমে ভুলে গিয়ে সে চলে গেছে বান উদ্ধার করতে।

— তাহলে কী হবে তন্দ্রাদি? আবার যাবেন না কি?

— আবার! ওই জল কাদা ঠেঙিয়ে। রক্ষে করুন ম্যাডাম।

— কিন্তু আপনার এনকোয়ারিটাতো পুরোপুরি করতে পারেননি।

— হ্যাঁ, তবে ওর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এসেছি।

— তাহলে তো হয়েই গেল।

— কিন্তু ওর বাবা-মা বা অন্য কারোর কাস্ট সার্টিফিকেট নেই যে।

সংযুক্তা এবার চুপ করে যায়। কলমটা ঠোঁটের গায়ে টিপে ধরে। বাইরের মেঘলা বৃষ্টিতে তাকায়। তন্দ্রাদি বলে ওঠেন, তা হলে কী করি ম্যাডাম?

সংযুক্তা সামনে তাকায়। তন্দ্রাদির আধ-স্পষ্ট গোঁফের ধারার দিকে চোখ যায়। চোখ বেড়ায় বৃষ্টি-চটা গালে আর চিবুকে।

— কী আর করবেন। ছেলেটিকে একবার নোটিশ করে ডেকে পাঠান। আমি একটু ওর সঙ্গে কথা বলব।

— কিন্তু এত জলের মধ্যে —

— এখন না, এখন না। বৃষ্টি একদিন না একদিন তো থামবে। থামবে না?

এবার এনকুয়ারি-দিদিমনির সহসা পতন আর মূর্ছার সময়। এই নাগাড়-বৃষ্টি সরিয়ে সেই কবে যেন রোদ উঠবে। আবার সব আগেকার মতন নতুন-নতুন বোধ হবে। সংসারে শরৎকালের মুখপাত ঘটবে।

হেলা বটতলা থেকে ধুম-বৃষ্টিতে বাসে করে অফিস যেতে-যেতে নবীনচন্দ্র মনের মতন জানলার ধারে একটি সিট পেয়ে কি যে খুশি। একটি ডবল সিট। পাশের লোকটি নামবে কামদেবপুর ঠাকুরবাড়ি। সে-কথা সে নিজেই জানিয়েছে কন্ডাক্টরকে। এও জানা গেছে, চাষিবাসি মানুষটি আসছে সেই হাওড়া জেলার কোনও একগ্রাম থেকে। সেখান থেকে রূপনারায়ণ নদ বেশ কিছু দূরে। তার ঘরদোর উঁচু ডাঙায়। ফলে সে বানে পড়েনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঘরে মহা আতান্তর উপস্থিত। পরিবারের পেটের মধ্যে একটি বৃহৎ আব গজিয়েছে। ডাক্তার বলছেন অপারেশন। কিন্তু কেউ-কেউ বলছে অস্ত্র করলে নির্ঘাৎ ক্যান্সার ও মৃত্যু। তাই অনেক খবর তত্ত্ব করে ওই ঠাকুরবাড়ির দোর ধরতে বেরনো। এমনও শোনা গেছে যে এক নামকরা ফিলিম্-অভিনেত্রীর রক্ত-ক্যান্সার নাকি ওখানে গিয়ে সেরে গেছে। ফলে ভরসা কিঞ্চিৎ প্রবল।

লোকটি বাস ছাড়ার পর থেকে যে কতবার কনডাক্টরকে ডেকে হেঁকে বলে — অ দাদা, অ কনটাক্টার ভাই, আমায় যেন ঠাকুরবাড়িতে নামিয়ে দিও ভাইটি। ভুলে যেওনাকো যেন।

নবীন বন্ধ জানলার মাঝখানকার কাচ-সাঁটা টুকরো দিয়ে দেখতে পান জাতীয় সড়কের দু-ধারে জলপ্রপাত ঘটে চলেছে। হাওয়ার তোড়ে কলাবাগানে ঝটাপটি-লুটোপাটি জল-বাতাসের খেলা। নারকেল গাছেরা মুহুর্মুহু চাবুক হাঁকড়াচ্ছে হাওয়ার শূন্যে। মাঠের এখানে-সেখানে জল জমে। তবু রক্ষে — এখানকার ভৌগোলিক চরিত্রে ওয়াটার লগিং।

পাশের লোকটির কোলের কাছে পুঁটলি। সেটি পেটের কাছে চেপে ধরেছে তাবৎ উৎকণ্ঠা নিয়ে। চোখজোড়া কী-হয় কী-হয়। এই বুঝি পেরিয়ে গেল, এই বুঝির সঙ্গে পরিবারের ভবিতব্য চিন্তা। সব মিলিয়ে খুবই বিহ্বল ভাব আর কি।

নবীনচন্দ্রের মন যেহেতু আশপাশ লক্ষ করলেও কাচের ওপারে আর এমনিতেই কথা আড়ষ্টস্বভাব, তাই যেচে কিছু বলা হয় না। কিন্তু যে মানুষ ইতিমধ্যেই তড়িঘড়ি-স্বভাব প্রমাণিত, সে আর কতক্ষণ পাশের জনের সঙ্গে মুখে কুলুপ দিয়ে থাকে। অতএব সে বলে ওঠে — এ যা বিস্টি নেগেছে ওসব ছাতা-টাতায় কিস্যু হবে না। কী বলেন।

নবীন ঘাড় ফিরিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করেন। রোগাসোগা মানুষটির

আড়া খুবই খাটো আর পাতলা। মাথার চুলগুলো কপালের দিকে পেতে আঁচড়ানো। নাকের ঠিক ডগায় বেশ বড় একটি আঁচিল। আর ছোট্ট একটুখানি মুখের ওপর মস্ত-মস্ত ঢ্যাবা-ঢ্যাবা চক্ষুজোড়া।

— আমার মতো প্রাণের দায় ছাড়া এমন বিষ্টিতে কি কেউ পথে বেরোয়।

নবীন এবারেও সামান্য মাথা হেলান।

— তার পর ধরুন গিয়ে পরিবার মানে তো ত্রিভুবন। কী বলেন।

ত্রিভুবনের সঙ্গে পরিবার কথাটির ধরন মেলাতে পারেন না নবীন।

— এই যেমন ধরুন কি না, আপনি আপনার পিতাঠাকুরের পরিবারের পেটে ছিলেন। তিনি আবার আপনার মা জননী হলেন।

— হুঁ।

— তা হলে এবার দাঁড়াচ্ছে কী বলুন দিকি।

— কী?

— ধত্তে পারলেন না তো কত্তা। থালে আমি বলি শুনুন। একে চন্দর, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্তর। তাহলে দাঁড়াল কী। আপনার পিতার পরিবার হলেন গিয়ে একে চন্দ্র। তারপরেতে সেই তিনিই আপনার মা-জননী হয়ে হলেন দুয়ে পক্ষ। আর তিন নম্বরে আপনার সন্তানের মা হলেন কি না আপনার পরিবার। তিনি হলেন গিয়ে তিনে নেত্তর। বাস্ — হয়ে গেল। তিনটি ভুবনের হিসেব হয়ে গেল।

নবীনচন্দ্র অপলকে লোকটির সদাই অবাক ঢ্যাবা-ঢ্যাবা চক্ষু দুটির দিকে চেয়ে থাকেন। চেয়ে থাকতে-থাকতে মনে হয় এমন খাসা কথা বোলনেওয়ালার নামটি তো জানা হল না। তার হাল-হদিসের বাদবাকি ইতিহাস তো জানা হয়ে গেছে।

— তা হলে, আপনার নামটি কী?

এই প্রথম প্রশ্ন শুনে প্রথমে খানিক চমকে উঠল সে। যুগপৎ পুলকিতও। ফলং — দন্তং বাহিরং। এবং পুরোদস্তুর বত্রিশ পাটির মধ্যে দেড়খানির ভগ্নদশা সমেত।

— আজ্ঞে বাবু, এই যা বললেন আর কি। কিন্তু নাম বলতে শরম হয় যে।

— সে কি!

— আজ্ঞে তাই। লোকে চমকে ওঠে। ছেলের চে ছেলের গু ভারী যে।

— সে কি কথা!

— আজ্ঞে, ওই কথা আজ্ঞে। এমন খয়ে-খপ্পুরে চেহারা আমার কিন্তু বাপের দেয়া নাম অষ্টবসু। সিরি অষ্টবসু মণ্ডল। বাপের নাম নেট বাসুকি মণ্ডল। ঠাকুদ্দা নেট অনন্ত। আমরা সদ্‌গোপ চাষা কিনা।

— হুঁ, তা তো হল। কিন্তু সব যে সর্প — মানে সাপ।

— থালে বুঝে দেখুন বাবু ঠ্যালাটা। একেবারে সর্পবংশ। তবে চক্কর থাকলেও বিষ নেই। তার পর দেখুন অমনি-অমনি ওই দশ কষাটাও মুখস্ত হয়ে গেল। কিন্তু শুধু নামটি কোনও গতিকে সই হয়।

— দশ কষা!

অস্টবসু এবার গলা খাঁকারি দেয়। তারপর বাইরের বৃষ্টি ঝমাঝমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে

বলে ওঠে, তিনের পর থেকেই থালে বলি বাবু। চারে বেদ, পাঁচে পঞ্চবান, ছয়ে ঋতু, সাতে সমুদ্দুর, আটে অষ্টবসু, নয়ে নবগ্রহ আর দশে দিক। ঠিক কি না বাবু।

কী বলবেন নবীনচন্দ্র। বলবার কী বা আছে। কথা কোথা থেকে কোথায় গড়িয়ে এল। ছিল ত্রিভুবনে, এসে পৌঁছল দিক্‌বিদিকে। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। বাইরে থেকে মানুষ চেনা যে সহজ কর্ম নয় সেটি আর একবার সত্যি হয়ে গেল।

অষ্টবসু বলে, হ্যাঁ বাবু, যদি ভুল বলি মাজ্জনা করবেন। মুখ্যু মানুষ। বই-পুস্তক পড়িনি বলে মা সরস্বতী তাঁর হাত দুখানি কিঞ্চিৎ আমার কর্ণে উপুড় করেছেন। সব শুনে-মারা বাবু।

— বটে।

— যে আজ্ঞে। তাহলে একবার সমুদ্দুর মন্থনের কথাই ধরুন না কেন। আমার ঠাকুদ্দা অনন্ত নাগ করলেন সমুদ্দুর মন্থন। সমুদ্দুর মন্থন করে প্রথমে-প্রথমে তো কত কী না উঠল বাবু। তার মধ্যে ধরে নিন একটি আমার বাপ বাসুকি। আর একটি এই আমি, অষ্টবসু। তারপরেতে আমার তিন বেটা। দুটি কন্যে। দুটিরই আজ হলে আজ নইলে কাল বিয়ে। কিন্তু পাত্তর পাচ্ছিনে। ভ্যান রিশ্‌কো চালায় ছেলে — মানে এক পাত্তর। তার বাপ বললে ছেলের সাধ গলায় সোনার চেন পরে, সঙ্গে দশটি হাজার নগদা, একটি র‍্যালে সাইকেল আর এক কুড়ি শাড়ি নমস্কারি।

নবীনচন্দ্র চুপ করে শুনে যান অষ্টবসুর সমুদ্রমন্থন পর্ব। অসুরগণ নাগরাজের সম্মুখভাগ ধরিয়া বার বার তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। অসুরগণের আকর্ষণে নাগরাজের মুখ হইতে বার বার ধূম ও অগ্নির সহিত নিশ্বাসবায়ু বহির্গত হইতে লাগিল।।

সেই ধূমসহ বিদ্যুৎযুক্ত মেঘসমূহে পরিণত হইয়া, পরিশ্রমে ও গ্রীষ্মে সন্তপ্ত দেবগণ ও অসুরগণের উপরে জলবর্ষণ করিতে লাগিল।।

সেই মন্দর পর্বতের শৃঙ্গ হইতে নির্গত পুষ্পবৃষ্টি, সকল দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া দেবগণ ও অসুরগণের উপরে পড়িতে লাগিল।।

দেবগণ ও অসুরগণ মন্দর পর্বত দ্বারা মন্থন করিতে লাগিলে, সমুদ্র হইতে গম্ভীর মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর ও বিশাল শব্দ উঠিতে থাকিল।।

মন্দর পর্বত ঘুরিতে লাগিলে তাহার উপরের বড়-বড় গাছগুলি পরস্পর সংঘর্ষ পাইয়া পক্ষিগণের সহিত পড়িয়া যাইতে লাগিল।।

সেই বৃক্ষসমূহের পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি জন্মিল, সেই অগ্নি বার বার জ্বলিতে থাকিয়া, বিদ্যুৎদ্বারা নীলমেঘের ন্যায় শিখাদ্বারা মন্দর পর্বতকে আবৃত করিয়া ফেলিল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র মেঘ-বারি বর্ষণ করিয়া সকল দিকে প্রজ্বলিত সেই অগ্নিকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত করিলেন।।

তুলে দেওয়া জানলার আধখানা কাচের ওপরে বৃষ্টির নাগাড়ে ধারাপাতে এখন মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই সংসার এতকাল ধরে অগ্নি দ্বারা আবৃত ছিল। সন্তপ্ত সংসারের বুঝি প্রয়োজন ছিল জলবর্ষণের। কিন্তু, প্রথম প্রথম যে বৃষ্টি ছিল পুষ্পবর্ষণের সমান আজ ক-দিনের অবিমিশ্রতায় তা আকাট অগ্নিস্রাবী হয়ে গেল অবশেষে। নেবা অগ্নিক্ষেত্রে নতুন করে আগুন প্রজ্বলিত হল। বাংলার মানুষ পাক্কা আটাত্তর বছর পরে ভয়ঙ্কর নতুন এক মহাপ্লাবন দেখল।

অষ্টবসু মুখ খোলে আবার।

— থালে বাবু আপনিই বলে দিন ছেলেপুলের মায়ের পেটের আব ভালো হবে তো। বলুন বাবু। ভালো হবে তো।

নবীনচন্দ্র মানুষটির তর্কের-থেকে-বহুদূর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সে তার বিশ্বাসী অথচ কাতর মুখখানা নবীনের কাঁধের কাছে এনে বলে, আপনি একটি-বার বলে দিন বাবু, ঠাকুরবাড়ির ওষুধে আপনার মেয়ে ভালো হয়ে যাবে।

মুহূর্তে বুকের মাঝখানে দমবন্ধ শূন্যে বোবা মেয়ে অমৃতার মুখের আলো ঝলসে উঠতে উঠতে মিলিয়ে যেতে-যেতে কী অবাক কায়দাতেই না অষ্টবসুর পরিবারের না-দেখা মুখচ্ছবি আর্ত হয়ে ওঠে।

দেবগণ! আপনারা সর্বপ্রকার ওষধি এবং সর্বপ্রকার রত্ন লাভ করিয়াও সমুদ্রমন্থনই করিতে থাকিবেন, তাহা হইলেই অমৃত পাইবেন।।

কী আশ্চর্যই না এই সব পুরাকথার তত্ত্ব। মহাভারত তো আদপে এক ধরনের ইতিহাস যার মোড়কটি কত সহস্র মিথের আবডালে ঢাকা। সেই সব প্রাচীন পুরাণতত্ত্ব যত দিন যাচ্ছে মোড়ক খুলতে-খুলতে সামনে এগিয়ে চলেছে। ইদানীং তো এমন কথা খবরের কাগজে উঠছে যে বিজ্ঞানীরা মহাসাগরের নিচে বিবিধ ভেষজের খনি আবিষ্কার করেছেন। অথচ মহাভারত সেই কবে বলে বসে আছে, সমুদ্রমন্থনকালে উঠে আসা ওষধি-লতার কথা। কিন্তু সব কথার শেষ কথা, অমৃত।

অষ্টবসুর স্ত্রীর পেটে টিউমার হয়েছে। বউটি এখন মরণবাঁচনের চৌকাঠে পড়ে আছে। আর এইমাত্র তার সঙ্গে অজানতে তুলনা দেওয়া অমৃতার প্রসঙ্গ এসে পড়লে মনে তো হতেই পারে, সেই মহাভারতের কাল থেকে সংসারে এত ওষধি থাকতেও, শেষ-মেষ নাকি সমুদ্র থেকে অমৃত উঠলেও, সেই বালিকার মুখে কথা যোগাল না। বোবা মেয়ে অমৃতার নামের সঙ্গে মশকরা করে বসে থাকা অমৃত কথাটি যে মেয়ের বাপকে কি আহাম্মকই না প্রতিপন্ন করে সটকান দিয়েছে।

বাইরে বৃষ্টির মাতনকে তুচ্ছ করে বাস কন্ডাক্টর চিক্‌রে ওঠে, কামদেবপুর ঠাকুরবাড়ি কে আসবেন, ঠাকুরবাড়ি —

অষ্টবসু পোঁটলা ধরে তিড়িং লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর তড়িঘড়ি দরজার দিকে যেতে-যেতে বলে যায়, দেখবেন বাবু, মনে রাখবেন বাবু — আপনার মেয়ে ভালো হয়ে যায় —

জগঝম্প বৃষ্টি আর বাসের এঞ্জিন-গর্জনের ভেতরে তার নেমে যাওয়ার সঙ্গে ভালো হয়ে যায় কথাটি অলীকতায় ডুবে যায়। অষ্টবসুকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

ব্লক অফিসের সামনে চা-দোকানি ডাক দেয় গলা তুলে, সেনবাবু, চা পাঠাবার লোক নেই। ছেলেটা কামাই করেছে।

ছাতা মুড়ে দোকানঘরের চালার নিচে ঢুকে পড়েন নবীনচন্দ্র। ধুতিময় কাদার ছিটে। শাদা জামার নিচের দিকেও।

দোকানের ওধারের বাঁশের মাচা বেঞ্চিতে আমডাঙ্গা গ্রামপঞ্চায়েতের কেরানি জলিল আহমেদ। শান্ত প্রকৃতির মানুষটির বুক সমান কুচকুচে দাড়ি। ঘিয়ে রঙা পাঞ্জাবি। পাজামা। জলিল হাত তুলে বলে, সেনবাবু, আসুন। আমি আপনার চা বলে দিয়েছি।

রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে-মুছতে নবীন মাথা নাড়েন, না না, সে কি। আমি তো —

— ঠিক আছে। একদিন না হয় এক কাপ চা খেলেনই।

— না না —

— সে কি! ভিজে গেছেন যে।

— পরে, পরে —

বলতে-বলতে নবীন ছাতা খুলে দ্রুত হাঁটা ধরেন অফিসের দিকে। বারান্দার সামনে বি.ডি ও. ম্যাডাম। চোখ থেকে চশমা খুলে আঁচলে মুছছেন।

— একি, নবীনবাবু। এক্কেবারে ভিজে গেছেন যে।

নবীনের গলায় চিরাচরিত আড়ষ্টতা, না ম্যাডাম, না —

— আমি দেখছি ভিজে গেছেন, আর বলছেন —

— ঠিক আছে ম্যাডাম, ঠিক আছে।

সংযুক্তার গলায় এবার মেঘ-চটা কাঠিন্য, আপনার কি সি.এল. পাওনা নেই?

পকেট থেকে রুমাল বার করে দ্রুত মাথা মোছেন নবীনচন্দ্র। মাথা মোছেন আর আড়ে তাকান বি.ডি.ও. ম্যাডামের দিকে।

— আছে তো, আছে মনে হয়।

— মনে হয়!

— আজ্ঞে, মনে হয়।

সংযুক্তা চশমা পরে নেয়। কাচের ওপারে সামান্য ঝিলিক। ভ্রূ ভাঙে।

— মনে হয় মানে?

এবার নবীনচন্দ্রের মুখে আর দু-একটি অক্ষরও ফোটে না। যা সম্বল ছিল সব এখানে এসে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। প্রায় ভিজে জামা-কাপড় আর সপসপে ছাতাটি নিজের সামনে আলাদা ছবি হয়ে যায় মূর্তিমান অধোবদনের। নবীনচন্দ্র টের পান, এবার বুঝি পলায়নই বাঁচার উপায়। ফলে আর কোনও কথা বাড়ানোর জায়গা না দিয়ে একপ্রকার হনহনিয়েই কতক দৌড় কতক হন্টন ধরেন। বি.ডি.ও. ম্যাডাম সংযুক্তা এই পলায়নের মুহূর্তটি দেখে চশমার ওপারে হাসতেও ভুলে যান। তার মনে-মনে জ্যাঠামশাই অবিনাশচন্দ্রের ভীরুপ্রাণ বাবা অনিকেতচন্দ্র আঁকা হয়ে যান।

অবিনাশচন্দ্র গম্ভীর মুখে তাকান ছোটো ভাই অনিকেতের দিকে। তারপর যথেচ্ছ চাপা গর্জনে বলে ওঠেন, তোমার বয়েস হলেও ছেলেমানুষী এখনো যায়নি। নেমতন্ন বাড়িতে কাল কী খেয়েছিলে শুনি?

অনিকেত এ-সময় বাঁ গালে ডান হাত বোলাতে থাকেন, না না, তেমন কিছু নয় তো।

— তেমন না হলে এমনটা হল কী করে। সকাল থেকে তো দেখছি বাথরুমেই যাতায়াত করছ। তা ওখানেই মশারিটা রাতে খাটিয়ে দিতে বোলো।

— না, না তেমন কিছু নয়। সত্যিই তো —

— লোভ সম্বরণ করতে জানো না তুমি।

— হুঁ।

— হুঁ কী? হুঁ মানে!

— আমি খাবো না। তবু জোর করে মাংসের চপ দু-খানা —

— তোমার গালে ফেলে দিয়ে গেল, তাই তো। ঠিক করে বলো, ক-টা খেয়েছিলে।

— গুনিনি তো।

— এই যে বললে দুটো।

— না, মানে ভিয়েন হয়েছিল তো কমলের মেয়ের বিয়েতে। তাই ওখানে বসে চায়ের সঙ্গে ঠাকুর একটু টেস্ট করে দেখতে বলল।

— কমল তোমার কেমন বন্ধু অনিকেতচন্দ্র।

বাবা জানেন দাদা ক্রুদ্ধ হলে পদবী বাদ দিয়ে পুরো নামটাই উচ্চারণ করেন।

— ছেলেবেলার। মানে ন্যাংটো বয়েসের। একসঙ্গে পড়তাম তো।

— হুঁ, বুদ্ধিটা সেই বয়েসেই রয়ে গেছে কমলের।

— সে কি দাদা!

— তা না হলে একজন ক্রনিক অম্বুলে রুগিকে আদর করে মাংসের চপ টেস্ট করায়? যাক্ গে — দুপুরে জলমুড়ি। আর আমার কাছ থেকে এক ডোজ নাক্স খেয়ে আমায় উদ্ধার করো।

বাবার ডান হস্ত আবার বাম গালে। — তাহলে, ভেটকি মাছ আনলাম যে।

জ্যাঠামশাই গলায় বাজ আড়াল করে বলেন, নাক্স, নাক্স। এসো আমার ঘরে।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ

স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ — এই সব প্রাচীন শ্লোকটোলোকগুলো কী রকম ঘোলাটে হয়ে যায় নবীচন্দ্রের সামনে ও পেছনে। বিশেষ করে বি.ডি.ও. ম্যাডামকে পেছনে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখে পলাতক অবস্থায় নিজের ঘরে চলে আসার পর। কেমন মায়া-মায়া শাসনের ধারা এই অল্পবয়সী প্রশাসকটির স্বভাবে। এরই মধ্যে — এত অল্প সময়ের মধ্যে — আধুনিক সিভিল সার্ভিসের ছলাকলা সরিয়ে রেখে কী আশ্চর্য ঘরোয়া গিন্নিবান্নি ঠাকুরনটি হয়ে বসে আছেন। আটপৌরে চলনের সঙ্গে প্রশাসনের বল্গা-ধরে-থাকা হাতদুখানি কোমলতার গড়ন ভুলে ম্যাডাম একাধারে রাজকুল আর স্ত্রী-জাতির সামনে দুয়ো তুলে ধরেছেন। কিন্তু এত সব বোঝার পরেও — ম্যাডামের সহজ সিধে প্রশ্নের সামনে নবীনচন্দ্র মুখ খুলতে পারলেন না। দিতে পারলেন না একটিও যথাযথ জবাব। স্বভাব যে মোলেও যায় না মানুষের!

কিন্তু গোরা কাহার এই বাদলাতেও দরজার বাইরে উপস্থিত। খাকি পোশাকের ওপর শস্তা মেলেটারি বর্ষাতি — যা ছাতার বদলে এই প্রথম দৃশ্যমান হল। হাতে পেতলের চাকতি আঁটা লাঠি। ও হাতে থলি।

নবীনচন্দ্র চোখ তুলে বলেন, এত বৃষ্টিতে। কী করে এলে!

গোরা হাত জোড় নমস্কার করে ভেতরে এল। তারপর কিছু বিষণ্ণ আর খানিক হাসি ছোটোনো মুখে বলে, আপনি যেভাবে এলেন আমিও তো সেভাবেই এলাম বাবু। কিছু কাগজপত্তর দিলেন তো প্রধান সাহেব। সরকারি কাগজ বলে কথা।

— হুঁ।

— বাবু, সরকারি কাগজ কি বিষ্টি-বন্যের জন্যে আটকে থাকে। আপনিই বলুন বাবু।

— তাই তো।

গোরা টেবিলের ওপর পঞ্চায়েতের রিপোর্ট-রিটার্ন আরও কত কী সব গোছ করে রাখল। গা থেকে ত্রিপলের ওভারকোটখানা খুলে ভাঁজ করে হাতে ফেলল। তারপর উল্টোদিকের টানা বেঞ্চে বসে পড়ল।

কাগজগুলোয় চোখ বোলাতে-বোলাতে নবীনচন্দ্রের ভ্রূ কভু উত্থিত কখনও পতিত হতে লাগল। গোরা তার পুরনো অভিজ্ঞতা মোতাবেক টের পেতে লাগল, কোথায় গলতি কোথায় ঠিকঠাক। কিন্তু ওই সব ফলাফলে তার ভাব লেখা নেই। তার অবস্থা বাইরের একঘেয়ে মেঘলা আর বৃষ্টির মতন।

দরজা পেরিয়ে এইমাত্র চা-দোকানে-দেখা আমভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্টাফ জলিল আহমেদ ঘরে ঢোকে। সুন্দর সাজানো কালো দাড়িতে জলবিন্দু। নিপাট পাঞ্জাবি-পাজামার ড্যাম্প ধরা ভাব। তার হাতেও যথারীতি সরকারি কাগজ।

জলিলকে দেখে গোরা কাহারের চোখে অস্বস্তির কাঁটা খচখচিয়ে তৎক্ষণাৎ উবে যায়। উড়ে যায় খোলা জানলার বৃষ্টির দিকে। উড়ে যেতে যেতে বলে যায় — এখন হারানো পরিবার সম্বন্ধে কোনও কথা নয়।

জলিল তাকায় আড়চোখে গোরা কাহারের দিকে। তারপর মিটিমিটি মুখে বলে, বুঝলে গোরাদাদা, সেনবাবু যার তার চা খান না।

নবীন চমকে তাকান। কোনও কথা বলেন না। গোরা ভ্রূ কোঁচকায়, সে আবার কী!

— কী জানি দাদা। বিষ্টিতে ভিজে জাব। বললুম চা খান। তা আমার নসিবে ওঁয়াকে চা খাওয়ানো কি লেখা আছে!

নবীন ভেবে পান না কী বললে সমুচিত বা যথাযথ বলা হবে। তাঁর এই ইতস্তত ফাঁকে মুখফোঁড় গোরা বলে ওঠে, বাবু কারু ঠেঙে এক গেলাস জল অব্দি খান না।

৩.

আজকের এই রাতটি কী মনোহর আর ভয়ঙ্কর। একই লপ্তে এমন যুগল বিষয় মনে হওয়ার সুযোগ তো আগে কখনও ঘটেনি বলেই মনে হয়। মনে হয়, ঠিক যেন দেখনদার একটি ঘেঁটকোল ফুলের চারপাশ ঘিরে তেষ্ঠানো-দায়-এমন পচা গন্ধ। অথচ পাপড়িগুলি যে কী মনোহারি।

এই মাঝরাতে নৌকোর সওয়ারি হয়ে জলে ভাসতে-ভাসতে বাসুদেব সেই যে সটান দাঁড়িয়েছেন আর বসা হয়নি। সঙ্গে আছে ব্লক পঞ্চায়েতের সহসভাপতি আব্বাসউদ্দিন, পার্টির ছেলে বাপী আর মজনুর । আরও কজন আসতে চেয়েছিল, কিন্তু নৌকোখানা বড়ো হলেও বেশি লোক আগে থাকতে নিয়ে গেলে জলে পড়া মানুষদের ঠাঁই দেওয়ার জায়গা হবে না যে।

নৌকোয় ওঠা হয়েছিল কোন সকালে সান্যালচরের মুখ থেকে, যেখানে গঙ্গা নদী ডাক ছেড়েছে চর এলাকার দিকে। এখন রাত কত তার ঘড়ি-ঘণ্টা কে রাখে! ঘুরতে-ঘুরতে, জল বাইতে-বাইতে হেথা-হোথা থেকে মানুষ উঁই করা হয়েছে নৌকোয়। কেউ ঘরের চালে, কেউ গলা-জলে, কেউ বা চৌদিকে জল একফোঁটা ভাঙার মাঝখানে সংসার-হাঁড়ি-পাতিল সমেত। কোথাও-কোথাও চরে বেড়ানো গরুকে দায়ে পড়ে ফেলে রেখে আসতে হয়েছে। নিতে পারা

গেছে শুধু ছাগলটিকে। মানুষের মন মানেনি। বুঝতে চায়নি অনেকেই। মানুষের চেয়ে পশুর প্রাণের দাম যে বস্তুত আকাশ-পাতাল, সেটা সাব্যস্ত হয়েও হয়নি। প্রাণ-আদপে প্রাণের ঠাঁই সবাকার তরফে এক রা — সেটাই হয়ে গেছে খিটকেল। এই বোঝাবুঝির কারবার ভজাতে-ভজাতে দিন গত হয়েছে। বহু মানুষ জল থেকে নৌকোয় উঠেছে। আবার উঁচু ডাঙায় ইসকুল-ঘরে বা অন্য কোথাও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। চৌদিকে জলের থই-থই হাতছানির চোখে রাতের ঠুলি পড়েছে। আকাশের রঙ পাটকিলে থেকে কালসর্প হয়েছে। বৃষ্টি গড়িয়ে চলেছে কখনও ঝিমি ঝিমি, কখনও দ্রিমি দ্রিমি।

সকালে সান্যালচরের ধার থেকে নৌকোয় ওঠার সময় চিঁড়ে-গুড়ের বস্তাগুলো যখন পাটার মাঝখানে রাখা হচ্ছিল, তখন মনে হয়েছিল জায়গাটি গঙ্গা নদীর মোহনা। নদীর ওপার বলতে বহুদূরে ওপার জিরাট-বলাগড়ের কুয়াশা-কুয়াশা ঠাঁই। গাছগাছাল, মেটে-মেটে আকাশ, কিঞ্চিৎ দালানকোঠা, সাবেক মন্দিরের চুড়ো আর আকাশে চক্কর দেওয়া এক ঝাঁক বক। বকের ঝাঁক হুগলির আকাশে চাঁদমারি খেলতে-খেলতে হঠাৎ কী মনে করে নদে জেলার আকাশে লাট খেয়ে চলে এল। অমনি, কী আশ্চর্য, ওখানকার ছবিটি এদিকে এসে বদলে হয়ে গেল ধবল চন্দ্রমালা। বকের মালায় আকাশের বর্ণটি আরও প্রকট হল। আর তখনই উল্টোবাগে গঙ্গা আর চরের ঠিক মুখটিতে এতক্ষণের মনে-করা আঁধার গতিক হঠাৎ করে আলো-আলো হয়ে গেল। ওপার জেলা থেকে নদে জেলার আকাশে এসে পড়া বকের সাদা পাখনার ছটা বুঝি ঐখানে ওই আজগুবি মোহনার মুখে যেয়ে পড়ল। আর অমনি জায়গাটির স্বভাব পালটে গেল। বাসুদেব ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে দেখলেন, আব্বাসউদ্দীন আর বাকি ছেলেদের নজর আর হাত চিঁড়ে-গুড়ের ঠিকঠাক ব্যবস্থায়।

দেখামাত্র মনে-মনে ভারি লজ্জা হল। নিজের ওপর একটু হেনস্তাও। কোথায় মানুষ মরছে তার চিন্তা সরে গিয়ে আদেখলার মতন আকাশ আর বক দেখা, যেন কখনও দেখিনি- কখনও দেখিনি — এগুলো কি ভালো লক্ষণ! তাও কে করছে, না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি — পঞ্চজনের মাথা — কোনকালে পার্টির লালকার্ডপ্রাপ্ত মাঝবয়সী দামড়া বাসু মোড়ল। এর চেয়ে ছি ছি আর কী আছে।

এখন এই মাঝরাত-চরা অন্ধকার রাত আর জল বাইতে-বাইতে সে-কথা মনে হতে মনে-মনে নিজের সঙ্গেই একটু মস্করা বোধ হচ্ছে। যে মানুষের স্বভাব সভাপতির চেয়ারে দু-পা তুলে বসলেও মনে-মনে হাতে পাঁচনবাড়ি, তার কাছে এমন বক দেখা অবাক কাণ্ড তো অবাকই বটে।

যে পথ ডাঙায়-ডাঙায় অঙ্ক-কষা কভু-সিধে কভু-আঁকবাঁক, সেই পথই জলে পড়লে বিলকুল বিপথ হয়ে যায়। ঘড়ি ঘণ্টা বাদেও প্রথম দফায় মানুষ ত্রাণ আর তারপরে এত বড় নৌকোখানা খুবই সামলে-সুমলে চালাতে হয়। পাকা মাঝি যদু মাহাতোর হাতে কখনও দাঁড় কখনও লগি। কে বলতে পারে কোনখানে নৌকো যাচ্ছে ঘরের চালের ওপর দিয়ে, কোথাও খেজুরগাছের মাথা ছুঁয়ে, ইসকুল বাড়ির বারান্দা টপকে। এমনকি মরা মহিষটির জেগে থাকা শিং এড়িয়ে। এমন স্রোত যে এই নিঝুম রাতে জলে রীতিমতন গর্জন ছুটছে। জলের বুক-চাপা রাগ নদীর দিক থেকে টেনে এসেছে এখানে আকাশের সঙ্গে তাল দিতে। আর এখানে এসে সব তালকাণ্ড বেতাল-চতুর্দশী হয়ে গেছে। রাতের এই অন্ধকারে সারা দিনের দেখে আসা

জলের ঘূর্নীগুলো চাকা-চাকা হারিয়ে এখন একাকার। উল্টে ভাবলে বলতে হয় এখন সবটাই বিরাট এক চাকা। ঠিক যেন প্রথমে একটি ফুটকি। ফুটকি থেকে সিকি-আধুলি-টাকা-রেকাবি-থালা-বগি থালা-পরাত-মস্ত গো-গাড়ির চাকা-চাকা-চাকা, অবশেষে রথের চাকা হয়ে মিলিয়ে যেতে যেতে সমস্তটাই ফাঁকা। ফাঁকা, হা হা হা যাত্রাপালার সেই অধিকারীর হাস্যরসের মতন মহা-মহা গোল-গোল অট্টালিকা। শেষ কথা বুঝি একেবারে চাঁদে। তাহলে এখনকার এই জলে টুবু টুবু নদের জেলার সংসারটির ছবিখানি কেমন দাঁড়াল! অতখানি চাঁদ পরিমাণ চাকা না হলেও নিদেন পক্ষে একটি কাছিমের পিঠ তো বটে।

হ্যাঁ, অবশেষে বুঝি কাছিমের পিঠেই নৌকোর পাছা ঠেকল। আগাটি যে কী করে সামলে নিয়েছে বনেদি দাঁড় বাইয়ে যদু, তা সেই জানে। এবার পশ্চাতে এসে ঠেকা মাত্র নৌকো বেসামাল হয়ে পড়ল। সহসভাপতি আব্বাসউদ্দিন আর একটু হলেই ঝপাং হচ্ছিল। বাপী তার জামার কানা খামচে ধরল। মজনুর হৈ হৈ করে উঠল। কিন্তু তার গলার আওয়াজ কড়কে দিয়ে যদুমাঝি চৌগুণে চেঁচিয়ে উঠল। সে চিৎকার কোনও কথা নেই। শুধু একটি ভয়ঙ্কর শব্দ — যেটা কোঁতানি আর আর্তনাদের মিশেল হয়ে যায়। বাসুদেব চমকে তাকান। চারদিকের জোলো অন্ধকার আর বাদলা মেঘ ছিঁড়ে যদুর চোখজোড়া হঠাৎ কেমন করে একজোড়া আস্ত আংরা হয়ে গেছে। জ্বলছে, ধক্ ধক্ করছে। জাড়ের দিনে মাঝরাতের ঝকঝকে লাল তারাটি হয়ে নেমে এসেছে।

— কী হল যদু, কী হল!

বাসুদেব চৌদিকে ছড়ানো জলের বুকে নিজের গলার ধাক্কা শুনতে পেলেন। শুনতে পেলেন বুঝি এই প্রথম ষণ্ডামার্কা মাঝবয়েসী বেটামানুষ হয়েও গলার স্বরটি কিঞ্চিৎ চড়ায় উঠলেই মেয়ে-মেয়ে। অনেকটাই পাড়া-চড়ুনি ঝগড়ুটে পাত্তা পিসী-পিসী।

যদু আরও একবার ঠিক আগের মতনই আকাট গলা ছাড়ে, আঁ আঁ আ আ —

— অমন কচ্ছিস কেন রে! বলি হল কী তোর?

নৌকোখানা টাল খেতে খেতে সোজা হওয়ার দিকে যায়। আবার টাল খায়। ঠিক যেন সাঁকো দুলুনি ঢেঁকির পাড় দেওয়া হচ্ছে। আব্বাসউদ্দিন হাতের কাছে পড়ে থাকা লগিখানা বাড়িয়ে দেয় মজনুর দিকে। মজনুর সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর পাছার দিকে লগি আড় করে চেপে ধরে।

নৌকোখানা কাঁপতে কাঁপতে সিধে হয়। তবু একদিকে একটুখানি কান্নিক দিয়ে থাকে। অমনি — ঠিক অমনি জলের বুকে শ্যাওলার পানা জেগে থাকা খেজুর পাতার আঁকাবাঁকা আঁকশি গুলোয় ভর করে একটি মেয়েছেলের উদুম শরীর হিলহিলিয়ে ওঠে।

বাপী বলে ওঠে, বাসুদা, এই প্রথম বানে ভাসা একটা মড়া দেখা গেল গো।

আব্বাস বলে, বানে ভাসা না সাপে কাটা কে জানে।

মজনুর সামনে ঝুঁকে সঙ্গে-সঙ্গেই মুখ তুলে নেয়, এঃ, পচে গন্ধ ছেড়েছে।

ওদিক থেকে যদু এই প্রথম শব্দ ছেড়ে কথা বলে, থালে কী হবে দাদা! কী হবে! বাসুদেব একটু ঝুঁকে দেখেন শরীরটা। হ্যাঁ, ভালোই পচন ধরেছে। কিন্তু এ-অবস্থায় এখানে ফেলে গেলে তো মুশকিল। পচা শরীর জলে আরও গলবে। তাতে রোগ ছড়াবে। আর দ্বিতীয় দফায় জল আরও বাড়লে দেহটি যদি কোনওমতে খেজুর গাছের হাত থেকে ছাড়ান পায়, তাহলে

কখন কোথায় যে ভাসতে-ভাসতে গিয়ে ঠেকবে তা কেউ জানে না।

যদু ওধার থেকে হাঁক দেয়, লগি চাপ। লগি চাপ মজু। নৌকো ঘুরিয়ে ঐদিকে দিয়ে চলে যাব।

বাসুদেব এবার নিদান হাঁকেন, থাম্ থাম্।

মজনুর চোখ তোলে, কেন বাসুদা! কী হল আবার!

বাসুদেব এই জলেও ভিজে চুলের গুছি সামলান। মাথার মাঝখানে বাঁধা গুটলি পাকানো ঝুঁটিটা আর একবার শক্ত করে বেঁধে নেন। তারপর নিচু হয়ে গলুইয়ে রাখা মোটা দড়িগাছটি খুলে নেন। দড়ির একদিকের কানায় একটি ফাঁস করেন।

যদু গলা তোলে, করছ কী দাদা!

বাসুদেব কোনও জবাব না দিয়ে ফাঁস করা দড়ির মাথাটি ছুঁড়ে দেন উদুমদেহ মেয়েটির পা বরাবর। গুলতি ছোঁড়া টিপ যে এখনও বহাল আছে তা প্রমাণ হয়ে যায় ফাঁসখানি ফুলে ঢোল পায়ে লেগে যেতেই। টান দেন বাসুদেব। দড়িগাছটি এবার কাছি এঁটে বসে। ফুলে ফেঁপে একসা পায়ে দড়িগাছটি নূপুরের বদলে কী সুন্দরই না মানিয়ে যায়। কিন্তু এই আটাত্তর সনে নূপুরের কথাবার্তা যে একেবারেই বেমানান। এমনকি পায়ের চার নম্বর আঙুলে ধার্য চুটকিও। তবু কেন যে মনে-মনে চমকে ওঠে এমন সব আদেখলা কথা! তার চেয়ে ভালো মনে-মনে মনের কথা চাপা দেওয়াই।

কিন্তু তাহলেও সব কথার মনে আগল পড়ে না। মাহাতো নৌকো ছাড়ে। জলের বুকে মেয়েটির চিৎ শরীরখানি মাকড়সার জাল হয়ে ভেসে চলে। বেদম ফুলো পায়ে দড়িগাছটি পাকাপোক্ত চেপে বসে তাকে টেনে নিয়ে চলে। বাসুদেব প্রথম চোটে টের পান প্রথমবার পোয়াতি হবার মুখে সুভদ্রার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলে একটি পলকা রূপোর চুটকি পরানো হল। পরিয়ে দিল সাধভক্ষণের মাসে বাবারই এক বুড়ি পিসি। সেই মেয়ের পায়ের গড়ন এখন বদলে গিয়ে একটি আঙুল ছেড়ে গোটা ফুলো পায়ে আঙটের বদলে কাছির দড়ির গহনা উঠেছে।

দড়ির টান, নৌকোর টানে দেহ ভেসে আছে পিছু-পিছু। বাসুদেব আবার টের পান দেশাচারের আশ্চর্য নিদান। ছেলেকাল থেকে মড়া পুড়িয়ে সেই একটি রহস্য আজও পরিষ্কার হল না। যেটা ছেলে মারা গেলে চিতার কাঠে তার দেহখানি উপুড় করে শোয়ানো হয়। আর মেয়েমানুষের বেলায় উল্টো ধারায় — চিৎ করে। ছেলেকালে কাউকে প্রশ্ন করেও উচিত জবাবটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু মন থেকে প্রশ্নটি মুছে যায়নি। সংসারের পাঁচ কাজে থাকতে- থাকতে কথাটি মনের আড়ালে চলে যায়। কিন্তু মৃতদেহ পোড়াতে গেলেই আবার নতুন করে প্রশ্নটি উঠে পড়ে। শেষকালে — যৌবনকালে একদিন হঠাৎ পাড়ারই এক কচি বউ কলেরায় মারা গেলে তাকে চিতা শয়ান দেওয়ার সময় মনের মাঝখানে হঠাৎ ঝল্‌সে উঠল নারী-পুরুষের সাধারণ সংগমকালের একটুকরো ছবি। নারী নীচে। বেটামানুষ ওপরে। চিরকালই এমনটা হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে মনে-মনে এমনটিও কথা হয় — সমাজ চিরকালই পুরুষজাত উচ্চে বসে মেয়েদের পায়ের নীচে ঠাঁই দিয়েছে। নারী প্রগতি-টগতি নিয়ে যত কথাই হোক না কেন এখনও সেটি বিলকুল উঠে যায়নি। টুকরো-টাকরা কোথায় কী হয়েছে সেটি তো বড় কথা নয়। আজও গাঁ-দেশে বাড়ির বেটোছেলেরা ঢেঁকুর তুললে তারপর বউ-ঝিরা খেতে বসবে। এমনকি আজও

বড় মাছটি, ভালো তরকারিটির বেশিটা পুরুষমানুষের জন্যে তোলা থাকে মেয়েদের চিরকেলে হেঁসেলঘরে।

জ্যান্ত শরীরের চেয়ে প্রাণ-নেই দেহের ওজন বুঝি বেশি। তার ওপর জলও খেয়েছে মনে হয়। তাই নৌকোর চলনে টান পড়েছে। মাহাতো ছাড়াও মজনুরের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে নৌকো চালাতে।

খানিক এসে ডান হাতে একটি উঁচু ডাঙা পড়ে। ঝোপঝাড়, পাতালতা বোঝাই। দু-পাঁচটি খেজুর গাছও। নৌকো লাগানো হল ডাঙার সঙ্গে।

দড়ি টেনে দেহটি তোলা হল ডাঙায়। আব্বাস বলল, কাঠকুটো পেলে একটু আগুন দিয়ে যেতাম।

বাসুদেব অন্ধকারে হাসেন, কোদাল থাকলে তো মাটিও দেওয়া যেত আব্বাস। কিন্তু দুটোর কোনোটাই যে হবার যো নেই।

— তাহলে কী হবে?

— কি আবার হবে। দেহটা এই ডাঙাতেই শুইয়ে রেখে যেতে হবে।

— শকুনে খাবে যে।

— তা খাক্। তাতে তো ব্যামো ছড়াবে না। জ্যান্তর চেয়ে মরা শরীরে যে ভয় বেশি।

অন্ধকার জল আর আকাশের নীচে, তুলনায় দিব্যি উঁচু ডাঙা জমির খেজুরতলায় মেয়ের দেহটি দড়ি টেনে হিঁচড়ে তোলা হল।

বাপী নৌকো থেকে কটা খালি চটের বস্তা তুলে এনে দেহটি চাপা দিয়ে দেয়। শুধু মুখটি আধখানা খোলা থাকে।

বাসুদেব চোখে-সওয়া অন্ধকারের ভেতর দিয়ে, আর ক্রমাগত ঝিরি-ঝিরি আকাশ ঝরনের মাঝখান দিয়ে দেখতে পান-ফুলে-ওঠা মেয়েটির সিঁথিতে চটা সিঁদুর। চোখজোড়া আধখানা ঘুমের দেশে। সেই মুখের ছবিখানি এই ডাঙালের বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভেতরে কী নিশ্চিন্তেই না বিশ্রাম করছে। বাসুদেবের মনে-মনে সুভদ্রার এমনি কতো না ঘুমের ছবি চলকে ওঠে। সে-ঘুম খুবই অনিশ্চিত আর ক্লান্তির জন্যে। সেই সব ঘুমের ছবি নিশ্চিন্ত বিছানায় নয়। তার বদলে বাইরে মাটির দাওয়ায় অপেক্ষা করে-করে এলিয়ে পড়া। সারাদিন চরে-চরে ঘরে-ফেরা মানুষটিরও তখন দেহ অচল। কত গ্রামগঞ্জ সাইকেলে নিয়ে দাওয়ায় উঠতে পা জড়িয়ে যাওয়া বাসুদেবের বুকে এক ঝলক বাতাসের মায়া ঠেলে ওঠে। মায়াই তো বটে। তা না হলে আর কিসে এমন বুক টনটনিয়ে ওঠে।

সাইকেলটি দাওয়ার নিচে ঠেসান দিয়ে রেখে বাসুদেব জামার কানা তুলে মুখ মোছেন। তারপর পা টিপে-টিপে উঠে কমিয়ে-রাখা লণ্ঠনটি তুলে দিয়ে পলতে উসকে দিয়ে মেলে ধরেন ঘুমন্ত পরিবারের মুখের দিকে।

প্রথমে কিছু হয় না। দ্বিতীয়ে চোখের ঢাকনার কাঁপন জাগে। কাঁপতে থাকে চোখের পাতা। কাঁপতে-কাঁপতে বলতে গেলে হঠাৎই চোখ খুলে যায় আচমকা। সুভদ্রা ধড়মড়িয়ে নিজের শরীরটি ঠেলে তোলে। উঠে বসে অপ্রস্তুত মুখে। সে-মুখে অপরাধও।

বাসুদেব তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি সেই অপরাধটুকু নিজের মুখে মেখে নেন। তারপর দু-হাতে সুভদ্রার দেহখানি ধরে বলে ওঠেন, আমার জন্যে তোমার কি দুর্গতি বলো দিকিনি।

সুভদ্রা বুঝি এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করেছিল। সে-কথা মুখে না বললেও বাসুদেবের হাত দুটি তা টের পাইয়ে দেয়।

— আমার হয়েছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ব্যাপার। কী করি বলো দিকিনি।

সুভদ্রা কোন কথা বলে না। তার মুখখানি বাসুদেবের দু-হাতের বেড়ে থমকে থাকে। চোখজোড়া অপলক হয়ে বাসুদেবের চোখের কানাচ পেরিয়ে দূরে উঠোনের অন্ধকারে চলে যায়। উঠোনে বেড়ার ঝোপেঝাড়ে জোনাকির ছয়লাপ ঘটে চলে। আকাশ-জোড়া প্রকাণ্ড মালসায় নেবা আংরার মিটি-মিটি চমকায়।

বাসুদেব হেসে বলেন, তুমি আমার ওপর গোঁসা করলেও তো বাঁচতুম।

এবার সুভদ্রা হাসে। সে-হাসির ছটায় আকাশের মালসা-বোঝাই নেবা আংরার আগুন মিটিমিটি।

—ওমা, রাগ করব কেন!

— তা হলে?

— কী তাহলে?

—দুঃখু তো হবে। না কি তাও নয়।

—সে কি কথা। তুমি সমুদ্দিন তেতে পুড়ে এলে, আর আমি করব রাগ, দুঃখু! তবে হ্যাঁ কষ্ট তো এক-দু ফোঁটা হয়।

—কষ্ট!

—ওমা, সেই কোন্ সকালে গুড়-পান্তা খেয়ে বেরিয়েছো। তা কষ্ট হবে না।

বাসুদেব নিজের দুটি হাত তুলে নেন সুভদ্রার মুখের ওপর থেকে। তারপর বাইরের অন্ধকারে চোখ রেখে বলেন, তোমায় আমি একফোঁটাও ধরতে পারলুমনি সুভদ্রা। ধত্তে পারলুমনি।

সুভদ্রা উঠে দাঁড়ায়। তারপর যেতে যেতে বলে যায়, হাত মুখ ধুয়ে এসে। দুটি পেটে দিতে হবে তো।

ভোরের আলো জেগে ওঠার মুখে মৌজার নামটি যে কৃষ্ণদেববাটি তার মহালে পড়বার খবরটি পাকা হয়। সেই পাকা হওয়ার সুবাদে বাসুদেব নৌকোর পাটায় বসে পড়েন। বৃষ্টির এখনও জিরেন নেই। ঝিরি ঝিরি, কখনও বা ঝমঝম হয়েই চলেছে। গায়ের জামা, লুঙির হাল বর্ণনা করার যো নেই। সে-অবস্থা আব্বাস, বাপী, মজনুরেরও।

নৌকোয় রাখা চিঁড়ে-গুড় প্রায় শেষ। আর মাত্র ক-বস্তা পড়ে আছে। বস্তাগুলোয় তেরপল-চাপা দিয়ে যথাসম্ভব রক্ষে করা হয়েছে। এত পথ বেয়ে মোট যে-কতগুলি পরিবারকে ইসকুল ঘর, তলার ঘরে আর দোতলা বাড়ির ছাদে তোলা হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। হিসেব রাখার সময়ও তো এটা নয়। আব্বাস একবার বলেছিল, বাসুদা, সরকারের ঘরে আবার ফর্দ জমা দিতে হবে না তো?

—কিসের ফর্দ?

— কত লোক জল থেকে ডাঙায় তুললাম তার।

— তোর মাথাটা দেখছি একেবারে গেছে। ওরে মুখ্যু, এখন কি হিসেব করার সময়?

— না, যদি বি.ডি.ও. সাহেব জিজ্ঞেস করে।

—বি.ডি.ও. সাহেবেরও এই একই দশা। তেনারও এখন হিসেব কষার সময় নেই। তবে হ্যাঁ, চিড়ে-গুড়ের হিসেবটা তো আমাদের মনে আছে। ওটা তো পাকা কাজ।

— তাই তো। তাই তো।

কৃষ্ণদেববাটির মুখে চারদিকে অথৈ জলের মাঝখানে একটি জামগাছ। গাছটির পুরুষ্টু গুঁড়ি ঘিরে জলের চাকা পাক দিচ্ছে। ওখানটিতে রীতিমতো ঘূর্ণি। গাছের ওপর আর এক কাণ্ড। মাঝামাঝি দুটি ডালে একটি তক্তা পেতে এক বুড়ো বসে আছে। তার কোলের কাছে একটি গেরস্ত পোষা কুকুর। কুকুরটির পাশে একখানা পুঁটুলি। ঠিক তার নিচের একটি ডালে দু-ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে এক যুবক ছেলে। ছেলে বসে-বসে দিব্যু পা দোলাচ্ছে।

বুড়ো গলা তুলে চিৎকার করছে, দু-দিন যেয়ে তিনদিনে পড়ল দু-রাত টপকে গেল। তবু তুই একখানা শালতিও যোগাড় করতে পারলিনে! তুই আমার পুত্তুর না ষাঁড়ের লাদ।

ছেলে নির্বিকার পা দুলিয়ে চলে। মাঝে-মাঝে নীচে তাকায় জলের ঘূর্ণি দেখতে। মাঝে মাঝে আঁৎকে উঠে চোখ তুলে নেয়।

— কিরে নন্দ তুই কি বয়রা হয়ে গেলি, না গোঙা!

নন্দ এবার ওপরে তাকায়। তারপর চোখ পাকিয়ে বলে, দুদিন ধরে তোমার তড়পানি শুনে আমি বয়রা হয়ে গেচি।

বুড়ো ওপর থেকে গলার রগ ফোলায়, মুতে দোবো। তোর মাথায় মুতে দোবো।

— কাল রাত্তিরে দু-বার মুতেছো আমার গায়ে। তোমার কুত্তাটাও মুতেছে।

— বেশ করিচি। এবার হেগে দোবো। তুই শালতি আন, ভালো চাস তো। আমি আর আমার বাঘা তাতে চড়ে চলে যাবো, হুঁ।

— আর আমি? আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এয়েচি?

— বানের জলে তো আমরা সবাই ভেসে এয়েচি রে ড্যাকরা। এখেনে কেউ ফূর্তি করতে করতে আসেনি। তুই শালতি আনবি কি না বল্।

— আমার কি বে দিয়েছো যে আমার শ্বশুরের শালতি নিয়ে আসবো।

— যদি বলি শালতি আনলে বে দোবো।

— তুমি শালা মহা চালু বাবা। আমি শালতি আনতে গিয়ে ভেসে গেলে কি মড়ার সঙ্গে বে দেবে!

— একটা জোয়ান পাষণ্ড ছেলে। তোর লজ্জা করে না ও-কথা বলতে। বলি বিদ্যেসাগর মাত্রি আজ্ঞায় দামোদর পেরিয়েছিল, আর তুই শালা পিত্রি আজ্ঞায় একখানা শালতি আনতে পারবিনে!

— ও-সব গপ্পো এখন রাখো। যার নামের সঙ্গে সাগর আছে তার কাছে ও-সব দামোদর-টামোদর নস্যি, নস্যি।

— এমন মুখ্য গাছে ফলে। মাকড়া, বিদ্যেসাগরের নামও শোনোনি!

— আমি যদি মাকড়া হই তাহলে তুমি কী?

— কী?

— তুমি হলে কাঁকড়া। শালা, নড়বড়ে চার-চারটে দাঁড়া দিয়ে নিজে সাঁতরে শালতি

আনতে পারছো না। বসে-বসে আমায় দামোদরের গপ্পো শোনাচ্ছো।

— আমি সাঁতার জানি যে যাবো?

— আমার বাবা হয়ে তুমি যদি সাঁতার না জানো, তাহলে তোমার বেটাও জানে না।

— বললি কী রে!

— ওই কথাই বললুম। কথায় বলে না — বাপের বেটা। তো, আমিও তাই।

—আমি না হয় তোর মতো একটা মাকড়া জন্মো দিয়ে কাঁকড়া হয়েছি, কিন্তু আমার বাঘাটা কী দোষ করলে! সে কেন এমন ভোগা ভুগবে।

গাছের কাছে নৌকো আসতেই মাথার আকাশে গর্জন ছুটে আসছে পুব-দক্ষিণ কোণ থেকে। আকাশে ধুলো ওড়ার ব্যবস্থা থাকলে কী যে হত। তার বদলে এই ভোর-ভোর মেঘলাটে দিন এসব কালে আর ঝিরি ঝিরি একটানা জল সইয়ের কালে গম্ভীর আকাশ চৌচির করে দিয়ে একটি মস্ত উড়ো পাখি — যার মাথায় ঘুরন্ত ডানা — কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল। বাসুদেব সটান উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে পড়ল আব্বাসউদ্দিনেরা। মাহাতো মাঝি গাছের সঙ্গে নাও লাগাতে লাগাতে নিয়মরক্ষে করে যেতে লাগল, সাবধান — সাবধান —

মজনুর গলা তুলে চেঁচিয়ে উঠল, হেলিকপ্টার — হেলিকপ্টার —

বাপী বলে, হ্যাঁ, আমি জানি ওখেন থেকে খাবার ফেলবে ওরা।

— খাবার! মাটিতে ফেলবে?

— হ্যাঁ রে, থলে করে। চকচকে কাগজের থলে করে শুকনো চিড়ে-গুড় — এইসব ফেলবে।

আব্বাস অবাক চোখে আকাশে তাকায়, চাদ্দিকে এত জলের মধ্যে কোথায় খাবার ফেলবে, শুনি।

বাসুদেব কপালে হাত সাঁটেন, মনে হচ্ছে ওরা ডাঙা খুঁজছে। কিন্তু এখেনে ডাঙা কই!

— তাই তো, ডাঙা কই।

উড়ো পাখি, কাঁপতে-কাঁপতে মাথার ওপর এসে টলমল করে। গাছের টঙ থেকে বৃদ্ধ চিক্‌রে ওঠে, আর এট্টু, আর এট্টু নিচে নাম বাপধন। আর একটুস্ খানি নেমে আয় বাপ। আমাদের দুটিকে উঠিয়ে নিয়ে যা।

ছেলেও গলা তোলে, না না, দুজন নয়, তিনজন। তোমরা উড়ে যাবে, আর আমি কি একা একা গাছের ডালে বসে থাকবো?

— না দুজন। আমি আর বাঘা।

— না তিনজন।

— হবে না, হবে না। তোকে নোবো না কখ্খনো না। ওইটুকু পাখির পেটে তিনজনার জায়গা হবে না।

— তাহলে কুত্তাটাকে জলে ফেলে দাও। ও ঠিক সাঁতরে চলে যাবে।

— মারবো মাজায় এক নাতি। শালা ড্যাকরা, হিংসুটে। তোর মতো পুত্তুরের আমার দরকার নেই। শালা মাকড়া কমনেকার।

—তুমি কাঁকড়া। কাঁকড়া, হুঁ বলেই তো দিয়েছি।

মস্ত পাখিটা আকাশের এক জায়গাতেই চক্কর দেয়। ঠিক তখনই পুব কোণ থেকে আর

একখানা নৌকো ভেসে আসে। তার ওপর ব্লকের রিলিফ ইনস্‌পেকটার গৌরহরি দাস, তাঁর পিয়ন যদুপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জামাত আলি — আরও দু-তিনজন।

যদুপতি হাত তোলে। তারপর গলা তুলে বলে সরকারি হেলিকপটার কিছু জানে না, কিছু বোঝে না। কিচ্ছু না।

বাসুদেব এধার থেকে বলেন, কী হল?

— ওরা চরসরাটির দিকে তারিণী গোঁসাইয়ের তিনতালার ছাতে খাবার প্যাকেট ফেলেছে। গোঁসাই সব প্যাকেট নিজে রেখে দিয়ে সদর দরজায় তালা দিয়ে বসে আছে।

জামাত আলি উত্তেজিত গলায় বলে, বাড়ির চারধারে বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে। এরপর একটা মারপিট না লেগে যায়।

বাসুদেব চিন্তিত চোখে চরসরাটির অনেক দূর আন্দাজি আকাশে তাকান, তা তোমরা সব দেখেও ওখেন থেকে চলে এলে!

— কী করব — অত লোক। সবই তো বানভাসি।

— অত লোক তো হবেই। বন্যায় পড়া মানুষ। ঠিক আছে, তাহলে আগে ওই বাপ ছেলেকে নৌকোয় তোলো আব্বাসভাই। ওদের জামাত ভাইদের নৌকোয় তুলে নিয়ে আমরা সরাটির দিকে চলো যাই।

দ্বিতীয় নৌকো এসে লাগে প্রথমটির পাশে — গাছের গা ঘেঁষে।

ছেলে অমনি হনুমানি কায়দায় কতক সড়াৎ করে নেমে পড়ে নৌকোয় পৌঁছে যায়। বৃদ্ধ ওপর থেকে গর্জায়, সাথকপর, সাথকপর। এ শালার সংসার না শ্মশান। নিজের পেটের ছেলে কিনা আস্ত বেইমান।

ছেলে নৌকো থেকে সবকটি দস্ত বার করে, বাপের পেটেও তাহলে বেটা হয়।

কৃষ্ণদেববাটির ভেতরে আর যাওয়া হয় না। বাপ ছেলে সমেত ওই নৌকোটিকে সেইদিকে পাঠিয়ে দিয়ে বাসু মোড়লদের নৌকো বাঁক নিয়ে নেয় চরসরাটির দিকে। ভোর আস্তে-আস্তে আলো-আলো ভাব প্রকট করে। কিন্তু তা হলেও সূর্য আকাশ ছিঁড়ে বাইরে প্রকাশ হয় না। কয়েকদিনের নাগাড়ে বৃষ্টি কখনও জিরেন কখনও ঝমর ঝমর হয়েই চলে। রাত পেরিয়ে আর একটি দিন আসে। কিন্তু দিনমণির একফোঁটাও খবর হয় না।

চরসরাটির গোস্বামী বাড়িটি এখন এক অদ্ভুত দ্বীপের মতন। তেতালা ছাদওয়ালা বাড়িটির তিনধারে জল — খানিক ছাড়ান দিয়ে। যে দিকটিতে জল নেই সেটি গিয়ে মিশেছে দূর গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের পশ্চাতটিও সমুদ্র হয়ে গেছে।

তারিণী গোঁসাইয়ের বাড়ির সামনে নৌকো ভেড়ামাত্র বাড়ির মস্ত সদর দরজাটি দমাস্ শব্দে ভেঙে পড়ল। সেই ভাঙা দরজা পায়ে পিষে মানুষের দঙ্গল উঠোনে ঢুকে পড়ল। নৌকো থেকে লাফ দিয়ে নেমেও বাসুদেব কিছু করে উঠতে পারেন না।

বাসুদেব আর আব্বাসউদ্দিন জনে সামনে এগিয়ে যান।

জমায়েত ভেঙে বাড়ির ভেতরে হই হই মানুষ ঢুকেই চলে। পোক্ত দরজাটা পায়ের নিচে হতভাগা পড়ে থাকে।

বাসুদেব গলা তুলে কিছু বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু মানুষের হুলুস্থুলু উল্লাসে তাঁর তীক্ষ্ণ গলাও মুখ তুলতে পারে না।

আব্বাস পাশ থেকে বলে, দাদা, মনে হয় আমরা এখেনে এসে ঠিক করিনি।

বাসুদেব কোনও উত্তর দেওয়ার মাঝেই দরজার একপাশ দিয়ে গোস্বামীর বড়ো ছেলে ভবানী উদভ্রান্তের মতন মানুষের ঠেলা-ঠেলি কোনওমতে বাইরে বেরিয়ে এল। তার চোখে ছন্ন-ত্রাস আর ভারি বিচলিত চেহারা ছবি।

সামনে বাসুদেবকে দেখে প্রায় দৌড়ে সামনে চলে এল ভবানী। বাসুদেব কথা বলার আগে সে বলে ওঠে, কাকা আমাদের বাড়ি লুঠ হয়ে গেল। আপনারা থাকতেও সব লুঠ হয়ে গেল যে। এদিকে বাবার অবস্থা যে কী হল—

— কি হয়েছে তারিণীদাদার? ওরা কি গায়ে হাত দিয়েছে?

— না না, সে কথা নয়। বাবা কাল দুপুর থেকেই কেমন করছে। ঠিক কেমন করছে —

— কী হল ভবানী। হলটা কি দাদার?

তিনতলার ছাদে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড চলেছে তা এখান থেকেই বোঝা যায়। শুকনো খাবার-পোরা প্যাকেটগুলো হাতে-হাতে লোফালুফি হতে থাকে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির নীচে মানুষের হাতে হাতে মানুষের জন্যে পাঠানো খাদ্য অদল-বদল খেলায় মেতে ওঠে। দু-চারটে প্যাকেট ছাদ টপকে বাইরে উড়ে আসে। একটি শিশুর চিৎকার-ওঠা কান্নায় বঁড়শি-বেঁধা শিঙিমাছ ডেকে ওঠে।

কিছু মানুষ খাবারের প্যাকেট হাতে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের পেছনে একজন বৃদ্ধর বুকের সঙ্গে জাপটে ধরা ভাতের হাঁড়ি। গোস্বামীবাড়ির অন্নও লুঠ হল কি!

বাসুদেবকে ওই দিকে আঙুল দেখিয়ে ভবানী চেঁচিয়ে ওঠে, কাকা দেখুন, ওরা গেল রাতের বাসী হাঁড়িটাও লুট করে আনছে। ওতে যা ভাত আছে তাতে দুজনেরও হবে না।

বাসুদেব লোক ঠেলে বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়েন। পেছনে পেছনে ভবানী আর আব্বাস।

তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড়িয়ে মানুষ নামছে। ভবানী চিৎকার করছে, কাকা, হেলিকপ্টার তো আমাদের চেনা নয়। ওরা যদি আমাদের ছাদে খাবার ফেলে তা হলে আমরা কী দোষ করলাম।

আব্বাস প্রশ্ন করে, তাহলে দরজাটা কেন বন্ধ করে দিলে ভাই।

— ভয়ে, ভয়ে আব্বাসভাই। আমাদের বাড়ি, আমরা সব যদি গুঁড়িয়ে যাই। মানুষের চাপে যদি চাপা পড়ে যাই।

— বন্ধ না করলে বুঝি এমনটা —

আব্বাসের কথা ফুরনোর আগেই উঠোনের লাগোয়া বারান্দা থেকে বৃদ্ধ তারিণী গোস্বামী নেমে আসেন। পরনের লুঙিটি অমাব্যস্ত। খালি গা। গলার পৈতেগাছটি কানে পেঁচানো। বাসুদেব একটু অবাক হন বৈকি। পুরনো দিনের বামুনরা প্রস্রাব করার সময় পৈতেটি ওই ভাবে কানের তাকে তুলে রাখে।

গোস্বামীবুড়ো ডান হাত তুলে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, চাদ্দিকে এত জল। তা সবটাই খেয়ে নিলুম। কিন্তু সেই হল গেরো। ঘড়ি-ঘড়ি পেচ্ছাব পাচ্ছে। কী করি রে বাবা, পেচ্ছাব পেলে কি করি বলো।

বাসুদেব আড়চোখে তাকান আব্বাসের দিকে। আব্বাসও। ভবানী কোনও কথা বলে না। তারিণী গোঁসাই একজন মস্ত কোল্ড-স্টোরেজের মালিক আর এলাকায় ডাকছাড়া পয়সাওয়ালা

মানুষ। এলাকায় বনেদি কংগ্রেস বলে পরিচিত, এত বছরকার নির্বাচনগুলো এলাকায় ঘটে গেছে, সে-সবের পেছনে তাঁর টাকা পয়সার লেনদেন। কিন্তু এখনকার গোঁসাই কর্তাকে দেখে সে-সব ঐতিহ্য কেমন যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে।

ভবানী এগিয়ে গিয়ে বাপের একখানি হাত ধরল, বাবা, অ বাবা। কী হল গো তোমার!

তারিণী গোঁসাই সে-কথায় কান না দিয়ে ছেলের হাতে ঝট্‌কা দেন, হুঁ, কী আশ্চয্যি, কী আশ্চয্যি কথা। এত জল, এত জল। কোত্থেকে এল রে বাবা। তা আমি আর কী করব। এত জল খাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। তা কী আর করা যাবে, মানুষ চেষ্টা করলে কী না পারে। অমাদের দেশে মুনি-ঋষিরা তো এক গন্ডুষে সমদ্দুর খেয়ে ফেলতেন। আমি তেনাদের কথা মনে করেই তো চুমুক দিলুম।

ভবানী আবার ডাকে, বাবা, অ বাবা কী বলছো তুমি! কী হল গো তোমার!

— আর সে কী নিত্য। জলের এমন নেত্য তো কখনো দেখিনি। ঠিক যেমনি মেঘ ডাকে তেমনি করে জল ডাকছে। হুঁ, জল আমায় ডাকছে। গোঁ গোঁ গোঁ — সে কী গোঙানি। তো আমিও তো গোস্বামীবামুনের বেটা। পৈতেটা আঙুলে জড়িয়ে একশো আট বার মহাকালের নাম জপ করে বললুম, দাঁড়া — দাঁড়া, তোর ব্যবস্থা করছি। এই না বলে গন্ডুষে জল তুলে নিলুম।

আকাশ-থেকে-ফেলা খাবার লুঠপাঠের কাজ শেষ হতে চোখের ক-প্রস্থ মাত্র পলক। সেই সঙ্গে গোঁসাইবাড়ির খাবার দাবার যা ছিল — এমনটি মানুষের মাথায় মাথায় চাল-ডাল-আনাজের বস্তাও। এক বালিকার বগলে দুটি আচারের শিশি। ভবানীর কথায়, এর নাম যদি লুঠপাট হয় তাহলে সেই লুঠের মালে এ-বাড়ির ভিন্ন কোনও সামগ্রী নেই। বাসুদেবের মনে মনে এই লুণ্ঠনের পরেরকার একটি ছবি ঝলসে ওঠে। গ্রামের বটতলায় জলা কিংবা নদীর ধারে চড়ুইভাতি হচ্ছে। মস্ত একটি উনুন জ্বলেছে। তাতে চ্যালা কাঠ গোঁজা হচ্ছে অনবরত। প্রকাণ্ড হাঁড়ায় খিঁচুড়ি রান্না হচ্ছে। খিঁচুড়ি নামছে, উঠছে। ঘ্যাঁট-ঘণ্ট যা হোক কিছু একটা হচ্ছে। ওদিকে সার সার কলার পাত পড়েছে। টাগরা পোড়া গরম গরম খিচুড়ি পড়ছে আর সপাত্-সপ্ উঠে যাচ্ছে মানুষের ক্ষুধার হাঁ-মুখে। পাতে যেন পড়তে পায় না। পড়া মাত্র কপ্পুর হয়ে যায়। কোথা থেকে খাদ্য আসছে আর কোথায় চলে যাচ্ছে। এই করতে করতে বেলা দুপুর থেকে বিকেলের ঢালে বেলা গড়াচ্ছে। বেলা টাল খাচ্ছে জলার ধারে। সারের একধারে সেই মেয়েটি বসেছে একটু যেন সরে সরে তফাৎ করে। পাতে পড়েছে গরম খিচুড়ি। ডান দিকে আগলে রাখা গোঁসাইবাড়ির আচারের শিশি। খিচুড়ির সঙ্গে ভারি গোপনে বালিকা আচার টাকনা দিচ্ছে। ঝালে আর গরমে হুস-হাস অতিষ্ঠ অবস্থা। কিন্তু কী যে মজা আর সোয়াদ মেয়ের জিভে। এই অতিষ্ঠতাই যেন আহ্লাদ হয়ে উঠেছে।

তারিণী গোঁসাই যেমন এসেছিলেন ঠিক তেমনি করেই আপন মনে থাকার অবস্থাটি নিজের মনে আগলে নিতে নিতে আবার ফিরে যান সদর দরজার দিকে। যেতে যেতে সেই একইরকম গলায় বলতে বলতে যান, জল দিয়ে আমায় ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। ডাঙার মানুষ জলে পড়লেও তার কিচ্ছু হয় না। আমি তো সাগরেই শয্যে পেতেছি বাপ, শিশিরে আমার কী করবে — ফুঃ ফুঃ।

ভবানী বাবার চলে যাওয়া দিকে তাকিয়ে বলে কী হল বাবা। বাবা ঠিক এমনি করছে

সারাদিন-রাত্তি। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। সারা রাত জেগে থাকে আর ছাতে ঘুরে বেড়ায়।

আব্বাস এবার বাসুদেবের কানের কাছে মুখ এনে বলে, চলো দাদা। ওদিকে অফিসের দিকটায় যে আবার কি খবর-পত্তর এল তা কে জানে।

বাসুদেব কোন কথা না বলে ভবানীর দিকে তাকিয়ে একবার শুধু মাথা কাত করেন। ভবানী একটু-আগে-চলে-যাওয়া তারিণী গোঁসাইয়ের বিহ্বলতা নিজের চোখে মুখে মেখে নিয়ে বলে, তা হলে কী হবে কাকা। এত জলের মধ্যে বাবাকে কি করে যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।

নৌকো ছেড়ে দেয়। ফিরে যেতে হবে ব্লক অফিস। যে পর্যন্ত নৌকো যাবে সেখান থেকে অফিস বেশ খানিক দূর। অতএব হয় হন্টন না হয় যদি ভ্যান-রিকশা মেলে। এইরকম ভাবনার মাঝখানে হঠাৎ আব্বাস বলে বসে, আচ্ছা দাদা, বি.ডি.ও. সাহেবের জন্যে তো সরকারি গাড়ি বাঁধা। তাহলে আমরা কি বেসরকারি লোক!

বাসুদেব মিস্ত্রি চোখ তুলে তাকান, বেসরকারি — সরকারি মানে?

— মানে তো সোজা। তিনিও সরকারি কাজ করছেন আমরাও। তাহলে তাঁর বেলায় উঠতে বসতে গাড়ি বরাদ্দ আর আমাদের বেলায় পা-গাড়ি।

—আরে বাবা, দেশে এখন এতখানি বিপদ। তার মধ্যে কি এসব কথা বলে?

— দেখো দাদা, আমার ও সব কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। যা মনে হল তাই বলে দিলুম।

মজনুর বুঝতে পারে কথার হাওয়া ঘুরতে বসেছে। এদিকে বৃষ্টিও কিছু সময়ের জন্যে খানিক জিরেন দিয়েছে। সেই সুযোগে সে বলে ওঠে — তাহলে তারিণী গোঁসাই লোকটা ক্ষেপে গেল। অমন স্যায়না লোকটা ক্ষ্যাপা হয়ে গেল।

বাসুদেব জলরাশির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠেন, প্রিকিতি ক্ষেপে গেছে মজু। এখন মানুষ কোন ছার!

৪.

"আমি কক্ষের সজ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীববাবুর সহিত কথা কহিতেছিলাম। অক্ষয়বাবু পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় সজ্জিত ও কুঞ্চিত কেশ, চক্ষুদুটি নাতিবৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল; নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যাঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া, — অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরান এবং পরিধানে নয়নসুকের ধুতি। দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি সুন্দর, সতেজ এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন, 'বলুন দেখি, লোকটি কে?' আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন— 'সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে?' আমি হাসিয়া বলিলাম—'বঙ্কিমবাবু'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন?' আমি উত্তর করিলাম—'শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।' সকলে হাসিয়া উঠিলেন এবং বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'বটে! আমার

গোঁফের উপরই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে?' আমি বলিলাম—'পড়িবার কথা নয় কি?'...''

নৈহাটি রেল স্টেশনের তেরছা পূব-দক্ষিণ কোণে বঙ্কিমবাবুদের সাবেক বাড়ি আর সংগ্রহশালা ট্রেন থেকে সিধে দেখা যায়। এত কাছে যে কটা মাত্র রেল লাইন পেরোতে পারলেই যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া হয়ে গেল। স্পর্শ করা গেল বঙ্কিমচন্দ্রের দুখানি মহার্ঘ চরণ।

নৈহাটির এই বাসভবনে এক অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কবিবরের প্রথম মিলন। চাকরিগত কথায়—দুই ডেপুটির প্রথম দেখাসাক্ষাৎ।

এইখানে এসে পঞ্চায়েত করণিক নবীনচন্দ্র সেনের বুকের অভ্যন্তর যুগপৎ আহ্লাদিত আর বিমর্ষ তাড়িত হয়ে পড়ে। কোথায় সেই সপ্তদশ দশকের শেষ ভাগ। আর কোথায় এই ১৯৭৮ সাল। কোথায় নবীন কবি, কোথায়ই বা ক্লীষ্ট কাগজে রিপোর্ট রিটার্ন কর্ষণ করা করণিকের ম্লান কলম। আহা — কলমের কী অনির্বচনীয় মহিমা।

সেদিন — সেই প্রথম দিনই সমাজে বিজ্ঞাপিত রাশভারি এবং কাউকে আমল না দেওয়া বঙ্কিম নবীনচন্দ্রকে খুবই আপন করে নিয়েছিলেন। দু কথার পর তাঁকে আপনি থেকে তুমিতে টেনে আনলেন। আরও একটি উল্লেখ করার মতন ব্যাপার হল যে নবীনের সঙ্গে তাঁর নাতি সম্পর্ক পাতিয়ে নিলেন। যেহেতু 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় সরকারের স্ত্রীকে বঙ্কিম নাতবৌ অসাধারণী বলে আদর করেন, যেহেতু অক্ষয়বাবুকে নবীন দাদা বলে সম্বোধন করছিলেন — সে কারণেই কবিবর হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর নাতি।

আহা — নবীনচন্দ্র সেনের জীবন কী চমৎকারই না মুঞ্জরিত হল। আর ৭৮ অবধি করণিক নবীনচন্দ্র চিরকাল মরমেই মরে রইলেন।

বঙ্কিমবাবু এ-জেলার বারাসাত মহকুমায় যে-সময়টা মহকুমা-শাসক ছিলেন সেটি হল ১৮৭৪ সাল। তার মাঝে-পরে বিস্তর ডেপুটি তথা এস.ডি.ও. সাহেব এসেছেন-গেছেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কাছে সকলই ফিকে। এখন যেটিকে, সাহেবের বাগানবাড়ি বলে সেই ধ্বংস প্রায় কুঠিতেই তাঁর অফিস ছিল। বাড়ির দোতলায় সাহেবের বল-নাচের ঘর। পুরো মেঝেটাই দামি কাঠ দিয়ে বাঁধানো। তখনকার সময়ে ওই ওপরতলাটাই ছিল মহকুমার শাসকের কোয়ার্টার। নিচে গাড়ি বারান্দা। প্রকাণ্ড সব গম্বুজ। জাফরিকাটা ঝুল বারান্দা। খিলেনগুলো চমৎকার কাজ করা। একতলায় এস.ডি.ও. সাহেবের খাস কামরা। শোনা যায় এই কামরার কাছারি ঘর থেকে হাকিমের কোর্ট পর্যন্ত মাটির নিচ দিয়ে লম্বা একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। সেটি গিয়ে উঠেছে কমপক্ষে এপাড়া থেকে ওপাড়া অবধি গিয়ে হাকিমের এজলাসের খাস দরজায়। বঙ্কিমবাবু যখন কোর্টে বসতেন তখন মাটির অভ্যন্তরের এই সুড়ঙ্গ পথ ব্যবহার করতেন। মহকুমা হাকিম বলে কথা। তাঁর গোপনীয়তা, নিরাপত্তা তো থাকবেই। তখন তো এত পুলিশ-বন্দুক ছিল না। ফলে সাহেবদের বেঁধে দেওয়া এইরকম ব্যবস্থাই জারি ছিল।

বঙ্কিমবাবুর বিচার করাটাও দেখার বিষয় ছিল। তখনকার এস.ডি.ও.-র সঙ্গে এখনকার মহকুমা অফিসারদের কাজের তুলনা করতে যাওয়াটা বাতুলতা। তখন কাজ করতে বনবাদাড় মাঠময় মফঃস্বলে যেতে হত ঘোড়ায় চড়ে। এখন ঘড়ি-ঘড়ি গাড়ি।

আসলে নবীনচন্দ্রের এমত প্রাচীন কথা মনে হওয়ার পশ্চাতে কাজ করছিল দুটি বিষয়। প্রথম বিষয়টি হল এই বাড়ির একতলায় এখন সিভিল ডিফেন্সের অফিস থাকায় আজই একবার কাজে আসতে হল। দ্বিতীয়ত গেল বিকেল থেকে ব্লকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি

হয়েছে। অদূরের বন্যার্ত ব্লক থেকে বশে কিছু শরণার্থী এসে এই ব্লকে ভীড় করছে। ঠাঁই দাও খেতে দাও, ওষুধপত্র দাও এই বাসনায়। তাদেরই মধ্যে থেকে কে বা কারা গ্রামের একটি বাড়িতে রাতের বেলা ঢুকে নাকি লুঠপাট করেছে। সেই নিয়ে থানা-পুলিশ হলেও বি.ডি.ও. ম্যাডামের ওপর ম্যাজিস্টেরিয়াল তদন্তের দায় পড়েছে। তাঁকে নাকি তদন্ত করে বলতে হবে লুঠপাট শরণার্থীরা করেছে না কি অন্য কোনও তস্কর-ডাকাত। আসলে এই ব্লকে বন্যার দাপট নেই বলেই বুঝি প্রশাসন ম্যাডামকে স্থির থাকতে দিচ্ছেন না। প্রশাসনের এই স্বভাবটি চিরকাল একই ভাবে বহাল রয়ে গেছে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার যোগাড়যন্ত্র করতে হবে।

এই দুটি ঘটনার সূত্র ধরে নবীনচন্দ্রের মনে পড়ে গেল বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। আসলে বঙ্কিমের কথা দিনের মধ্যে একবারও যে মনে না করে পার পাওয়া যায় না। আর করণিক মহাশয় তো নিজের মধ্যেই গিলে বসে আছেন কবিবরকে। এ যে কী ভয়ঙ্কর গোল।

হিসেব মতন আজ প্রায় দেড়দিন হল বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব কমে এসেছে। টান পড়েছে তার একটানা দমকের স্বভাবে। কোথা থেকে যেন আস্তে আস্তে রাশ টানা হচ্ছে কাউকে তেমন বিশেষ করে টের পেতে না দিয়ে। সংসার হঠাৎ করে চমকে উঠে টের পেয়েও পাচ্ছে না দ্রুত তালপ্ত থেকে ধীর পায়ের দিকে ক্রমে নেমে যাওয়ার সমাচার। মানুষের আগে হয়তো পশু পক্ষীরা অনেক কিছুই টের পেয়ে যায় আগে ভাগে। তারাই তো হল আসল প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির জলবায়ু মাটি একাধারে চটকে মটকে কিংবা আঁতিপাঁতি করে তাদের টিকে থাকা। তারা জানে কেমন করে আগল ছাড়া বাঁচতে হয়। কেমন করে মানুষের চেয়ে একেবারে একশো আশি ডিগ্রি বিপরীত ভাগে গিয়ে নর্তন কুর্দন করে হেসে গেয়ে দিন পার করতে হয়। এই স্বভাবটির সঙ্গে এই সংসারে একমাত্র নিজেকে ঢেলে দিয়ে বসে আছে ওই বোবা মেয়ে অমৃতা। সে কথা আর কেউ না জানলেও নবীনচন্দ্র মর্মে মর্মে টের পান। এই না কথা বলাটিও বুঝি প্রকৃতির দান। প্রকৃতিই তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে কেমন করে মুখর না হয়েও সব কিছু ব্যক্ত করা যায়। অনেক কিছুই স্পর্শ থেকে স্পর্শ যোগ্যতম করে ফেলা যায়। আহা — প্রকৃতির কী অনবদ্য লীলা খেলা।

কোথা থেকে যে মেঘলা ফুঁড়ে সামান্যতম রোদালি ভাব গুনগুন করছে সেটি আর কেউ বোঝার আগেই বুঝে ফেলল ওই মেয়ে। নবীনচন্দ্র তো অবাকের চেয়েও অধিক অবাক। এ যেন কতকটা বিস্ময়াবিষ্কারের মতন। কোথাও রবির করের দেখা নেই, সামান্য আলো আলো স্বভাবের আহ্লাদেই মেয়ে উছল হয়ে পড়েছে। আর কী আশ্চর্য, আর চারদিন পরেই তো দুর্গাপূজোর পত্তন — মহাষষ্ঠী। সে-কথাও কি কারও মনে নেই।

নবীনচন্দ্র মেয়ের চোখের তারায় এই কালো সকালেও টের পেয়ে গেলেন বাঙালির শারদীয় উৎসবের পাটা পড়তে চলেছে। তারপরেই দেখা গেল পাড়ার পুজোতলায় কয়েকটি ঝাঁপ পড়েছে। ম্যারাপ বাঁধার তোড়ঝোড় চলেছে অলখে। তারই মধ্যে অফিসে পূজা অ্যাডভান্স মিলে গেছে। অতএব আর বিলম্ব নয়।

আজ অফিস-ফেরতা টুকটাক জামা-কাপড় কিছু কিনতে হবে, এমন বাসনা মনের মধ্যে জমিয়ে রেখেছেন নবীনচন্দ্র। ঠিক তখনই দরজার বাইরে যথারীতি গোরা কাহার।

— সেনবাবু; তাহলে ভেতরে আসি?

মাথা হেলান নবীন। বৃষ্টি ধরে গেলেও গা থেকে মেলেটারি বর্ষাতিটি খোলেনি গোরা। কে

জানে আবার কখন যে কী হয় — এমনি ভাব।

— বাবু, একটা খপর ছিল যে।

— খবর!

— আজ্ঞে। আপনার বউমার বিষয়ে।

— কীরকম!

গোরা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। দেখে নেয় তৃতীয় কেউ আছে কি না। তারপর টেবিলের সামনে ঝুঁকে বলে, কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড বাবু, শুনলে বিশ্বেস যাবেন তো!

নবীন অবাক হয়ে গোরার মুখের দিকে তাকাল।

— হ্যাঁ বাবু, আমারও যে বিশ্বেস হচ্ছে না। নিজের চোখে দেখেও বাবু।

— কী দেখলে?

— কালকে বিকেলের দিকে বাবু গেছিলাম গাদমারা হাটে। টুকটাক কেনাকাটি ছিল তো। তা হাটে ঘুরতে ঘুরতে এক ঠায়ে একছড়া পাকা কলা দরদস্তুর করছি হঠাৎ দেখি কিনা একজন মোটাপানা আধবয়েসী লোকের সঙ্গে আপনার বৌমা হেসে হেসে কথা কইতে কইতে চলে যাচ্ছে।

— বলো কি!

— ওই বলি বাবু। মাথায় সেই সাবেক জটা। এই এত্তোখানি ধ্যাবড়া সিঁদুর টিপ। কিন্তু বাবু ডেরেস পত্তর এক্কেবারে বদলে ফেলেছে। পরনে নতুন শান্তিপুরি শাড়ি। ডেরেস দিয়ে কাপড় পরেছে। রঙচঙে বেলাউজ গায়ে দিয়েছে। সাত জন্মে যা পরেনি সেই চটিও একজোড়া পরেছে। আর সেকি মচর-মচর পান চিবোনা।

— সেকি!

—হ্যাঁ বাবু, লোকটার সঙ্গে এমন করে গপ্পো করতে করতে যাচ্ছে যেন কত জন্মের ভাতার। কী বলব বাবু, আমায় চিনতেও পরলে না।

— লোকটা কে?

— লোকটা কে তা তো জানিনি বাবু। কোনোদিন দেখিওনি। সে কিনা আমার পরিবারকে সঙ্গে করে নিয়ে! ওঃ পান চিবনোর সে কী ঘটা।

— তারপর!

— আর তারপর বাবু। আমায় তো দেখেও দেখলে না। তবে হ্যাঁ, একটি কথা বলতে ভুলে গেছি বাবু, মাথার সাবেক জটা দিয়ে কী সুন্দর একটি বাঁধাকপির পাতা খোঁপা বেঁধেছে। তাতে আবার রাঙা ফিতে।

— তা তুমি কী করলে?

— কি করব বাবু, পেছু পেছু যাই আর মনে করি একটিবার সে যদি পেছুতে তাকায়। থাকে থাকে পানের পিক ফেলে আর হেসে হেসে লোকটার কাঁধের কাছে এসে কথা কয়। আমিও থাকে থাকে ওদের টপকে সামনে চলে যাই। যেতে যেতে নীচু হয়ে চটি ছিঁড়ে যাওয়ার ভান করি। কিন্তু বাবু তেনার যেন ওই লোকটি ছাড়া তিভুবনের কোনো খবরে নজর নেই। একবার ভুলেও তাকায় না আমার দিকে।

—তারপর কী হল?

— এই করতে-করতে বাবু আমি তাদের পেছু পেছু যাই। এটা কেনে, সেটা কেনে, ব্যাগে ভরে। যে পাকা পেঁপে আপনার বৌমা দুচোক্ষে দেখতে পারত না তাও একখানা কিনে ফেললে। কিনে সে কী আহ্লাদ বাবু।

নবীনচন্দ্র চুপ করে থাকেন। এ কথার পর আর নতুন কি কথা মুখে আসতে পারে। কী বা বলা যেতে পারে। এখনই যদি বলা হয় — তুমি ভুল দেখেছো গোরা, অথবা সত্যি সত্যিই কি তুমি দেখেছো — এমন বললে মানুষটির দিবাস্বপ্ন হলেও তা আহত হয়ে পড়বে। সত্যি, আশাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সে বেঁচে থাকে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এমন কি মৃত মানুষদের জন্যেও। হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জন্যেও। কে জানে, হয়তো সে একদিন না একদিন ফিরে আসতে পারে। ঠিকানা হারিয়ে গেলেও মানুষ কখনও হারায় না।

গোরা বলে, তা হলে কী হল বাবু! আপনার বৌমা আমায় এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল কেন বাবু! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

নবীন তার হতাশ আহত মুখটি নিজের মনে টেনে নেন। তারপর নিচু গলায় বলে ওঠেন, সংসারে সব কিছু বোঝা যায় না গোরা। তা ছাড়া সব কিছু না বোঝাই ভালো। তাতে কষ্ট বাড়ে বৈ কমে না।

কথাটা বলেই মনে হয়, এতখানি বলা বোধ হয় উচিত হল না। এত কঠিন কথা বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল।

নবীন তাকান গোরার চোখের দিকে। তারপর সেই একই নিচু গলায় বলেন, যা দেখেছো ভুলে যাও গোরা। ভুলে যাও।

— ভুলে যাব কেন বাবু। ভুলে যাব কী করে। সেই ছেলেকালে যে-মেয়ের সঙ্গে বে হয়েছিল। সে একদিন ছেলেপুলের মা হল, কেরমে কেরমে একমাথা চুল থেকে জটাধারিণী হল, জটা যতো বাড়ে আর মেয়ের কথা সিধে থেকে বাঁকা হয়ে যেতে থাকে, রাম বললে রাবণ শোনে। তারপর একদিন এমন হল যে কারুর সঙ্গে আর কথাটি কয় না। যা বলে তা নিজেই শোনে। সারাদিনকাল আপন মনে বিড় বিড় করে। বিড় বিড়, বিড় বিড়...

যে-গ্রামে ডাকাতি হয়েছে তার নাম রাজবেড়িয়া। বৌদ্ধযুগে এখানে নাকি বহু বিহার ছিল। সেই সময় রাজবেড়িয়ার নাম ছিল রাজবিহার। সাহেবদের কালে এখানে নীলকুঠি তৈরি হয়। এখনও তার দু-চারটি নজির ইতস্তত এখানে সেখানে জঙ্গল-গড় হয়ে রয়ে গেছে।

সংযুক্তা যখন রাজবেড়িয়ায় পৌঁছল, তখন বেলা দুপুর। গত দেড়দিন বৃষ্টি বিরাম দিলেও আকাশ সেই একই মেঘলাটে রয়ে গেছে। মেঘের সঙ্গে রৌদ্র খেলার সুযোগ থাকলে ভালই লাগত। কিন্তু প্রকৃতির কাছে কোনও দাবি পেশ করা যায় না বলেই সংযুক্তা মনকে আর বাড়তে দিল না।

গ্রামের নাম রাজবেড়িয়া। এখানে এখন রাজারাজড়ার উচ্ছিষ্টও পড়ে নেই। বেশির ভাগই চাষীবাসী মানুষ। আর আছে একটি প্রাচীন কাছারিবাড়ি। বাড়ির মালিক পূর্বপুরুষ একদা জমিদার তাঁর পরিবার সমেত কলকাতায় থাকেন বলে জানা গেল জিপ ড্রাইভার শ্যামচাঁদবাবুর কাছ থেকে। শ্যামচাঁদবাবু পুরনো সরকারি ড্রাইভার। এলাকার ইতিহাস-ভূগোল সবই নখদর্পণে। সে যখন তার মিশকালো ঢ্যাঙা রোগা মাথার ওপর বাবরি চুলের ঝাড় আর সদাই রক্তচক্ষুর সঙ্গে মানানসই কপালে আঁকা সিঁদুর-টিপ নাচিয়ে নাচিয়ে কথা বলে, তখন সংযুক্তার বেশ

মজা লাগে। শ্যামচাঁদ এলাকার এমন লোক নেই যে চেনে না। চেনা নেই এমন এলাকাও তার খাতায় নেই। আজকের তদন্তকালে সংযুক্তার সঙ্গে বাড়তি হিসেবে আছে একজন এস.এ.ই. বা সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অরূপ দে। অরূপের যদিও আওতা এমন ধরনের তদন্তের মধ্যে পড়ে না তবু তাকে সঙ্গে করে এনেছে সংযুক্তা। এই বছর আঠাশের যুবক ছেলেটি ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান আর খুব প্রাণবন্ত।

ডাকাতি হয়েছে যে-বাড়িতে তার মালিকের নাম ধনঞ্জয় সরকার। মাঝবয়সী ভদ্রলোক পাটের ব্যবসা করেন। তা বাদে পেট্রল পাম্প আছে হাইওয়ের ধারে। ইলেকশনের সময় সরকার ফুয়েল সাপ্লাই থেকে তেল নেওয়া হয়, এ-খবরও শ্যামচাঁদ দিয়ে দিয়েছে। তাছাড়াও বি.ডি.ও. ম্যাডামকে জানিয়ে দিয়েছে গেল ইলেকশনের দরুণ সরকারবাবুর কিছু তেলের টাকা এখনও ব্লক অফিসের কাছে পাওনা হয়ে আছে।

সংযুক্তার জিপ এলাকায় চেনা। ফলে দাঁড়ানোমাত্র লোকজনের ভিড় হয়ে গেল দুটি-পাঁচটি করে।

দোতলা বাড়ি। সামনে বেশ খানিক ফাঁকা জায়গা। তার একপাশে দোহারা একটি গোডাউন। তার সামনে একফালি সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে একটি গরু শুয়ে জাবর কাটছে। একমাত্র ওই গরুটিই ভর দুপুরের নির্জনতার ছবি ধরে রেখেছে।

ধনঞ্জয় গাড়ির সামনে জোড়হস্ত দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোকের কঠিন চোয়াল দেখে মনে হয় না তিনদিন আগে ওঁর ওপর দিয়ে একটা তাণ্ডব চলে গেছে। পেছনে — একটু তফাতে — তাঁর তিন জোয়ান ছেলে। তারাও সব বাপেরই মতন নিরেট মুখধারী। তবে তারা কেউ হাত জোড় নয়।

শ্যামচাঁদ কানে কানে বলল, ম্যাডাম, এনকোয়ারিটা পাঁচজনের সামনে করাই ভালো।

গোডাউনের চাতালের ওপর একটি চেয়ার এনে রাখল একজন। সংযুক্তা সেখানে বসতে বসতে সামনেকার মানুষদের দিকে চোখ বোলাল। — আমি একাই বসব! আপনারা?

সরকার গলা তুলে এক ছেলেকে বলল, বলু, যা একটা বেঞ্চি নিয়ে আয়।

দেখতে দেখতে মানুষে মানুষে ঘিরতে ঘিরতে সংযুক্তার চারদিকে একটি প্রায় বৃত্ত হয়ে গেল। অরূপ হাত তুলে বলল, আপনারা একটু পিছিয়ে দাঁড়ান। বাচ্চরা — তোমরা এখান থেকে যাও।

মানুষের ঘরবন্দীর সামনের দিকে কচি কাঁচাদের সার। এ ওকে ঠেলছে। ও তাকে।

গোডাউনের মাথায় টিনের চালে একজোড়া কাক বসে আছে। তারা বসে বসে কাল্পনিক জল ঝাপটাচ্ছে। কে জানে-কদিন নাগাড়ে জলে ভিজে ওদের ডানা বুঝি এখনও শুকোয়নি। টিনের চালের পেছনে বাঁশঝাড়। বাঁশের ডগা জেগে আছে কালশিটে পড়া আকাশে। চার-পাঁচটি বক চলে যাচ্ছে আকাশের একধার দিয়ে। আকাশের ওইখানেও নিঝুমতা আর নাগাড় বৃষ্টি ক্লান্ত দ্বিপ্রহরের আলস্য বিছিয়ে আছে। সংযুক্তার মনে হয় এ ব্লকে ওয়াটার লগিং আর ওই দূরের আকাশের নিচে জল থই থই। কে জানে — ওখান থেকে বানভাসি মানুষজনই কী এ-বাড়িতে এসে ডাকাতি করে গেল!

সংযুক্তা চোখ থেকে চশমা খুলে কাঁচ মোছে শাড়ির আঁচলে, হ্যাঁ, তাহলে আপনিই তো —

— আজ্ঞে হ্যাঁ মা জননী, আমার নামই ধনঞ্জয় সরকার।

— তাহলে বলুন।

— তাহলে কোথা থেকে শুরু করি মা?

সংযুক্তার স্বরে বিরক্তি থাকলেও যেটুকু আড়াল দেওয়ার চেষ্টা করে সে। — সেটা তো আপনার ব্যাপার।

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তাইতো।

পাশ থেকে সম্ভবত ছোটোছেলে নীচু স্বরে বলে, ওরা যখন এল সেখান থেকে শুরু করো না।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি লম্বা বেঞ্চি এনে রাখা হয়। সরকার সমেত আরও কয়েকজন বসে পড়েন। অরূপের জন্যেও একটি নীচু চেয়ার আসে।

সংযুক্তা অরূপের দিকে ঝুঁকে পড়ে নোট নিতে বলে। অরূপ পকেট থেকে কাগজ-কলম বার করে বসে।

ধনঞ্জয় গলা খাঁকারি দেন, আমরা সবাই খেয়ে উঠে শোবার যোগাড় করছি। আমার বুড়ি মা তো আবার সন্ধ্যেবেলা একটু আফিং খান। তা মা বাইরে ঘরের রক্তপোশে অনেক আগেই ঘুমিয়ে কাদা। বড়ো ছেলে মানে এই আবু ওর বাচ্চাটাকে নিয়ে কলতলায় গেছে। এমন সময় ঐ বাঁশঝাড়ের দিক থেকে তারা এল।

আবু পাশ থেকে যোগ করে — না না, মা তখন পরের দিন সকালের রান্নার জন্যে কুটনো কুটছিল।

ধনঞ্জয় ধমকে ওঠে — তুই থাম্। তা মা জননী, তারা বাঁশঝাড়ের দিক থেকে এক্কেবারে চুপিসাড়ে এল। এসে ঐ সদর দরজায় টুক টুক টোকা। টুক টুক, টুক টুক। এত রাতে কে ডাকে! কে টোকা দেয়! মনে একটু সন্দ হল বৈকি। প্রথমে খানিক সময় চুপ করে রইলাম।

আবু, কথা বলে, আমিও শব্দটা শুনেছিলাম ম্যাডাম। মনে একটা কু বলছিল। উঠে গিয়ে দু ভাইকে ডাকলাম। তারা তখন মশারি খাটাচ্ছিল।

সরকার মশাই এবার ধমকান না। তিনি তারপর থেকেই শুরু করেন।

— তা আমিই এবার উঠোনে নামলাম। নেমে — মা, বাড়ির ভেতরটা একবার দেখবেন না।

সংযুক্তা এক হাত তোলে, আপনি আগে বলুন।

— হ্যাঁ মা, বলি। তা আমিই গলা তুলে জিজ্ঞেস করলাম কে? কে টোকা দিচ্ছে দরজায়? বলা মাত্তর ওদিক থেকে সাড়া এল — কুটুম। আপনার বড়ো কুটুম। কী বলব মা, মাথায় একবারও এল না এত রাতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে বিনি খবরে কেউ আসবে না। বরঞ্চ যেটা হল আর কী, মনে হল, মেয়ের বাড়িতে কোন বিপদ হয়নি তো!

আবু ফুট দেয়, বাবা এখানেই ভুলটা করে ফেলল। আর দরজা খুলে দিল।

— খোলামাত্র তারা হুড়মুড়িয়ে আমায় ঠেলে ভেতরে ঢুকে বড়ল।

অরূপ প্রশ্ন করে, আন্দাজ কত জন?

— তা আজ্ঞে তখনই তো ধরতে পারিনি। তবে পরে দেখেছি — হুঁ, তা বিশ-বাইশ জন তো বটেই। তা তারা আমায় ঠেলে ঢুকতে আমি তো প্রথম চোটে মাটিতে পড়ে গেলাম। উঠে দাঁড়াবার আগেই তারা চারজন সদর দরজা বন্ধ করে আগলে দাঁড়িয়ে রইল। বাকিরা সব

ভেতরে চলে গেল। মিছে বলব না স্যার, তারা কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি। কেবল ওই আবু কী বলতে এসেছিল তাকে কষে একখানা চড় হাঁকিয়েছে। আর আবুর মা ডাকাত-ডাকাত বলে দুবার ডাক ছাড়তেই একজন এসে বেশ টাইট করে তার মুখ আর হাত দুখানা বেঁধে দিল।

সংযুক্তা বলে, তারপর?

—তারপর আর কী মা। না চাইতেই চাবি-টাবি দিয়ে দিলাম আমি।

অরূপ উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না। — দিয়ে দিলেন!

সংযুক্তা তাকায় অরূপের দিকে, ওঁকে বলতে দিন না।

সরকার মশাই আবার কথায় ফেরেন, আজ্ঞে মা, ওরা কাউকে মারধোর করেনি। তবে দোতলার আলমারি খুলে বারো হাজার মতো ক্যাশ-টাকা, টুকরো টাকরা গয়না।

—আর? আর কী?

সংযুক্তার প্রশ্ন শুনে সরকার তিন ছেলের মুখের দিকে একবার চোখ বোলান। ঢোঁক গেলেন। তারপর বলে ওঠেন, হ্যাঁ নিয়েছে। আমার একজোড়া নতুন জুতো। একদিন মাত্তর পায়ে দিয়েছি।

জমায়েতের মধ্যে চাপা চাপা হাসির গুঞ্জন গুনগুনিয়ে ওঠে। সামনের মানুষদের ঠেলে আবার কচিদের মুখ উঁকি দেয়। অরূপ আড়াচোখে দেখে নেয় ম্যাডামের ঠোঁটে হাসি ভাঙছে কি না। কিন্তু না, প্রশাসকের কুর্সির নিয়ম কানুন এরই মধ্যে তাঁর ধাতস্থ হয়ে গেছে। ফলে বি.ডি.ও. ম্যাডামের মুখ আগের মতনই নিপাট গম্ভীর থেকেই যায়।

সংযুক্তা বলে, তারপর?

তারপর আর কী বলি মা জননী, তারা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। আর যাবার সময় সদর দরজার ছেকলটা বাইরে থেকে তুলে দিয়ে গেল। এই পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় নিল — কত হবে, দশ থেকে পনের মিনিট।

সংযুক্তা প্রশ্ন করে, তাহলে এবার বলুন, যারা এসেছিল তাদের আপনি চেনেন না একথা পুলিশকে বলেছেন। আবার এও বলেছেন ওরা সব পাশের বানভাসি এলাকার লোক। কী করে বললেন এ কথা! যাদের আপনি চেনেন না তারা কোথাকার লোক এটা বুঝলেন কেমন করে!

ধনঞ্জয় খানিক থমকে যান! চোখ বোঁজেন এবং খোলেন বারকতক। বক্রচোখে তিন ছেলের দিকে দেখেন। ঢোঁক গেলেন। তারপর বলে ওঠেন, তাছাড়া আর কী হতে পারে মা। এলাকার লোক দেখলেই বোঝা যায়। আবার বানভাসিও দেখলে চেনা যায়।

সংযুক্তা অবাক, বোঝা যায়! কী করে! কারও গায়ে লেখা থাকে নাকি?

— ঠিক কথা মা জননী। লেখা থাকে না। কিন্তু তবুও বোঝা যায়। আমরা পারি।

— আপনারা পারেন, মানে! এ তো ভারি অদ্ভুত কথা।

ধনঞ্জয় হাত জোড় করেন, মা, আপনি আমায় মারুন কাটুন — আমি এই কেনর জবাব আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, আমরা পারি। এটার মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই।

—আপনার ছেলেরা পারবেন? তাঁরা কি বলতে পারবেন ওরা কোথাকার লোক!

— সে তো তারাই বলতে পারবে মা। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করলে পারবে বৈ কি।

সংযুক্তার কিরকম অদ্ভুত লাগে এই যুক্তিহীন অথচ দৃঢ় বক্তব্য। সে বুঝে পায় না, এবার কোন প্রশ্নের দিকে যাওয়া যেতে পারে।

বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে সংযুক্তা বলে, আপনি কী বলেন।

আবু স্বভাবগম্ভীর গলায় বলে, আমি আর নতুন কী বলব ম্যাডাম।

— যা জানেন তাই বলবেন। আপনিও তো তখন বাড়িতে ছিলেন।

আবু এবার একটু বাড়তি গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর মুখ নিচু করে বলে, বাবা যা বলার বলে দিয়েছে। আমার আর কিছু বলার নেই।

সংযুক্তা চারপাশের জমায়েতের দিকে চোখ বোলায়। হঠাৎ তাদের মধ্যে একটি ছোকরা বলে ওঠে, হ্যাঁ দিদি, ও বন্যায় পড়া লোকেরই কম্মো।

সংযুক্তার কঠিন চোখ তার দিকে গিয়ে থামে।

— কী করে জানলেন আপনি। তখন তো আপনি ছিলেন না।

— না থাকলেও এটা জানা।

— কী করে?

—আমাদের এলাকায় তো তেমন কোনো চোর-ডাকাত নেই দিদি। তাই বলছিলাম।

—আপনার নামটা কী?

ছোকরা চুপ করে থাকে। আস্তে আস্তে পিছু হটে ভিড় ঠেলে ঠেলে।

সংযুক্তা এবার গলা তুলে বলে, কি হল, নাম বললেন না যে! চলে যাচ্ছেন কেন? নাম বলুন।

লোকটি চলে যেতে যেতে বলে, নাম জেনে কী হবে।

সে ভিড় ঠেলে পেছনে মিলিয়ে যায়। সংযুক্তা জমাতের দিকে তাকায়।—ওর নাম কী? নামটা বলুন তো?

প্রথমত কেউ কথা বলতে চায় না। এ ওর গা ঠেলাঠেলি করে। ভিড়ের মধ্যে ফিসফাস ওঠে। অরূপ গলা চড়িয়ে বলে, ওর নামটা বলুন। নাম-বাবার নাম-বাড়ি কোথায়।

আবারও চুপচাপ। পেছন থেকে কে একজন বলে, নাম বললে তো পুলিশে কেস খেয়ে যেতে হবে।

সংযুক্তা উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। তারপর ভিড়ের ওপর দিয়ে মাথা তুলে বলে, আপনার নামটা কী আগে শুনি। বলুন, আপনার নাম বলুন।

পেছনে মেঘলা দুপুরের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে থাকা শীর্ণ একটি লোক বলে ওঠে, আজ্ঞে ওর নাম ছিমন্ত মণ্ডল। পিতা, লেটঅনাথ, সাকিন— এই রাজবেড়ে।

—ছিমন্ত, মানে শ্রীমন্ত!

—আজ্ঞে।

বলেই লোকটি দৌড়ে চলে যায় জমায়েত ছেড়ে।

সংযুক্তা হাত দেখিয়ে সামনে এগোতে এগোতে বলে, ঠিক আছে সরকার মশাই, আমি তাহলে চলি।

সরকার দু হাত জোড় করে বলেন, বাড়ির ভেতরটা একবার দেখবেন না?

সংযুক্তা মাথা নেড়ে বলে, না, তার কোনো দরকার নেই।

— তাহলে একটু চা-টা—

—আমি বাইরে কিছু খাই না।

জিপে ফিরতে ফিরতে সংযুক্তা অরূপকে বলে, ওই শ্রীমন্ত মণ্ডলের নামধাম সব থানায় জানিয়ে দিতে হবে। তাতে তদন্তের সুবিধে হলেও হতে পারে।

এস এ ই অরূপ দে সন্ধ্যায় অফিসে ফিরে ডাকাতি কেসের তদন্তের বিবরণ দিচ্ছিল নবীনচন্দ্রের ঘরে বসে মুড়ি-বাদামের আসরে। নবীনচন্দ্র ফাইলে কলম বাইতে বাইতে ঘটনা শুনছিলেন। কোনও মন্তব্য করা এমনিতে তাঁর ধাতে নেই। তাই শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল ম্যাজিস্টেরিয়াল এনকোয়ারির কি হ্যাপা কম। এই তো সবে শুরু করলেন ম্যাডাম। এখন জল কোথায় পৌঁছোয় তা কে জানে। তবু ম্যাডাম, বয়েস অল্প হলে কী হবে, ধরেছেন ভালো।

বঙ্কিমবাবুর কালটা ছিল একেবারে ভিন্ন। সেই ১৮৭৪, মানে ঠিক একশো চার বছরের ফারাক। এই উনিশো আটাত্তরের মেঘলা আর দেশময় প্লাবনের কাল টপকে ঐখানে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কতো না দুস্তর সময়ের পরত আর পুরু সর ঠেলে ভেতরে হাত চালনা করা, বিগত অন্ধকার আর মেঘের ভেতর দিয়ে পলেস্তারা খসা শ্যাওলা-চর্চিত বিবরণ ডেপুটি বাহাদুর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে স্পর্শ করে নেওয়া। এ বড়ো আশ্চর্য অনুভূতি।

এস ডি ও সাহেবের কুঠিতে একদিন এক শীতের সকালে এক গ্রামের কৃষক এসে উপনীত হল। প্রায় প্রাণেরই দায়ে। বারাসতে মফস্বলের পাশেই এই এখনকার ব্লক এলাকার এক গ্রামের মানুষ সে। বেচারির জমির ফসল, বাগানের আনাজ কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। বিস্তর থানা-পুলিশ করেও কোনও আমল পাওয়া যায়নি। তখন নিতান্ত দায়ে পড়েই সে ভেবেছে— একেবারে খোদ ধর্মাবতারকে নিবেদন করা যাক্। বড়জোর তাড়িয়ে দেবেন। এর চেয়ে বেশি কিছু তো হবে না। বঙ্কিমবাবু তখন কুঠির বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। সেপাইকে অনেক বলে কয়ে, যথেষ্ট তোষামোদ করে ভেতরে যাওয়ার হুকুম মিলল।

কৃষক তাঁর পায়ে পড়ে তার দুঃখের বৃত্তান্ত বলল। বঙ্কিমবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে সব শুনলেন। কোনও মন্তব্য করলেন না। শেষকালে বললেন, কাল সকালে আমি তোমার গ্রামে যাব। তদন্তটা আমিই করব।

পরদিন সাতসকালে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে হাকিম সরেজমিনে উপস্থিত। উপস্থিত সেই কৃষকটির দোরগোড়ায়। মেটে ঘরের অদূরেই মানুষটির জমি। খাঁ খাঁ পড়ে আছে ফসলহীন। সে বিনীত হাত তুলে দেখাল পাশের বাগান থেকে কিছু ফল ফুলুরিও গেছে। হাকিম হুকুম দিলেন পাড়া পড়শিদের সব খবর করতে। লোকটি হুজুরের জন্যে একখানি কুর্সি এনে পেতে দিল আম গাছতলায়।

দেখতে দেখতে খবর হয়ে গেল চৌহদ্দিময়। নিমেষে গাঁ ঘরের মানুষ এসে জুটল আমতলায় আস্ত হাকিম দেখতে।

বঙ্কিম তাঁর স্বভাবগম্ভীর মেজাজে প্রথমে বলে দিলেন এখানে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। তারপর বললেন, আমি সকলকে খানিক সময় দিলাম। যে এই দুষ্কর্ম করেছো স্বীকার যাও।

কেউ কোনও কথা বলে না। নিঃশব্দ আকাশ তলে মানুষগুলি সকালবেলার শীত কুয়াশার মতন জড়াজড়ি ঠেসাঠেসি বসে থাকে। শুধু দু চার উসখুস। মুখ তাকাতাকি। চোখের সঙ্গে

চোখ বদল। হাকিম যে এমন একটি প্যাঁচ চেলে বসবেন তা কে জানত।

—যদি সত্যিকথা বলো তাহলে লঘু সাজা হবে। স্বীকার করো। যে করেছো স্বীকার করো।

হাকিমের দ্বিতীয় বাক্যগুলি যেন সবার মর্মে গিয়ে বিদ্ধ করে। তথাপি কেউ উত্তর করে না। নৈঃশব্দের শীত যেন জাঁকিয়ে পড়ে। গায়ে গা ঠেলাঠেলি সঙ্কোচ কিঞ্চিৎ প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। হাকিমের গৌরবর্ণ আর্যসুলভ চেহারা, বঙ্কিম গ্রীবা, বাহারি গোঁফ আর টেপা ঠোঁট সমেত নাতি বৃহৎ চক্ষুর পানে তাকাতেও ভয় হয়। তাকালে মনে হয় বুঝি অন্তঃকরণে ছুরিকা চলছে। দলবাঁধা মানুষদের সাক্ষাৎ হাকিম দেখার শখ নিমেষে কর্পূর দেখে। কেন যে মরতে এলাম, কেন যে— এমত চিন্তায় প্রায় সকলেই ঘোরগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বঙ্কিম এবার তৃতীয় বাক্যটি উচ্চারণ করেন, তাহলে তোমরা শোনো— যে চোর সে এখানেই হাজির আছে। আমার চোখে সে ধরা পড়ে গেছে।

এবার যেন হিমেল বাতাস ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। জীবন্তেরা নিজ নিজ শব দর্শন করে। গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে। দূরের মাঠগুলিতে বাতাস খেলে। মাঠপারে কোনও মানুষ হাজির থাকে ফসলকাটার জন্যে। এক ঝাঁক বুলবুলি শিস বাজাতে বাজাতে ধাঁ করে হাওয়া হয় ধানের ক্ষেতে আলটপকা দিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার নিদান হাঁকেন, বেশ, তাহলে শোনো, যে চোর তার মাথায় একটি কুটো লেগে আছে।

এটি যেন জীবন কাড়া মকরধ্বজ। জীবনদায়ীর উল্টো এই ব্রহ্মাস্ত্র। আমতলার জমায়েতের একধার থেকে একজন ব্যক্তিই শুধু নিজের মাথায় হাত দেয়।

নবীনচন্দ্র ওদিকের মুড়িবাদামের মেঘলা বিকেলের একপাশ থেকে মনে মনে ঠোঁট টিপে হাসেন। হাকিম মানে তো অন্তর্যামির যমজ। অন্তরের কথা পড়ে ফেলতে পারেন। বলতে পারেন কোন মানুষটি কেমন ধারা। কোন স্থলে কোন টোপ খাটবে সেটি হাকিম সাহেবের করতলগত। তার ওপর একজন ডাকা হাঁকা লেখক। তার ন-বছর আগে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়েছে। তারও আগে কিশোরী চাঁদ মিত্রের ইন্ডিয়ান ফিল্ডে ধারাবাহিক ভাবে ইংরেজীতে উপন্যাস লিখে বসে আছেন। নেশা হয়ে গেছে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী। সবচেয়ে বড়ো কথা, ১৮৭২ এ তাঁর সম্পাদনায় বেরিয়ে গেছে বঙ্গদর্শন।

'বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি, অশিক্ষিত অথবা অসৎ।'

তাহলে বঙ্কিমবাবু, আপনিই বলুন নিজের ডালে বসে ডাল কাটলেন কিনা।

৫.

এই ব্লকের বি ডি ও সাহেব কমল কুমার বাগচি বেশ স্থূলকায়, মাথা ঠাসা চুল আর মাঝ বয়সের দোর গোড়ায়। তাঁর নাম ফলকে ডাবলিউ বি সি এস (একস্) লেখা থাকলেও কুলিন সিভিল সার্ভিস যাঁরা পরীক্ষায় বসে পাশ করে সোজা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ বি ডি ও— তাঁদের মহলে গোঁফের আড়ে মিচ্‌কে হাসি, হুঁঃ ঘষা বি সি এস। বলা বাহুল্য বড়ো তক্‌মা বলে ডাবলিউটি কথাবার্তার সময় বাদ থাকে। আর ঘষা কথার অন্তরের কথাটি হল নিচু পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে ঘষতে ঘষতে উচ্চে ওঠা।

কমলকুমার বাগচি চাকরির প্রথম জীবনে জে এল আর ও বা জুনিয়ার ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার হিসেবে ভূমিষ্ঠ হন কলেজ পেরিয়েই। তারপর এক ধাপ উঠে এস. এল. আর . ও— সাব ডিভিশনাল এল আর ও। তার পরের বারেই ভঙ্গকুলীন থেকে কুলে-ওঠা বি ডি ও সাহেব। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ঘর্ষণ মতে এই বি ডিও অবলিগ ডেপুটি তক্‌কো চাকরির মোট সময়কাল হিসেব করলে কম হয়। এখনও চাকরি আছে কম করে বছর নয়। ফলে কাজে উৎসাহ আর সহিষ্ণুতা দুটোই বাড়তি। এমনিতে বরাবরের সৎ অফিসার হিসেবে সুনাম আছে। জমি দপ্তরের জনগণের কুলে তিনি তিলক সমান। তবে স্বভাবের মধ্যে দোষ যেটি সেটি অফিসের স্টাফের গুজগুজ ফুসফুসে—বারেন্দ্র বামুন তো এমন রগচটা হয় না। কথায় কথায় আগুন দপ্। এই রাম তো এই রাবণ। ধাত সঠিক বোঝা একটু মুশকিল।

তবে বাসুদেবের সঙ্গে বি ডি ও সাহেবের সম্পর্কটি অনেকটাই মধুর এবং বন্ধুতার। তার প্রথম কারণ হল ওই সততা। তবে এই সততা বা সরকারি খাতায় কবে সাহেবরা চলে গেলেও ইন্টিগ্রিটিও মাঝে মাঝে এমন কড়া ধাতে পৌঁছে যায় যে অফিসে চেয়ারে বসে প্রকাশ্যে বেঁটে বেঁটে কলেজ-বিড়ি খান। তা নিয়ে আড়ালে সিগারেটখোর অধস্তন মহলে হাসি পরিহাস আর বেশি সতীপনা। সততা বুঝি কারও কারও বাই হয়ে দাঁড়ায় এক এক সময়। তাই বাগচি সাহেব ব্লকে কাজ-করতে-আসা কন্ট্রাকটর দেখলেই সন্দ করেন, বেটা চোর। কিংবা— এই বুঝি ঘুষ দিল। এই ব্লকে আসার প্রথম দিকে একবার এক কনন্ট্রাকটর এক প্যাকেট পাঁচশো পঞ্চান্ন মার্কা সিগারেট টেবিলে রেখে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে এসেছিল। ফলং— তার ব্লকে কাজ পাওয়ার ভবিষ্যৎটি একেবারে ঝরঝরে। এই বাতিকের আর এক দফা হল এস এ ই-দের সর্বদাই বক্রচোখে দেখা। ক্যাশিয়ার হেড ক্লার্ককে সর্বদা তটস্থ রাখা। ক্যাশিয়ার কোনও ভাউচার আনলেই পাসড্ ফর পেমেন্ট অর্ডার তখনই না করে— ওগুলো টেবিলে রেখে যান। রিলিফ ইনসপেকটরকে দেখলেই মনে হয় —স্টকটা ঠিকঠাক বলছে তো!

আজ কদিনের বন্যায় বাগচি সাহেবের বারংবার অনুশোচনা হয়েছে, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে। একে মোটা দেহ তার ওপর টানা কদিন ধরে অহোরাত্র জাগরণ ও পরিশ্রম। তাও এক জায়গায় বসে নয়। কভু হেথা কভু হোথা। চেয়ার থেকে জিপে, জিপ থেকে নৌকোয় কিংবা জলে। জল থেকে ডাঙায়। আবার জলে। চতুর্দিকে বন্যাতাড়িত দাও দাও। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, কেরোসিন দাও, ওষুধ দাও। এত দাও, আর দাও শুনে শুনে কমলকুমারের মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এবার বুঝি শুধু প্রাণটুকুই দেওয়া বাকি। কিন্তু এই বিরক্তি-ভাবনার আড়ালে একটি জীবন্ত সত্য ভাবনাও মনে মনে উস্‌কে উঠেছে। সেই চিন্তার স্রোতখানি ভারি পুরনো একটি লক্ষ্মীর ঝাঁপি হয়ে কুলুঙ্গির খোপে রাখা। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান এই বাদলা আকাশের নিচ দিয়ে ছোঁ দিয়ে উঠে যাচ্ছে, ফ্যান দাও, প্রাণ দাও—ফ্যান দাও, প্রাণ দাও। লক্ষ্মীর কড়িগুলো উড়ে যাচ্ছে।

একটি লোক এসেছিল কাল রাতে। মাঝের চর এলাকায় তার ইঁট ভাটা আছে। এ বাদেরও আছে দুই চার নম্বরি ব্যাবসা। প্রথমে চেনা যায়নি। পরে নাম শুনে মনে মনে নড়ে বসা গেল। এই অমর সিং লোকটির ইঁটভাটা জে এল কারও ব্যবস্থায় ইনসপেকশন করতে গিয়ে সঙ্গে থাকা তহশীলদার বিনোদ রায় বুঝি একটু নিচু গলায় সিংজিকে বলেছিল, সাহেব আবার

বাইরে কিছু খান না। তৎক্ষণাৎ অমর সিং জবাব দিয়েছিল। সাহেবকে খিলাতে জানলে ঠিকই খাবেন।

মাথাটা অমনি টন্ করে উঠেছিল। কিন্তু যেহেতু কথাটা সিং সামনাসামনি বলেনি তাই কোনও উত্তর দেওয়া যায়নি। তাঁটায় যথারীতি জলস্পর্শ করেননি বাগচি সাহেব।

রাত্রে অফিস থেকে ফিরে— যেহেতু তখনও বিয়ে হয়নি— মা এসে একটা বৃহৎ মিস্টির প্যাকেট সামনে রাখল ওপরে জবা ফুল সিঁদুর। কী ব্যাপার, না একজন গোঁফওয়ালা মোটা মতন লোক গাড়ি করে এসে এসে এটা দিয়ে বলে গেছে-কালী মাতার পরসাদি।

মায়ের ছেলে তথা তখনকার জেলের আর.ও সাহেব যাবতীয় বিবরণ উপলব্ধি করে ফেললেন তখনই। মাথার ভেতরে ঝল্‌সে উঠল, সাহাবকে খিলাতে জানলে ঠিকই খাবেন।

বেশ রাতে সে যখন একটি বন্যা-শিবিরে জিলিপি বিতরণ করছিল লোক-লস্কর-সহ তখনই দেখা। বয়েস হয়ে গেছে বেশ। গোঁফ পেকে ঝুলছে। শরীর থেকে অনেক মেদ কমে গেছে। বাগচি আগে চিনতে পারেননি। সেই সামনে এগিয়ে এসে বলল, নমস্‌কার সার। আপনার সাথে ঘুরে ফিরে আবার মুলাকাত হল। আমি অমর সিং আছি।

বাগচি সাহেব অবাক। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো দিনের ছবিগুলো কচুরিপানা সরিয়ে জেগে উঠল।

— কি ব্যাপার। আপনি।

দুহাত জোড় করে সিং বলে, জি সাব, আখুনো জিন্দা আছি।

— হুঁ, কেন থাকবেন না। কিন্তু এদের জিলিপি খাওয়াচ্ছেন শুধু!

— আউর কী দিতে হবে ফরমায়েস করেন হুজুর।

— বেশ, যা বলছি তা যদি দিতে পারেন তাহলে আসার খুব উপকার হয়।

— হুকুম করুন সার।

—বাচ্চাদের খাবার দুধের খুব অভাব। কিছু মিল্ক পাউডার দিতে পারবেন?

এই সময়টা সত্যিই খুব অভাব মিল্ক পাউডারের। সরকারি সাপ্লাই প্রায় নেই বলা ভালো। অমর সিং কিছু না বলে চলে গেল।

দুপুরের দিকে খবর এল গ্রাম কাঁচরাপাড়ার দিকে কয়েকটি এলাকায় ত্রাণের খাবার লুঠ হয়েছে। লুঠ করেছে বানভাসিরাই। ঠিক তখনই একটা ভালো খবর এল। অমর সিং কলকাতার বড়বাজার ঘুঁড়ে এক ট্রাক মিল্ক পাউডার পাঠিয়েছে। বাগচি মনে ভাবলেন, এতদিন পর বুঝি ঠিক লোকের কাছ থেকে দরকারি জিনিসটা চেয়ে নেওয়া গেল।

বন্যার সময় সভাপতি মাঠ আগলাচ্ছেন আর বিডিও সাহেব অফিস-ব্যাপারটা এমন নয়। যখন যা সামলাবার দরকার তা দুজনকেই সারতে হচ্ছে। তবে বাগচি এটা ভালো বুঝে গেছেন যে, বাইরের দুর্যোগময় কাজে তাঁর চেয়ে বাসু মোড়ল বিস্তর এগিয়ে। উল্টো দিকে অফিসের কুটকচাল, গর্ভমেন্ট অর্ডার, অ্যালটমেন্ট, স্টক ইত্যাদির ফিরিস্তি তো পঞ্চায়েতে নতুন-নাম মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু—এত সব কিছু সামলেও বাইরে এই যে বিপুল ত্রাণকার্য চলেছে তার সমস্ত দায়িত্বটাই তো বি ডি ও র। ফলে, সব ঠিকঠাক সম্ভব হচ্ছে কি না, কোথাও কোনও ঘাটতি হচ্ছে কি না সে-নিয়ে দিনরাত তদারকি, দৌড়ঝাঁপ। সব মিলিয়ে এ কদিন পর আজ মনে হচ্ছে, শরীর বলে কোনও পদার্থ নেই আর। কিন্তু সে বললে কি পার

পাওয়া যাবে!

চেয়ারে বসে মাঝরাতের দিকে একটু ঝিমুনি এসেছিল। ঝিমোতে ঝিমোতে কখন যে ঘুম এসে গেছে, খেয়াল নেই। এমনকি একজন ডিপ টিউবেল অপারেটর ত্রাণ বিষয়ে কথা বলার জন্যে কয়েকবার নিচু ডাকাডাকি করার পরেও নয়। সারাদিনের বিরামের পর রাতের দিকে আবার বৃষ্টি এসেছে আকাশ ঝাঁপিয়ে। চেয়ারের পেছনে আর টি সেট নাগাড়ে সোঁ সোঁ আর হরেক খবর চালাচলি করে চলেছে। বাইরের ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টির সঙ্গে বেতার যন্ত্রের দরকষাকষি— ক্লান্ত শরীরকে ঘুমের লোভে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। সেইসঙ্গে আলাদা জানান দিয়ে যায় বাইরে রাস্তা বরাবর থেকে থেকে গড়িয়ে যাওয়া ট্রাক কিম্বা ক্বচিৎ মোটর। আর মনে মনে সিমুরালির গঙ্গার ধারে হঠাৎ হঠাৎ পাড় ভাঙা গর্জন। অতর্কিতে চালাঘর, মেটে বাড়ি জলে নেমে যাওয়া। তার আগেই বুঝি মানুষজন টের পেয়ে ঘর ছেড়ে ভাঙা খাঁ খাঁ সংসার ফেলে রেখে কোনও ত্রাণ শিবিরে উঠে গেছে। সঙ্গে গেছে পোঁটলা বোঁচকা। হাট খোলা ঘরে পড়ে আছে একটি ভাঙা লাটাই, বাতিল চুপড়ি, পোড়া কালো হাঁড়ি, একটি ছেঁড়া বস্তা, চিরুনিতে লেগে-থাকা একগোছা চুল। আধখানা আয়নার পেছনে খামচা খামচা পারদ-চটা। বহু দূরে হাইস্কুল বাড়ির দোতলার ত্রাণশিবিরে ঢালাও বারান্দার এক কোণে কাঁথা-কুণ্ডলি ন্যাতা জোবড়া, জানলার সঙ্গে দড়ি খাটিয়ে মেটে হাঁড়ি দুলছে, মশারির খুঁটে রাজ্যের ঝুল, দুখানি ইঁট দিয়ে কাঠের উনুনে ভাত টগবগ, কোলের ছ্যানাটা মায়ের মাই চক চকাত্-চক চকাত্, তার ওপরেরটি খাবো খাবো নাকি কান্না ধরেছে। বড় পুত্রটি অদূরে একটু এড়িয়ে অন্ধকারে বসে বিড়ি টানছে। তার পাশাপাশি আর একটি আর্ত পরিবার। সেখানে দুই বুড়ো-বুড়ি। বুড়ি বলছে এই কদিন আর রান্না-বান্নার পাট নেই। বুড়ো বলছে, বহুকাল সুক্তো খাইনি। আজ একটু সজনে ডাঁটা দিয়ে সুক্তো খাবো। কে জানে, বোধ হয় ছেলে-পুলে নেই বুড়ো-বুড়ির জীবনে চড়ুইভাতি ঘটেনি। তাই এখানে এসে এই বাহানা। এদের থেকে তফাতে, স্কুল-বারান্দার একবারে শেষে, ভারি অন্ধকার। অন্ধকার এমনই যে বাইরের জোলো আকাশের এক চিলতে যেন ওখানে আঁকা হয়ে বসে আছে। আকাশের তারারা সেই যে কবে ডুব দিয়ে বসেছে তার খবর রাখবার কে বা আছে এখন। তবু এখানে এই দুজন—দু-গ্রামের দুই যুবক যুবতী। যুবকটি কৃষ্ণদেববাটির বলরাম শিকারি। যুবতী চাঁদুরিয়ার সন্ধ্যা। তারা এই বন্যাত্রাণ শিবিরে এসে পড়েছে দুধার থেকে। তাদের বাবা-মা-ভাই-বোনেরা এই স্কুলবাড়ির একতলায় জায়গা নিয়েছে। সেখান থেকেই চোখে চোখে কথা, সম্ভাষণ। আস্তে আস্তে দু-এক কথা। হাসি। এই করতে করতে তিনদিন গিয়ে চারদিন। চারদিনের দিন সন্ধ্যায় এই দোতলায় বারান্দায় একধারে।

বলরাম কথা বলে, তাহলে তোমার বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে।

—বাড়ি নয়, ঘর।

—ঐ হল। যা বাহান্ন তাই তিপান্ন।

— হুঁ, তোমার বাবা পেরাইমারি ইস্কুল মাস্টার। তোমাদের একতলা হলেও পাকা দালান। আর আমার তো বাবাই নেই। মা ব্লক হাসপাতালে দাই-এর কাজ করে।

—চাকরি তো করে। রিটায়ার করলে না হয় টাকা-পয়সা পেলে পাকা বাড়ি হবে।

—আমার পাকা ঘরের শখ নেই। মাথা গুঁজে থাকতে পারলেই হল।

— তা হলে পাকা ঘর কাঁচা ঘরের কথা পাড়ছ কেন?

সন্ধ্যা হাসে, এই বললাম আর কী। কিছু একটা তো বলতে হয়।

—তাহলে ঘর-বাড়ি ছেড়ে এবার অন্য কিছু বলো না।

সন্ধ্যা আবার হাসে। বেশ ছড়িয়ে ছড়িয়ে হাসে। তারপর বলে ওঠে, বললে তুমি তো আবার রাগ করবে।

— কেন, রাগ করব কেন!

—তাহলে বলি। তুমি এত ঘড়ি ঘড়ি বিড়ি খাচ্ছো কেন?

বলরাম চোখ বড়ো বড়ো করে তাকায়, ওমা, বিড়ি খেলে কী হয়?

— কী হয় জানি না। তবে কিনা বিচ্ছিরি একটা গন্ধ হয়।

— তাহলে তো খুব বিপদ হল। বিড়ির বদলে সিগারেট— সে পয়সা তো রোজগার করি না। সামান্য একটা মুদি-দোকানে হেলপারের কাজ করি।

— কী পার?

— হেলপার। মানে যোগাড়ে। দোকানি বসে বসে ফর্দ করে। আমি মাল ওজন করি। খরিদ্দারের থলেতে ভরে দিই।

— তাই বলে বিড়ি খাবে!

— তাহলে কী খাবো বলো।

— কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।

বলরাম এবার সরে বসে সন্ধ্যার কাছাকাছি। কিছুটা হেলে পড়ে তার দিকে। তারপর খানিক নামো গলায় বলে, তাহলে তো খালি অন্য একটা জিনিস খেতে ইচ্ছে করবে।

সন্ধ্যার বুঝি আর পাঁচটা মেয়ের মতনই সমান গন্ধ বোঝার ক্ষমতা। সে অমনি সরে যায়। সরে যায় কিন্তু একেবারে দূরেও চলে যায় না।

বলরাম দেখে রোগা মেয়েটির দেহের শাঁস এই অস্পষ্ট অন্ধকারে কী যে অদ্ভুত। রোগা রোগা হাত দুখানিতে কাঁচের চুড়ির শোভা লাল সবুজ না কালো এই অন্ধকারে বোঝা যায় না। হাতের গোছ যেখানে শুরু সেইখানটিতে শাঁসের ভাবটিতে কী রকম ধার এসেছে। কচি ধানের একট আঁটির গোড়ায় হলদেটে রঙ-ধরা ভাব। তারপর ফিকে ফিকে সবুজ। তারপর কোনখানটিতে যে ওইরকম সবুজ আস্তে আস্তে গাঢ়তার দিকে চলে গেছে—অনেকটা গরুর টানা টানা গাভীর চোখের ধাঁচে। হাতের ওপর এলাকার পর থেকে কাঁধের পত্তন। শস্তা লাল রঙা ব্লাউজের খাঁজে একজোড়া হাত-সেলাই। বুঝি দাইমার ফাঁকা হাতের কাজ। অথচ এই বলরাম যে কিনা ক্লাস টেন তক পড়ে স্কুলমাস্টার বাবার আর দুটি ছেলের মতন টুকটাক লেখা পড়া শিখে টুকটাক চাকরিদার নয়, ফলে সর্বদাই বাবার একটুখানি যেন নিচু নজরে, সে কিনা এখানে বানে ভেসে এসে এক আনকা মেয়ের নেক নজরে পড়ল— এমনও আশ্চর্যও ঘটে এ সংসারে। বলরামের এই ক্ষুদ্র জীবনে তো এ এক না চাওয়া জল, অথচ তেষ্টা পেল কি না সে কথা এর আগে কখনও জানা হয়নি, এখন দেখছি মনে হচ্ছে কোনও কোনও তেষ্টা খুবই চাপা থাকে অনেককাল। তারপর একদিন জানতে পারা যায় আচমকা, এ যে একেবারে বুক যাই যাই তেষ্টা।

তখন সামনে উজিয়ে আসা জল দেখলে যে কেবলই খেতে মন চায়। খাওয়া না পান

করা তাই বা কে বলতে পারে। বিড়ি খাওয়ার রকমটি যদি ধুমপান হয় তা হলে জল খাওয়ার রকমটি কেমন করে সেই একই ধারা। ধুমপানে বুক খারাপ হয়, কিন্তু নেশা মেটে। জল পানে শুকনো বুকে রস নামে, ধড়ে প্রাণ নামে।

এ-পর্যন্ত এসে বলরাম টের ক্লাস টেন তক্‌কো পড়ে মিছে এত সব কচকচানি। সব জিনিস কি সবাইকে মানায়! তারচেয়ে যেটা ইচ্ছে করছে সেটা মিটিয়ে ফেললেই বরং ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু তার কি আর যো আছে। বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে একজন খকর্ খক্ খকর খক্ উঠে আসছে। অতএব তাড়াতাড়ি এখান থেকে দুজনারই সরে যেতে হয়।

চেয়ারে বসে ঝিমুনির সঙ্গে ফাঁকে এতাদৃশ বাস্তবতার যে কোনও মানে হয় না তা টের পাওয়া যায় বাস্তবে— সামনের চেয়ার টেনে বসার শব্দে।

চোখ মেলতেই চেয়ারে বসি বসি ভাব জেলাশাসক স্বয়ং—শ্রীমতী রমা সেন। প্রথমেই চোখ যায় বিয়ে থা সারা আধুনিক ফর্সা সিঁথিতে। আর তার পরে পরেই ঠিক তাঁর পেছনের চেয়ারের মাথা ধরে দণ্ডায়মান সিভিল পোশাকধারী এস পি সাহেব। এই এস পি টি উত্তর প্রদেশী ব্রাহ্মণ আর সুপুরুষ। জেলাশাসক, যিনি স্যারের বদলে ম্যাডাম শুনলে তেলে বেগুনে হন তাঁর সঙ্গে এই অবিবাহিত এস পি সাহেবটির সম্পর্ক নিয়ে জেলায় কিছু গুজ-গুজ, ফুসফাস আছে।

— কী খবর বাগচি, শরীর খারাপ নাকি?

ডি এম-এর প্রশ্ন শুনে কমলকুমার প্রথমে কী বলি কী বলি, পরে — হ্যাঁ স্যার, না স্যার— না মানে একটু চোখ লেগে — জাতীয় কথা।

এস পি বসতে বসতে বলেন, বি ডিও সাহেবের উপর এখুন বহুত রেসপনসিবিলিটি। বহুত কাম—

ডি এম তেরছা হাসেন, আপনি একটু শেয়ার করুন না দেখি।

কমলকুমার হন্তদন্ত বেল টেপেন। বেশ খানিক পর নিশাচর নাইট গার্ড আর হেড ক্লার্ক আগু-পিছু ঘরে ঢোকেন। নাইটগার্ডের হাতে জ্বলন্ত টর্চ। সেটি বুঝি সে উত্তেজনায় নেবাতে ভুলে গেছে।

ডি এম কথা বলেন, তাহলে বাগচি, নতুন কোনো ক্যাজুয়ালটির তো খবর নেই!

কমলকুমার সাত তাড়াতাড়ি টেবিলের ফাইল থেকে রেডিমেট স্টেটমেন্টখানা তুলে গড়গড়াতে থাকেন।

ডি এম একটি হাত তুলে নিরস্ত নয় বরাভয় মুদ্রা আঁকেন।—থাক্ থাক্। এবার আপনার স্টক পজিশনটা শুনি। অত কাগজটাগজ দেখতে হবে না। মোটামুটি কী দরকার। তবে মিল্ক পাউডার পারবো না।

কমলকুমার এক গাল হাসির ক্লান্তি ভেঙে বলেন, দুধ—মানে ড্রাই দুধ খানিকটা ম্যানেজ করেছি।

— ম্যানেজ! বাঃ!

এই বলে তিনি আশ্চর্য এক চক্ষু টেপেন ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে-বসা এস পির দিকে।

— স্যার, একটু চা—

ডি এম মাথা নাড়েন, ভাত খেয়ে বেরিয়েছি।

এই একটি মাত্র কথাতেই ডি এম-এর মা জননী ভাব অথবা মেয়েত্ব ঠেলে বেরোয়। পেছন থেকে হেড ক্লার্ক সুযোগ ছিনিয়ে নেন, হিটারে জল গরম আছে স্যার। এক মিনিট—

ডি এম সে-কথায় কান না দিয়ে বলে ওঠেন, আপনার সভাপতি তো বেশ করিৎকর্মা লোক মানে, বেশ খাটিয়ে। পোড়খাওয়া আর কী।

—হ্যাঁ ম্যা— মানে স্যার, খুবই হেল্পফুল। কে বলবে, নতুন পঞ্চায়েত করছেন। কিছু বলতে হয় না। মানে রিলিফের ব্যাপারে। নিজের লোকজন নিয়ে বেশ—

ডি এম উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, আর কী কী জিনিসের স্কেয়ারসিটি আছে?

বাগচি উঠে দাঁড়ান। ফাঁকা জলের গ্লাসটা কাত হয়।— কিছু টারপোলিন স্যার।

—কত?

— শত-তিনেক হলেই এখন চলে যাবে।

এস পি আর ডি এম ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে নিচু গলায় বলাবলি করেন। পেছনে— একটু তফাৎ রেখে বাগচি অনুসরণ করসে-করতে হেড ক্লার্কের দিকে ভ্রূকুটি করেন। কারণটা যে চা না দিয়ে গরম জলের গল্প— সেটা বোঝা যায়।

জিপের ধারালো আলোয় ব্লক এলাকার নিকষ অন্ধকার গলে যেতে থাকে। অকারণ বিচলিত কে কে বাগচি সেই ধাঁধার মাঝখানে গুটি কয় জোনাকি দেখেন। হেডক্লার্কের চোখে ভাবী ধমকের হতাশা উসকে ওঠে। তিনি হাত জোড় করে বলে ওঠেন, এক পেয়ালা চা খেয়ে গেলে ভালো লাগত ম্যাডাম।

তাঁর এই শেষ নিবেদনের ফাঁকেই জিপ গর্জে ওঠে।

মাঝরাত-পেরনো অন্ধকারের ঢালের মধ্যিখানে ঠিক যে কতজন মানুষ প্রায় এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে তা খেয়াল করা খুবই কঠিন। তবু বাসুদেব আন্দাজে বুঝলেন জনা পনেরো তো হবেই। সান্যাল চরের দিকে মস্ত একজোড়া তাল গাছ সাক্ষী করে, তাদের একটিতে নৌকো ঠেক্‌নো দিয়ে। এবার সহ সভাপতির বদলে খোদ বি ডিও সাহেব। বাগচি সাহেব বাসুদেবের কানের কাছে মুখ এনে ঝিমঝিমন্ত গলায় বলে ওঠেন, ডাকাত নয় তো!

বাসুদেব অন্ধকারে দাড়িআর পোক্ত দাঁতের ঝিলিমিলি দুলিয়ে হাসেন, না বি ডি ও সায়েব। ডাকাত এক কোমর জলে ডাঁড়িয়ে কী করবে।

— তাহলে?

—ওরা যে যার সম্পত্তি আগলাচ্ছে।

—সম্পত্তি!

ওরা সব যে যার ডুবো ঘর পাহারা দিচ্ছে।

— ডোবা ঘরে কী সম্পত্তি থাকবে শুনি!

— তোরঙ্গটা। তক্তপোশখানা। এই রকম সব আর কী। এখানকার লোকগুলো তো সব জনমজুর খাটা।

মাহাতো লগি চেপে ধরে তালগাছের সঙ্গে। নৌকোর ধারের কাঠখানি তাল গাছের শুকনো শরীরে ডগ ডগ করে। রাতের এই চুপিসাড়ের মাঝখানে সেই পুরু অথচ নিচু শব্দটি অনেকটা গর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। বি ডিও সাহেবের হাতে ধরা টর্চ চোখ চেয়ে তাকায়।

তখনি সেই জনা পনেরোর কোমরসমান জলে হঠাৎ চৌকিদারি পড়ে যায়। যে যার মুখে-হাত আড়াল দিতে চেষ্টা করে যেমন তেমন একহাতে । একটিই হাত জলের বুকে আগে পিছে কিঞ্চিৎ ঝিনন্ তরঙ্গ বাজিয়ে কী এক অদ্ভুত ঠার তৈরি করে বসে। বাসুদেবের মতন পাঁচনবাড়ি মানুষের কাছেও এই তরঙ্গটি আগুন পিছু কখন ও কই মাছের ঝাঁকি লাফ কখনও আবার এক গুছি কাঁচের চুড়ির পাঁয়তাড়া ভেঁজে বসে।

বি ডি ও হাঁক দেন, উঠে এসো। চুপ চাপ নৌকোয় উঠে এসো।

কারোর মুখে রা ফোটে না। টর্চ জ্বলে আবার নেবে। আবারও জ্বলে। সেই তালে বেতালে কোমর ডোবা পাহারাদারির সামনে হাত পড়ে হাত ওঠে। দূরে গঙ্গা পারের কোন কারখানায় অসময়ে আনকা ভোঁ পড়ে যায়। কালচে জলের ওপর হেথা হোথা স্থির কচুরিপানার দঙ্গল গা ঠেলাঠেলি করে। বি ডি ও সাহেব টর্চের আলো নাড়েন, এসো, উঠে এসো।

আবারও নিঃসাড়। তবে এবার কচুরিপানাদের বদলে মানুষের শরীরগুলি গা ঠেলাঠেলি করে। টর্চের আলোয় টের পাওয়া যায় সকলেরই হাতে কিছু না কিছু। হাঁড়িটা, বস্তাটা তোলা কাঁধে, ছোটো প্যাঁটরা এই রকম আর কী।

বাসুদেব এবার গলা তোলেন, আরে বাপু, উঠে এসো। শরীর যে হেজে যাবে। জল নেবে গেলে আবার এসো খন।

এবার বুঝি অন্ধকারের মুখে চিড় ধরে। এলোমেলো জনা পনেরো মানুষের যেমন তেমন গাঁতি থেকে ভারি চাপা আর আড়ষ্ট গলায় নিজেদের দু-তিনজনের মধ্যে কী যেন শলা হয়। একের কথা অন্যে শোনে পলকা নিঝুম সতর্কতায়।

একজন কথা বলে, আলোটা নেবাবেন তো। চোখে লাগছে।

কমলকুমার টর্চের আলো লোকটির মুখের পাশে রাখেন। সে তখনি চোখে আড়াল দেয়। তার গলার কাছে লটকে-থাকা চৌকোনো তাবিজটা ঝকঝক করে। টর্চের তেরছা আলোর পাশে সেই ধাতুর টুকরোখানি আগ বাড়িয়ে কথা বলতে চায়।

দ্বিতীয় জন কয়েকজনাকে টপকে ওপাশ থেকে বলে, আজ নাগাড়ে ক-দিন জলে ডাঁড়িয়ে যদি শরীল না হেজে যায় থালে আর দু দিনে কিছু হবে না বাবু।

বাসুদেব বলে ওঠেন, তুমি কি আকাশের ধাত গুনতে জানো বাপু। কী করে বললে এই কথাটা!

—এমনি বললুম কত্তা। বলে দিলুম আরকী।

ওধার থেকে তাবিজধারী বলে, আমরা আজ নাগাড়ে কদিন জলে থেকে একটু আধটু ধাত বুঝে গেছি বৈকী।

কমলকুমারের গলায় অধৈর্য স্বভাব ভেঙে পড়ে, হয়েছে, হয়েছে, অনেক বক্তৃতা হয়েছে। এবার উঠে এসো দেখি এক-এক করে।

আবার চুপচাপ। আবার সকলের মুখে কুলুপ। অন্ধকার জলের বুকে বি ডি ও সাহেবের হাতে ধরা টর্চের আলোর ঘোরাঘুরি। নিকষ আকাশের থম্-ধরা বুকে হঠাৎ হঠাৎ আলোর চিড়িক। কালো আকাশে ঢালের দিকে লালচে আভাস—অনেকটা ওই লোকটির বুকের কাছে লেপটে-থাকা তাবিজটির মতন। সেই লোকটিই কথা বলে, কী বলি বলুন দিকি বাপু। আমরা আমাদের মতোই তো আছি। কারুর অসুবিধে তো করিনি।

—সুবিধে-অসুবিধের কথা হচ্ছে না। তোমরা উঠে আসবে কি না বলো।

—এটা একটু জুলুম হচ্ছে না বাবু!

— জুলুম!

— তা নয় তো কী।

এক বুড়ো মানুষ জলের বুক আর কোমর ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। রোগা সোগা মানুষটির পলকা শরীরের ঠেলায় জলে সামান্য ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউয়ের নিচু দোলায় নৌকো ছলছলিয়ে ওঠে। বুড়ো মানুষ বলে, মাজ্জনা করবেন আজ্ঞে। ছেলেমানুষদের কথা মনে নেবেন না যেন।

বাসুদেব বলেন, তুমি আবার কী বলতে এলে কত্তা!

বুড়ো জলের ভেতর থেকেই জোড়হস্ত হয়। আকাশের ঢাল বরাবর বিছিয়ে-থাকা লালচে আলো তার চোখের ভেতরে জড়ো হয়।

—আমি কী আর নতুন কথা বলি বাবা। সে কথা তো আপনারাও হজম করে বসে আছেন।

— কী রকম?

বুড়ো ঢোঁক গেলে, আজ্ঞে কথাটা হচ্ছে মায়া। ভারি মায়া আজ্ঞে। বানে তো সব ভেসে যায় না। ঘর ভাঙলেও বাঁশের খোঁটা, ডেও ঢাকনা, তারপর ধরুন গিয়ে তেলের শিশিটাও যে পড়ে থাকে। বাকসো প্যাঁটরার মধ্যেকার জিনিসপত্তরগুলো তো অক্ষয় থাকে।

— তোমাদের ঘরের বৌ মেয়ে, ছেলেপুলেদের কী হল!

— আজ্ঞে তারা তো আপনাদের দয়াতে সুবিধেমতো ডাঙাতেই আছে বলে জানি। আমরা— এই বেটামানুষরা কেবল এই জল আগলে পড়ে আছি।

— জল আগলে!

— আজ্ঞে নাগাড়ে জলে থেকে থেকে ভিটেটিও জল হয়ে গেছে।

— এই জলে ভিটে কোথায়!

— আজ্ঞে ডুবে ভিটে। যা আছে তাই বা কী কম বাবা। আছে তো। জল নেমে গেলে কঙ্কালগুলো তো উঠে আসবে।

—ততক্ষণ-মানে যতক্ষণ না উঠে আসে ততক্ষণের জন্যে তো উঠে এসো।

— ওই যে বললাম বাবা মায়া। মায়া সে এমনিই জিনিস যে একেবারে কয়েদ করে বেঁধে রাখে। ছাড়ান পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই যে।

কমলকুমারের অধৈর্য স্বভাব আরও এক ধাপ চড়ে। এই রাতদুপুরে এ সব কেত্তন আর ভাল্লাগে না। অনেক হয়েছে। এবার উঠে এসো।

বুড়োর লালচে আলো-মাখানো অন্ধকার আবছা চোখে নৌকোর গায়ে-লাগা ঢেউয়ের ছল ছলাৎ দুলে ওঠে। সে একবার মুখ নিচু করে নিজের কোমর-ছোঁয়া স্থির জলের দিকে দেখে।

—এটাকে কেত্তন বললেন বাবু! আর কোনো বাক্যি খুঁজে পেলেন না!

— কেন, কেত্তন কি খারাপ কথা!

— সে কথা বলি কেমন করে বাবা। আমাদের ঘাড়ে তো একটিই মাথা আছে।

বাসুদেব সামনে ঝুঁকে পড়ে বলেন, আরে বাপু, খোমোখা তক্কো করছ কেন! এই বানের জলে কত সাপখোপ থাকতে পারে সে কথা জানো কি?

বানের সময় সাপ তো ডাঙাতেই ওঠে বাবা। সেদিক দিয়ে আমাদের চেয়ে তো বিপদে আছেন আপনারাই।

কমলকুমার স্বগতোক্তি করেন, মহা ঘোড়েল লোক তো!

বুড়ো বলে যায়, মানুষের মায়া এমনিই বস্তু যে সাপও তাকে তফাৎ রেখে পালায়। কিন্তু মানুষ পালিয়ে যায় না। কী জানি, যদি পড়ে-থাকা পাখির খাঁচাটিও মেলে। যদি মেলে তোরঙ্গে-রাখা বিয়ের সময়কার পেতলের যাঁতিটি। কী বাবা বলুন, ভুল বলেছি কি?

নৌকোর মানুষদের মুখে অনেকক্ষণ পর বুঝি এবার কথা থমকে যায়। কিন্তু কেউ কারো মুখ তাকাতাকি করে না। মুখের সামনে ওই সিড়িঙ্গে বৃদ্ধটির মাথা-মুণ্ডু ছাড়া কথকতা আর চারদিকে জলের কালো এই মাঝরাত-পেরনো সময়টির মুখে আঠাকাঠি বুলিয়ে দেয়। কোথা থেকে একঝলক হাওয়া এসে গড়িয়ে যায় জলের ওপর দিয়ে— পাতলা খোলামকুচি ছুঁড়ে ব্যাঙবাজি খেলার মতো। দূর অন্ধকারের লেপা-মোছা দেওয়ালে অন্ধকারেরই আলো আলো ভাব চোখ টেপা টেপি করে। জোনাকির ছররা ঘোরে অগুনতি দেওয়ালগিরি হয়ে। সেই সব আলোরা সেতু বন্ধন হয়ে দপ্ দপ্ আগুনের ভঙ্গী তৈরি করে চলে। কিন্তু সে তো সত্যিকারের আগুন নয় বলেই চোখে আঙুল দিয়ে থাকে থাকে অন্ধকার দেখায়। দেখিয়ে চলে গোটা দেশ এক আকালে পড়েছে। সে আকাল উল্টো মুখে। মানুষের জন্যে মরণ-বাঁচন। এত জলেও যে ভালো নয়। তাই বুঝি তার নাম রোদের আকাল। আর সেই সমস্ত অনাসৃষ্টির এ পারে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলায় সবে-উঠে-আসা পঞ্চায়েতের কাঠামো।

বাসুদেবের মনে মনে ঢাক গুড়গুড় করে। কাঠি পড়ে চামড়ার বুকে। সঙ্গে কাঁই না না-ঝাঁই না না কাঁসিদার। হুঁ, সামনেই তো দুর্গা পুজো। পাঁচজনের কথায় দুর্গতি নাশ করার ফিরিস্তি হলেও এখনকার এই প্রকাণ্ড দুর্গতি সামলাবে কে। বিপাকে-পড়া মানুষ মরণ-কাঠির বাদ্যি শুনতে শুনতে ভুলেও কি টের পাবে এবার বচ্ছরকার দিনে ছেলেপুলেদের গায়ে নতুন জামা কোথা থেকে উঠবে! কোথা থেকে বারোয়ারি তলায় ম্যারাপ বাঁধার যোগাড় হবে, সেই ম্যারাপের বাইরে খোলা মাঠে কেমন করে কদিনের জন্যে মেলার ব্যবস্থা হবে।

বিডিও সাহেব নিচু গলায় বাসুদেবকে বলেন, চলুন ফিরে চলুন। এরা সব জলের মায়ায় পড়েছে।

চমকে ওঠেন বাসুদেব। জলের মায়া। এ যে একেবারে আন্‌কা উল্টো কথা। কোথাকার কথা কোথায় ঠাঁই পেল!

— বেশ বলেছেন বি ডি ও সাহেব। জলের মায়া।

— ওই একটা বললাম আর কী।

—আসলে বুঝি জলই এদের টেনে রেখেছে। হুঁ, একেবারে দু হাত দিয়ে সাপটে টেনে রেখেছে। আর পালাবার পথ নেইকো।

তালগাছের ঠেকনো ছেড়ে নৌকো ভেসে পড়ে ফিরতি মুখে। অন্ধকারের পরাত জিরে বুক জলে মানুষগুলের চোখ ফেটে হাসি ঠেলে আসে। এইমাত্র কী একটা জয় হয়ে গেল। ফলে সামনেই বচ্ছরকার পরবি ঢাক জল ভেদ করে উঠে আসে। ড্যাং ড্যাং ড্যা ড্যাং ড্যাডাং,

ড্যাডাং ড্যাং ড্যাং ড্যা ড্যাডাং। কাঁই না কাঁই না— ঘিস্‌দা ঘিসিং ঘিসদা ঘিসিং।

চারদিক থেকে ধুনোর ধোঁয়া ঠেলে আসে। নারকেল ছোবড়ার সঙ্গে ধুনো গুগগুল পড়ে চোখ জ্বলে। তার মাঝখানে সন্ধিপুজোর পিদিমে ঘিয়ের দোলায় পলতের আগুন দোলে। ছেলেপুলেরা নতুন জামা পরে ফটাস্ ফট্ ক্যাপ বন্দুক খেলে। বেলুনওয়ালা বহুরূপী সেজে সিটি বাজায়। এক-ঝাঁক গ্যাস বেলুন আকাশের দিকে তাগ করে থাকে। এ সব কথা মনে করাও অপরাধ এখন। তবুও এই বুড়ো বাসুদেবের মনে মনে চোখ ঠারার ঘটনাটি কেমন করে লুকোবার আঁদাড় পাবে।

অন্ধকারে নৌকো ভেসে কিংবা ফিরে যায় যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই মুখে। এই ফিরে যাওয়ার কথাটির রাজসাক্ষী হয়ে থাকে আটাত্তরের প্লাবন আর সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পত্তন।

‘বিভাব’ যেখানে পাবেন

পাতিরাম

(কলেজ স্ট্রিট)

ইস্টার্ন বুক এজেন্সি

৮/সি, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি-র কাছে
(কলেজ স্ট্রিট)

সম্পাদকীয় দপ্তর

৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৬৮
দূরভাষ : ৪৭৩ ৩৬০০

বিভাবের পুরনো এবং নতুন সংখ্যা পাবার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করুন

কোন্ বাড়ি কার দেশ

কল্যাণ মজুমদার

১.

আকাশের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে এক বিপুল ভূমিক্ষেত্র। মাঝে-মাঝেই ছোটো টিলা, ছোটো পাহাড়। কোথাও থেকে একটা সুর উঠে আসছে। যেন মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে দূরে। আবার শোনা যায় পাহাড়ি সংগীতের সুর। ডিম ডিম ডিম একটানা। আপন খেয়ালে ডিঙিয়ে যাচ্ছে জমির আল, ছুটে পেরোয় মাঠ। একটা নদী এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে। তার পাড় ধরে হাঁটতে থাকে। নদীর জলে গান বাজে। আহ্বানের মতো। নদীর ওপারে আলোর মায়া, রঙের শোভা। অপরূপ সুন্দর পাখিরা উড়ছে। দিগন্ত ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে একটা হাতি। চলনে তার সম্রাটের গরিমা। ইচ্ছে হয় ওর পিঠে চড়ে খুঁজতে যায় দিগন্তরেখা আসলে কতদূরে। কে যেন বলল, তুমি যাবে? কোথায় যাবে — নদী পেরিয়ে যাবে, নাকি পাহাড়ে উঠবে?

— হাতির পিঠে উঠব। — কথাটা কি উচ্চারণ করেছিল? স্বর তো শোনা যায়নি। তবে কি শুধু ভেবেছিল? তবু তো জবাব এল, নদীর ও-পারে। তোমাকে তো নদী পেরুতেই হবে।

— কী করে পেরুব? কোথাও কোনো নৌকো নেই।

— মানুষ যখন প্রথম নদী পেরোয় তখনও নৌকা ছিল না। তবু পেরিয়েছে। কত নদী পেরুবার পর নৌকা তৈরি করতে শিখেছে মানুষ, কে জানে!

— তখন মান্দাস বানাত। আমি পড়েছি।

— তারও আগে নদীতে ভাসমান গাছপালা ধরে ভাসতে শিখেছে মানুষ। মাছের অনুকরণে সাঁতার শেখার অভ্যাস করেছে। তুমি পারবে না?

মানুষটা কী সুন্দর কথা বলেন! কণ্ঠস্বরে কী স্নিগ্ধ মমতা! অনেকটা উদয়ন মামার মতো। কিন্তু উদয়নমামা নন। অনেক চেষ্টা করেও মুখটা দেখতে পায় না ও।

— এসো, আমার হাত ধরো। — মানুষটা তার দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে দেয়।

ওর একটা দৃশ্য মনে পড়ে। বাবার হাত ধরে হেঁটে চলেছে বালক ঈশ্বরচন্দ্র। পথফলক দেখে-দেখে শিখছে শতকিয়া। ও বাবার হাত ধরার জন্য হাত বাড়ায়।

— বাবাই — ওঠো বাবা। ওঠো —

বলে ছেলের কপালে হাত রাখে প্রণতি।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বাবাই। দু-হাত মুঠো করে দু-চোখ ঘষে। মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেনির্নিমেষ। ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে যায়। মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে জানলার কাছে দাঁড়ায়। চোখের পাতায় পাহাড়ের ঢেউ। দু-একটা বাড়ি। না, এখানে কাছাকাছি কোনো নদী নেই। কখনও কি নদী পেরিয়েছে? ট্রেনে যেতে-যেতে নদী দেখেছে। নৌকায় চড়ে কখনও পেরোয়নি। তবু স্বপ্নের দৃশ্যটা এখনও মাথায় ভাসছে। কে বলেছিল, নৌকা তৈরি শেখার অনেক আগেই মানুষ নদী পেরুতে শিখেছে? কে মানুষটি?

দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে প্রণতি ঢুকে বলল, কীরে, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস! কী হয়েছে?

বাবাই মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। প্রণতি ভোরে উঠে স্নান সেরেছে। স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রায় প্রস্তুত। বাবাইয়ের খুব ইচ্ছে হয় মার বুকে মাথা রাখে কিছুক্ষণ। এখন তার সময় নয়, বাবাই জানে।

— দুধ খেয়ে পড়তে বোস্। আমি বেরুচ্ছি। একটু পরে দিদা জলখাবার দেবে। হোমটাস্ক? সব হয়েছে তো?

— মা —। বাবাই ডাকে।

— কিছু বলবি?

— মা, বাবার কোনো ফোটো নেই তোমার কাছে? স্তম্ভিত প্রণতির শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম। এ কী প্রশ্ন করল বাবাই। কেন করল? কোনোদিনই বাবার বিষয়ে কিছু বলে না। অল্প বয়সেই জেনেছিল পিতৃ-সন্দর্শনের ভাগ্য নিয়ে ও জন্মায়নি। প্রণতির বকের মধ্যে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা শিরশির করে। বলল, না বাবা। যা ছিল সবই তো আগুনে পুড়ে গেছে। কেন রে, বাবার কথা মনে হচ্ছে?

বাবাই বলল, না, স্বপ্নে একজনকে দেখলাম। যেন বাবার মতো। মুখটা বোঝা গেল না। আমি তো বাবার মুখ কখনও দেখিনি। তাই ভাবছিলাম ফোটো থাকলে হয়তো বোঝা যেত।

প্রণতি ছেলের মাথায় হাত রাখে। কাঁধে পিঠে হাত বুলিয়ে উদ্গত অশ্রু চোখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

স্কুলে ক্লাস নিতে-নিতে, ক্লাসের ফাঁকেও, বার বার বাবাইয়ের কথা মনে পড়ছিল প্রণতির। বাবার ছবি চেয়েছিল ছেলেটা। তাও দিতে পারল না। বিয়ের সময় তোলা গোটা-চারেক ফোটো ছিল। সব পুড়ে ছাই। কিন্তু প্রণতি আজ সারাদিন মনে-মনে বিনোদের মুখের ছবি আঁকার চেষ্টা করে। নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য প্রণতি যে, ও তা পারেনি। সময়ের, বিস্মরণের ধূসরতায় কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল না বিনোদের মুখের ছবি। বরং বার বার তার উপর চাপানো ছবির মতো ফুটে ওঠে উদয়নের মুখ। অথচ উদয়নের সঙ্গেও দেখা হয়নি দু-বছরে। কিংবা তারও বেশি। শেষ যে কবে দেখা হয়েছিল মনেও পড়ে না।

ইদানীং প্রণতির খুব মনে হয় বাড়িতে একজন পুরুষ থাকা দরকার। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নয়, বাবাইয়ের জন্য। বয়ঃসন্ধির এই জটিল সময়ে একটি ছেলের কাছে মা-দিদার স্নেহ ছাড়াও পিতৃ-প্রতিমার প্রয়োজন প্রগাঢ়। কেবলই মনে হয়, জীবনের কঠিন পথে চলার উপযুক্ত দিগ্‌দর্শন কি দেওয়া যাচ্ছে বাবাইকে! উদয়নের সঙ্গে ওর একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উদয়ন থাকলে সঠিক পথনির্দেশ ছাড়াও মানসিক নির্ভরতাও পেত নিশ্চয়ই। ছেলের অনুভবে যেমন ভাঙাগড়াই চলুক, মুখে কিছু বলে না। তবে ঘনঘন পবিত্র মেসোর কাছে যাওয়ার মধ্যে পিতৃ-অনুষঙ্গের অকিঞ্চনতা আছে কি না জানা নেই। এভাবে এতটা কখনও ভাবেনি প্রণতি। কিন্তু আজ ছেলে হঠাৎ বাবার কথা বলায় অজস্র জিজ্ঞাসা মাথায় ধানের শিষের মতো দোল খাচ্ছে। বাবাকে স্বপ্নে দেখেছে। কথা বলেছে। তবে কি মনে-মনে বাবার সঙ্গে কথা বলে বাবাই? বাবার অভাব পীড়িত করছে ওকে? জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখে দুঃসহ যে-সময়-সমুদ্র পেরিয়ে চলেছে, সে তো শুধু ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবনাকে অবলম্বন করেই। তবে কি এত চেষ্টা সত্ত্বেও বাবাইয়ের বুকে এক গোপন হাহাকার থেকে গেছে — যার সন্ধানই জানা ছিল না; জানার চেষ্টাও করেনি কখনও! বাবা থাকলে অতিরিক্ত কী করত যা প্রণতি করছে না?

পড়াশোনার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই। খাওয়া-পরার ব্যাপারেও অভিযোগ করা হবে অমূলক। বিলাস নেই, দারিদ্র বা অনটনও অনুপস্থিত। ক্লাসের পড়া ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলার সঙ্গে এই বয়সে যতটা সম্ভব পরিচয় ঘটছে। শুধু খেলার মাঠে বাবাইকে একা যেতে হয়। তাতেও কোনো বাধা নেই। খেলা থেকে ফিরলে প্রণতি ছেলে কেমন খেলেছে, ফলাফল কী হয়েছে জানতে চায়। অবশ্য মা জানতে চাইবার আগেই ছেলে গলগল করে খেলার মাঠের বিশদ কাহিনী শোনায়। অনেক কিছু না-বুঝলেও প্রণতির মনোযোগ অটুট থাকে। দিদা শুধু ভয় পান, চোট আঘাত যেন না লাগে। তবু ফুটবল খেললে আঘাত লাগবেই। প্রণতি সামান্য কারণে বিচলিত হয় না। যমুনাকে বলে, মা, অত পুতুপুতু কোরো না। এসব ধকল ব্যথা যন্ত্রণা সইতে শিখুক। বৃহত্তর জীবনের জন্য এগুলো অনুশীলনমাত্র। তুমিই তো বলতে আছাড় না খেয়ে কেউ হাঁটতে শেখে না।

মুখে বলে বটে, তবে মনের মধ্যে উদ্বেগও খাঁড়ি কাটে। ছেলের ফিরতে দেরি হলে মনে হয় চরাচর জুড়ে আলোর সম্ভাবনাহীন অন্ধকার নেমে আসছে। তারই প্রতিফলন ঘটে ছেলে ফেরার পর তীব্র বকুনিতে। তার পর একলা বসে চোখের জল চাপতে-চাপতে বা মুছতে-মুছতে অন্তর্দাহে দীর্ণ হওয়া। ইদানীং আরও একটা বেদনাবোধ প্রণতির প্রাণের গভীরে, মাঝেমাঝেই, ঘাই মারে। পিতৃহীন ছেলেটিকে মাতৃ-মমতাও কি যথোচিত দিয়েছে? পিছু ফিরে দেখলে মনে হয়, বাবাইয়ের শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণে মার যেন কোনো ভূমিকাই ছিল না। ওইসব বছরগুলো প্রণতির কেটেছে নিজের পড়াশোনা, পরীক্ষা, টিউশনি, চাকরি আর নিজেকে আগলানোর অন্তহীন একা-দোক্কা খেলায়। অথচ ওই সময়গুলোই হতে পারত বর্ণময় স্মৃতির হেমবৈভব, ফুল্লকুসুমিত নীলকণ্ঠ সঞ্চয়। এখানে আসার পর আচমকাই একদিন হঠাৎ লম্বা-হওয়া রোমশ পা লক্ষ করে মনে জিজ্ঞাসা জাগে, কবে এমন বড়ো হয়ে গেল বাবাই? মা যমুনা কি জানেন? বলেননি তো কোনোদিন। অথচ যমুনারই খেয়াল রাখা স্বাভাবিক।

বাবাইয়ের পড়াশোনার শুরু দিদার কাছে। খাওয়া দিদার হাতে। শোওয়া দিদার পাশে। যত আবদার গল্প দিদার সঙ্গে। চার-পাঁচ বছর থেকেই ওর মনের সঙ্গী হয়ে ওঠে উদয়ন। বাকি সময়টা ছিল কানাইদার সঙ্গে খুনসুটি, হুটোপুটির। প্রণতির সঙ্গে কটা কথাই বা হত! সে-সবও হত পড়াশোনা নিয়ে। অথবা শাসন অনুশাসনের ধারাবিবরণী। ছেলের সঙ্গে একা বসে কখনও গল্প করেছে প্রণতি ? কোথাও বেড়াতে গেছে? সিনেমা থিয়েটারে? পুজোমণ্ডপে? না। না। না। না। সব জায়গায় দিদার সঙ্গে গেছে। প্রণতি কখনও সঙ্গে ছিল। অনেক সময়েই থাকত না। এখন ভাবলেই বুকের ভিতরে মরুবায়ু হুহু ছুটে যায়।

আসলে বাবাই বেড়ে উঠছিল একটা চারাগাছের প্রাকৃত স্বভাবে। অবুঝ বায়না করতে শোনেনি। জামা-প্যান্ট, খাবার, খেলনা — কোনো কিছুর জন্যই লোভ-আদ্র খাঁই ছিল না। কখনও কিছু চেয়ে না-পেলেও মা-দিদা যা বুঝিয়েছে, মেনে নিয়েছে। পরে উদয়ন শিখিয়েছে, সবকিছু কেন, অনেক কিছুই জীবনে পাবে না। তার জন্য হা হুতাশ না করে, যা তুমি অর্জন করতে পারো, তার সাধনা করো। প্রত্যেককেই নিজের লক্ষ্যের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়।

প্রণতি বলেছিল এখনই কি বাবাই নিজের লক্ষ্য স্থির করতে পারবে?

উদয়ন উত্তর দিয়েছিল, জীবনের মূল লক্ষ্য এখন অবশ্যই নির্ধারণ করতে পারবে না। এখন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে ছুটবে । স্বপ্নের মতো। কখনও উমরিগড় কখনও প্রদীপ ব্যানার্জি, আবার কখনও হেমন্ত মুখার্জি বা উত্তমকুমার। জীবনানন্দ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়ার কথাও ভাবতে পারে।

— কিংবা উদয়ন সরকার। — ঠোঁট টিপে প্রণতি বলেছিল, আপনাকে যা ভালোবাসে ও!

উদয়ন হেসেছিল, তা হবে না আশা করি। আমার মতো বাউন্ডুলে হলে ওর চলবে না। তোমাদের জন্যই বাবাইকে দায়িত্বশীল মানুষ হতে হবে। আমার বিশ্বাস এটা ও নিজেও বোঝে। আমি তো ওর কথায় আচরণে শান্ত পরিমিতিবোধ দেখে অনেক সময় অবাক হয়ে যাই।

উদয়ন সরকার — মাস্টারমশাই, মানুষটার কথা মনে হলেই প্রণতি বাতাসে দুলে-ওঠা কেতকীর মতো নিজের নিভৃতে নুয়ে যায়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষটা যদি উদার সহায়তার দাক্ষিণ্য শর্তহীন প্রসারিত না করতেন তবে কী করত প্রণতি? বিলাপী বিধবা হয়ে ক্ষয়িষ্ণু জীবনের দাঁড় টেনে যেত? সম্ভবত, না। জীবনের লেলিহান দাবি বাধ্য করত অবলম্বন অনুসন্ধানে। হয়তো বিক্ষত হত আরও বেশি। রক্তঘামের বিসর্জন হত অবধিহীন। হয়তো আপাত-অর্জিত স্থিতধী প্রত্যয়ের দীনতার আঁকিবুকি মিশে থাকত। কিন্তু, তবু, মানুষটা এমন নিঃশব্দে ওদের জীবন থেকে হারিয়ে যাবে, তাও কি কোনো দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল?

আচমকা উদয়নের অন্তর্ধানের রহস্য উন্মোচিত হয়নি। শুধু আগরতলা ছাড়ার আগে পূরবীর কাছ থেকে জানা গেছে উদয়ন কলকাতায় আছে। শৈলেশকে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু কোনো ঠিকানা দেয়নি।

পূরবীর ঘরেই 'উল্টোরথ' পত্রিকায় একটি সুদর্শনা মেয়ের ছবি দেখে মনে পড়েছিল ফোটোর দোকানে একদিন যে-তরুণীর মুখ চেনা লেগেছিল এই ছবি তারই। পূরবী বলেছিল, একে জানো?

— না। প্রণতি বলেছিল।

— এর নাম রঞ্জনা নন্দী। নতুন এসেই খুব নাম করেছে। 'এরই নাম প্রেম' দেখনি? আমি তিন বার দেখেছি। উঃ যা দারুণ দেখতে। এবার উত্তমকুমারের সঙ্গে জোট বাঁধছে।

— আমার ছবি দেখার অভ্যাস নেই। সময় তো হয় না। তবে এ-মেয়েটিকে কেন যেন আমার চেনা-চেনা লাগে। অথচ কোনোদিনই ওকে দেখিনি। ওর সিনেমাও দেখিনি।

—রঞ্জনাও নাকি রিফিউজি। রায়টে মা-বাবাকে হারিয়েছে। অবশ্য এখন তো অঢেল টাকা। ফিল্ম লাইনে তো লাখের কমে কথা বলে না কেউ। কী গ্ল্যামার বল!

প্রণতি বলে, টাকা বা গ্ল্যামার কি মা-বাবা হারানোর যন্ত্রণা মুছে দিতে পারে? পারে ছিন্নমূলের লাঞ্ছনার ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে?

নিজের মনে বার বার প্রশ্ন উঠে আসে আজকাল, ছিন্নমূল মানুষ কি কখনোই স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পায়? সুখে-দুঃখে-সংগ্রামে-সংঘর্ষে বারো বছর কাটাবার পর আগরতলা ছেড়ে অসমে চলে আসতে বাধ্য হবে, ভাবতেও পারেনি। এখানে এসে আবার ঘর গড়ার প্রয়াস। যদিও বাতাসে বিসংবাদের বিষ। ওরা আসার অল্পদিনের মধ্যেই 'বঙাল খেদাও' নামে অসমের নানা জায়গায় বহু বাঙালি, যার বেশির ভাগই উদ্বাস্তু দেশহারা মানুষ, প্রাণ হারিয়েছে। ঘরবাড়ি

জ্বলেছে। প্রাণের মায়ায় অনেক বাঙালি চলে গেছে পশ্চিম বাংলায়। বিহারে। অসমবাসী লক্ষ-লক্ষ বাঙালি নিরাপত্তাবোধের অভাবে সন্ত্রস্ত থেকে দিনাতিপাত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ও বিচলিত বোধ করেছিলেন। রাজ্য থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় সর্বস্তরে, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। ক্রমশ অবস্থা স্বাভাবিক না হলেও শান্ত হয়ে আসে। ভাঙা ঘরে আবার বাঁধা হয় নতুন চালা। শুধু যে-প্রাণ অকালে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার আর পুনর্বাসন হল না।

আগরতলা থেকে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই গড়বেতায় একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে — গৃহদাহ ও গণহত্যার। ছোটো বড়ো মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটতে থাকে অন্যত্রও। আর এইসব সময়ে গুজবের ফলন হয় অবিশ্বাস্যরকম। আতঙ্কিত যমুনাকে পবিত্র বলেছিল, ভয় পাবেন না। আমাদের এই রেলকলোনিতে কিছু হবে না।

প্রণতি বলেছিল, কিন্তু আমার কাজ?

পবিত্র বলে, হবে, হবে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? অবস্থা একটু নর্মাল হোক, তোমাকে ফাদার জোনসের কাছে নিয়ে যাব।

— ততদিন বসে-বসে আপনার ঘাড় ভেঙে খাব?

— ঘাড়ের একটা শক্তি পরীক্ষা হবে, মন্দ কী। একটু নোটিশ যদি দিতে, দেখতে রেড কার্পেটের ব্যবস্থা করতাম।

নোটিশ দেওয়ার উপায় ছিল না প্রণতির। চোখের সামনে বারো বছরের সংগ্রামের মিনার জ্বলে যেতে দেখে বোধবুদ্ধিহারা হওয়াই স্বাভাবিক। জ্ঞানহীন মা আর কিশোর পুত্রকে নিয়ে সে-রাতে আবার ডলিদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। ট্রাঙ্ক সুটকেস অন্য জিনিসপত্র কানাই লোকজন নিয়ে যতটা পারে উদ্ধার করে নিজের ঘরে রাখে। উদ্ধার পেল না নিরাপত্তাবোধ আর স্বাবলম্বনের সাহসিকতা।

পরদিন দগ্ধ ঘরের পোড়া খুঁটি ও কর্দমাক্ত ভগ্নস্তূপে হাতড়াতে থাকা যমুনাকে দেখে প্রণতির মনে হয়েছিল, মার বয়স এক রাতেই কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। চোখের ধার বেয়ে শুধু জল। মুখে শব্দ নেই। হাতের পরিশ্রমী আঙুলে কীসের অন্বেষণ? স্বপ্নবীজ না কি আত্মার অঙ্কুর।

কীভাবে আগুন লেগেছিল সে-রহস্যও জানা যায়নি। পুলিশ প্রথমে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগানোর সম্ভাবনার কথা বললেও পরে সর্ট-সার্কিটের দোহাই দিয়ে কেস-ফাইল বন্ধ করে দেয়। প্রণতির মাথায় একটা প্রবল প্রশ্ন দিনের পর দিন ঋজু হয়ে থাকে।

বহমান জীবনের অনিবার্য তাড়নায় বাসা ভাড়া করতে হয়। যমুনা পুরোনো জায়গাতেই আবার ঘর তোলার জন্য জেদ করেন। কানাই ছোটাছুটি করে পুরসভার অনুমোদনের জন্য। নীরদও ভিতর থেকে চেষ্টা করে।

এরই মধ্যে প্রণতির রেজাল্ট আসে। এম.এ.-তে সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে। উনিশ নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাস অধরা রয়ে গেল। আপসোসে প্রণতি সাফল্যের আনন্দ অনুভব করতে পারল না বিন্দুমাত্রও। উদয়ন নেই শহরে। ছোট্ট ভাড়া বাসায় কোনো উল্লাসের চকমকি জ্বলল না। এবার অন্য কোনো হাইস্কুলে বা কলেজে চাকরির চেষ্টা করার কথা ভাবে। পরামর্শের জন্য শৈলেশের কাছে যাবে ভেবেও সংকোচে পিছিয়ে আসে। শৈলেশের ওখানেই পরিচয়ের দুর্ভাগ্য হয়েছিল অর্ধেন্দুর সঙ্গে। মানুষটা কিছু উপকার অবশ্যই করেছে। অথচ স্মৃতিতে

অবশিষ্ট শুধু বিবমিষা।

মুশকিল হচ্ছে বাবাইকে নিয়ে। আগুনে ওর সব বইপত্র পুড়ে গেছে। অঙ্কের খাতা, কোটেশন বুক, রচনা খাতার সঙ্গে ছিল ওর এক গোপন সঞ্চয়। একটা খাতায় প্রিয় খেলোয়াড়দের ছবি, খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা থেকে কেটে-কেটে এঁটে রাখত। সর্বশেষ লাগিয়েছিল আব্বাস আলি বেগের ছবি। সে-খাতার ছাইও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেইসব দুর্লভ অমূল্য ছবি এখন কোথায় পাবে?

প্রণতি বোঝায়, আমারও কত দামি বই জ্বলে গেছে। কত বই দিয়েছিল মাস্টারমশাই। সব ভস্ম। বাবাই, আবার নতুন করে শুরু কর্।

বাবাই বলে, ওসব ছবি কোথায় পাবো আর?

প্রণতি বলে, নতুন ছবি তো পাবি। যা যায়, তা কখনোই আর পাওয়া যায় না, বাবা। একটা নতুন সকাল দিয়েই আর-একটা দিন শুরু হয়।

কয়েকদিন পর কানাই এসে বলল, দিদি, আমি রায়বাবুর কাজ ছেড়ে দিয়েছি।

এতদিনে রাঘবেন্দ্র রায়ের নাম একবারের জন্যেও উচ্চারণ করেনি প্রণতি। বীভৎস স্মৃতি নিঃশেষে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। বলল কেন?

কানাই বলল, লোকটা ভীষণ দু-নম্বরি। অত বুঝতে পারিনি। তোমাকে যদি কখনও খবর দেয়, যাবে না কিন্তু।

প্রণতি ওর চোখের দিকে চেয়ে কানাইয়ের না-বলা কথা অনুধাবনে সচেষ্ট হয়।

— তুই তাহলে এখন কী করবি?

— আমি একটা মোটর গ্যারেজ খুলেছি, নতুন বাজারের কাছে।

— বাঃ খুব ভালো। অত টাকা পেলি কোথায়?

— কিছু জমিয়েছিলাম। আর আমার পার্টনার কিছু দিয়েছে। দিদি, কাল গ্যারেজে পুজো দেবো। তুমি আর মা বাবাইকে নিয়ে একবার পায়ের ধুলো দেবে।

— আমার তো স্কুল আছে।

— স্কুলের পরে এসো। বিকেলে। আমি এসে নিয়ে যাব।

— ঠিক আছে। মাকে বলে যা।

— বাবাই কোথায়।

— দ্যাখ্ ঘরে— খবরের কাগজের ছবি কাটছে কি না।

পরদিন মা-দিদিকে নেওয়ার জন্য একটা গাড়ি নিয়ে পড়ন্ত বেলায় আসে কানাই। ওর সারা শরীরে খুশির উচ্ছলতা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দিদি বলে ঘরে ঢুকতেই প্রণতি ও যমুনার বিধুর মৌনতা ওকে স্তব্ধবাক করে দেয়। বুঝতে অসুবিধে হয় না ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে।

চেয়ারে বসে আছে প্রণতি। পাশে দাঁড়ানো যমুনার বুকে মাথা। যমুনার করতল মেয়ের মাথা ও মুখে ইতস্তত চলাচল করে। জানালা দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের লালিম আলোকরেখা বর্শার ফলার মতো প্রণতির শাদা শাড়িতে আতত। যমুনার মুখে অন্তর্গত যন্ত্রণার আঁকিবুকি। প্রণতির চোখের কোণে গুকিয়ে-আসা অশ্রুর পলি।

কানাই দু-জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শঙ্কিত স্বরে জানতে চায়, কী হয়েছে?

কেউ উত্তর দেয় না। ঘরের মধ্যে বরফ-শীতল নীরবতা। কানাই আবার বলে — মা —

দিদি —

প্রণতি চোখ তুলে কানাইকে দেখে। 'মা ঠাকরুন, আমি যামু আপনের লগে'— কাতর নিবেদন করা কিশোর নয় আর। এক যুবক পুরুষ। সবল স্বাস্থ্যের সঙ্গে স্বাবলম্বনের আত্মাভিমান ওকে প্রত্যয়ী করে তুলেছে। প্রণতি হাত বাড়িয়ে কানাইয়ের বাম বাহু ধরে। ওর ঠোঁট কাঁপে। গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না।

যমুনা বললেন, তোর দিদির আর চাকরি নাই। স্কুল থেইকা তাড়াইয়া দিছে।

অনেকদিন পর যমুনার মুখে দেশের ভাষা শোনার চমক ছাপিয়ে প্রবল বিস্ময়ে হতচকিত হয় কানাই। নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে নির্গত হয়, নিশ্চয় রায়বাবুর কারসাজি! হারামজাদারে একদিন পালিশ করতেই হবে।

যমুনা বললেন, ক্যামনে বুঝলি?

কানাই বলে, আগে বুঝতাম না। অনেক কথা শুনতাম, অনেক কিছু দেখতাম। ফলে দুয়ে দুয়ে মিলিয়ে বুঝছি, ওই শয়তানই সব উৎপাতের কারণ। ভাইবেন না মা, আমি আছি। আমি থাইকতে আপনাগোর কোনো কষ্ট অইব না।

এই সময়ে বাবাই স্কুল থেকে ফিরে আসে।

প্রণতি বলল, কানাই, তুই বাবাইকে নিয়ে যা তোর গ্যারেজে। আমাদের শুভকামনা তো সব সময় আছেই তোর জন্য।

বাবাই বলল, তোমরা যাবে না?

যমুনা জবাব দেয়, না দাদুভাই, তোমার মা-র শরীরটা ভালো নাই। তুমি ঘুরে এসো।

রাঘবেন্দ্র যে এভাবে আক্রমণ করবে ভাবতে পারেনি প্রণতি। সামান্য অনুমান করতে পারলে হয়তো বিকল্প কিছু চিন্তা করত। বিতাড়নের কারণ জানতে চাইলে হেডমিসট্রেস জানায়, তোমাকে তো অ্যাডহক নিয়োগ করা হয়েছিল। গভর্নিং বডি এই অতিরিক্ত নিয়োগ অনুমোদন করেনি। তা ছাড়া তোমার পারফরমেন্স রিপোর্টেও তাঁরা খুশি নন। তবু ইচ্ছে করলে একবার রাঘবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারো। তিনি প্রেসিডেন্ট — ক্ষমতাধর মানুষ। চাইলে অনেক কিছুই করতে পারেন।

প্রণতি বুঝতে পারে এই সর্বতোভাবে অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া নিছক মূর্খতা। বরং অন্য কোথাও সুযোগ পাবে কি না তাও অনিশ্চিত। এই সব শ্বাপদ মানুষের জন্য সারা শহরটাই মৃগয়াক্ষেত্র। তবু যদি উদয়ন থাকত, কিছু সাহায্য, পরামর্শ, এমনকী হয়তো প্রতিবিধানও পাওয়া যেত। নিরুদ্দিষ্ট উদয়নের কোনো খবরই জানা নেই। অথচ অবিলম্বে রোজগারের ব্যবস্থা চাই।

সুরেনের আসা বা টাকা পাঠানো বন্ধ বহুদিন। গয়নাপত্র যা ছিল তার অনেকটাই ব্যয় করতে হয়েছিল বাড়ি করার সময়। জামাকাপড় সহ গৃহস্থালির সব সম্পদই আগুনের গ্রাসে হৃত। টিনের সুটকেসে থাকা সার্টিফিকেটগুলো আর ব্যাঙ্কের খাতা কানাইয়ের তৎপরতায় রক্ষা পেয়েছিল। নতুন করে সংসার সাজাতেও খরচ কিছু কম হল না। ওই সুটকেসটা উদ্ধার না হলে যে কী হত ভাবলেই চোখে অন্ধকার নামে। বিধ্বস্ত গৃহ-শ্মশান থেকে কতকিছু যে বেহাত হয়েছে তা নিরূপণই করা যায়নি। যা পাওয়া যায়নি তা-ই ছাই হয়েছে বলে মেনে নিতে হয়েছে।

প্রণতি বলল, মা, এখানে আর থাকা যাবে না। চলো অসমে যাই। পবিত্রজামাইবাবু বলেছিলেন, ওখানে কিছু হতে পারে।

যমুনা বললেন, এখানের ঘরবাড়ি —

— বাড়ি আর কোথায়? নতুন করে বাড়ি করার আশা ছাড়ো। জমিটা বেচে দিয়ে চলো।

— ওদের একটা খবর দিবি তো? হট করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

— যাওয়ার ব্যবস্থা করেই চিঠি দেব।

যমুনা বলেন, নিজের দ্যাশ ছাইড়া সর্বস্ব খোয়াইয়া এইখানে বাড়ি করলাম, এখন এখান থেইকাও যাইতে লাগব! অখনই না গিয়া জগদীশরে একবার কই। যদি কিছু করতে পারে।

প্রতিবাদ করে প্রণতি, না মা। মেসোর কাছে আর হাত পাতার দরকার নেই। ঘর পোড়ার পর যখন খোঁজ নিলেন না, তাঁকে আর বিরক্ত করার দরকার কী। তা ছাড়া মা, আমার কাজের দরকার। আশ্রয়ের নয়। এখানে আপাতত আমার কাজ পাওয়ার আশা দেখছি না।

— ওই লোকটার সঙ্গে তোর কী হইছে তাও তো কইলি না? হ্যায় শত্রুতা করতাছে ক্যান?

— সেসব তোমার না-শুনলেও চলবে।

যমুনা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মতো করে বুঝে যান কিছু। মুখের ভাষার মিশ্র গুরুচণ্ডালির মতো মনের অনুভবেও সংশয়ের দোলাচল চলে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বুকে চাপ তৈরি করলেই স্বামী-বাড়ি হারানোর বিপ্রলব্ধ শোক স্মৃতির সৈকতে আছড়ে পড়ে।

কানাই ওদের চলে যাওয়ার কথা শুনে বলল, দিদি, আমার উপর ভরসা রাখতে পারলে না?

প্রণতি বোঝায়, কথাটা ভরসার নয় কানাই। এটা আমাদের জীবনের সমস্যা। জীবিকার প্রশ্ন। বাবাইয়ের ভবিষ্যৎ। তুই নিশ্চয় বুঝেছিস এখানে আমার আর কিছু হওয়ার নয়।

— আমাকে ফেলে চলে যাবে?

— তুই এখন বড়ো হয়েছিস। তোর বউ আছে। নিজের সংসার গড়ে তুলছিস। ব্যাবসা করছিস। ফেলার কথা ওঠে না কানাই। যখন খুশি আমরা যেখানে থাকব চলে আসিস। তুই তো লেখাপড়া শিখেছিস, চিঠি লিখবি।

বাবাই জানতে চেয়েছিল, আমরা কোথায় যাব?

প্রণতি বলে, এক নতুন রাজ্যে।

— সেখানে কেউ আমাদের ঘরে আগুন দেবে না?

ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে প্রণতি বলল, তা কি বলা যায়!

পরবর্তী দৌড়ঝাঁপ কানাইকেই করতে হয়। জমি বিক্রির ব্যবস্থা, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করা, বাসের টিকিট, ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ, পবিত্রকে খবর দেওয়া। কানাই অক্লান্ত। বুকের ব্যথা গোপন রেখে সব করে গেছে।

যাওয়ার দিন মালপত্র সব বাসে তুলে দিয়ে যমুনাকে প্রণাম করার সময় অনেকদিন পর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে, মা ঠাকরুন, আপনাদের ছেড়ে ক্যামনে থাকুম!

যমুনা নিজের চোখ মুছে বলেন কাঁদিস না, কাঁদিস না। নিয়মিত চিঠি দিস। বৌমারে দেখিস।

বাবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে কানাই বলে, গরিব মামাটারে ভুলে যাবি না তো?

বাবাই বলল, কানাইমামা, তুমি আমাকে ভুলে যেয়ো না। বড়ো হয়ে আসব আমি।

বাস ছেড়ে দেয়। সজল চোখে কানাই চলন্ত বাসকে দেখে। বুকের মধ্যে গমগম করলেও বলতে পারে না, মা ঠাকরুন, আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

ওর মনে প্রশ্ন জাগে, এটা কেমন স্বাধীন দেশ যেখানে রহস্যময়ভাবে নিরীহ বিধবার ঘর জ্বলে যায়, অসহায় অথচ লড়াকু নারী চাকরিচ্যুত হয়? এটা কি ওদের দেশ নয় তবে?

প্রশ্ন জাগলেও কানাইয়ের মাথায় উত্তর জোগায় না।

বাসে চলতে-চলতে যমুনা বলেন, দেশ ছেড়ে এসে আগরতলাকেই নতুন দেশ বলে মেনে নিয়েছিলাম। এখানেও থাকতে পারলাম না।

বাবাই বলে ওঠে, দিদা, তুমি পড়োনি—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া'।

নাতির মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে যমুনা বলেন, আমি আর কি পারব, দাদুভাই!

প্রণতির মাথায় একটা লাইন বার বার ঘুরতে থাকে — 'প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চিরজনমের ভিটাতে'।

২.

রবিকিরণসম্পাত অবলোকনের জন্য ঝঞ্ঝানিশি অতিক্রম করতে হয় কখনও। জীবন কোথায় স্থিত তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অন্বিষ্ট নির্ভুল কি না। দীর্ঘ যাত্রাপথে এই ভাবনাগুলো প্রণতিকে বার বার ঠুকরেছে। আর বার বার তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই যে এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে চলেছে, তার মধ্যে হঠকারিতা নেই তো? কিছু অপমান মেনে নিয়ে আপস করে আগরতলায় থেকে যাওয়া কি নিতান্তই অসম্ভব ছিল? কাজ পাওয়ার অনিশ্চিতির সঙ্গে বাবাইয়ের শিক্ষা-চিন্তাও উদ্বেগ তৈরি করে। নতুন স্কুল, নতুন পরিবেশ, নতুন বইপত্র — ও কি মানিয়ে নিতে পারবে? যত চিন্তাগুলো মগজে দাপাদাপি করে, নিজের বিশ্বাসের অবয়বে আরও বর্ম চাপাতে থাকে।

আগরতলা থেকে শিলচর। তার পর ট্রেনে বদরপুর হয়ে লামডিং। ট্রেন বদল করে আবার যাত্রা। একেক সময় মনে হচ্ছিল বঙ্গাইগাঁও যেন না-ফুরোনো পথের ভূগোলবিন্দু। ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ অনুভবে তুহিনাবৃতি ঘটালে প্রণতি গুনগুন করে, ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি...।

স্টেশনে হাজির ছিল পবিত্র, সকন্যা সীমা। সাদর অভ্যর্থনায় উষ্ণতার অভাব ছিল না। একটু স্থিতু হলে, সীমা বলল, টুনু শেষমেষ আসতে পারলি তবে।

প্রণতি বলল, এটা আসা নয়, গলগ্রহ হওয়া।

পবিত্রকে বলল, জামাইবাবু, চাকরি জোগাড় করে দিতেই হবে।

বাবাই বলল, মা আমার স্কুল?

সবিতা বলল, বাবা, ওকে রেলস্কুলে ভরতি করা যাবে না?

পবিত্র বলল, কারও ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। এখন ক-টা দিন বিশ্রাম কর। শহরটাকে দ্যাখো। বেড়াও। ধীরে-ধীরে সব ব্যবস্থা হবে।

'বঙাল খেদাও'-র বিকৃতি স্তিমিত হওয়ার পর প্রণতিকে ফাদার জোনসের কাছে নিয়ে যায় পবিত্র। ফাদার জোনসকে দেখেই প্রণতির রক্তের মধ্যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ-কোরক বিকশিত হয়। তার অন্বেষণে ভুল ছিল না। যেন ওর এক জীবনের সকল প্রার্থনার মূর্ত উত্তরের মুখোমুখি হয়েছে। ষাটোর্ধ্ব মানুষটির ঋজু শরীরের শুভ্র পোশাকে যেন প্রাণের অমলতা বিম্বিত।

পবিত্র জানিয়েছিল ফাদার স্কটল্যান্ডের মানুষ। গত চল্লিশ বছর ধরে এই উপমহাদেশে আছেন। দীর্ঘকাল পূর্ব-পাকিস্তানে ছিলেন বলে বাংলা বলেন অবাধে। এখানে এসে অসমিয়াও শিখেছেন।

প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পর পবিত্র বলল, ফাদার, ও ইংরেজিতে এম. এ.। আপনাদের স্কুলে যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়, তাই —।

ফাদার প্রণতিকে বলেন, লুক মাই চাইল্ড, আমি শুনেছি তোমার দুর্ভাগ্যের কথা। তুমি তো আগরতলায় পড়াতে। ওখান থেকে চলে এলে কেন?

কী জবাব দেবে প্রণতি? সত্য কথা, যা অতিশয় লজ্জার, বলা যাবে না। অথচ এই দেবোপম মানুষকে মিথ্যা বলাও অসম্ভব। ও একবার ফাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

ফাদার বলেন, দ্যাখো, সমস্যা-দুর্যোগ জীবনের অঙ্গ। সেসব অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে না পারলে, যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় না যথার্থ ভালোবাসার।

প্রণতি বলল, আমি চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। ওখানে থাকার আর ভরসা পাচ্ছিলাম না। মা আর ছেলেকে নিয়ে আমার থাকাটা ভীষণ কঠিন হয়ে উঠেছিল।

— তোমার ছেলে কত বড়ো?

— সিক্সে পড়ে— বছর-বারো —

— বায়োডাটা এনেছ?

প্রণতি ব্যাগ খুলে একটা কাগজ বাড়িয়ে বলে, সার্টিফিকেট লাগবে?

— এখন থাক।

পবিত্রকে বললেন, আমি বোর্ডে বলব। একটু সময় তো লাগবেই। আশা করি হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা থাকবে কোথায়?

পবিত্র বলে, এখন তো আমার ওখানেই আছে। পরে না হয় দেখেশুনে বাড়ি নেবে।

ফাদার বললেন, আপনার কোয়ার্টার থেকে আমাদের স্কুল তো বেশ দূর। যাতায়াতে অসুবিধে হবে। আমাদের কোয়ার্টার একটাও খালি নেই। আমার মনে হয় এখনই থাকার ব্যবস্থা করা ভালো। গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে থাকা শুরু করুক। প্রতিবেশীদের সঙ্গে জানাচেনা হওয়াও দরকার। নতুন জায়গায় আবাসনের নিশ্চিতি না থাকলে সাহসের বিকাশ হবে না।

কয়েক দিনের মধ্যেই একটা ছোটো বাড়ি পেয়ে গেল। আসামের বাড়ি যেমন হয় — টিনের ছাউনি, দেয়ালগুলো পাকা। দুটি শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর। বাথরুম-পায়খানা আলাদা। পাতকুয়াও আছে। আছে ইলেকট্রিসিটিও। বাড়িটা নগরকেন্দ্র থেকে একটু দূরে। গির্জা-স্কুল

পনেরো মিনিট হাঁটাপথের দূরত্বে। চার দিকে অনেক ফাঁকা জংলাজমি। ছোটো ছোটো টিলার উপরে এক-একটা বাড়ি। রাস্তা দিয়ে সাইকেল, গোরুর গাড়ি যায়। ক্বচিৎ একটা কী দুটো গাড়ি। দল বেঁধে আদিবাসীরা যাতায়াত করে। মুখে সরল হাসি।

শহরের কোলাহল এত দূরে পৌঁছোয় না। দিনের সময় যেমন নিথর। রাতে অনন্ত নির্জনতা। ঝিঁঝির একটানা ডাকে প্রাণের স্পন্দন থাকে অব্যাহত। তীব্র হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন ছুটে গেলে বোঝা যায় জগতের কর্মকাণ্ডে কোনো ছেদ নেই।

বাবাই রেলস্কুলেই ভরতি হল। সিলেবাস বইপত্র আলাদা। প্রণতি রোজ ওকে পড়াতে বসে। তবে এখন ওর খেলাতেই যত আনন্দ। নতুন বন্ধু হয়েছে অল্পদিনেই। বিকেল হলেই ফুটবল মাঠে ছোটে। একটু-একটু অসমিয়া শিখছে। নতুন শব্দ শিখলেই দিদাকে বলা চাই আগুন হচ্ছে জুই। খবর হচ্ছে বাতরি। শুনতে কী মিষ্টি না দিদা!

যমুনা হেসে বলেন, জুঁই না বেলি টগর তুমিই শেখো দাদুভাই। আমার জন্য আগুনই থাক।

— দিদা, তুমি না হরু ছোয়ালির মতো কথা বলছ।

— সেটা কী?

— জানো না তো! হা-হা ছোট্ট মেয়ে।

দিদাকে জড়িয়ে ধরে বার বার বলতে থাকে বাবাই, ছোট্ট মেয়ে — হরু ছোয়ালি — তুমি একটি ছোট্ট মেয়ে —

যমুনা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে বলেন, হ্যাঁ আমি ছোট্ট, তুমি দাদুভাই তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠো।

— আমি তো বড়ো হয়েই গেছি। দেখছ না আমি তোমার চেয়েও লম্বা।

এই দাবি মানতে বাধ্য যমুনা। বাবাই হঠাৎই লম্বা হয়ে মাথায় ওঁকে ছাড়িয়ে গেছে। ছেলেটা বয়েসকালে ওর দাদামশাইয়ের মতোই লম্বা হবে। আহা, মানুষটা থাকলে আজ কত খুশিই না হত! যমুনার চোখের কোণে জ্বালা ভাব জাগে। যুগান্ত পেরিয়ে জিহ্বায় লবণ-স্বাদ।

ফাদার জোনস প্রণতির চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছিলেন মাসখানেকের মধ্যেই। ইংরেজির ছাত্রী বলে সুবিধেই পায়। অষ্টম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতে হয়। প্রণতি দেখে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি মার্জিত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। পড়াশোনার ভিতও বেশ ভালো। নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বিধিনিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হল না। ফাদার জানতে চেয়েছিলেন, তুমি কি ইংরেজি ছাড়া আর কিছু পড়াতে পারবে? প্রণতি বলেছিল, ভূগোল অথবা ইতিহাস পড়াতে পারি।

ফাদার বলেন, ইতিহাস লাগবে না। দরকার হলে তোমাকে ভূগোলের ক্লাস নিতে বলতে পারি কখনও-সখনও। ক্লাস নাইন ও টেনের সিলেবাসটা দেখে রেখো। লাইব্রেরি থেকে দরকার-মতো বই নিয়ে যেয়ো।

প্রণতি ফাদার জোনসকে দেখে যত, মুগ্ধ হয় তত বেশি। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। অথচ সাদা পোশাকের মতো মুখের হাসিও সারাক্ষণ অমলিন। সব সময় স্কুল, গির্জা, দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র, আদিবাসী উন্নয়ন আর দুঃখী কাতর মানুষের জন্য কাজ করেন, ভাবেন। মানবসেবা তাঁর ব্রত নয়, যেন জীবনবায়ু। মাঝে মাঝেই প্রণতিকে কিছু-কিছু

অতিরিক্ত কাজ করতে বলেন। সম্মত না হয়ে উপায় থাকে না। নিয়মিত ফাদার ছেলে আর তার দিদার কথা জিজ্ঞাসা করেন। বার-দুয়েক বাড়িতে এসে যমুনাকে দেখে গেছেন। বাবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি বড়ো হয়ে কী করবে?

বাবাই হঠাৎ বলে ওঠে, তোমার মতো ফাদার হবো।

গম্ভীর গলায় ফাদার বলেন, কেন?

বাবাই-এর সপ্রতিভ জবাব, টু সার্ভ হিউম্যানিটি।

হয়তো এমন উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ফাদার জোনস। এক মুহূর্ত অপলক বাবাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ওকে বুকে জড়িয়ে বলেন, গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড, গড ব্লেস ইউ।

পরে প্রণতিকে বলেছিলেন, এখন আমি বুঝি তুমি কেন ছেলের জন্য এমন প্রাণপণ করছ। তোমার ছেলে একদিন অবশ্যই বড়ো মানুষ হবে।

— আপনি আশীর্বাদ করবেন।

— না, আমি ওর জন্য প্রার্থনা করব।

গত দু-বছরে ধীরে ধীরে ফাদার জোনসের মিশনারি কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষত আদিবাসী উন্নয়নের কর্মসূচিতে। এই অঞ্চলে বোড়ো রাভা ইত্যাদি বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতি আছে। আপাতদৃষ্টিতে ওদের আলাদা করে শনাক্ত করা কঠিন। সাধারণ অসমিয়াদের সঙ্গে এদের অমিলের চেয়ে মিলই বেশি চোখে পড়ে প্রণতির। তবে এদের অশিক্ষা ও দারিদ্র যেমন লক্ষণীয়, তেমনই ভূস্বামী ও বণিক ধূর্ততা দ্বারা শোষিত হওয়াও বেদনাদায়ক।

যমুনা অতশত বোঝেন না। তাঁর অভিযোগ মেয়ে বড়ো বেশি খেস্টান-বাবা কর্তৃক প্রভাবিত হচ্ছে। সাহেবদের জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর ধারণা রক্ষণশীল। তাঁর শঙ্কা মেয়ে মেমসাহেবি অভ্যেস বা স্বভাব না রপ্ত করে বসে। এসবই যমুনার অনুচ্চারিত ভাবনা। প্রত্যক্ষত এখনও এমন কিছু প্রণতির আচরণে পরিলক্ষিত হয়নি যার জন্য কোনো প্রশ্ন তোলা যায়। প্রণতি ঠোঁটে-মুখে রং মাখে না। পোশাকের বর্ণরহিত সারল্য অবিকল। স্কুল থেকে ফিরে, মার সঙ্গে বসে গল্প করা, ছেলের পড়াশোনার তদারকি — কোথাও কোনো ব্যত্যয় নেই। যমুনার মুশকিল নিজের মনের গোপন কথা কারুকে বলতে না পারা। সীমা বা পবিত্রকে বলবেন ভেবেও, না বলার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। ওরা তো আরও সরেস — হয়তো আবারও প্রণতির বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে!

মাথার মধ্যে এসব চিন্তাগুলো দাপাদাপি করলে যমুনা ব্যাকুল হয়ে পড়েন বাবাইয়ের জন্য। বাবাইয়ের স্কুল থেকে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে যায়। খেলার মাঠে সময় দিলে তো সন্ধ্যা পিঠে নিয়ে ঢোকে। সারাদিন—বিশেষত দুপুর—একা একা কখনও মেয়ে কখনও নাতির শুভাশুভের কথা ভেবে যান। ভেবে ভেবে কাতর হয়ে পড়েন। অজানা আশঙ্কা বিকেলের ছায়ার মতো তাঁর মনের আলো শুষে নেয়। তখন তিনি প্রাণপণে স্বামী হরিশের কথা — তাঁদের যুগল জীবনের হৃত স্মৃতির ঝাঁপি উন্মোচনের চেষ্টা করেন। সময়ের নিষ্ঠুর অনিবার স্রোত অনেক সঞ্চয়ই ধুয়ে-মুছে দিয়েছে। অনেক কিছুই আর ঝাঁপিতে খুঁজে পান না। বিশেষত একান্ত গোপন রঙিন মুহূর্তগুলি। কয়েকদিন আগে একটা বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে নিজের

ফুলশয্যার স্মৃতি ফিরে দেখার চেষ্টা করছিলেন। কিছুতেই মনে পড়ল না হরিশ প্রথম কী কথা বলেছিলেন। মনে পড়ল না ঠিক কীভাবে দখল নিয়েছিলেন সদ্যস্ত যমুনার তৎপর যৌবনের। শুধু মনে পড়ল মানুষটার ভালোবাসা ছিল বড়ো তীব্র, লেলিহান। সরল মনটা ছিল অতীব কোমল। বাবাইয়ের মধ্যে টুকরো-টুকরো হরিশকে দেখতে পান যমুনা।

— দিদা — দিদা —

বাবাইয়ের ডাক শুনে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন যমুনা। দৌড়ে আসার জন্য বাবাইয়ের মুখে কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। অল্প-অল্প হাঁপাচ্ছেও। উৎকণ্ঠিত যমুনা বললেন, কী হয়েছে দাদুভাই, কী হয়েছে?

পিঠ থেকে বইয়ের ব্যাগ নামিয়ে বাবাই বলল, যুদ্ধ লেগে গেছে। চীন আমাদের আক্রমণ করেছে।

৩.

চীন ভারত আক্রমণ করেছে এই সংবাদে প্রধানমন্ত্রী নেহরু সহ দেশের তাবৎ মানুষের মতো উদয়নও অবিশ্বাসে স্তম্ভিত। এই তো কদিন আগেও বান্দুং সম্মেলনে চীন-প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর সঙ্গে নেহরুর সৌহার্দের সমাদর ছিল রূপময়। হিন্দি চিনি ভাই-ভাই স্লোগান উচ্চারিত হত জনগণনার মতোই। হঠাৎ বন্ধুর হাতে বন্দুক! চমক ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল দেশ জুড়ে যুদ্ধোন্মাদনা। চীনবিরোধী প্রচার তুঙ্গে। চীন মানেই হীন, ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। এবং যেহেতু চিনা সরকার কমিউনিস্ট অতএব ভারতে কমিউনিস্টদেরও পাঠাও নির্বাসনে — অর্থাৎ জেলখানায়। সব প্রধান কমিউনিস্টনেতারা বন্দি হলেন। কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারে সংবাদপত্র রেডিয়ো সরগরম। উন্মাদনা এমন বিবেকবিচারশূন্য যে পারলে অর্বাচীন শব্দটিকেও দ্বিখণ্ডিত করে। ভাবাবেগের মত্ততায় পাড়ায়-পাড়ায় অর্থসংগ্রহের প্রতিযোগিতায় সাধারণ মানুষ টাকা, গহনা উদার হাতে উজাড় করে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে কিছু নিঃস্ব হল। সেই অর্থ-অলংকার কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কখনও জানা যায়নি। এই উন্মাদনার ঘোর অল্পদিনেই কেটে গিয়ে অনেকেরই মনে অনুশোচনার দাহ স্থান করে নিয়েছিল।

কিন্তু তখন উদয়ন ছিল কঠিন সমস্যায়। সে নিজে পার্টির সদস্য নয়, অথচ পার্টির কিছু নেতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। এ-কারণেই কি দেশদ্রোহী বলা যাবে না? ধরা পড়বে কি পড়বে না এই অনিশ্চয়তার জন্য কর্মপন্থাও স্থির করতে পারে না। জেল থেকে পুরোনো বন্ধু প্রবোধ রাহা খবর পাঠায়, ও যেন আত্মগোপনই করে থাকে। বন্দি বন্ধুদের পরিবারের যথাসাধ্য দেখাশোনা করেন। প্রবোধের সঙ্গে একসঙ্গে ইংরেজের জেলে ছিল। দেশভাগের পর প্রবোধ এ-পারে এসে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রচুর কাজ করেছে।

কোথায় আত্মগোপন করবে উদয়ন? শিয়ালদার যে-মেসে থাকে সেটা এক হট্টমেলা। ওর রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানসিকতা সকলেরই জানা। সবাই সাধারণ চাকুরে বা ছোটো ব্যবসায়ী। এঁদের কারুর কাছে, অর্থাৎ কারুর দেশের বাড়িতেআশ্রয় প্রার্থনা করে বিপন্ন করা সমীচীন হবে না। এক মিমির বাড়িতে যেতে পারে। আলিপুরের ও-বাড়িতে ওকে খুঁজতে কেউ যাবে না। মিমিও আপত্তি করবে না। বরং দাদাকে কাছে পেলে খুশিই হবে, ওর ব্যবহারিক

অসুবিধে সত্ত্বেও। কিন্তু তিন বছর আগে আচমকা আগরতলা ছেড়ে এসে যে-বোনের সন্ধান পেয়েও আবার ত্যাগ করেছে তারই কাছে আশ্রয় যাচ্ঞা করবে? অবশ্য ত্যাগ শব্দটা বোধ হয় ঠিক নয়। ও মিমির বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। মিমির বর্তমান জীবনযাপনের প্রকরণের প্রতি সমর্থন জানাতে না-পেরে। মানসিক গোঁড়ামি? সংরক্ষণশীলতা? হতে পারে। উদয়ন কখনও দাবি করে না যে ও ডিক্লাসড হয়ে সব মধ্যবিত্ত সংকীর্ণ চেতনামুক্ত হতে পেরেছে।

কিছুদিনের জন্য আগরতলায় ফিরে যাওয়ার কথাও মনে এসেছিল। শৈলেশের কাছে থাকা যেত। তবে নিরাপদ হত কি না বলা যায় না। ধরপাকড় সেখানেও হয়েছে। আর শৈলেশের বাড়ি মানেই পূরবী, মেয়ে টিটি। না, পুরোনো বৃত্তে আর ফিরতে চায় না। যদিও পূরবীর প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা একান্ত অনুভবে নিরন্তর বহমান।

আগরতলা ছাড়ার সপ্তাহখানেক আগেই মাত্র 'অপুর সংসার' ছায়াছবি দেখে এসেছিল। *উল্টোরথ* পত্রিকায় মিমির ছবি দেখিয়ে বলেছিল, শর্মিলা ঠাকুরের চেয়েও সুন্দরী দেখতে। 'নবীন ভুবনে' নাকি দারুণ করেছে। কবে যে এখানে আসবে!

পূরবীই জানায় রঞ্জনা নন্দী রিফিউজি ঘরের মেয়ে। মাত্র উনিশ বছর বয়েস। ছবিটা প্রথম দেখে একটি সুন্দর মুখ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। পূরবীর কথার তোড়ে ভালো করে দেখতে গিয়ে উদয়নের স্মৃতির রুদ্ধ গবাক্ষে বিজলির উদ্ভাস ঘটে। ওই চোখ, ঠোঁটের নীচে কালো তিল বড়ো চেনা, অতি চেনা। ওর বুকের মধ্যে কেবলই অনুরণিত হয় মিমি-মিমি-মিমি। দিগন্ত পেরিয়ে ওর শ্রবণে ধ্বনিত হয় — বড়দা — বড়দা।

লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। কলকাতায় মিমিকে খুঁজে নেওয়াটা সহজ হয়নি। একে তো সিনেমা লাইনের কোনো লোকজনের সঙ্গে চেনাজানা ছিল না, মিমি সরকারই যে রঞ্জনা নন্দী তার কোনো প্রমাণও ওর কাছে নেই। মিমিকে ঘিরে থাকা লোকজন যে ওকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না, বুঝতে পেরে বাড়ির হদিশ সংগ্রহ করে। ঠিকানা পায়নি। নিউ আলিপুরে থাকে মাত্র এটুকু তথ্য নিয়ে কয়েকদিনের চেষ্টায় উদয়ন মিমির বাড়ির খোঁজ পায়। সকাল আটটায় গিয়ে ডোরবেল বাজালে একজন মধ্যবয়েসী ভারিক্কি চেহারার মানুষ দরজা খুলে বলে, কী চাই?

— মিমি, মানে রঞ্জনার সঙ্গে একটু দেখা করতাম।

— কোত্থেকে আসছেন? অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

— আমার নাম উদয়ন সরকার। ওকে বলুন আমি ওর দেশ থেকে এসেছি।

— সরি। উনি এভাবে কারও সঙ্গে দেখা করেন না। তা ছাড়া ওঁর শুটিং আছে। এখনই বেরিয়ে যাবেন।

— আপনি জাস্ট আমার নামটা বলুন। দেখা না করতে চাইলে, আমি চলে যাব।

লোকটা, পরে জেনেছে—বিকাশ সিংহ, ওকে খুঁটিয়ে দেখে ভিতরে ঢুকতে দিয়ে বলে, বসুন এখানে।

ঘরে সোফাসেট, সেন্টার টেবিল। কয়েকটা শান্তিনিকেতনি মোড়া। দেয়াল জুড়ে মিমির নানা ভঙ্গিমার ছবি। দুটো ছবি সম্ভবত ওর নায়কের সঙ্গে। ঘরে আরও তিন জন মানুষ বসে ছিল। তাদের কথায় বোঝা যায় সিনেমার লোকেশন ও রিলিজ নিয়ে খুব চিন্তিত।

আগে ভাবেনি, ওখানে বসে হঠাৎই মনে প্রশ্ন জাগে, রঞ্জনা যদি মিমি না হয়? বা যদি

মিমি ওকে চিনতে অস্বীকার করে? মিমির পরিচয় সম্পর্কে ও নিজে সংশয়হীন। তবু ছয় বছরের মিমি আর উনিশের রঞ্জনার মধ্যে অনিবার্য সময়প্রবাহের চিহ্ন নিরূপণে বিভ্রমের সম্ভাবনা থাকতেই পারে। এই জিজ্ঞাসাগুলো নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া কয়েক মুহূর্তেরই শুধু। তবু সেই মুহূর্তগুলোকেই যেন অনিঃশেষ অন্ধকার সুড়ঙ্গসদৃশ লাগে। মধ্যরাতে সুর্মাব্রিজের উপর দিয়ে ছোটা ট্রেনের শব্দ যেন কানে বাজে।

তখনই পায়ের মল ও হাতের অলংকারের ঝংকার তুলে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢোকে রঞ্জনা। এক পলকের ঘরের মানুষদের দেখেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপায় উদয়নের উপর — বড়দা — বড়দা — তুমি! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না। উঃ, বড়দা — বড়দা — ওর চোখ ভেঙে জল নামে।

উদয়ন বোনের মাথায় হাত বোলায়। মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে, মিমি — মিমি — মিমি —

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মিমি বলল, চলো, ভিতরে চলো।

মিমির শোওয়ার ঘরে বসে উদয়ন জানতে চায় মার কথা, ভাইদের কথা।

মিমি জানতে চায়, তুমি কোথায় ছিলে বড়দা? এতগুলো বছর—আমরা কোনো খোঁজও করতে পারিনি।

উদয়ন বলে, আমি তোদের যে কত খুঁজেছি — বার বার দেশে গেছি, কলকাতায় ঘুরে গেছি। কেউ কোনো খোঁজ দিতে পারেনি। ক-দিন আগে একটা সিনেমা পত্রিকায় তোর ছবি দেখে মনে হল তুই। কিন্তু নাম লিখেছে রঞ্জনা নন্দী। সন্দেহ ছিল। তবু চান্স নিলাম। মা, বটু আর দীপুর খবর কীরে?

— সব বলব। তার আগে বলো, তুমি উঠেছ কোথায়?

— শিয়ালদার একটা মেসে।

— ওখানে আর যেতে হবে না। এখন থেকে এখানেই থাকবে তুমি। আমার কাছে।

— ধুর পাগলি!

— পাগলি বল আর ছাগলি বল, আমি কিন্তু কোনো কথা শুনব না। তোমাকে থাকতেই হবে।

দরজার বাইরে থেকে কেউ ডাকে—রঞ্জনা—।

রঞ্জনা বলে, বিকাশদা, ভিতরে এসো।

উদয়ন দেখে, বিকাশই সেই মানুষ যে বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিল।

রঞ্জনা বলল, বিকাশদা, আমার বড়দা — উদয়ন সরকার — স্বাধীনতা-সংগ্রামী — কত যে জেল খেটেছে। দেশভাগের পর আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম। আজ এত বছর পর বড়দা আমাকে খুঁজে বের করেছে।

উদয়নকে বলল, বড়দা, বিকাশদা — আমার ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। দারুণ এডিটিং করেন। স্ক্রিপ্ট লেখেন।

সৌজন্য বিনিময় করে বিকাশ বলে সাড়ে ন-টায় শুটিং। যাবে তো?

— নিশ্চয়। — রঞ্জনা বলল, বড়দা, আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি বিশ্রাম করো। শোভা আমার গৃহকর্ত্রী। ও খাবারদাবার দেবে। আমি বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব। তখন সব বলব, শুনব। ওঃ আমার যা লাগছে না —।

উদয়ন বলল, শোন্ আমি এখন মেসে চলে যাই। বিকেলে আসব। ছ-টা নাগাদ?

ভুরু কুঁচকে মিমি বলল, যেতেই হবে? কী সম্পত্তি আছে তোমার? যাই থাক সব নিয়ে চলে আসবে। ছ-টার আগেই আসবে।

সেদিন ভাইবোনে অনেক রাত পর্যন্ত নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছিল। তাতে কাহিনী ছিল, ঘটনা-দুর্ঘটনার ইতিকথা, আর ছিল অজস্র যন্ত্রণা ও অশ্রু। এক কিশোরীর নারী হয়ে ওঠার, জীবনের চৌকাঠ ধরে টিকে থাকার সংগ্রাম।

স্বাধীনতা লাভের দু-বছর আগেই রাজবন্দি উদয়ন পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল স্বাধীন ত্রিপুরায়। বাড়িতে মা লতিকার সঙ্গে ছিল মিমির মেজদা বটু আর ছোড়দা দীপু। কাকা নিশানাথ সরকার জায়গাজমি দেখাশোনা করতেন। গ্রামের পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠায় সম্পন্ন হিন্দুরা একে-একে কলকাতার দিকে যাওয়া শুরু করে। নিশানাথ লতিকাকে বলেন, আর থাকা যাবে না বলে মনে হচ্ছে। আমার বেশি ভয় চন্দ্রাকে নিয়ে।

লতিকার দ্বিমত হওয়ার কারণ ছিল না। নিশানাথের মেয়ে চন্দ্রা বিবাহযোগ্যা তরুণী।। অস্থির সময়, অনন্ত গুজবে নিরাপত্তাবোধ ক্ষীণ হতে বাধ্য। লতিকা বললেন, কী করতে বল?

— চলো কলকাতা যাই। অন্তত তোমাদের রেখে আসি। তার পর দেখেশুনে যা হোক করা যাবে। আর যদি চন্দ্রার বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারি, তবে একটু নিশ্চিতি পাই।

— এখানের এসব বিষয়-আশয় আর টাকা-পয়সার বন্দোবস্ত—

— দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। কিছু টাকা না নিয়ে তো যাওয়া যাবে না।

নিশানাথের যাওয়া হয়নি। চার দিনের মাথায় ওদের বাড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ হয়। জুম্মা খাঁ, যাকে নিশানাথ বিশ্বাস করে বাড়ি-জমি বিক্রির কথা বলেছিলেন সে-ই অগ্রণী হয় নিখরচায় দখল নেওয়ার জন্য। চন্দ্রাকে তুলে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন নিশানাথ। বল্লমে এফোঁড়-ওফোঁড়। ওই লাশ দেখেই হয়তো সন্ত্রস্ত লতিকাদের উপেক্ষা করে উন্মত্ত জনতা চলে গিয়েছিল। সম্ভবত এক রাতেই সব খুঁটে নিতে চায়নি।

লতিকা আর দেরি না করে নিজের যা কিছু সম্বল নিয়ে বটু দীপু আর মিমিকে নিয়ে দেশত্যাগের আয়োজন করেন। রাতের অন্ধকারে কোনোক্রমে স্টেশনে এসে হাজির হয়ে দেখেন জনারণ্য। অতি কষ্টে ট্রেনে চাঁদপুর। তার পর স্টিমারে গোয়ালন্দ। দর্শনা বর্ডার পেরিয়ে আবার ট্রেনে শিয়ালদা। দীপুকে অবশ্য এত জটিল যাত্রা করতে হয়নি। মিমি ঠিক জানে না কীভাবে দীপু গোয়ালন্দের কাছে স্টিমার থেকে নদীতে পড়ে হারিয়ে যায়। ছোড়দাকে আর ফিরে পাওয়া যায়নি। মনে আছে, লতিকা খবরটা শুনে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মিমিকে বুকে শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছিলেন।

বটু বলেছিল, মা, কী করব — দীপু — ।

লতিকা চোখের আঁচল সরিয়ে বলেন, জিনিসপত্রগুলো সব দেখে নিয়ে চল। এখানে আর কিছু করার নেই।

বটু বলল, মা, দীপু —

মিমি বলল, ছোড়দাকে ছাড়া যাব?

মাথা ঝাঁকিয়ে লতিকা বলেন, যে গেছে তার খোঁজে কি তোদেরও খোয়াব? স্টিমার থেকে নেমে লতিকা দীপুর শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বটু কীভাবে মাকে শান্ত করবে ভেবে পায়

না। মিমিও মার সঙ্গে আকুল কান্নায় চিৎকার করে। দীপুর শোক লতিকার গলায় বলিরেখার মতো স্থায়ী হয়ে থাকে। তখন কি জানতেন যে এই সান্ত্বনাহীন রোদনেই হবে এক ভিন্নতর জীবনের অকালবোধন।

লতিকার এক মামা টালিগঞ্জে থাকতেন। ইচ্ছে ছিল সেখানে উঠে মামার পরামর্শ অনুযায়ী কর্মপন্থা স্থির করবেন। বটু সদ্য বি.এ. পাস করেছে। ওর চাকরির ব্যবস্থা করাটাই সবচেয়ে জরুরি। রোজগারের বন্দোবস্ত হলে সাধ্যানুযায়ী থাকার আয়োজন করা যাবে।

কিন্তু শিয়ালদায় নেমে টালিগঞ্জের খোঁজ করারও সুযোগ পেলেন না লতিকা। স্বেচ্ছাসেবী একদল যুবক ওদের নিয়ে যায় এক ক্যাম্পে। কয়েকদিন পর আবার অন্য ক্যাম্পে। ক্যাম্পের দিনগুলো ছিল পাকিস্তানের দিনগুলোর চেয়েও ভয়ংকর, বীভৎস। ওখানে ছিল শুধু ভয়। এখানে ভয়ের সঙ্গে গ্লানি, অপমান, মনুষ্যেতর জীবনযাপনের ধিক্কার।

ওরা শেষ ছিল রানাঘাট ক্যাম্পে। পঞ্চাশ সালের গোড়ায় লতিকা স্থির করেন ক্যাম্পের নারকীয় পরিবেশে আর থাকবেন না। বটুর কাজের কিছু হচ্ছে না। মিমির শরীরে রমণীয়তা ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে লোলুপ আক্রমণের শঙ্কা বাড়ছে।

ইতিমধ্যে বটু টালিগঞ্জে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে লতিকার মামা ওখানের ভাড়া বাসা ছেড়ে বারাসাতে বাড়ি করে চলে গেছেন। ঠিকানা পাওয়া যায়নি। অফিসের কথা জিজ্ঞেস করে জানা গেল, তিনি অবসর নিয়ে নিয়েছেন।

এই সময়ে এক দিন হারীন ভৌমিক বটুকে বলল, তিন কাঠা জমি ব্যবস্থা করে দেব। যাবে?

হারীন ভৌমিক, আর. এস. পি.-র পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করার দায়িত্বে আছে। বছর চল্লিশের সাদামাটা মানুষ। মাঝে-মাঝেই ক্যাম্পে এসে মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে। সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাও। বটু লেখাপড়া-জানা যুবক, সেজন্য তাকেই অগ্রণী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। বটু বলে, আমাকে একটা কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দিন। হারীন প্রতিশ্রুতি দেয়। বলে, চেষ্টা করছি।

জমির কথায় বটু বলল— কোথায়?

— বারাসাতের কাছে নতুন কলোনি হচ্ছে। বসন্তপুরে।

— কাঠা কত?

— কত কী হে! ফ্রি। দখল করা জমি। শুধু সমিতিকে কাঠা-প্রতি কুড়ি টাকা করে দেবে। তার পর ঘর তুলে থাক।

লতিকা শুনে বললেন, একদিনও দেরি করিস না। বলে বাক্স খুলে একটা হার বটুর হাতে দিয়ে বলেন— এটা বেচে ঘর তোলার ব্যবস্থা কর্। মিমির বিয়ের জন্য রেখেছিলাম।

বটু হারীনের সঙ্গে গিয়ে জমি দেখে, দখল নিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে। দেখে আশেপাশে অনেক নতুন ঘর উঠেছে। আরও উঠছে। সমিতিরই অন্যতম কর্তা হলধর সাহা সর্ব অর্থেই ধুরন্ধর মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এক বছরের মধ্যেই নিজের কাঁচাবাড়ি পাকা করেছে।

বটুকে বলল, তুমি নিজে লোক লাগিয়ে ঘর তুলতে পারো। তবে রানাঘাট থেকে রোজ এসে দেখতে হবে। আর যদি বল, আমি করিয়ে দিতে পারি। কম খরচেই করিয়ে দেব।

তোমার বাবা নেই বলছ। মা-বোন নিয়ে এই বয়েসে একা কি-ইবা দিতে পারবে।

হারীনও বলল, হ্যাঁ বটু, হলধরদাকে দিয়ে দাও। উনি সব করে দেবেন।

বটু জানতে চায় কত দিন লাগবে?

— টালির ছাউনি, দরমার বেড়া, কাঠের দরজা — এই তো?

— বাথরুম — মানে স্নানের ঘর, পায়খানা —

— তোমার তো এক নম্বর ব্লকের তিরানব্বই নম্বর প্লট। পিছনের দিকে নালামতো আছে। ওখানেই খাটা পায়খানা, মানে ওই চট দিয়ে ঘিরে দেওয়া আর কী। কিন্তু বাথরুম — জল পাবে কোথায়? পুকুরই ভরসা। খাবার জলের জন্য টিউবকল বসিয়েছি আমরা। প্রতি ব্লকেএকটা। যাই হোক, মাসখানেকের মধ্যে হয়ে যাবে। কিছু আগাম দিয়ে দাও। মাঝে-মাঝে এসে দেখে যেয়ো। একটা কথা বলি, হলধর সাহা স্পষ্ট কথার মানুষ। কথার খেলাপ পাবে না। আর যদি পাকাবাড়ি করতে চাও — ।

বটু বাধা দিয়ে বলে, না-না। এই যা বললেন তা করতে কত লাগবে — একটা আন্দাজ যদি পাই —।

হলধর বলে, অন্য কেউ হলে — সাত-আটশো বলতাম। তবে হারীনবাবুর নিজের লোক তুমি, ওঁকে আমরা মান্য করি, তুমি ছ-শো টাকা দিয়ো।

— ছ-শো?

— মা-বোন নিয়ে থাকবে। ঘরে একটা পার্টিশান তো দিতে হবে। দরমার খরচটাও তো ধরলাম না।

— ঠিক আছে। মার সঙ্গে কথা বলে দু-এক-দিনের মধ্যে আসব।

লতিকার আপত্তি করার কিছু ছিল না। তিনি ক্যাম্প ত্যাগ করার জন্য উদগ্রীব। ছেলেকে বলেননি, গত রাতেই কে যেন অন্ধকারে মিমির হাত ধরে টেনেছিল। ঠারেঠোরে কু-কথা বলা তো আছেই।

বললেন, ওখানে যখন থাকতে হবে সমিতির লোকজনের সঙ্গে সদ্ভাব রাখাই ভালো।

এক মাসে হয়নি। নিয়মিত তাড়া দিয়ে হলধরের কাছ থেকে ঘরের দখল পায় দু-মাসের মাথায়। কয়েকদিনের টানা পরিশ্রমের পর মোটামুটি গুছিয়ে আবার নতুন করে জীবন গড়ার প্রয়াস শুরু করে। মিমি দেশে ক্লাস ফোরে উঠেছিল। এ-পারে এসে আর পড়া হয়নি। লতিকা ওকে ক্লাস ফাইভে ভরতি করে দিলেন। স্কুলটা শুধুই মেয়েদের। একটু দূরে। হেঁটেই যাওয়া-আসা করে মিমি। মাকে বলে, দেশের স্কুল তো আরও দূরে ছিল।

লতিকা বোঝায়, ওটা ছিল নিজেদের দেশ। সব চেনাজানা মানুষ। এটা একটা অন্য শহর। কত মানুষ! সব অচেনা। সব সময় সাবধানে চলাফেরা করবি।

বটু কোনো চাকরির সন্ধান না পেলেও, সুপাত্র সন্ধানী মেয়ের বাপ-মা-রা লতিকার কাছে একের পর এক প্রস্তাব নিয়ে আসে। এ-দেশে বিয়ের জন্য বয়স ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা লাগে না। এমনকী বেকার পাত্রের জন্যও বরপণের সম্পন্ন প্রতিশ্রুতি মেলে। বরপণ আসলে কন্যাদায়-মুক্তিপণ।

ছেলের চাকরি না-হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবছেন না বলে লতিকা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। না-ছোড় পাত্রীপক্ষ বলে, গ্র্যাজুয়েট ছেলে আপনার। আজ হোক কাল হোক চাকরি একটা পাবেই। কথা হয়ে থাকতে দোষ কী! উদ্যোগী ছেলে আপনার, এখনও তো ঠিক বসে নেই।

গোটা-চারেক টিউশনি করে মাসে বটু পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে। তাও সারা বছর নয়। কীভাবে যে সংসার চালান লতিকা তা কেউ ধারণাও করতে পারবে না। দেশ থেকে যা আনতে পেরেছিলেন তা প্রায় নিঃশেষ। সামান্য যে দু একটা গহনা পড়ে আছে তা মিমির বিয়েতে দেবেন না ছেলের বিয়েতে, সেই সংশয়ের কথাও কাকে বলবেন?

লতিকা প্রবল বিপন্ন বোধ করেন সস্ত্রীক হলধর সাহার প্রস্তাবে। হলধরের স্ত্রী করালীবালাই ইতস্তত গলায় শুরু করে, দিদি, আপনারা মানী মানুষ। শুনেছি আপনার বড়ো ছেলে স্বদেশি করে জেল খেটেছে। ওদের বাবাও নামী মাস্টার ছিলেন। আগের দিন হলে আমাদের সাহসই হত না। দেশে কোনো ভদ্র কায়স্থ নমশূদ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করত! তবে আপনার ছেলে বটুকে আমাদের বড়ো পছন্দ।

হতবাক লতিকা বিশ্বাসই করতে পারেন না যে হলধর সাহার মতো অন্ত্যজ এমন অসম্ভব প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে আসতে পারে। দেশ হলে বা বটুর বাবা বেঁচে থাকলে ওরা ঘরেই ঢুকতে পারত না। শুধু নানা ধান্দা করে টাকা করেছে বলেই জাতে উঠে গেছে! অন্তরের ক্রোধ প্রশমিত করে বললেন, আমার ছেলে বেকার। আমাদের অবস্থাও আপনাদের অজানা নয়। এই অবস্থায় বটুর বিয়ের কথা ভাবতেও পারি না। তা ছাড়া আমার মেয়েও বড়ো হচ্ছে। তার বিয়ের কথাও চিন্তা করতে হবে।

হলধর বলে, আমার তিন মেয়ে, দু-জনের বিয়ে হয়ে গেছে। এক জন থাকে বম্বেতে, আর একজন গৌহাটি, ছোটোর মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে দেওয়ার ইচ্ছে। বটুর কাজের জন্য ভাববেন না। আমি তো আছি। আমার কাজ-কারবার ওই দেখবে। আপনার মেয়ের বিয়েরও আয়োজন হয়ে যাবে। সম্বন্ধ হলে আমরা তো আর পর থাকব না।

—কিন্তু আমি কি মেয়ের জন্য আর পালটি সম্বন্ধ পাব?

—আপনি জাতের কথা ভাবছেন? এখানে কে কাকে চেনে, কেই-বা মানে। ওসব উঠেই গেছে। সব মানুষই সমান এখন। তবে আমি খরচার কোনো ত্রুটি রাখব না। আপনি যা বলবেন আমি রাজি।

করালীবালা বলল, বিশ-ভরি গয়না আমি করিয়ে রেখেছি, অন্য সব —

স্ত্রীকে বাধা দিয়ে হলধর বলে, আমার মেয়ে তো পাকা বাড়িঘর, কল-বাথরুমে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তো, আমি আপনাদের বাড়িটা করে দেব। নগদও দেব কিছু — বিয়ের খরচ বাবদ।

মাথার মধ্যে আগুন জ্বললেও নিজেকে সংযত রাখেন লতিকা। বলেন, বটু আসুক। ওর সঙ্গে কথা বলি।

— বটু গেছে কোথায়? — হলধর জানতে চায়।

— কলকাতা। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে।

— বাঃ, খুব ভালো খবর। ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

বটু ফিরেছিল বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে। এত দূর থেকে কত আশা নিয়ে গিয়েছিল। সব ভাঁওতা। আই-ওয়াশ। ইন্টারভিউর ডাক পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থেকেই বুঝে গিয়েছিল, নেওয়ার লোক ঠিক হয়েই আছে। প্রশ্ন শুনে আর সন্দেহ থাকে না। শনি গ্রহের ওজনের সঙ্গে জুনিয়র ক্লার্কের চাকরি কী সম্পর্ক তা কেবল হয়তো প্রশ্নকর্তাই বলতে পারেন।

হলধরের প্রস্তাবের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয় বটু। লোকটা ভেবেছে কী? নিজের ব্যাবসা দেখার কাজে লাগাবে? ঘরজামাই করবে? অবশ্য শূর্পণখার মতো ও-মেয়েকে আর কীভাবেই বা পার করবে হলধর!

লতিকা ছেলেকে বোঝান, রাগারাগি করিস না। আমি কোনোমতে টালিয়ে দেব।

সমিতিতে হলধরের বিরোধী চন্দ্রনাথ ঘোষ। ফরোয়ার্ড ব্লক করেন। তাঁর বিশাল কারবার। পেল্লায় বাড়ি। গাড়ি হাঁকিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দেন। তাঁর ছোটো ছেলে অধীর তিনবার ম্যাট্রিকে ফেল করে স্থানীয় হোমিওপ্যাথির ডাক্তার অনুকূল হাজরার মেজো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। বটুকে দিয়ে প্রেমের চিঠি লেখায়। জবাব পেলে বটুকে পড়তে দেয়। নইলে আবার লিখবে কীভাবে! এই পরম গোপন কথা বটু বিশ্বস্ত নিষ্ঠায় গোপন রেখেছে। তারই পুরস্কার-স্বরূপ অধীর বটুকে বাবা চন্দ্রনাথের কাছে হাজির করিয়ে বলে, বাবা, ও প্রচণ্ড লেখাপড়া জানে। ওকে তোমার সেক্রেটারি করে নিলে অন্য কাজের সঙ্গে তোমার স্পিচ-টিচও লিখে দিতে পারবে।

বটুকে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে চন্দ্রনাথ বললেন, তুমি স্পিচ লিখতে পার? কোন্ ভাষায়?

— আজ্ঞে, ইংরেজি বাংলা দুটোতেই পারব।

— ইংরেজি বিশেষ লাগবে না। বাংলা হলেই চলবে। তবে হ্যাঁ, ইংরেজির একটু মিশেল থাকা ভালো। মানে — দু-একটা কোটেশন গোছের। তোমার কাছে কোনো স্যাম্পেল আছে?

— স্যাম্পেল — স্পিচের স্যাম্পেল?

— হ্যাঁ — আগে যেসব লিখেছিলে —

— আগে তো লিখিনি।

— তবে যে অধীর বলল —

—ওঃ। সেসব তো জমা হয়ে গেছে। পরীক্ষার খাতায়। কপি তো রাখিনি।

— শোনো, কালকের মধ্যে তুমি একটা ড্রাফট তৈরি করে আনো। সেটা দেখার পর ভাবব তোমার জন্য কী করা যায়।

— কোথায়, কীসের ওপর ভাষণ দেবেন যদি বলেন এবং আপনি কী বলতে চান, তার একটু আভাস যদি দেন —

— নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে তো বলতে হবেই।

এ-পরীক্ষা সহজ ছিল বটুর কাছে। চন্দ্রনাথ বক্তৃতার খসড়া দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পর প্রসন্নতার আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। কারণ পার্টি-নেতৃত্ব ওই ভাষণে খুবই প্রভাবিত। তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, পরের নির্বাচনে দাঁড়াবার সুযোগ পাবেন। বটুকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করা হল। বেতন মাসে দেড়শো টাকা।

তিন মাসের মধ্যেই সমিতির বৈঠকে চন্দ্রনাথ, হলধর সাহাকে সদলে হারিয়ে দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সমিতির অফিসঘর থেকে বেরিয়ে হলধর বটুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

বলে, আত্মীয়তার বদলে শত্রুতা পছন্দ করলে! পরে আমাকে দুষো না যেন।

চন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যস্ত সময় কাটে বটুর। আর্থিক উদ্বেগ প্রশমিত হওয়ায় লতিকার মুখে স্বস্তি। হলধরের সঙ্গে দূরত্ব ঘটায় আত্মিক নিশ্চিন্তিও বাড়ে। তৈরি হয় নতুন আকাঙ্ক্ষা। মাটির মেঝে, টালির চাল, দরমার বেড়া, শীতে বর্ষায় কত কষ্ট। মেঝেটা যদি পাকা করা যেত! সম্ভব না। মাসের শেষে দু-চার টাকা যদি বাঁচাতে পারেন, তা তুলে রাখেন মিমির বিয়ের জন্য। মেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে। ক্লাস সেভেনে পড়লেও বাড়ন্ত গড়নের জন্য দেখায় অনেক বড়ো। সেটাই আরও ভয়ের বিষয়। মুখের গড়ন, শরীরের বাঁধুনি দুই-ই ভালো। লতিকার মনে হয়, সারাক্ষণ যেন গলায় কাঁটা বয়ে বেড়াচ্ছেন।

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় অবিশ্বাস্যভাবে তড়িঘড়ি বিয়ে হয়ে যায় মিমির। প্রায় বিনা খরচে। পাত্র হিমাদ্রি নন্দী ম্যাঙ্গালোরে থাকে। মিমিকে নাকি একটা ফাংশনে আবৃত্তি করতে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে। বিয়ে করে ফিরতে চায়। হিমাদ্রিকে দেখে লতিকা ভাবেন এমন ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল মিমি। সুদর্শন, সুপুরুষ হিমাদ্রি কথাবার্তায় নম্র। অথচ বিদেশে থাকার স্বভাবদীপ্তিতে উজ্জ্বল। পাত্রপক্ষের কোনো দাবি নেই। আসবাবপত্র কিছু দিতে হবে না। কেন না, বিয়ের দু-দিন পরেই ওরা চলে যাবে। ম্যাঙ্গালোরে হিমাদ্রির বিশাল বাড়ি, গাড়ি।

বটু কলকাতায় ছেলের কাকার বাড়ি দেখে অবাক যেমন হয়, আশ্বস্তও বোধ করে। তালতলায় বনেদি বাড়ি। সর্বত্র স্বাচ্ছল্য ঝলমল করছে। হিমাদ্রি জানায়, ওর মা-বাবা অল্প বয়সেই মারা গেছে। কাকার কাছেই মানুষ। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। কাকাই পড়িয়েছেন। না চাইতেই ডিগ্রির প্রমাণপত্র দেখায়। বটু মৌখিক আপত্তি করে — কী দরকার!

কাকা বলেন, না-না। দেখবে বইকী। নিশ্চয় দেখবে। বোনের বিয়ে বলে কথা। নিঃসংশয় না হয়ে কি দেওয়া যায়।

নয় নয় করেও লতিকা মেয়েকে দশ ভরি গয়না দিলেন। নতুন জামাকাপড়, প্রসাধনী ও দিলেন সাধ্যমতো। চন্দ্রনাথ কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

বিয়ের পরদিন মিমিকে নিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় হিমাদ্রি বলল , আমরা আগামীকালই চলে যাব। জরুরি তলব অপিস থেকে। আবার এলে দেখা হবে।

— ধুলো পায়ে আসার যে একটা নিয়ম ছিল — লতিকা বলেন।

— ওটা পালন করা সম্ভব হচ্ছে না।

— বউভাত — ফুলশয্যা —

ওসব ম্যাঙ্গালোরে হবে।

লতিকা মেয়েকে বলেন, গিয়েই চিঠি দিস।

পনেরো দিনে কোনো চিঠি বা খবর না পেয়ে লতিকা বটুকে পাঠান হিমাদ্রির কাকার বাড়িতে। দারোয়ান জানায়, ও-বাড়িতে রসময় নন্দী বা হিমাদ্রি নন্দী বলে কেউ থাকে না। বাড়ির মালিক হরিদেব সাহা তীর্থে গেছেন। মাসখানেকের আগে ফিরবেন না।

বটু বলল, আমি নিজে এসে রসময় নন্দী আর তার ভাইপোর সঙ্গে কথা বলে গেছি। এক মাসও হয়নি এখনও।

অনেক ভেবে দারোয়ান জানায়, হ্যাঁ, এক বুড়ো বাবু আর জোয়ান ছোকরা এসেছিল, মনে পড়ছে। তারা তো একবেলা থেকেই চলে গেছে।

বটুর মনে পড়ে ওই একদিন ছাড়া আর এ-বাড়িতে আসা হয়নি। বর নেওয়ার জন্যও কাউকে পাঠানো হয়নি। রসময় বলেছিলেন বাড়িতে কোনো মহিলা নেই। তাই স্ত্রী-আচার কিছুই হবে না। অকারণে অত দূর থেকে কারুকে পাঠাবার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই গাড়ি নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। গিয়েছিলও তিনটে গাড়ি। সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। ফুল দিয়ে সাজানো বড়ো গাড়ি, বরসাজ, বরযাত্রী — কোনো ত্রুটি ছিল না আয়োজনে।

বটু বলল, ওঁরা কোত্থেকে এসেছিলেন, কোথায় গেছেন জানো কিছু?

— না, বাবু। তীর্থে যাওয়ার আগে বড়োবাবু বলেছিলেন, হলধরবাবু কারুকে পাঠালে খাতির করে থাকতে দিতে।

— হলধরবাবু — মানে বসন্তপুরের?

— তা তো জানি না। তবে হলধরবাবু আমাদের বড়োবাবুর ভায়রাভাই। বাবুরা কেউ না থাকলে তিনিই এসে দেখভাল করেন।

আর কিছু জানার থাকে না। নিজের চূড়ান্ত বোকামির কথা ভেবে নিজের ভিতরে দীর্ণ হয় বটু। হলধর ভয়ংকর প্রতিশোধই নিয়েছে। অথচ ওকে স্পর্শও করা যাবে না। এ-বাড়িতে ও যে এসেছিল বটু ছাড়া আর কোনো সাক্ষী নেই। সেদিন দারোয়ানকেও দেখেনি। দারোয়ানও দেখেনি তাকে। বর নিতে কেউ আসেনি। কনের সঙ্গেও কেউ যায়নি। যাওয়ার মতো কেউ ছিল না। আর পর দিনই ওরা ম্যাঙ্গালোরে চলে যাচ্ছিল।

ম্যাঙ্গালোরে খোঁজ নেবে? বটুর মনে হয়, সেটাও ভাঁওতা। হয়তো নীলগিরি ইঞ্জিনিয়ারিং বলে কোনো কোম্পানিই নেই। থাকলেও সেখানে হিমাদ্রি নন্দী বলে কারও অস্তিত্ব থাকবে কি?

মুখের আঁচলে ভিতর থেকে উদ্গত আর্তনাদ যথাসাধ্য চাপা দিয়ে মিমি বলল, বড়দা, আমাকে আর কিছু বলতে বোলো না। আমি পারব না বলতে। বলার কিছু নেইও। বিয়েটা ছিল বিশাল ধোঁকাবাজি। আমি লুঠ হয়ে গেলাম। তার পর হাত-বদল।

স্তম্ভিত উদয়ন করুণ চোখে আদরের বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাষাহীন চেয়ে থাকে। খবরের কাগজে কখনও কখনও এমন ঘটনার কথা পড়েছে। নাটক-নভেলেও ঘটতে পারে। দূর থেকে বড়োজোর আহা উহু করেছে। মানুষ সাধারণত তাই করে। কিন্তু যখন তেমন ঘটনা নিজের পারিবারিক জীবনে ঘটে, তখন কী করে মানুষ? কী করতে পারে? অসহায়তার কাছে নতজানু হয়? দীর্ণ হয় আত্মধিক্কারে? নাকি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। কার বিরুদ্ধে?

উদয়ন বলল, হিমাদ্রি এখন কোথায়?

— জানি না। ঠিক দু-দিন ছিল। তার পর আর দেখিনি।

— আর কখনও আসেনি বা যোগাযোগও করেনি?

— না, বড়দা। সেটাই একটা পরম শান্তির।

— তা হলে নামের মধ্যে নন্দী জুড়ে রেখেছিস কেন?

— ঘৃণায়। আর প্রতিশোধস্পৃহায়। ওই শব্দটা প্রতি মুহূর্তে আমাকে মনে করিয়ে দেয় হিমাদ্রি নন্দী নামক কসাইয়ের কথা।

একটু থেমে আবার বলে মিমি, সরকার পদবি লিখে তোমাদের অপমান করার অধিকার

আমার নেই, বড়দা।

ছোটোবোনের মাথায় হাত বুলিয়ে উদয়ন বলল, বসন্তপুরের ঠিকানাটা বল, আমি কালই তাহলে —

— কোথায় যাবে বড়দা? ওখানে এখন আমাদের আর কেউ নেই।

— মানে! মা — বটু —

মিমি জানায়, আমিও কোনো খবর জানতাম না। খবর নেওয়া সম্ভবও ছিল না। 'নবীন ভুবন' করে একটু নাম হলে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম বসন্তপুরে। মাকে দেখার জন্য আমি ছটফট করছিলাম। তখন কি আর জানতাম, মাকে আর কোনোদিনই দেখতে পাব না। — বলতে-বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে মিমি।

উদয়ন কিছু বলতে পারার আগেই মিমি যোগ করে, মা আমার সো-কলড বিয়ের মাস দুয়েকের মধ্যেই গলায় দড়ি দেন। অপমান কটূক্তি, সামাজিক লাঞ্ছনার দুর্বাক্য অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মেজদা কিছুদিন পর বাড়ি বিক্রি করে কোথায় চলে গেছে কেউ বলতে পারে না।

— তা হলে বটু এখন কোথায়?

— জানি না, বড়দা।

বোনের ফ্ল্যাট ছেড়ে আসার সময় উদয়ন বলে, দেখিস, বটুও হয়তো আমারই মতো তোকে খুঁজে বের করবে। তখন ওকে আমার মেসের ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলিস।

৪.

ভারত-চীন যুদ্ধের আয়ুষ্কাল ছিল এক মাস। ২০ অক্টোবর, ১৯৬২ নামকা চু উপত্যকায় চীনা আক্রমণে যার সূত্রপাত। প্রথম থেকেই ভারত পর্যুদস্ত। তবু দেশপ্রেমের তরল উচ্ছ্বাসে আহুতি হিসেবে নেতৃবৃন্দ আবোল-তাবোল ভাষণ এবং পরস্পর দোষারোপে ব্যাপৃত থাকলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, বিশ্বাসহন্তা চীন পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। গৃহমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বললেন আমাদের উপযুক্ত প্রস্তুতির দরকার ছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বললেন কুছ পরোয়া নেই। আমরা ওদের ঠিক মোকাবিলা করব।

অথচ ভারতীয় সৈন্য কেবলই পিছু হঠতে থাকে। চিনা সৈন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বমডিলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তেজপুর আর সামান্য দূর। তেজপুরের পর কি গুয়াহাটি? সারা দেশে আতঙ্ক। গুজব। তবে কি ভারত আরও একবার বিদেশের অধিকারে চলে যাবে? নাকি রাশিয়ার লালফৌজের মতো চীনারাও ভারতে কমিউনিস্ট শাসনপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবে?

অসমের মানুষের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভ, অভিযোগ। তারা মনে করে দিল্লি অসমের সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। কেউ-কেউ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, অসমিয়াদের উচিত চীনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিল্লিওয়ালাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া। অবস্থা প্রশমিত করার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের বিশেষ অনুরোধে প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসেবে ছুটে আসেন গৃহমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

ঘটনাক্রমে সেদিনই, ২০ নভেম্বর, ১৯৬২, চীন একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে জানায় ১ ডিসেম্বর থেকে চীনা সৈন্য কুড়ি কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়ে নভেম্বর ৭, ১৯৫৯-এর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার আড়ালে স্থান নেবে।

এরই মধ্যে একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে বাবাই বলে, দিদা শুনেছ, চীনারা তেজপুরে

এসে গেছে। তাহলে এখানে এসে যাবে, তাই না?

যমুনা অবিশ্বাসের চোখে নাতির দিকে তাকান। দেশে থাকতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু স্মৃতি আছে তাঁর। ঝাঁক-বাঁধা উড়োজাহাজ দেখতে উঠোনে ছুটে-ছুটে আসতেন। বোমা ফেলার, বোমা পড়ার গল্প শুনেছেন। কিন্তু সত্যি-সত্যি বোমা পড়তে দেখেননি কখনও। এবারও কতদিন ধরে যুদ্ধ লেগেছে শুনছেন। তবে বোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। বোমারু বিমানের ওড়াওড়িও চোখে পড়ছে না। প্রণতি বলেছিল, সীমান্ত-যুদ্ধ এটা। মানেটা ঠিক বোঝেননি যমুনা। সব যুদ্ধই তো সীমান্ত-যুদ্ধ। সীমা অতিক্রম করার জন্যই তো যত সংগ্রাম?

— তোমাকে কে বলল দাদুভাই?

— সবাই বলছে। মেসোমনিও বলল।

— কী বলেছে পবিত্র?

— চীনারা তেজপুরে এসে গেছে। এখন রঙ্গিয়া হয়ে এদিকে আসবে, না গৌহাটি যাবে তা বলা যাচ্ছে না। এদিকে এলে কী হবে দিদা? আমাদের ধরে নিয়ে যাবে? নাকি মেরে ফেলবে?

নাতিকে বুকে জাপটে ধরে যমুনা বলেন ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। এসো, দুধটা খেয়ে নাও।

— না। খাব না।

— কেন রে?

— ভালো লাগছে না।

— আমার যে অনেক কাজ রয়েছে, দাদুভাই।

— তুমি করো তোমার কাজ।

আচমকাই বাবাইয়ের উদয়নের কথা মনে পড়ে। মাস্টারমামা যে কোথায় চলে গেলেন! থাকলে নিশ্চয়ই এই যুদ্ধের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেন। ঠিক বলতে পারতেন চীনারা এদিকে আসবে নাকি গৌহাটি যাবে। কিংবা ওরা এলে ওদের নিয়ে কী করবে। সৈন্যদের বন্দি করবে। সৈন্যদের বন্দি করে নিয়ে যায়, বাবাই পড়েছে। ওর মতো ছেলেকেও কি বন্দি করবে? বন্দিদের নাকি খুব খাটায়। কিন্তু ওকে বন্দি করলে মা-দিদার কী হবে? কত প্রশ্ন মাথায় আসে আজকাল। কোনো জবাব পায় না। মেসোমনিকে জিজ্ঞেস করলে, এমন হেসে ওঠেন মনে হয়, জিজ্ঞেস না-করলেই ভালো হত। ও যেন এখনও শিশু রয়েছে!

আর তেমনই হয়েছে সবিতাদি। মাত্র তো দু-বছরের বড়ো। ভান করে যেন ঠানদি। কিছু বললেই বাঁধা জবাব, ছেলেমানুষের অত কৌতূহল কেন? বড়ো হলে বুঝতে পারবি।

চীনারা এখানে আসবে, না গৌহাটি যাবে তার সঙ্গে বড়ো হওয়ার কী সম্পর্ক? সবিতার এখন প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গী তরলা। এক ক্লাসে পড়ে দু-জনে। ওকে দেখলেই তরলা খালি হাসে আর এমন ছড়া কাটে যার অর্থ বাবাই আদৌ বোঝে না। এমন রাগ হয় তখন। ভাবে আর কখনও যাবে না ও-বাড়ি। তবু যেতে হয়। ওদের রেডিয়ো আছে। রেকর্ডপ্লেয়ার আছে। রোজ খবরের কাগজ আসে। এসবের দুর্জয় আকর্ষণে না গিয়ে পারে না বাবাই।

ওদের ওখানে না-গেলে জানতেই পারত না, দেশের গোলাবারুদের কারখানায়, হ্যারিকেন তৈরি হত। অত নামী প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন নিজের অযোগ্যতার জন্য পদচ্যুত। কমিউনিস্টরা নাকি চীনাদের মদতে ক্ষমতা দখল করবে।

মেসোমনি ঘোর কংগ্রেসি। বলে কমিউনিস্টদের সব জেলে পোরা উচিত।

মাস্টারমামা যেসব গল্প শুনিয়েছিল তার সঙ্গে এসব একদম মেলে না। মাস্টারমামা কি কমিউনিস্ট? কাদের আসলে কমিউনিস্ট বলে? মাস্টারমামাকেও কি তবে জেলে পুরবে? মাস্টারমামা নাকি অনেকবার জেল খেটেছে স্বদেশি আন্দোলনে। এবারে জেলে গেলে কি ওকে বিদেশি বলবে?

বাবাই যখন এমন সব কঠিন প্রশ্নাবলী নিয়ে মুহ্যমান তরলা ওকে দেখেই বলে — হাত নাই, পাও নাই, রসিক নাগর / অনায়াসে পার হয় অকূলসাগর। বল্ তো কী? ঠিক উত্তর দিলে তোকে দারুণ একটা পুরস্কার দেবো।

বাবাই বলল, আর-একবার বলো।

তরলা দু-বার বললেও, বাবাই জবাব দিতে পারে না।

তরলা বলে, সবিতা, তোর ভাইটা একটা হাঁদারাম।

সবিতা বলে, এই খবরদার। বাবাইয়ের পিছনে একদম লাগবি না। তোর ধাঁধার উত্তর, সাপ।

তরলা বলল, লাগব না, যদি এটা বলতে পারে —

রাজার বাড়ির চৌকারি,
যোলো হাজার কেওয়ারি;
এক বেতের বান
পুন্নিমার চান

সবিতা বলল, বাবাই, এটা তো সোজা। বলে, ছড়াটা আবার উচ্চারণ করে।

— বল্, কী?

বাবাই মাথা নাড়ে। — তুমি বলো।

সবিতা বলল, মৌচাক। দেখিসনি কখনও।

— না, দেখিনি। — পর মুহূর্তেই বলল, হ্যাঁ, দেখেছি, ছবিতে।

তরলা বলল, বড়ো হও খোকাবাবু, তখন আসল মৌচাক দেখতে পাবে।

বলতে বলতে চোখ টিপে তরলা সবিতার দিকে তাকায়। সবিতা ঠোঁটের ফুটে-ওঠা-হাসি আড়াল করতে ভ্রূ কুঁচকে বলে, তুই থামবি!

ভাইকে বলল, নতুন রেকর্ড কিনেছি কাল। চল্ শুনবি।

একটু পরেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বেজে ওঠে, 'আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে!'

বাবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে আর ভাবে এমন অত্যাশ্চর্য কণ্ঠ কী করে হয় একজন মানুষের! ও যদি একটু সামান্য অংশও পেত তবে নিজেকে ধন্য মনে করত।

গান শেষ হলে বাবাই বলল, দিদিভাই, *গীতবিতানটা* দাও না একটু, গানটা লিখে নেবো।

তরলা বলল, কেন, গাইবি নাকি?

বাবাই বলল, আমি কী করে গাইব। কথাগুলো এত সুন্দর। মনে-মনে আবৃত্তি করব।

ওর মাথার মধ্যে গুনগুন করে, কোন্ ভিখারি হায় রে। এল আমারি এ অঙ্গনদ্বারে —

চীন-ভারত যুদ্ধ শেষ হলেও কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার অব্যাহত থাকে। ধীর গতিতে বন্দি

নেতাদের ছাড়া শুরু হয়। উদয়নকে শেষপর্যন্ত কোথাও আশ্রয় নিতে হয়নি। মেসেই কাটিয়ে দিয়েছে।

ওর খোঁজে পুলিশ আসেনি। যদিও চেনাজানা অনেকেই জেলে। দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা আর ডি. আই. আর. (ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া) রুল নামক এক কবন্ধ আইনের দুরন্ত তাণ্ডব। চীনাপন্থী ঘোষণা করে, বেছে-বেছে কিছু নেতাকে ধরা হয়েছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারকে সেজন্য তীব্র অস্বস্তিতেও পড়তে হয়েছে। যেমন নাম্বুদ্রিপাদের গ্রেফতার। গৃহমন্ত্রী পরে স্বীকার করেন, ওটা ছিল বৃহত্তম ভ্রান্তি।

এই প্রবল টানাপোড়েন আর চাপান-উতোরের মধ্যে উদয়নের দিশাহারা লাগে। একটু-একটু করে বুঝতে পারে ভারতের কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী আন্দোলনের করুণ অবস্থার মর্মকথা। দেখে কমরেডদের মধ্যে কী নিদারুণ হুড়োহুড়ি, কে কত ডানপন্থী দেশপ্রেমী প্রমাণের জন্য। বলা হয় মোটামুটি চক্রান্ত করেই পরবর্তীকালে বামপন্থী কমিউনিস্টদেরই জেলে পোরা হয়েছিল। এমনকী যুদ্ধবিরতির ছয় মাস পরও কমিউনিস্ট পার্টি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের দাবি করেনি। বরং পার্টি চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে এক অনুষ্ঠানে জরুরি অবস্থা চালু রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পার্টির ভিতর দ্বন্দ্ব তীব্রতর হতে থাকে।

বাইরে গণ আন্দোলনও ক্রমশ দানা বাঁধে — বন্দিমুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নানা বিষয়ে। সারা দেশজুড়ে কংগ্রেস-বিরোধী বাতাবরণ ধূমায়িত হয়ে ওঠে।

মুক্তি পেয়ে উদয়নের সঙ্গে দেখা করতে আসে প্রবোধ। ওকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয় উদয়ন। পারস্পরিক সমাচার বিনিময়ের পর প্রবোধ বলল, বুঝতে পারছি না এভাবে কতদিন পার্টি চলবে।

— এ-কথা কেন বলছ?

— ডাঙ্গেরা পার্টিটাকে একেবারে কংগ্রেসের লেজুড় করে দিতে চাইছে। রিভিশানিজমের চূড়ান্ত। ভূপেশ গুপ্ত, বাসবপুন্নাইয়াদেরও কোনো প্রস্তাব ও পরামর্শ শুনতে চাইছে না। ন্যাশনাল কাউন্সিল একটা কুক্ষিগত স্বৈরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

— ই. এম. এস. কী বলছেন?

শব্দ করে হেসে ওঠে প্রবোধ, তোমার দুষ্টুবুদ্ধি এখনও গেল না। ই.এম.এস. কি আমাকে আলাদা করে কিছু বলবেন! কাগজে তুমি যা পড়েছ আমিও তাই জানি।

— তা কেন হবে। পার্টির ভিতরে নিশ্চয়ই বিশদ আলোচনা হয়।

— হলেও তোমাকে বলব না। তুমি তো মেম্বার হলে না।

— কী জানি ভাই, আমি আর যেন কিছুতেই আগ্রহ পাই না।

শুনি না আর সমুদ্রের গান
থেমেছে রক্তে ট্রামবাসের বেতাল স্পন্দন। (সমর সেন)

প্রবোধ বলল, স্কুলে যাচ্ছ তো ঠিকঠিক?

— হ্যাঁ, ভাই। তুমি কাজটা পাইয়ে দিয়ে কী যে উপকার করেছ —

— উদয়ন! প্রবোধ ধমকে ওঠে — তুমি তো আমার জন্য কিছু করছ না।

— কী করব, বলো।

— চা বলবে, চা আর শিঙাড়া।

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে দুই পুরোনো বন্ধু টুকরো-টুকরো কথা বলে। ফিরে আসে স্মৃতি। স্মৃতির মানুষ, ঘটনা। জেলারের হঠকারিতার প্রতিবাদে তিন দিনের অনশন।

প্রবোধ বলে, সেসব দিনের কথা ভাবলে মনে হয়, এত মানুষের এত ত্যাগ, এর কি কোনো মূল্য নেই?

— আছে। তাই, স্বাধীনতা পেয়েছ।

— কিন্তু ওই ঘেয়ো বিবর্ণ স্বাধীনতা কিআমরা চেয়েছিলাম?

কোনো উত্তর জোগায় না। স্তব্ধ সময় বয়ে যায় খানিক। নীরবতা ছিঁড়ে উদয়ন বলে, আমার এখন খালি রবার্ট ফ্রস্টের কথা মনে পড়ছে —

The present
Is too much for the senses,
Too crowding, too confusing —
Too present to imagine.

৫.

ক্লাস নাইন চলছে বাবাইয়ের। আর দু-বছর পর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। মা সারাক্ষণ বলেন, ভালো রেজাল্ট করতে হবে। কখনও রেজাল্ট খারাপ করেনি এ-যাবৎ। তবু মা-র মনে সংশয় থাকেই। পরীক্ষা, রেজাল্ট পার্সেন্টেজ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে না বাবাইয়ের। ওর কত কী জানতে ইচ্ছে হয়। কত বই পড়তে ইচ্ছে করে। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে কিছু কিছু আনে। মাঝে মাঝে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটেও যায়। পড়ার বই ছাড়া অন্য বই দেখলেই মা আপত্তি করে। বলে, এসব পড়ার অনেক সময় পাবি, কিন্তু রেজাল্ট ঠিক না হলে জীবনে কোথাও ঠাঁই পাবি না।

ঠাঁই পেতে কে চায়? রামনাথ বিশ্বাস কি চেয়েছিলেন? সাইকেলে চেপে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ালেন কেন তবে? তিনি কি ভুল করেছিলেন? লিভিংস্টোন? স্যার রিচার্ড বার্টন। ১৮৫৩ সালে যিনি মুসলমান সেজে মক্কায় গিয়ে কাবা দর্শন করে লিখেছেন সুবিখ্যাত গ্রন্থ *এ পিলগ্রিমেজ টু এল-মদিনা অ্যান্ডমক্কা*, পরে ষোলো খণ্ডে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন সম্পূর্ণ *অ্যারাবিয়ান নাইটস*। ঘরে বসে শুধু বই পড়লে এত সব করতে পারতেন?

নিজের সাইকেল না-থাকলেও বাবাই সাইকেল চড়া শিখেছে ভালো। কোনোক্রমে একটা সাইকেল জোটাতে পারলে রামনাথ বিশ্বাসের মতো বেরিয়ে পড়তে পারবে না? লুকিয়ে যেতে হবে। কান্নাকাটি করে দিদা কিছুতেই যেতে দেবে না। নিজেও কি দিদাকে ছেড়ে যেতে পারবে? মাকে? মা-দিদাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা মাথায় এলেই সব সংকল্প মুছে যায়। তখন অস্থির লাগে। নিজেকে অসহায় মনে হয়। মন খুলে যে কারুর সঙ্গে কথা বলবে তারও উপায় নেই। সবিতাদিকে বলতে ইচ্ছে করে। তবে ওকে বলা মানেই তরলার সামনে ঝাঁপি খোলা। পর্যটক হওয়ার কথা ভাবছে শুনেই হয়তো একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করবে, কয়েকদিন আগেই যেমন করেছিল —

আলু পাতা ঠাল্লুর ঠুল্লুর বিল্লী পাতা কেশ।
নয়া রাজা দীঘি দিছে পূবে তাহার দেশ।

বল তো কী?

এসব হেঁয়ালি বাবাইয়ের মাথায় ঢোকে না। পরে জেনেছিল ওর মানে সূর্য।

তার সঙ্গে তরলার ঝরঝর হাসি আর চোখের কুঞ্চন ওকে রহস্যময়ী করে তোলে। বাবাই একটুও স্বস্তিবোধ করে না। অথচ ওকে দেখতে ভালো লাগে। ইচ্ছাও হয়। ইচ্ছা হয় বলে ভয়ও পায়। মনে হয়, ইচ্ছাটা অনুচিত। তাই ভয়? নাকি দোদুল্যমানতা!

বরং অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করে ফাদার জোনসের সঙ্গে কথা বলে। ফাদার খুব ব্যস্ত মানুষ। তবুও গেলে সস্নেহে কথা বলেন। কখনও-কখনও দু একটা বই দেন। বলেন, নিজের লক্ষ্যে অটুট থাকবে। সেইসব ছোটো মাপের মানুষের কাছ থেকে দূরে থেকো, যারা তোমার স্বপ্নকেও ছোটো করতে চায়।

ফাদার পড়াশোনা ছাড়াও নানা বিষয়ে কথা বলেন। বাবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে। একদিন চাঁদে নামা প্রথম মানুষ নিল আর্মস্ট্রংয়ের গল্প বললেন। জানা কাহিনীও ফাদারের কাছে শুনতে শুনতে যেন ভিন্নতর জগতে চলে গিয়েছিল। মজার সুরে ফাদার বলেছিলেন, ধরো, মাঝ রাস্তায় নেমে পড়ার সুযোগ থাকলে আর্মস্ট্রং কি কখনও চাঁদে পৌঁছাত ?

বাবাই বলে, নেমে পড়বে কেন?

— ভয়ে, অনিশ্চয়তার আতঙ্কে।

— নেমে গেলে গন্তব্যে পৌঁছবে কী করে?

— রাইট! এই কথাটা মনে রেখো।

আজ খেলার মাঠে হাফটাইমে ফাদারের কথাগুলো মনে পড়ল বাবাইয়ের। কোনো গোল হয়নি। ফাইনালে ওদের জিততেই হবে। পায়ে চোট পাওয়ায় যথেষ্ট জোরে ছুটতে পারছে না। কিন্তু গন্তব্য — গোল আজ চাই। দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই দুরন্ত খেলে বাবাই। রাইট আউট থেকে একের পর এক সেন্টার পাঠাতে থাকে। হঠাৎ জায়গা বদল করে পেনাল্টিবক্সে ঢুকে বাঁ পায়ে তীব্র শট নেয়। গোলকিপার ভেবেছিল ডান পায়ে মারবে। বল ডান দিকের পোস্ট ঘেঁষে গোলে।

খেলাশেষে খুশির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে বাড়ির পথ ধরে। যে যার নিজের পথে চলে গেলে ওদের পঞ্চপাণ্ডবের ছোটো দল একসঙ্গে ফিরছিল। নরেশ ডেকা, দিবাকর রাভা, নীতিশ শর্মা, দেবল দত্ত আর বাবাই। বাবাই ছাড়া সবারই সাইকেল আছে। অন্য দিন কেউ না কেউ ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। আজ শেষ বিকেলের আলোয় ক্লান্ত শরীরে হেঁটে ফিরতে ভালোই লাগছে। খেলার কথাই ঘুরে ফিরে উঠছে।

দিবাকর বলে, বাবাই, ইমন ধুনিয়া (দুর্দান্ত) খেলিছে! ময় আগতে দেখা নাই।

নীতিশ বলল, গাওতে জুই লাগিছিল নাকি? (শরীরে আগুন লেগেছিল?)

নরেশ হেসে বলে, নহয়। মনত রঙালি বিহু লাগিছিল।

দেবল বলল, ব্যাপার কীরে বাবাই?

বাবাই বলে, নারে, আমার খার চেপে গেছিল। যেমন করে হোক গোল করতে হবে। যাকগে, খেলা শেষ। এবার পরীক্ষার জন্য রেডি হতে হবে।

দিবাকর বলে, তোমার রেডি হওয়ার কী আছে। তুমি তো এভার রেডি। আমারই যত

মুশকিল। কিছুতেই অঙ্কটা ম্যানেজ করতে পারছি না।

নীতিশ বলল, বাবাইকে ধরো। ও ঠিক উদ্ধার করে দেবে।

আচমকা সামনের ছোট্ট টিলা বেয়ে পাহাড়ি ঝরনার মতো কলকল করতে-করতে সাত-আটটি মেয়ে নেমে আসে। পোশাক দেখে বাবাই বুঝতে পারে মা-র স্কুলের মেয়ে সবাই। স্কুল সেরে ফিরছে।

ছেলেদের দেখে মেয়েরা চুপ করে পরস্পর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উপযুক্ত দূরত্ব রেখে চলতে থাকে।

প্রগলভ নীতিশ বলে ওঠে, বাঃ একঝাঁক পক্ষিলা (প্রজাপতি)। বল্ কে কোন্‌টা নিবি?— যেন কেউ ওকে লুটের মাল বিতরণের দায়িত্ব দিয়েছে।

দিবাকর গেয়ে ওঠে — বোল রাধা বোল সংগম হোগা কি নেহি...

বাবাইয়ের এই ধরনের অসভ্যতা অসহ্য লাগে। প্রতিবাদ করে বলে, কী হচ্ছে এসব!

নীতিশ বলে, কিঁয়? ছোয়ালি বিলাক ভাল্ নহয়?

বাবাই বলল, সে-কথা হচ্ছে না। তোমার বোনেদের এমন করলে ভালো লাগবে?

— এই বঙালি কেলা, ভাষণ নিদিবি। শালা, সবাই বোন হলে বিয়ে করবি কাকে?

দুম করে বাবাই বলে ওঠে, তোর বোনকে। আদপেই নীতিশের কোনো বোন আছে কি না জানা নেই বাবাইয়ের। দেখার প্রশ্নও ওঠে না। তবু বলে ফেলে।

ক্ষিপ্ত নীতিশ বাবাইয়ের দিকে ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে, শালা, বঙালি কেলা — তুই আমার বোনকে বিয়ে করবি। আজ তোকে তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়ব।

বাবাইও হুংকার দিয়ে বলে — এই বঙালি কেলা বলে গালাগাল দিবি না। আমি তোকে কিচ্ছু খারাপ বলিনি।।

হাতাহাতি ঠেকাবার জন্য দিবাকর ও দেবল দু-জনকে টেনে দু-ধারে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। নীতিশের আস্ফালন ও শাসানি চলতে থাকে। দেবল শান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে — তুই মিথ্যে রাগ করছিস, নীতিশ। বাবাই যাকেই বিয়ে করুক, সম্পর্কে সে তোর বোন ছাড়া আর কী হতে পারে?

নীতিশের গজরানি থামে না। চিৎকার পরে বলে, শালা বঙালি কেলা, তোকে আমি দেখে নেবো।

নরেশ এতক্ষণ নীতিশের সাইকেল সামলাচ্ছিল। ও এগিয়ে এসে বলল, চল্, বাড়ি চল্। শুধু-শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিস কেন! পরশু আবার খেলা আছে না?

ক্ষুব্ধ নীতিশ বলে, আমি আর বাবাইয়ের সঙ্গে খেলব না।

দিবাকর বলল, তেরা দিমাক ঠিক হ্যায়? ফালতু গোঁয়ার্তুমি না করে এখন চল্।

দেবল নরেশকে বলল, তোরা নীতিশকে নিয়ে যা। আমি বাবাইকে পৌঁছে দিচ্ছি।

দিবাকর আর নরেশ প্রায় জোর করেই নীতিশকে টেনে নিয়ে যায়। দেবল বাবাইকে সামনে বসিয়ে সাইকেলে ওঠে। মেয়েরা যে-টিলা বেয়ে উড়ন্ত প্রজাপতির মতো নেমে এসেছিল, তার বাঁ-দিকে ঘুরে যায়। নরেশরা ডান দিকের সোজা রাস্তা ধরে।

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ঝিলের সামনে এসে বাবাই বলল, থাম্ এখানে।

— কেন?

— আকাশের দিকে তাকা। চল্ একটু বসি।

ঝিলের কিনারার দিকে যেতে-যেতে বাবাই বলল, দিগন্তের ঠোঁটে যেন নানা রঙের লিপস্টিপ মাখা। কী অপরূপ দেখাচ্ছে, বল্।

দেবল অবাক চোখে বন্ধুর দিকে তাকায়। মুখে একটু আগের ক্রোধের চিহ্নও নেই। কণ্ঠস্বরে নেই যুযুৎসার তীব্রতা। এ যেন অন্য মানুষ। নিসর্গের মায়ায় মগ্নচিত্ত কিশোরের মুগ্ধতার বিরল অবয়ব।

— জানি না। একটু বসি। দেখি কেমন লাগে। মুখে তেতো স্বাদ নিয়ে এখনই বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।

— দেবল বলল, তোর দেরি হবে?

— তেতো স্বাদ কেন?

— গালাগালগুলো কি রসগোল্লা ছিল যে মিষ্টি লাগবে! এরা কথায়-কথায় অকারণে কেন যে খারাপ কথা বলে!

— তোকে কতবার বলেছি, অত হুটহাট রেগে যাস না। অসমিয়াদের তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ আছেই।

— এখানে বাঙালি-অসমিয়ার কথা ওঠে কী করে? আমরা সহপাঠী। একসঙ্গে খেলি। আমরা কেন নিছক বন্ধু হব না!

—আমার মনে হয় আজ তোর অমন দুরন্ত গোল করে হিরো হয়ে যাওয়াটা ওর পছন্দ হয়নি।

নীতিশের এমনিতেই তোর উপর রাগ আছে। তোর জন্য একবারও অঙ্কে ফার্স্ট হতে পারছে না।

— এতে আমার কী করার আছে।

এক টুকরো পাথর ঝিলের জলে ছুড়ে বাবাই আবৃত্তি করে—

এই মর্ত্য পৃথিবীতে শক্তিধর শুধু বুঝি কীর্তির মালিক,
কীর্তির ভাস্কর যারা কীর্তির মজুর যারা তারা নয়,
ভাবে মানুষ নগণ্য ভাবে মানুষ গড়েনি
সংঘাতে সংরাগে।
নির্বোধ নিষ্ঠুর, ভাবে মানুষের সত্য নেই
সবার উপরে! আসমুদ্র হিমালয় এই দেশে বাংলায় মালাবারে।
আমরা দেখেছি দেশ দেখেছি মানুষ পারে
দেশের মানুষ দেশ আমাদের আমরাই দেশ।

মুগ্ধ দেবল জানতে চায়— কার লেখারে?

—বিষ্ণু দে। পড়েছিস ওঁর কোনো বই?

— না, ভাই। পরীক্ষার পড়া করতেই হাঁফ ধরে যাচ্ছে, তার উপর আবার বিষ্ণু দে! চল্, এবার বাড়ি যাই।

বাবাই বলল, তুই যা। আমি আর-একটু বসি।

— যাবি কী করে?

—বড়ুয়া টিলা দিয়ে শর্টকাটে মেরে দেব।

— মাকে নিয়ে আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তাই আর দেরি করতে পারছি না। তুই একা বসে থাকবি, তাও ভালো লাগছে না। অন্ধকার হয়ে আসছে।

— কিছু ভাবিস না। তুই যা।

দেবল চলে যেতে বন্ধুর মন ভার হয় বাবাইয়ের। দেবলের মা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন। নিয়মিত চেক-আপে নিয়ে যেতে হয়। ওর বাবা ঘন ঘন টুরে যান বলে সংসারের যাবতীয় দায় দেবলেরই কাঁধে। ভাইবোনদের ঝক্কি মিটিয়ে বেচারা পড়ার সময়ও পায় না যথেষ্ট।

ফাদার জোনসের কথা মনে আসে। তিনি বলেন, ঈশ্বরের দুটো জায়গায় অবস্থান— একটা স্বর্গে, আর অন্যটা নম্র কৃতজ্ঞ মানুষের হৃদয়ে। দেবলের হৃদয়ে নিশ্চয়ই আছেন তিনি। যদি নাও থাকেন, ওর হৃদয়ের নিহিত নক্ষত্রে দ্যুতি যেন কখনও ম্লান না হয়!

গোধুলির অপসৃয়মাণ আলো ঝিলের জলে অসংখ্য বিমূর্ত ছবি আঁকে। এক-একবার মনে হয় যেন অজস্র চড়ুইপাখি দল বেঁধে জলের মধ্যে ঢেউ ভাঙতে-ভাঙতে দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে। রং ফুরিয়ে জলটা ক্রমশ কালো হয়ে ওঠে। দিক্‌চক্রবালের পাহাড় যেন ঘাড় উঁচু করে শেষবারের মতো আকাশে রঙের শেষ তুলির টানে উঁকি দিচ্ছে।

বাবাইয়ের মাথায় একটা সুর গুনগুন করে। একটু পরে গেয়ে ওঠে, 'এখন দিক-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা/কীসের আশায় বসে আছি অভয় মানি'। গান শেষ হতেই ভাবে, ভাগ্যিস আশেপাশে ছাগল-গাধা নেই। শেয়ালরাও নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি। নিজের মনেই কুলকুল হাসে বাবাই। নাঃ এবার যাওয়া উচিত। আর দেরি করলে দিদা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আর মার জিজ্ঞাসার অবধি থাকবে না।

বাবাই দ্রুত পায়ে বড়ুয়া টিলার দিকে এগিয়ে যায়। এই টিলার উপর একটা সুন্দর বাংলো টাইপের বাড়ি আছে। গেটে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা, বড়ুয়া। সেজন্যই টিলার ওই নাম। শোনা যায় সব্যসাচী বড়ুয়া গৌরীপুরের বিখ্যাত বড়ুয়া পরিবারেরই এক জন। চা বাগান, কাঠের ব্যাবসা ছাড়াও আরও বহু রকমের কাজকারবার আছে। গৌহাটি তো বটেই, কলকাতাতেও আছে নানা ব্যাবসা। বড়ুয়ারা এখানে সাধারণত থাকেনা। মাঝেমধ্যে এলে দূর থেকেও রাতে, বাংলোর আলো দেখা যায়। অন্ধকার সমুদ্রের জাহাজের মতো। অবশ্য বড়ুয়া টিলায় খুব কমই ওঠা হয়। কেবল যেসব দিনে একা পায়ে হেঁটে ফেরে। সাইকেলে গেলে টিলায় চড়ার কথাই ওঠে না।

একটু দূর থেকেই আলো দেখা যায়। আজ তা হলে কেউ এসেছে। বাবাই দু-একবার কেবল সব্যসাচীবাবুকেই দেখেছে দারোয়ান চাকর ছাড়া। বাংলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কোনোদিনই কোনো ঔৎসুক্য বোধ করেনি। ওটা বাড়ি না হয়ে পাথরের স্তূপ হলে হয়তো আরেকটু বেশি মনোযোগ পেত।

আজও বাবাই গেটের সামনে গিয়ে উঠে ডান দিকের দেয়ালের পাশ দিয়ে নির্বিকার এগিয়ে যায়। ঝাঁকড়া আমগাছটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই চোখ পড়ে খোলা জানলায়। সঙ্গে-সঙ্গে যেন লক্ষ ভোল্টবিদ্যুৎতরঙ্গ ওকে শিহরিত ও স্থাণু করে দেয়। যেন নিশ্বাস নিতেও ভুলে যায়। ওর আবিষ্ট চোখ দেখে, এক তরুণী পোশাক বদলাচ্ছে। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে দুই হেমবর্ণ বর্তুল স্বপ্নের মায়া। তৎপর বাহুতে শিল্পের নির্ঝর। বাবাইয়ের বুকের মধ্যে অব্যক্ত

বেদনা কঁকিয়ে ওঠে। এমন ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। আর কি কখনও দেখবে? মন চাইলেও ওর অসাড় পা চলে না। ও মেয়েটির মুখ স্মৃতির কার্বনে ধরে রাখার চেষ্টা করে। মেয়েটি শুভ্র ব্রেসিয়ারের উপর পিঙ্ক ব্লাউজ পরে জানলার দিকে চোখ ফেলে। অন্ধকারে ওকে দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবু বাবাই দ্রুত টিলা বেয়ে নেমে যায়। কিন্তু অপরূপ মূর্তি ওর চোখে এঁটে থাকে। হিরণ্ময় গোলকের উপর তুষারধবল ব্রা। ও কি মহাশ্বেতা? বিষ্ণু দে কি এর জন্যেই লিখেছিলেন —

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।

অন্ধকারে হাঁটতে-হাঁটতে বাবাই নিজের শরীরে এক অচেনা অস্থিরতার সঞ্চার অনুভব করে। মনে হয় কানদুটো যেন গরম হয়ে উঠছে। স্বর্ণগোলকের চিত্র বার বার চোখে ফুটে ওঠে। মেয়েটির মুখ প্রতিমার মতো। হঠাৎই মনে হয়, যদি একটু ছুঁতে পারত! সঙ্গে -সঙ্গে সংশয় জাগে, ও কি সত্যি দেখেছিল, না স্বপ্ন দেখছিল? মেয়েটি বৈদেহী নয়তো? না। তা কী করে হতে পারে। ওর বাহুর সঞ্চালন, ব্লাউজ পরার কারুকৃতি, চোখের সরল বিভঙ্গ—সবই তো মিথ্যে হতে পারে না। আর ওই কাঞ্চনবর্ণ সুষমার অমোঘ আহ্বান—তখনই মনে পড়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি লাইন—

বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।

যখন প্রথম পড়েছিল, সঠিক অনুধাবন করতে পারেনি। এখন মনে হচ্ছে, সামান্য হলেও, অনুরূপ অধিকারের আর্তি বাবাইয়ের শরীরের তটেও আছড়ে পড়ছে।

সেদিন রাতে সহজে ঘুম আসতে চায় না। ও নানাভাবে মন থেকে সন্ধ্যার মায়াময় ছবি মুছে ফেলার চেষ্টা করে। কঠিন সম্পাদ্য সমাধানের চেষ্টায় বহুক্ষণ ব্যস্ত থাকে। ইতিহাস পড়ে পাতার পর পাতা। একসময় সারাদিনের ক্লান্তি চোখের পাতায় জড়ো হয়। ঘুমের মধ্যে বাবাই চলে যায় এক অচিন কাননে। নানা বর্ণের ফুলের সমারোহ, নদীর সংগীতময় কলস্বর। অসংখ্য প্রজাপতির ভিতর থেকে উঠে আসে এক কিন্নরী। তার ঊর্ধ্বাঙ্গে হিরণদ্যুতির কাঁচুলি, ডানায় উদার গগনের আহ্বান। পরি ওর হাত ধরে পরম আদরে সবুজ মখমলের উপর বসায়। বাবাই বলে, তুমি এত সুন্দর! আমি দেখব তোমাকে। পরি হাসে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আমি তো তোমার সামনেই আছি। বাবাই পরির চিবুকে হাত রাখে, ঠোঁটের উপর আঙুল বোলায়। পরি কাঁচুলি খুলে ওকে বুকের মধ্যে প্রগাঢ় মমতায় আশ্লেষে বাঁধে। অসহনীয় সুখের আবেগে বাবাইয়ের শরীরের অণুতে অণুতে দামাল হাওয়া ঘোরে। শরীরের প্রাচীর বিদীর্ণ করে নির্গত হয় উদ্দাম প্রস্রবন। অনাস্বাদিত সুখের আহ্লাদ স্নায়ুতনু ছেয়ে ফেলে। স্নিগ্ধ তৃপ্তির রেশ নিয়ে আচমকা ঘুম ভাঙে। উরুদেশে সিক্তভাব। হাত বাড়াতেই আঙুলে আঠালো অনুভূতি। ও লাফিয়ে উঠে পড়ে। বুকে হাতুড়ির শব্দ। মগজে অজস্র জিজ্ঞাসা।

৬.

প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যার সংবাদে সারা বিশ্ব হতচকিত। ২৩ নভেম্বরের আকস্মিক শোকাবহ ঘটনায় এ-দেশের মানুষেরও মনে বিষণ্ণ বেদনা। খবরের কাগজে শুধু কেনেডি-বন্দনা।

জ্যাকলিনের সৌন্দর্যস্তুতি। পিতৃহীন শিশুদের জন্য সমবেদনার প্রাবল্য। লিঙ্কনের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা তো হলই। গান্ধি হত্যার কাহিনীও ফিরে-ফিরে আসে। আলোচনা হয়, মানুষের প্রাথমিক নিরাপত্তা নিয়ে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও যদি প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হতে পারে তবে আর কী কথা! যে কলকাতার রাস্তায় নিয়মিতভাবে মার্কিন-বিরোধী মিছিল চিৎকার করে, আমার নাম তোমার নাম-ভিয়েতনাম, সেই রাস্তাতেই ইউ.এস.আই.এস.-এর সামনে দীর্ঘ লাইন কেনেডির নানা ছবি দেখার জন্য, শেষ যাত্রার সমারোহ চাক্ষুষ করার আগ্রহে। মানুষের আবেগের কোনো ভূগোল হয় না। তার রঙ রূপও পরিবর্তনশীল।

ঠিক ওই সময়েই সারা দেশ জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টির একাংশের উপর তীব্র উৎপীড়ন শুরু হয়। মহারাষ্ট্রে তথাকথিত চীনাপন্থীদের গ্রেফতারের পর অনুরূপ পীড়নের সন্ত্রাস অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতাশীল ডাঙ্গেপন্থীরা বন্দিমুক্তির জন্য কোনো উদ্যোগ বা গণ আন্দোলন পড়ে তোলায় অনাগ্রহী থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি সরকারিভাবে আন্দোলন না-করলেও বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে বন্দিমুক্তি আন্দোলনের প্রাবল্য বাড়ে।

এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে উদয়নকে এক বিমূঢ় অস্থিরতা তাড়িত করে। মনে হয় বিশ্বাসের সোপান, নির্ভরতার গম্বুজ সব হারিয়ে যাচ্ছে। প্রিয় বন্ধুদের চোখেও অনুচ্চারিত অপ্রকাশিত সন্দেহ। নিজের মধ্যেও নানা সংশয়। কাগজে, পোস্টারে অহরহ মিমির ছবি। ওর আরও খ্যাতি বেড়েছে। মাঝে-মাঝে ছোটোবোনের জন্য ব্যাকুলতা জাগলেও উদয়ন যেতে পারে না। ক্বচিৎ ফোন করে। অবশ্য ফোন করলেই মিমিকে পাওয়া যায় না। শ্যুটিং আউটডোর তো থাকেই এখন নাকি আবার বম্বেতেও যাতায়াত করছে। মিমি বলেছিল, বড়দা তোমার নম্বর দাও। আমিই ফোন করব। কিন্তু ওদের মেসে ফোন নেই। স্কুলের নম্বর দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা সবসময়েই দপদপ করে — বটু ফিরে আসবে বা তার কোনো খবর পাবে। পাওয়ার সম্ভাব্য সূত্র মিমিই হতে পারে। মিমি ওকে বারবার যেতে বলে, ওর কাছে থাকতে বলে। উদয়ন যেতে চায় না। ছোটো বোন চিত্রাভিনেত্রী হয়েছে বলে কোনো মানসিক বিরূপতা নেই। কিন্তু মিমি ওরফে রঞ্জনা নন্দীর জীবনপ্রণালী ও তাকে ঘিরে-থাকা মানুষদের অমার্জিত উচ্চকিত উপস্থিতি উদয়নের রুচিবিরুদ্ধ লাগে। অথচ পৃথিবীতে এখন ওই বোনটি ছাড়া আপনজন কেউ নেই ওর। পূরবী বা তার মেয়েকে কি আপনজন বলা যায়?

গত প্রায় পাঁচ বছরে শৈলেশকে গোটা-চারেক চিঠি লিখেছে। একবারও আগরতলা যায়নি। শৈলেশের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও। শৈলেশই জানিয়েছে প্রণতির ত্রিপুরা ত্যাগের কথা। ওদের নতুন ঠিকানা জানাতে পারেনি। উদয়ন শৈলেশকে নীরদ করের কাছ থেকে প্রণতির ঠিকানা জানার জন্য লিখতে পারত। লেখেনি। কী লাভ? এখন তো আর ওকে দরকার নেই প্রণতির। দরকার থাকলে ও নিজেই কি যোগাযোগ করত না? অভিমানে আচ্ছন্ন উদয়ন জানে না, আগরতলা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে প্রণতি কতবার শৈলেশ-পূরবীর কাছে ওর কলকাতার ঠিকানা চেয়েছিল। তখনও পর্যন্ত শৈলেশকে একটা চিঠিও লেখেনি উদয়ন। প্রণতি ও বাবাইয়ের কথা খুব মনে পড়ে। বাবাই এখন কী পড়ছে? উচ্চমাধ্যমিক হয়ে গেছে কি? পূরবীর মেয়েও বেশ বড়ো হয়েছে। শৈলেশ জানিয়েছে, স্কুলে যাচ্ছে।

একদিন প্রবোধ এসে বলল, তুমি তো অনেকদিন ত্রিপুরায় ছিলে। পার্টির সকলকে নিশ্চয়ই চেন?

উদয়ন বলল, সকলকে না হলেও অনেককে চিনি। তবে তাঁরা আমার প্রতি সদয় নন।

— তা না হোক। তুমি একবার ঘুরে এসো তবু।

— কেন?

দ্যাখো, মতাদর্শগত সংগ্রাম যেমন জোরদার হয়ে উঠছে, পার্টির ভাঙন অনিবার্য। আগরতলার কমরেডদের মনোভাব জানতে পারলে একটু সুবিধে হবে।

— সে তো পার্টি-লেভেলে কথা হবেই। শুনেছি দশরথ দেবের সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙারের সম্পর্ক খুবই গাঢ়।

— তা তো আমিও জানি। আসলে ভাবছিলাম নিরপেক্ষভাবে পার্টির কর্মীদের ঝোঁক কোন্ দিকে তার একটা হদিস কী করে পাওয়া যায়। তুমি কয়েকটা দিন ঘুরে এসো। শুধু নেতা দিয়ে পার্টি চলে না। কর্মী আর জনসমর্থনই সংগঠনের মূল শক্তি। তোমার রিপোর্ট নির্ভেজাল হবে সে-বিশ্বাস আছে আমার।

প্রস্তাবটা খুব উল্লাসজনক মনে না হলেও আগরতলা ভ্রমণের বাহানা হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং কয়েকদিন পর রবিবার সকালের ফ্লাইটে আগরতলা পৌঁছোয় উদয়ন। ওকে দেখে শৈলেশ বলে, তুই পথভোলা পথিক নাকি রে?

উদয়ন বলল, না। আমার ঘরটা আছে তো?

পূরবী বলল, না। দখল হয়ে গেছে। আর আপনাকে তো ঢুকতে দেওয়াই উচিত না। কোনো খোঁজ না, খবর না—হঠাৎ একটা মানুষ উধাও।

শৈলেশ বলল, কত পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে এল বেচারা, আগে একটু জিরোতে দাও।

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে চেয়ারে বসে উদয়ন ইতিউতি দেখে। এই ক-বছরে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। পর্দাগুলো বদলেছে। দেয়ালের রং দু-তিন বছরের পুরোনো। পূরবী একটু পৃথুলা। শৈলেশের মাথায় টাকের আভাস।

—আমার ঘর কে বেদখল করল?

টিটি মার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অচেনা মানুষটাকে কৌতূহলী চোখে জরিপ করছিল।

পূরবী বলল, এই যে টিটি। টিটি, এই তোমার উদয়নকাকু।

উদয়ন বলে, কাকু না জেঠু?

শৈলেশ বলল, থাক, অনেক জ্যাঠামি করেছিস। আমার মেয়ের সঙ্গে না-করলেও চলবে।

উদয়নকাকুর - কথা প্রচুর শুনেছে টিটি। ও মুগ্ধ চোখে মানুষটিকে দেখে। উদয়ন ডাকতেই ওর কাছে গিয়ে প্রণাম করে। উদয়ন ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, কী সুন্দর হয়েছে! এত বড়ো হয়ে গেছে ভাবতেও পারিনি। কোনো ক্লাসে পড়ছ?

—এবার টু-তে উঠবে।— পূরবী বলে।

—বাঃ!

চা খেতে-খেতে শৈলেশ জানতে চায়, মাসিমাদের কোনো খবর পাসনি?

মাথা নাড়ে উদয়ন। — মা নেই। ছোটকুও মারা গেছে। বটু যে কোথায় আছে কেউ জানে না।

—আর মিমি?

— মা ওর বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পরই ম্যাঙ্গালোর না কোথায় চলে গেছে।

কেন উদয়ন মিমির পরিচয় গোপন করল নিজেই জানে না। ভেবেচিন্তে যে বলেছে তাও নয়। সরল স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো চলে এল। নাকি মিমিই রঞ্জনা নন্দী শুনলে, পূরবীর কৌতূহল উদগ্র হয়ে ওঠার শঙ্কা থেকেই সাবধানী হল? নাকি, চিত্রাভিনেত্রীর দাদার মলিন জীবনযাপন বিসদৃশ দেখানোর দীনতা আড়ালের প্রয়াস? নাকি, অনুজার বারনারী হওয়ার কলঙ্ক-স্পর্শ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আকর্ষণে? উদয়ন রঞ্জনার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা কাউকেই বলে না।

স্নান সেরে বেরুবার উদ্যোগ করলে পূরবী বলে, এখন কোথায় যাবেন?

—একটু ঘুরে আসি। পুরোনো বন্ধুদের খোঁজ করা দরকার। একবার দেববর্মাদের সঙ্গেও দেখা করব।

— বুড়ো দেববর্মা আর নেই। আপনার ছাত্ররা এখন দিল্লিতে। ও-বাড়িতে আপনার যা কিছু ছিল সব টিটির ঘরে রাখা আছে দেখে নেবেন।

গলা নামিয়ে উদয়ন বলে, আর এ-বাড়ির জিনিস—

ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে পূরবী বলল, বেশি দেরি করবেন না যেন।

উদয়ন রিকশা ধরে নীরদ করের বাড়ির দিকে রওনা হয়। নীরদের বাড়িতে কখনও আসেনি। তবু একটা আবছা ধারণা ছিল। এই ক-বছরে জনবসতি বেড়েছে। নতুন ঘরবাড়ি হয়েছে অনেক। তবু অল্প খোঁজাখুঁজি করেই নীরদকে পাওয়া গেল বাড়ির সামনেই। রিকশা ছেড়ে নীরদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদয়ন বলল, চিনতে পারছেন? আমি উদয়ন সরকার।

নীরদের মুখে আন্তরিক খুশির উল্লাস ঝলসে ওঠে, চিনব না কেন। কোথায় ছিলেন এত দিন? টুনু তো প্রতি চিঠিতে আপনার কথা লেখে। আপনার ঠিকানার জন্য কতবার গেছি শৈলেশবাবুর কাছে।

ম্লান হেসে উদয়ন বলল, হ্যাঁ, অনেকদিন কারও সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতে পারিনি। কলকাতায় একটা মেসে থাকি তো— তার ঠিকানা কারুকে দেওয়া যায় না। তার উপর ডি. আই. আর. পুলিশের উৎপাত।

নীরদ বলল, আসুন, ভিতরে আসুন।

— না মানে, আমি এখনই যাব। প্রণতির ঠিকানা যদি দিতে পারেন— বাবাই কেমন আছে?

—ভিতরে আসুন। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। ওরা এমনিতে ভালোই আছে।

প্রণতির ঠিকানা নিয়ে উদয়ন জিজ্ঞেস করে, ওদের বাড়িতে একটা ছেলে থাকত—

—কানাই?

—হ্যাঁ, কানাই। ও কোথায় আছে?

—কানাই এখানেই থেকে গেছে। নতুন বাজারের কাছে মোটর গ্যারেজ করেছে।

আবার একটা রিকশা ধরে উদয়ন পৌরভবনের দিকে যেতে বলে। কিছু দূর আসার পর উদয়নের চোখে পড়ে উলটোদিক থেকে হেঁটে আসছে মানিক। ভালোই হল। এখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়ার হদিসের জন্য বেশি ঘোরাফেরা করতে হবে না। কাছাকাছি আসতেই উদয়ন ডাকে, মানিক—

মুখ তুলে আহ্বানকারীকে দেখেই উজ্জ্বল স্বরে মানিক বলে, উদয়নদা। কবে এলে?

—উঠে এসো। অনেক কথা আছে।

—আমারও।

পূরবী তাড়াতাড়ি ফেরার কথা বললেও উদয়ন ফেরে রাত নটার-পর। শৈলেশ বলল, তোর স্বভাব দেখছি একটুও বদলায়নি। কোথায় ছিলি সারাদিন?

তপ্তস্বরে পূরবী বলে, তার আগে বলুন, দুপুরে যে খেতে আসবেন না, তা বলে গেলেন না কেন? বসে-বসে বেলা চারটের সময় ভাত বেড়েছি। মেয়েটা পর্যন্ত বসে ছিল কাকুর সঙ্গে খাবে বলে।

লজ্জিত উদয়ন বেদনাময় চোখে পূরবীকে দেখে অনুশোচনায় বলে, খুব ভুল —অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করে দাও। আসলে মানিকের সঙ্গে এত জায়গায় যেতে হল যে—

—আমাদের কথা আর মনে পড়েনি। তা আসার সঙ্গে-সঙ্গে বাঁয়াটাকে জোটালেন কোত্থেকে।

— জোটাইনি। হঠাৎই রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। আমারই সুবিধে হল।

— চা-টা কিছু খাবেন এখন, নাকি খাবার দিতে বলব?

—একটু চা-ই হোক। তার আগে গায়ে একটু জল ঢেলে আসি।

চা খেতে-খেতে দুই বন্ধু হারানো সময়ের চটজলদি হিসেব করে। শৈলেশ নিজের বৃত্তের ছকে বাঁধা জীবনে নিবিষ্ট। মেয়ে টিটির জন্য ঘরের বাইরে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে না। কলেজ থেকে ফিরে অনেকটা সময় মেয়ের জন্য ব্যয় করে। গর্বের সঙ্গে বলে, সুকুমার রায়ের অনেক ছড়া শিখিয়েছি।

রান্নাঘর থেকে পূরবী এসে বসলে উদয়ন বলল, টিটিকে একটা সঙ্গী দিলি না কেন? এখন তো হাম দো হামারা দো-র যুগ।

শৈলেশ বলল, আমি বলেছিলাম। কিন্তু উনি—

পূরবী বলে ওঠে, আহা হা— কত শখ। কষ্টটা তো নিজেকে করতে হয় না।

কথা ঘোরাবার জন্য শৈলেশ বলল, তুই কি এখন ফুল টাইম পার্টি করছিস?

— ঠিক তা নয়। তবে শিক্ষক সংগঠনে আছি। দলের লোকজনের সঙ্গেও নিয়মিত কথাবার্তা হয়। আন্দোলন মিছিলেও যাই। আমি আছি, আবার নেইও। ঠিক বোঝাতে পারব না। মাঝে মাঝেই আমার মধ্যে এক ধরনের নিরাসক্তি জাগে। নানা প্রশ্ন ওঠে মনে। সংশয়ও।

পূরবী বলে, ওইজন্যই অত করে বিয়ে করতে বলেছিলাম। শুনলেন না। এখনও তো করতে পারেন। করবেন?

—আমার বয়েসটা জানো?

—বন্ধুরটা যখন জানি, আপনারটাও অনুমান করতে পারি। পঞ্চাশ হয়নি। ইজিলি বিয়ে করা যায়। রাজি থাকলে বলুন। পাত্রী দেখি।

পূরবীর কথায় সরাসরি উত্তর না দিয়ে উদয়ন আবৃত্তি করে —

জানি— তবু জানি
নারীর হৃদয়— প্রেম—শিশুগৃহ —নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—

আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত-ক্লান্ত করে;...

কবিতা শুনে টিটি ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাবার গা ঘেঁষে বসে বলল, আমিও জানি।

— কী জানো?

— ছড়া বলতে।

— তা হলে একটা শোনাও।

টিটি মার দিকে তাকায়। পূরবী মাথা নাড়ে।

টিটি শুরু করে —শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে— থেমে-থেমে পুরোটা আবৃত্তি করে টিটি বলল, কাকু, তুমি তবলা বাজাও?

— পাঁচ টাকার জন্য? না।

— তবে যে মা বাঁয়ার কথা বলছিল—

শৈলেশ পূরবী ও উদয়ন যুগপৎ সশব্দে হেসে ওঠে। টিটি কৌতূহলী চোখে তিন জনেরই মুখের দিকে তাকায়। শৈলেশ মেয়েকে সস্নেহে বুকে টানে। পূরবী বলে, চলো, খেতে চলো— খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের সব কাজ শেষ করে পূরবী জলের গ্লাস হাতে উদয়নের ঘরে ঢোকে। উদয়ন বিছানায় বসে *উপনিবেশ*-এর পাতা ওলটাচ্ছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বইটা অনেক বছর আগে একবার হাতে পেয়েও পড়া হয়নি। মনে-মনে না-পড়তে পারার কারণ ভাবার চেষ্টা সফল হচ্ছিল না।

টেবিলে গ্লাস রেখে পূরবী বলল, শুয়ে পড়ুন। মশারিটা গুঁজে দিয়ে যাই।

— শৈলেশ?

—ওর এখন মাঝরাত। কান খাড়া করলেই নাকের বাঁশি শুনতে পাবেন।

মশারি গুঁজতে-গুঁজতে উদয়নের শিয়রের কাছে এলে উদয়ন দৃঢ় হাতে পূরবীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। চকিতে স্মৃতির উপর দিয়ে বর্ষা-বিকেলের অনুপুঙ্খ দৃশ্যাবলি ভেসে যায়। উদয়নের ধমনিতে বহমান রক্তধারা উদ্দাম হয়ে ওঠে। ও নিশ্চিত ছিল, এত বছর পর পূরবীর উন্মুখতাও থাকবে তীব্র। ওকে মুহ্যমান করে দিয়ে পূরবী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধীর গলায় বলে, এমন আর করবেন না।

বিহ্বল গলায় উদয়ন বলে, পূরবী—আমি—

পূরবী বলে, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার কাছে আমি সারাজীবন ঋণী থাকব। আপনাকে অনুরোধ আমার স্মৃতি-আরাধনায় মালিন্য লাগতে দেবেন না।

সে-রাতে ঘুম আসে না উদয়নের। ও কিছুতেই পূরবীর আচরণের, কথার নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে পারে না। বিস্ময় আরও বাড়ে নিজের কথা ভেবে। এত বছর কলকাতায় একা থেকেও পূরবীর জন্য দেহ-টান অনুভব করেনি। করেনি অন্য নারীসঙ্গও। অথচ আজ পূরবীর সান্নিধ্যে আসামাত্রই সারা শরীরের চিৎকৃত হাহাকার ওকে তাড়িত করে। শরীর-

পিপাসা সারা সত্তায় এমন দহন সঞ্চার করে যে উদয়ন বাধ্য হয়ে বাথরুমে গিয়ে দাহমুক্ত হয়ে আসে। তেতো মুখে বিবমিষার উদ্রেক। জল খেয়ে শুতে গিয়ে মনে পড়ে জেলে থাকাকালে আফজল নামে এক কয়েদি ওকে বলেছিল, স্যার, চুরি-জোচ্চুরি এমনকী খুনও করতে পারি। কিন্তু মেয়েছেলের ধার মাড়াই না। থাকিতে নিজের হস্ত, কেন হব পরদ্বারস্থ— বলেই কুৎসিতভাবে হস্তসঞ্চালনের ভঙ্গি দেখিয়েছিল। এতদিন পর আকস্মিকভাবে আফজলের কথা মনে হতে এই হতাশ বেদনাব্যঞ্জক সময়েও ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ছলকায়। স্মৃতির আজব খেলার রহস্য মানুষের এখনও জানা নেই।

পরদিন পূরবীর ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। নিখুঁত আতিথেয়তা, সরল গল্প, কবিতা শোনানোর আর্জি— সবই অবিকল। দুপুরে উদয়নের সঙ্গে বসে খেল, গল্প করল অনেক। বেশিটাই মেয়ের কথা। মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন। ওর ইচ্ছে মেয়েকে ডাক্তার বানাবে।

উদয়ন বলে, আমার ইচ্ছের বুঝি কোনো দাম নেই?

—আপনার শুভানুধ্যান ছাড়া আর কী চাইব বলুন।

— তুমি না-চাইলেও আমি যে চাই।

— না, উদয়দা। আপনিও চান না। চাইলে এতগুলো বছর এমন উদাসীন নিশ্চলতায় থাকতে পারতেন না। এখনকার চাওয়াটা, শুধু আপনার চোখের আকাঙ্ক্ষা।

— ভুল, পূরবী, ভুল। আমি সত্যি তোমাকে ঠিক সেদিনের মতোই চাই।

— না, চান না। কখনও ভেবেছেন আমি কী করে মেয়েটাকে বড়ো করছি। আপনার বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করার কষ্ট কী নিদারুণভাবে আমাকে কুরে-কুরে খায় বোঝার চেষ্টা করেছেন কখনও? সব কষ্টযন্ত্রণা সহ্য হয়ে যায় যখন কলেজ থেকে ফিরে মেয়েকে কোলে নিলে ওর মুখে ফুটে-ওঠা স্বর্গীয় হাসি দেখি। পাশে থেকে আপনি আমাকে কত সাহায্য করতে পারতেন। আমি অনেক নির্ভরতা পেতে পারতাম। কিন্তু আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

—পূরবী, তুমি আমার অসহায়তা বুঝছ না।

—খুব বুঝছি। আপনি দেশহিতৈষী, বিপ্লবের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমার মতো সামান্য স্ত্রীলোকের কারণে খরচা করার মতো সময় কোথায়। কাল যখন ওকে হাম দো হামারা দো শোনাচ্ছিলেন, তখনই বুঝেছিলাম, আপনি কী চান। যদি চলে না যেতেন হয়তো আমিই ভিক্ষে চাইতাম আপনার কাছে। কিন্তু এখন আর তা হয় না। আমি ওই সরল মানুষটাকে প্রকাশ্যে ধিক্কৃত হতে দিতে পারি না।

— এ-কথা কেন বলছ?

— বুঝতে পারলেন না? এত বছরে হল না, আর আপনি দু-দিনের জন্য এসে চলে যেতেই আমার পেটে বাচ্চা এল—মানুষজন কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে? আপনার বন্ধুকে কি মূর্খ মনে করেন?

—তুমি দেখছি খুবই রেগে আছ!

— না, উদয়দা। রেগে নেই। গভীর দুঃখ থেকে বলছি। দুর্ভাগ্য আমার, আপনি তাও বুঝবেন না। আপনি ওভাবে চলে গিয়ে আমাকে যে কী ভঙ্গুর অবস্থায় ফেলেছিলেন কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনি এসেছেন, আমি খুশি। চাইব আরও আসুন। বার বার আসুন। তবে টিটির কাকু হিসেবে। মেয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে আমার যেন কোনোদিন বুক

না কাঁপে— এই আশীর্বাদ করবেন।

উদয়ন নির্বাক চোখে পূরবীর দিকে চেয়ে থাকে। এই নারীকে কি চেনে? ওর শরীরের সুলুক সন্ধান জানা আছে। অব্যর্থ মনে করতে পারে ওর ডানদিকের স্তন বাঁদিকের থেকে একটু বড়ো, আর তার ঠিক মাঝখানে একটা তিল আছে—হলুদ ফুলে বসা ভ্রমর যেন। ওর বুকে সঞ্চিত স্বর্ণচাঁপার মদির সুবাস। কিন্তু এসবই তো আবরণ। অন্তরালের অনন্যা ওর নিতান্ত অচেনা। উদয়নের চোখে মুগ্ধতার সম্ভ্রম প্রদীপের আলোর মতো কাঁপে। খুব ইচ্ছে হয় পূরবীর কোলে মাথা রেখে কিছু অশ্রুপাত করে। নাটুকে রগড়ে ওর রুচি নেই। উদয়ন ঘর থেকে বেরিয়ে রিকশা ধরে বলে—এয়ারলাইনস।

এয়ারলাইনস থেকে বেরিয়ে নতুন বাজারে গিয়ে কানাইকে খোঁজে। বলে না দিলে উদয়ন কিছুতেই চিনতে পারত না কানাইকে। সার্ট প্যান্ট পরা বলিষ্ঠ পুরুষ। গ্যারেজে কাজের তদারকি করছে। কর্তৃত্বের স্বরে সচ্ছলতার আভাস। ওকে দেখেই দৌড়ে আসে কানাই— মাস্টারমশাই! আপনি?

উদয়ন হাসে, তোমাকে দেখতে এলাম।

—আসুন, আসুন। — বলে ওর ছোট্ট ছিমছাম অফিসে উদয়নকে বসিয়ে কানাই নম্রকণ্ঠে নিবেদন করে, একটু চা বলি স্যার।

কানাইয়ের বলার ভঙ্গিতে হেসে ওঠে উদয়ন।

চা খেতে-খেতে কানাইয়ের কথা শুনে উদয়ন অনুভব করে শ্রম নিষ্ঠা ও সাহস থাকলে কোনো বিপত্তিই অনতিক্রম্য নয়। কানাইয়ের কণ্ঠস্বরে যেন প্রণতির প্রত্যয় প্রতিধ্বনিত।

আরও কয়েক জায়গায় ঘুরে সন্ধের মুখে ঘরে ফিরে দেখে শৈলেশ মেয়েকে নিয়ে লুডো খেলছে। ওকে দেখে টিটি বলে, কাকু এসেছে, এখন খেলা বন্ধ।

উদয়ন টিটিকে কাছে ডেকে ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে বলল, দ্যাখো তো পছন্দ হয় কি না।

টিটি প্যাকেট হাতে ভিতরে ছুটে যায়। একটু পরেই খোলা ফ্রক হাতে করে পূরবী বলল, এত দামি ফ্রক!

শৈলেশ বলল, ব্যাপার কী রে?

— কিচ্ছু না। কাল চলে যাবো, তাই মেয়েটার জন্য সামান্য স্মারক।

— কালই যাবি কেন?

— উপায় নেই রে। যেতেই হবে।

ঘরের ছাউনিতে অলক্ষ ছিদ্রের শূন্যতাও অনন্তবর্ষী।

৭.

শ্রীমতী প্রণতি চৌধুরী

স্নেহাস্পদাসু,

অবাক হলে তো? অবাক করার জন্য কিন্তু লিখছি না। সম্প্রতি আগরতলা গিয়েছিলাম। নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা করে তোমার ঠিকানা নিয়েছি। কানাইয়ের সঙ্গেও দেখা করেছি। ওর উদ্যম ও সাফল্য দেখে আমি মুগ্ধ। তোমাদের দুর্বিপাকের কথাও শুনেছি কিছু-কিছু। বিশ্বাস

করবে কি না জানি না, তবে আমি আন্তরিকভাবেই গভীর বেদনাহত। নিজেকে অপরাধীও মনে হচ্ছে। সেই দুঃসময়ে আমি উপস্থিত থাকলে হয়তো তোমাদের সামান্য হলেও সাহায্য করতে পারতাম। বা, হয়তো দুর্যোগটা এড়ানোও যেত।

আমার আকস্মিক অন্তর্ধানের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারব না। শুধু বলি, আমিও দীর্ঘদিন বড়ো দুঃসময়ের মধ্যে ছিলাম। দুঃসময় এলে চলা থামাতে নেই। একটার পর একটা প্রাচীর পেরিয়ে যেতে হয়। তুমি সেটা পেরেছ বলে অভিনন্দন জানাই।

বাবাই কী পড়ছে? কেমন করছে পরীক্ষায়? ও মেধাবী ও প্রতিভাবান। আমি নিশ্চিত, ওর অন্তর্গত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যা কিছু করণীয় তুমি অবশ্যই করছ এবং করবে। আমি যদি কোনোভাবে কিছু করতে পারি নির্দ্বিধায় জানিয়ো।

আমি কলকাতার শহরতলির একটা স্কুলে কাজ করছি। শিয়ালদার কাছে মেসে থাকি। চিঠি দিলে স্কুলের ঠিকানায় লিখো। বাবাইকেও লিখতে বোলো।

তোমার মা কেমন আছেন? তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো।

চিরশুভানুধ্যায়ী

উদয়ন সরকার।

চিঠিটা পড়ে প্রণতি উচ্চস্বরে ডাকে, মা—

যমুনা রান্নাঘরে চা বানাচ্ছিলেন। দু-হাতে দু-কাপ নিয়ে মেয়ের ঘরে ঢুকে একটা কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কী হয়েছে?

— মাস্টারমশাই চিঠি দিয়েছেন।

— সে কী! এতদিন বাদে মনে পড়ল!

— তোমার কথাও লিখেছেন। তোমাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

— কোথায় থাকে এখন?

প্রণতি সংক্ষেপে চিঠির বয়ান মাকে বলে। মেয়ের খুশির উচ্ছলতায় যমুনাও আপ্লুত। বলেন, বাবাইকে মাস্টার কী ভালোই না বাসত।

— বাবাই এখনও ফিরল না? সামনে পরীক্ষা আর ছেলে খেলে বেড়াচ্ছে!

চা শেষ করে নিজের পড়ার টেবিলে চিঠিটা নিয়ে বসে প্রণতি। এ-বাড়িতে চিঠিপত্র তেমন আসে না। কখনও-কখনও নীরদ-ডলি লেখে। কোনো বড়ো খবর থাকলে পদ্মাও দিদিকে লেখে— মেয়ের বা ছেলের বিয়ে বা নাতির অন্নপ্রাশন। প্রণতি নিজেকে এমনভাবে নিগড়িত রেখেছে যে মা, বাবাই আর স্কুলের সীমিত বলয়ের বাইরে বহির্বিশ্ব যেন অস্তিত্বহীন। তার অন্তর্গত ভুবনের গহন স্মৃতির পীড়নে আহত। উদয়নের চিঠি দীর্ঘকাল— যেন যুগান্ত অতিক্রম করে, দুর্গম তমিস্র প্রকোষ্ঠে বর্তিকার উপহার।

লেখার জন্য কাগজ কলম নিয়েও স্তব্ধ বসে থাকে প্রণতি। কী লিখবে? আষাঢ় আকাশের পুঞ্জিত মেঘের মতো অভিমানের কথা লেখা যাবে না। লেখা যাবে না নিভৃত আত্মার আকুতিও। বরং বাবাই লিখুক। ওর লেখাই সমীচীন হবে।

বাবাই বড়ুয়া-ভবনের পাশ দিয়ে ফিরছিল। ইদানীং ওদিক থেকে আসার সময় এই পথেই যায়। অনিবার্যভাবে চোখ সেই জানলায় সার্চলাইটের মতো ঝাপায়। না, আর একদিনও সেই

অপার্থিব অলৌকিক দৃশ্য চোখে পড়েনি। তবে মেয়েটিকে দুই-একবার সুচারু পোশাকে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেছে। অনামিকার মুখটা ফ্রেমে-বাঁধা ছবির মতো মাথায় আঁটা। মুখের নীচে নিরাবরণ বর্তুল অহমিকার নিটোল আহ্বান, শুধুই ভাবনায়, প্রত্যক্ষত নয়। তবুও আশা, হয়তো আজ—অঘটন কি ঘটতে পারে না? সেদিনের মতো?

আজও ব্যর্থমনোরথ হয়ে বাড়ির কাছাকাছি এসেও বাবাই মাসির বাড়ির দিকে হাঁটে। ওকে দেখে সীমা বলে, কীরে কদিন আসিসনি কেন? বাড়িতে সবাই ভালো তো? পিসি কেমন আছে?

—সবাই ঠিক আছে। আজ স্পেশাল কী বানিয়েছ বল তো?

—আজ কিছু করিনিরে। তোর মেসো তো নেই।

— মেসো কোথায় গেছে।

— গৌহাটি। কাল আসবে। তুইও আসিস।

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সবিতা ও তরলা। তরলা বলে, বুকোদরবাবুর আজ কপালটাই মন্দ। মাসি তুমি বরং ওকে এক বাটি মুড়িই দাও।

সীমা হেসে বলে, তুই সবসময় ওর পিছনে লাগিস কেন বল তো?

তরলা বলে, কী করব বলো,

তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি যাই ঘাটে।

দেখিয়া তোমার দুঃখ পরাণ আমার ফাটে।

সবিতা বলল, তুই এসব কোথায় পাস?

— কী করব বল, আমি তোর মতো বুদ্ধিমতীও না, আর তোর নাড়ুগোপাল ভাইয়ের মতো মেধাবীও নই।

বাবাই ক্ষুব্ধভাবে বলে, মাসি, আজ যাচ্ছি। আর কখনও আসব না।

তরলা ছুটে এসে বাবাইয়ের হাত ধরে বলে, ঢেঁকি ঘরে মানিক পাই/তবে কেন পর্বতে যাই। গোঁসা করে না নাড়ুগোপাল। এই কান মুলছি, আর কখনও বলব না।

এমন রগুড়ে ঢঙে তরলা বলে যে বাবাইয়ের গোমড়া মুখেও গোপন হাসি চিকচিক করে।

সবিতা বলল, এদিকে আয় তো, ভাই। দেখ তো একটা অঙ্ক করতে পারিস কি না।

বাবাই বলল, তোমাদের অঙ্ক আমি পারব কেন?

— আমাদের অঙ্ক আবার কী! এমন অঙ্ক তোদেরও আসতে পারে।

অঙ্কটা দেখে বাবাই বোঝে সবিতা মিথ্যা বলেনি। ত্রিকোণমিতির এই অঙ্ক ওদেরও করতে হয়। তবে এই অঙ্কটা উঁচুস্তরের। সৌভাগ্যবশত ওদের অঙ্কের শিক্ষক স্পেশাল ক্লাসে এমনই একটা অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন। ও খাতা নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে তরলা। সবিতা ভাইয়ের পাশে বসে অঙ্ক কষা দেখে। বাবাই মুখ তুলে তরলাকে বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।

বলতে গিয়ে শব্দগুলো যেন কণ্ঠায় আটকে যাবে। তরলার ব্লাউজ ঢাকা উদ্ধত ডান বুক আঁচলের বাইরে থেকে ওর চোখে ঝাঁপায় যেন। আড়চোখে সবিতাকে দেখেই ও মুখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু চোখের নিভৃত পর্দায় ওই বুক অনাবৃত। জিজ্ঞাসা জাগে, এই গোলক কি অনামিকার বর্তুল বৈভবের মতোই অপরূপ—কিংবা সেই পরির ঐশ্বর্যের মতো? ওর কান গরম হয়ে

ওঠে। গলা শুকনো।

অঙ্কে মন দিয়ে কোনোমতে বলে, দিদি একটু জল দেবে?

তরলা বলল, আমি দিচ্ছি।

তরলার হাত থেকে জলের গ্লাস নেওয়ার সময় বাবাই লক্ষ করে, ওর বুকের আব্রু যথাযথ। তখন কোনো অসতর্কতার জন্যই হয়তো আঁচল সরে গিয়ে বর্তুল বিকাশ ঘটেছিল।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় অঙ্কটা সফলভাবে শেষ করে। সবিতাও মাথা লাগিয়েছিল। দু-জনে মিলে পদ্ধতিটা আলোচনা করে যাতে স্মৃতিতে থাকে। তরলা শুনে বলে, সবি, এ আমার মাথায় ঢুকবে নারে। এটা পরীক্ষায় এলে তোর খাতা থেকে টুকতে হবে।

— তুমি টুকবে?— বাবাইয়ের স্বরে অবিশ্বাস।

— না-পারলে কী করব! তুমি তো করে দিতে পারবে না।

— চেষ্টা করলেই শিখতে পারো।

— চেষ্টা করলেই হয়? আচ্ছা বল দেখি এটা কী—

জন্ম দিয়া বাপ পালাইল
মা হইল বনবাসী।
যার ছেলে সে নিয়া গেল
কাইন্দা মরল পাড়াপড়শি।

বাবাই উজ্জ্বল হেসে বলল, কোকিলছানা।

তরলা উজ্জ্বল গলায় বলে, সবি, তোর ভাই দেখছি সেয়ানা হয়ে উঠেছে। কোথায় শিখেছ?

—দিদা বলেছিল একদিন।

— দিদাকে গিয়ে বলতে হবে তুমি খুব ডেঁপো হয়েছ।

— সে কী! আমি কী করলাম?

সবিতা বলল, ওর কথা ছাড়। চল্, মা বোধ হয় লুচি ভাজছে তোর জন্য।

— না, দিদি, এখন আর কিছু খাব না। কোনো নতুন রেকর্ড কিনেছ?

—আয়। একটা দারুণ গান শোনাব আজ। সবিতা উঠে রেকর্ডপ্লেয়ার বের করে একটা রেকর্ড চালিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে ঘরে গমগম করে— সবাই চলে গেছে, শুধু একটি মাধবী তুমি এখনও তো ঠিকই ফুটে আছ—

তরলা ঠোঁট টিপে জিজ্ঞেস করে, কার গলা?

বাবাই বলল, এ-গলা একজনেরই হতে পারে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গানটা বাবাইয়ের অসম্ভব ভালো লাগে। ও বার বার শুনে প্রায় মুখস্ত করে ফেলে। সুরটা মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে বিনবিন করে। আঃ, গলায় যদি একটুও সুর থাকত!

ঘড়িতে চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয় বাবাই। সাতটা বেজে গেছে। মা আজ বেজায় বকবে। ও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

তরলা বলল, আমিও যাইরে সবি।

সবিতা বলল, বাবাই তরলাদিকে একটু এগিয়ে দিয়ে যা।

বাইরে বেরিয়ে বুঝতে পারে কৃষ্ণপক্ষ চলছে। রাস্তার ম্লান আলো ঘিরে চাপা অন্ধকার।

বাবাই বোঝে রেলের সীমানা পেরোলেই ঘন অন্ধকার ঠেলে যেতে হবে। মাসির কাছ থেকে টর্চ চেয়ে আনলে ভালো হত। নিজের অজান্তেই ওর পায়ের গতি বাড়ে।

তরলা ওর হাত ধরে টেনে বলে, আস্তে। আমি কি অত জোরে হাঁটতে পারি?

— স্যরি।

বাবাইয়ের মাথার মধ্যে গুনগুন করে—হায় চাঁদও যে মেঘে ঢেকে গেছে /শুধু একরাশ ব্যথা রেখে গেছে—।

—গানটার কথাগুলো কী দারুণ!— বাবাই আপন আনন্দে উচ্চারণ করে।

নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি এসে তরলা বাবাইকে একটা গাছের আড়ালে টেনে ওর গালে চুমু খেয়ে বলে— এটা অঙ্কের জন্য। অন্য গালে চুমু দিয়ে বলে, এটা ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পারলে পুরস্কার দেবো বলেছিলাম। আজ পেরেছ, দিয়ে দিলাম।

বাবাই কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই তরলা ওর ঠোঁটে ঠোঁট বুলিয়ে বলে, আর এটা আমাকে মনে রাখার জন্য।

বাবাই ঠোঁট মোছার আগেই তরলা ছুটে গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

বাবাই অন্ধকার যবনিকার দিকে চোখ মেলে সাড়হীন দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু শরীরের চাগিয়ে ওঠা অস্থিরতা টের পায়। প্যান্টের ভিতরে পৌরুষের আস্ফালন। পকেটে হাত দিয়ে তার কঠোরতা অনুভব করে দ্রুত হাঁটতে থাকে। বাড়িতে ঢোকার আগে ঝিলের কাছে, জলের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ বসতেই হবে।

আটটারও পর বাড়িতে ঢোকে বাবাই। এত দেরি সাধারণত করে না। আজ সে অনন্যোপায়। প্রণতি বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—মাসির বাড়িতে। অঙ্ক কষছিলাম দিদির সঙ্গে।

যমুনা সরস স্বরে বলেন, দাদুভাইয়ের আর বুড়ি দিদাকে পছন্দ হচ্ছে না।

বাবাই যমুনাকে সজোরে জড়িয়ে বলে, কী যে বলো না দিদা, আমার কাছে তুমি বিশ্বের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা!

প্রণতি বলল, হয়েছে, হয়েছে। আর দিদার সঙ্গে ধামালি করতে হবে না। হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

নিজেকে দহনমুক্ত করে ঝিলের জলে ভালো করে পরিচ্ছন্ন হয়েছিল। ঘরে ঢুকে প্যান্ট ছেড়ে পাজামা আর গেঞ্জি গায়ে বেরিয়ে এলে প্রণতি বলল, একটা সুখবর আছে।

বাবাই কৌতূহলী চোখে মার দিকে চায়।

প্রণতি বলে, মাস্টারমশাই চিঠি দিয়েছেন।

একটু সময় লাগে বাবাইয়ের, মাস্টারমশাইয়ের অনুষঙ্গ বুঝতে। তার পরই চেঁচিয়ে ওঠে মাস্টারমামা! আগরতলার? আমাকে কত গল্প বলতেন। মামা এখন কোথায়?

— কলকাতায়। তোর কথা লিখেছেন। কী পড়ছিস, রেজাল্ট কেমন হচ্ছে। ওঁর স্কুলের ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে দিস।

— তুমি লিখবে না?

—আমি আর কী লিখব! তুই-ই লিখে দিস আমাদের হয়ে।

— চিঠিটা আমি দেখব?

—নিশ্চয়ই। তোর টেবিলে রাখা আছে।

বাবাই ক্ষিপ্র পায়ে ঘরে ঢুকে চিঠিটা পড়ে। নিজের সম্পর্কে লেখা পড়ে নির্মল আনন্দে আত্মহারা। তখনই কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে। লেখা শুরু করার আগে চিঠিটা আর-একবার পড়ে। 'দুঃসময় এলে চলা থামাতে নেই'— লাইনটা ওকে ভাবায়। এমন লাইন কোথায় পেলেন! মাথায় গুঞ্জরিত হয়—

কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুষ্পিত
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা!
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

শরীরটা যেন মোমের মতো গলে যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে না। বরং অনবদ্য সুখের উষ্ণ আবেশে দেহের প্রতি অণুতে ফুটে উঠছে জুঁই, সূর্যমুখী। আগ্রাসী আশ্লেষে প্রণতির মথিত বুকের পিরামিড বেয়ে হিরণ্ময় অঞ্জলি ঝরে। কোথায় লুকিয়েছিল ওই তীব্র শিহর-জাগানো জৈব আহ্লাদের নির্ঝর? এতগুলো বছর শুধু খরাদীর্ণ উষর অনাবাদী হয়ে পড়েছিল। ভুলেই গিয়েছিল অন্তর্গত স্রোতস্বিনীর উৎস। আজ, এখন ও বাধাবন্ধহীন অবগাহন করবে। দু-পায়ে ছড়িয়ে নিজের ভিতরে পুরুষটিকে টেনে নিয়ে তীব্র আলিঙ্গনে জড়িয়ে ওর মুখ তুলে ঠোঁট ডোবায়। মুখের রেখা স্পষ্ট হতেই প্রণতির মর্মমূলে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়— এ কে? এ কেন? আক্রান্ত নারীর সরল প্রতিক্রিয়ায় ঝটিতি উঠে বসে প্রণতি। শ্বাস পড়ে দ্রুত। যেন হাঁফ ধরেছে। গলায় শিরিষ কাগজের শুষ্কতা। কোমরের কাছে উঠে-আসা শাড়ি টানার সময় নিজের অজান্তেই অস্ফুটে উচ্চারণ হয় আঃ!

যমুনা ব্যস্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে মেয়ের গায়ে হাত রেখে বলেন, কী হয়েছে? স্বপ্ন দেখছিলি?

আলো জ্বেলে মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে যমুনা বলেন, যা—বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে গলায় জল দিয়ে আয়।

প্রণতি বাথরুম থেকে ফিরে দু-গ্লাস জল খায়। যমুনা মেয়েকে নিজের কাছে টেনে বলেন, আয়, আমার কাছে শো।

মাকে জড়িয়ে ঘরের অন্ধকারে উদয়ন সরকারের মুখ অত সুন্দর আর প্রেমময় লাগছিল কেন ভেবে নিজের ভিতরে উজিয়ে-ওঠা লালিম লজ্জা এড়াতে প্রয়াসী হয় প্রণতি।

৮.

সবিতা উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তরলা ফেল করে। সবিতা কলেজে পড়ার জন্য কলকাতা যাবে। পবিত্র প্রস্তাব দেয় বাবাইও যেন দিদির সঙ্গে কলকাতা যায়। উদয়ন জানায় কলকাতায় ক্লাস ইলেভেনে ভরতি করিয়ে দিতে খুব অসুবিধে হবে না। বাবাই দ্বিধাগ্রস্ত। মা-দিদাকে ছেড়ে একা থাকার কথা কখনও ভাবেনি। প্রণতি অর্থ সংস্থানের জন্য চিন্তিত। কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়তে যত টাকা লাগবে তার ব্যবস্থা করা এখনই ওর সাধ্যায়ত্ত নয়। তবু বাবাই জেদ করলে হয়তো না বলতে পারত না। বাবাই সিদ্ধান্তের ভার

মা-র উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত। যমুনা অবশ্য নাতিকে কাছ-ছাড়া করতে চান না। অচেনা শহরে ওকে কে দেখাশোনা করবে? মাস্টার খোঁজখবর করলেও বাবাইকে তো নিজের কাছে রাখতে পারবে না। শুনেছে মেসে নানা রকমের লোকজন থাকে। ওইটুকু ছেলের তার মধ্যে ঢুকে পড়া অনুচিত হবে।

ফাদার জোনস প্রণতিকে বলেন, বাবাই এখানেই পড়ুক। তার পর না হয় যাবে কলকাতা। তুমি কিছু সময় পাবে। তোমার আর্থিক উন্নতিও হবে কিছু।

ফাদারের পরামর্শে সারবত্তা আছে নিঃসন্দেহে। যতই স্নেহান্ধ হোক, প্রণতি জানে ছেলেকে উদার আকাশে ছড়িয়ে দিতে হবেই। দীর্ঘদিন আর এখানকার সীমিত সুযোগ-সম্ভাবনার বলয়ে বন্দি রাখা যাবে না। বাবাই আরও পরিণত হবে। এমনিতেই সাহসী ও। আত্মবিশ্বাসীও। সময়ে তা আরও আহৃত হলে যুযুধান বহির্বিশ্বের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া সহজতর হতে পারে।

বাবাই পুরোনো স্কুলেই রইল। দেবল, নীতিশ আর নরেশও। দিবাকর আশঙ্কা অনুসারে ক্লাস টেনে অঙ্কে ফেল করে। ও আর পড়বে না। পারিবারিক ব্যাবসা দেখবে। এটা শুনে বিমর্ষ বোধ করে বাবাই। সেই মারামারির পর নীতিশের সঙ্গে সম্পর্ক আর স্বাভাবিক সুস্থতা পায়নি। পরীক্ষার ফল-এ নীতিশের রোষ বেড়েছে আরও। দিবাকর ওদের মধ্যে হাইফেন হয়ে থাকত। ওর অনুপস্থিতি বাবাইয়ের কাছে অস্বস্তিকর। শুধু এজন্যই একবার কলকাতা যাওয়ার কথা বিবেচনা করেছিল। পরে ভেবে দেখেছে ওটা হত পালিয়ে যাওয়া। ভীরুতার চূড়ান্ত। বাবাই চ্যালেঞ্জ নিতে চায়।

সবিতা মা-বাবার সঙ্গে কলকাতা রওনা হল। স্টেশনে গিয়েছিল বাবাই, তরলা। কতদিন সবিতার সঙ্গে আর দেখা হবে না। ইচ্ছে হলেই আড্ডা দেওয়া, গান শোনা, তর্ক করা যাবে না। বাবাইয়ের বুকে বিষাদের সঞ্চার। কণ্ঠার কাছে রুদ্ধ রোদনের ঝাপট। সবিতা বুঝতে পেরে বলে, মন খারাপ করিস না। ছুটিতে তো আসবই। ভালো করে পড়িস। পরের বছর তোকেও যেতে হবে। এক কলেজেও পড়তে পারি।

সীমা বলল, পিসিকে— তোর মাকে বলিস আমি ফিরে এসেই দেখা করতে যাব।

ঝোড়ো শব্দে ট্রেন এল। ওরা সুস্থির হয়ে বসার পর ছেড়েও দিল। জানালায় সবিতার হাত নড়ে। বাবাই মূক চোখে দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বহু দূর চলে যায়। দিগন্তের গায়ে লেগে থাকা চাকতির মতো দেখায়। তরলা ডাকে, যাবে না?

—হ্যাঁ, চলো।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা রিকশায় উঠে তরলা বলল, উঠে এসো। আজ আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

বাবাই বলল, এইটুকু তো—আমি হেঁটেই যেতে পারব।

— পারবে না, তা তো বলিনি। হাঁটতে তো আমিও পারতাম। তবে রাত হয়েছে, আর দেরি করলে তোমার দিদা থানায় ছুটবেন।

রিকশায় দু-জনে বসলে ঘেঁষাঘেঁষি হবেই। রিকশাগুলো এমনভাবে তৈরি হয় যে দু-জন মানুষ কখনোই স্বচ্ছন্দে বসতে পারে না। নিজের বেড়ে-ওঠা শরীর নিয়ে তরলার পাশে বাবাই স্বস্তি বোধ করে না। তরলা ওর হাত টেনে বলে, ঠিক হয়ে বোসো। ঝাঁকুনিতে পড়ে যেয়ো না যেন।

বাবাই শরীর আলগা করে বসে। ডান বাহুতে তরলার স্তনের ঘষা লাগে। ও হাতটা যতটা সম্ভব কোলের দিকে গুটিয়ে রাখে।

তরলা বলে, সবি চলে যাওয়ায় তোমার খুব মন খারাপ লাগছে?

— তোমার লাগছে না?

—ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি যে কী করব—

—তুমি আর পড়বে না?

—পড়ালেখা আমার আর হবে না।

—তুমি মন দিয়ে চেষ্টা করো না। করলেই পারতে। দিদি পারল আর তুমি পারলে না! দিদির মতো অত নম্বর না পেলেও পাস তো করতে পারতে। এবার আবার দাও।

—আবার? না, বাবা। আমি আর পরীক্ষা-টরিক্ষার মধ্যে নেই।

— তবে কী করবে?

কথা ঘুরিয়ে তরলা বলে, মাসিরা না ফেরা পর্যন্ত তুমি আর এদিকে আসবে না?

— কোথায় আসব? এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই।

— আমাকে দেখতে আসবে না?

বাবাই জবাব দেয় না। তরলা ওর ডান হাত মুঠিতে ধরে নিজের বুকের উপর চেপে বলল, মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়িতে এসো।

একটু পরে বাবাই রিকশা থামিয়ে বলে, আমি এখানে নেমে যাই। এখান থেকে একটুখানি আর। শুধু-শুধু বড়ুয়া টিলা ঘুরে যাওয়ার অর্থ হয় না।

নামার সময় ওর হাত তরলার সুডৌল স্তনের স্পর্শ পায়। তরলা হাত চেপে রাখায় মনে হয় ওর হাত যেন নরম তুলোর স্তূপে ডেবে যাচ্ছে। ওর শরীরে ঝাঁকুনি লাগে। বাবাই হাত ছাড়িয়ে নেমে যায়। তরলা বলে, আসবে তো?

বাবাই হাত তুলে বলে, হ্যাঁ, যাবো।

বাবাই বড়ুয়া টিলার দিকে এগুতে থাকে। অন্ধকারে টিলার উপরে বড়ুয়া ভবনের আলো সমুদ্রের বাতিঘরের মতো জ্বলে। যদিও বাবাই বাতিঘর দেখেনি কখনও। বইয়ে পড়েছে। দেখেছে ছবিতে।

সবিতার চিঠি আসে কয়েকদিন পর। ও যাদবপুরে ভরতি হয়েছে। পবিত্রর বাবা যাদবপুরেই বাড়ি করেছেন। সুতরাং আসা-যাওয়ার সমস্যা নেই। লিখেছে বাবাইয়ের কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে। ওর বয়েসী এক খুড়তুতো ভাই আছে, কুশল, ওকে দেখলেই বেশি করে বাবাইয়ের, কথা মনে আসে। শেষে লিখেছে আমার মতোই তরলা তোকে খুব ভালোবাসে। ওর খোঁজখবর করিস। ওর কথা শুনে ওকে ভুল বুঝিস না। পাস করতে না পারার জন্য ও মরমে মরে আছে। অথচ সর্বক্ষণ মজা আর হল্লোড়ে মেতে থাকার ভান করে।

উদয়নও চিঠি লেখে। বস্তুত উদয়নের চিঠির জন্য বাবাই উদগ্রীব হয়ে থাকে। গত চিঠিতে উদয়ন লিখেছে, এই-ই সময় জগৎ-জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র-সরকার নিয়ে তোমার মনে নানা জিজ্ঞাসা জন্ম নেবে। অনেকসময় বিভ্রম-সংশয় তোমাকে হয়তো বিপন্নও করতে পারে। তখনই দৃঢ়চিত্ত হয়ে, অবিচলতার অঙ্গীকার করবে। যত পারো পড়বে, জানবে। পরীক্ষার প্রস্তুতির সঙ্গে জীবনবীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে হবে। দুইয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমি কিছু

কিছু বইয়ের কথা তোমাকে লিখব। ওখানে সংগ্রহ করে পড়তে চেষ্টা কোরো। ভালো লাইব্রেরিতে পাবে। অন্যথায় আমাকে জানালে এখান থেকে পাঠাবার চেষ্টা করব। *নাউ* নামে একটা ইংরেজি পত্রিকা বেরিয়েছে। ওটা নিয়মিত পোড়ো। আর কিছু না হোক ভালো ইংরেজি শিখতে পারবে। এর সম্পাদক সমর সেন একজন অসাধারণ কবি। তাঁর কোনো কবিতা পড়েছ কি?

স্টেশনের স্টল থেকে *নাউ* এনে পড়তে বসে বাবাই আক্ষরিকভাবেই থ হয়ে যায়। অজস্র নতুন শব্দের সমাহার। লেখার স্টাইল ভিন্নতর। অধিকাংশই অবোধ্য লাগে। ও মাকে দিয়ে বলে, তুমি পড়ে বুঝিয়ে দাও।

প্রণতি কিছুটা পড়ে বলল, তোকে কে বলেছে এটা পড়তে?

— মাস্টারমামা।

— উনি নিজে তো পাগল। তোকেও পাগল বানাবে দেখছি। তোর এসব বোঝার বয়স হয়নি। রাজনীতির কচকচি শুধু।

— মা, ইংরেজিটা কীরকম বলো?

— খুব ভালো। কাগজটা আনিস। আমি পড়ব। অনেকদিন ভালো বইটইও পড়া হচ্ছে না। স্কুল আর খাতা দেখেই দিন চলে যাচ্ছে।

— দুটো বইয়ের অর্ডার দিয়েছি।

— কী বই?

—সমর সেনের কবিতা আর তারাশঙ্করের *গণদেবতা*।

— দাম কত?

— ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ফ্রেন্ডস্ ক্লাবে খেলার জন্য আমার কিছু প্রাপ্তি হয়েছে।

৯.

মেসে উদয়নের ঘরে আরও তিন জন থাকে। প্রভাত গোস্বামী বিড়লা কোম্পানিতে চাকরি করে। সকাল আটটায় বেরিয়ে ফেরে রাত দশটা নাগাদ। রবিবারেও সব সময় ছুটি মেলে না। বাবুর বাড়িতে কোনো উৎসব অনুষ্ঠান থাকলে তো ছুটির কথা উচ্চারণও করা যায় না। ওর খাটটা উদয়নের পাশে বলে, সেখানে বসেই আড্ডা জমে। প্রবোধের সঙ্গে অনেকেই আসে। এ. বি. টি.এ-র লোকজনের আনাগোনাও থাকে।

ভবতোষ করের দোকান আছে গড়িয়াহাটে। হোসিয়ারি জিনিস বিক্রি করে। প্রতি শনিবার শেষ ট্রেনে শান্তিপুরের বাড়িতে যায়। সোমবার ফিরে আসে। কথায় বাঙাল টান। দোকান বন্ধ করে দু-পাত্র পান করে এলে মেজাজ ফুরফুরে থাকে। তখন সোৎসাহে উদয়নের সঙ্গে তর্ক করার উৎসাহ বাড়ে।

জিতেন সামন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চাকরি করে। মাসে ক-দিন অফিসে যায় বা আদৌ যায় কি না উদয়ন নিশ্চিত নয়। তবে তার চৌকশ সচ্ছলতার ঔজ্জ্বল্য প্রকট। জিতেন প্রতি শনিবার দেশে যায় না। মাসে এক বার বা দু-বার যায়। যাওয়ার সময় যা কেনাকাটি করে মনে হবে যেন মেয়ের বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। বেচারার অবশ্য

কোনো মেয়ে নেই। তিন ছেলেই মেদিনীপুরে।

এদের সকলেরই বয়েস চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। উদয়ন স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষক. এখনও রাজনীতির লোকজনের সঙ্গে ওঠাবসা আছে, এ-কারণেই তিন জনই ওকে সমীহ করে। ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে পরামর্শ চায়। প্রভাত অবশ্য পরামর্শ করার সময়ও পায় না।

সেদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে ভবতোষ বলে ওঠে, যাঃ আপনাদের পার্টি দু-টুকরো হয়ে গেল। আপনি এখন কোন্ দলে যাবেন?

উদয়ন বলল, আমি তো দলে ছিলাম না।

জিতেন বলল, আপনি এ.বি.টি.এ-তে আছেন আর দলে নেই? প্রবোধবাবুর সঙ্গেও নেই?

— সঙ্গে তো অবশ্যই আছি। যেমন আপনাদের সঙ্গেও আছি। কিন্তু আমাদের কাজ আলাদা।

গত জুলাই মাসেই কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি ঘোষিত হয়েছিল। ডিসেম্বরে (১৯৬৪), কলকাতার ত্যাগরাজ হলে সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি. পি. আই. (এম.)-এর প্রতিষ্ঠা তথা অভ্যুদয় ঘটে। অবিভক্ত পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের বৃহত্তর অংশ ওই দলের অনুগামী। নাম্বুদ্রিপাদ, সুন্দরাইয়া থেকে শুরু করে প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু সকলেই এই দলে যোগ দেন। ডাঙ্গের দলে থেকে যান ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, ভবানী সেনের মতো বাঙালি নেতৃবৃন্দ।

উদয়ন ত্রিপুরা থেকে ফিরে এসে প্রবোধকে বলেছিল, ওখানেও বেশিরভাগ কর্মী সমর্থকরা বামপন্থীদের দিকেই ঝুঁকে। পার্টি কংগ্রেসে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। প্রবোধ উল্লাসের সঙ্গে বলে, তোমার কথার ভিত্তিতে আমি যে রিপোর্ট দিয়েছিলাম, তা দেখে প্রমোদবাবু দারুণ খুশি।

—আমার বোঝায় যদি ভুল থাকত?

— থাকতে পারে না, উদয়ন। আমি নিশ্চিত ছিলাম। তোমাকে কি আজকে দেখছি? দেখে নিও ডাঙ্গেপন্থীদের অস্তিত্বও থাকবে না।

—আমার তা মনে হয় না। বিভিন্ন জায়গায় ওদের সংগঠন বেশ জোরালো। নতুন পথের, নতুন সংগ্রামের সবে তো শুরু। এখনই ও-কথা বলা ঠিক না। শেষ কথা বলবে ইতিহাস।

সেদিনই সন্ধের পর একটু আগেই ফিরে আসে ভবতোষ। উদয়নকে দেখে বলে, আপনে আছেন অখনও।

— না থাকার কী হল?

— শোনেন নাই কিছু? আপনাগো নেতাদের ধইর‍্যা-ধইর‍্যা জেলে পুরতাছে। ভাবলাম নেহরুর গ্যাস তো ফুরাইছে। লালবাহাদুর অন্যরকম হইবেন। এ তো দেখি গুয়ের এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

ভবতোষের নেহরু-বিদ্বেষ মজ্জাগত। মে মাসে নেহরুর মৃত্যুর পর বলেছিল, বড়ো আপদটা শেষপর্যন্ত গেছে।

—আপদ বলছেন কেন?

—হ্যার জন্যই তো দ্যাশভাগ। আমাগো বাঙালির এই হ্যানস্তা। পাঞ্জাবিদের সব গুছাইয়া দিছে। আর বাঙালিদের পাঠাইছে দণ্ডকারণ্যে। অথচ মোসলারা দিব্যি রইছে। ক্যান হালাগুলারে

পাঠাও পাকিস্তানে। পাঞ্জাবে করলা, বাঙলায় করবা না ক্যান?

উদয়ন বলল, নেহরুর গ্যাসের কথা কী যেন বলছিলেন?

—ক্যান, আপনে শোনেন নাই? নেহরু তো দাতা কর্ণের ঠাকুর্দা। সারা বিশ্বরে দিয়া গেছে গ্যাস, এই দ্যাশের মানুষরে অ্যাশ—তাঁর চিতার ছাইভস্ম, আর কন্যারে যত ক্যাশ।

সশব্দে হেসে উদয়ন বলল, কোথায় শুনলেন ওটা?

— ট্রামে শুনছিলাম। বেশ ক-দিন আগে। আপনে রেডিয়ো খবর শোনেন না? একটা রেডিয়ো কিন্না ফালান। রেডিয়োতে নাকি কইছে চীনাপন্থীদের ধরপাকড় চলছে। সবখানে।

ভবতোষের খবর সঠিক। বামপন্থী কমিউনিস্টরা নাকি ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করছে, এই অজুহাতে সারা দেশে আর-একবার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। পত্র-পত্রিকায় চলে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রোপাগান্ডা।

১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। তখন অজস্র নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে উদয়নও জেলে। কারাবাসে দলের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ওকে বলা হয় মুক্তির পর বৃহত্তর দায়িত্ব নিতে হবে।

জেলে বসেই জানতে পারে এই অর্থহীন যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল বাংলা ও বাঙালি। ও-পারে হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সব শত্রু-সম্পত্তি বলে ঘোষিত হল। বহু হিন্দু কারারুদ্ধ। অনেকে আবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসে আশ্রয়ের সন্ধানে। এখানেও মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ। বহু মুসলমান গ্রেফতার হয়। লোকসভার সদস্যরাও কেউ-কেউ গুপ্তচর সন্দেহে বিনা বিচারে বন্দি হন।

যুদ্ধের অবিবেচক ক্রূরতার অনন্ত গুজবের সঙ্গে, জন্ম দেয় বর্বর পাশবিকতার, হত হয় মানবিকতা সৌভ্রাতৃবোধ। খুঁচিয়ে তোলা প্রতিহিংসাপরায়ণ মেকি দেশপ্রেমের মাতাল নেশা আচ্ছন্ন করে বিবেক, সুস্থির-বোধ ও দেশের প্রতি প্রকৃত মমত্ব। অগণিত মৃত্যু ও অনর্থক অর্থব্যয় দেশকে করে দরিদ্রতর।

এখন কোনো যুদ্ধই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রাশিয়া আমেরিকা মোড়লি করতে আসরে ঝাঁপায়। তাসখন্দে সালিশিতে বসলেন লালবাহাদুর ও আয়ুব খাঁ। ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু নতুন প্রভাতের মুখ দেখতে পেলেন না প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ওই চুক্তিস্বাক্ষর তাঁকে অমরত্ব এনে দেবে, স্বাক্ষর দেওয়ার সময় এক পলকও কি ভেবেছিলেন লালবাহাদুর!

নতুন বছরে ছাড়া পেল অনেকে। উদয়নের মুক্তি পেতে আরও কয়েক মাস লাগে।

দেশে তখন নতুন প্রধানমন্ত্রী—ইন্দিরা গান্ধি।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কৃষি ও শিল্পে বিপুল উৎপাদন, হ্রাস। চাল ও গমের উৎপাদন কমে যায় গত বছরের তুলনায় যথাক্রমে ২৫ ও ৬ শতাংশ। মাথাপিছু খাদ্যলভ্য ছিল মাত্র ১৪ আউন্স। শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণের সূচক ১৫৮ থেকে বেড়ে ১৯১ হয়, খোদ রাজধানীতেই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে একশো কোটি টাকা খরচহলেও প্রতিরক্ষার বাজেট বরাদ্দ বাড়ে আট শতাংশ। এই অবস্থায় দেশ জুড়ে খাদ্যের ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে।

আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য বাঙালি অর্থমন্ত্রী আচমকা টাকার অবমূল্যায়ন ঘোষণা

করেন জুনের প্রথম সপ্তাহে। অবমূল্যায়নের ৫৭.৫ শতাংশ সকলকে স্তম্ভিত করে। তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা গড়ে উঠতে থাকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

মিটিং মিছিলে প্রায় প্রতিদিন ব্যস্ত কাটে উদয়নের। মিমির খবরও নেওয়া হয় না। জেল থেকে ফিরে একবার দেখা করতেও যায়নি। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' মুক্তি পেয়েছে। কাগজে, সিনেমা হলে উত্তমকুমারের ছবি। তার কাছাকাছি সময়ে মিমির ছবি 'অন্যজীবন'ও মুক্তি পায়। রঞ্জনা নন্দীর লাস্যময় ছবি শহরের দেয়ালে, ল্যাম্পপোস্টে।

বাবাইয়ের চিঠি আসে — পরীক্ষা ভালো দিয়েছে। রেজাল্ট বেরুলেই কলকাতার কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য আসবে। হস্টেল না-পাওয়া পর্যন্ত কোথাও থাকার ব্যবস্থা কি করা যাবে?

বাবাই নিশ্চিত ভালো রেজাল্ট করবে, তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। প্রণতির অনুরোধে এসেছে পবিত্র ও সীমা। এসেছেন ফাদার জোনসও। ফাদার জানতে চান, কী নিয়ে পড়বে ঠিক হয়েছে।

প্রণতি বলল, পিওর সায়েন্সেই পড়বে।

পবিত্র বলল, বাবাই, তোমার কী ইচ্ছে?

—আমার ইচ্ছে অঙ্ক নিয়ে পড়ার। না পেলে ভাবতে হবে।

পবিত্র বলল, পাবি না কীরে!

— মেসো, পরীক্ষার কথা কিছু বলা যায় না। আমার চেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র-রা অভাব হবে না।

ফাদার বললেন গুড। খুব ভালো বলেছ। পৃথিবীটা অনেক বড়ো। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তে চাইলে আমি চেষ্টা করতে পারি।

প্রণতি কুণ্ঠিত স্বরে বলে, আমার খুব সাধ প্রেসিডেন্সিতে পড়ুক। সব সেরা প্রতিভা ওখান থেকেই এসেছে।

— খুব ভালো।— ফাদার বলেন, প্রেসিডেন্সির হস্টেল আছে।

সীমা বলে, যাদবপুরে পড়লে সবিতার সঙ্গে থাকতে পারত আমাদের বাড়িতে। ওখান থেকে প্রেসিডেন্সি দূর হবে একটু।

প্রণতি বলে, না, না— ও হস্টেলেই থাকবে। জামাইবাবু, বাবাই কখনও একলা যায়নি কোথাও। কলকাতা দেখেওনি। আপনি যদি দয়া করে ওকে সঙ্গে নিয়ে ভরতি করিয়ে আসেন—

পবিত্র বলল, আরে, আগে রেজাল্ট বেরোক। দিনক্ষণ দেখে ঠিক করলেই হবে। তোমার সেই মাস্টারমশাই আছেন না— উদয়নবাবু— তাঁকেও লিখে দ্যাখো কিছু করতে পারেন কি না।

সেদিন সন্ধ্যায় বড়ুয়া ভবনে আলো দেখে বাবাই বার-কয়েক ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। অনামিকা সহ আরও দুটি মহিলাকে দেখল। এক জন মধ্যবয়স্কা। ওরা নিজেদের মধ্যে রগড়ে মশগুল। সেই স্বপ্নাতীত নিরাবরণ উড্ডীন পরির দৃশ্য দেখা হল না। হতাশ খিন্ন চিত্তে হঠাৎই মনে হল, তরলার কাছে গেলে কেমন হয়। একবার কি ছুঁতে দেবে না? নিদেন একটা চুম্বন!

ধ্যুত, এসব পাগল চিন্তা নিতান্তই অনর্থক।

বাবাই বাড়ি ফিরে আসে।

ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পরও যতক্ষণ সম্ভব জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাবাই। মা-দিদার সঙ্গে, বারণ করা সত্ত্বেও, তরলা এসেছিল। দেবল আর সীমামাসিও। মেসো আসেননি। যেতেও পারছেন না বাবাইয়ের সঙ্গে। জরুরি কাজে মালিগাঁও গেছেন। তবে তার বন্ধুর ছেলে অভয় রাহা যাচ্ছে। অভয় কলকাতায় নতুন চাকরিতে যোগ দেবে। কলকাতা তাঁর অতি পরিচিত। মাস্টারমামা জেলে। তাঁর এক বন্ধু স্টেশনে আসবেন লিখেছেন। না এলে অভয় ওকে মামার মেসে পৌঁছে দেবেন।

চোখের দৃষ্টি থেকে মা-দিদার পেনসিল-স্কেচের মতো অবয়ব-রেখা মুছে যেতেই বুকের ভিতরে যেন বজ্রপাত হয়। ঘনীভূত আবেগ অনুভবে মুচড়ে ওঠে। চোয়াল শক্ত করে অশ্রুপাত রোধ করে। হৃদয়ে তিরতির শূন্যতা বহমান। চোখে জ্বালা। আবার কবে দিদাকেদেখবে? অত প্রিয় মানুষদের ছেড়ে যাওয়া কি অনিবার্য? না গেলে কী ক্ষতি হত পৃথিবীর? পৃথিবীর হত না। ক্ষতি ওর নিজের। ছাড়িয়ে যাওয়া আর ছড়িয়ে যাওয়াই জীবনের চলিষ্ণু পরিচিতি। স্থবিরতা মানে অবসান। যবনিকা। এসব স্বচ্ছ যুক্তির কথা জানা আছে। কিন্তু হৃদয় অবুঝ। সেখানে স্মৃতির খড়কুটো নিয়ে সারাক্ষণ খুনসুটি করে শালিক চড়ুই। একা-একা ডাকে বিষণ্ণ কুবো পাখি।

অভয় ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, মন খারাপ লাগছে?

জবাব না দিয়ে বাবাই অভয়ের মুখের দিকে তাকায়। স্নেহময় হাসিতে উজ্জ্বল চোখ।

— প্রথমবার আমারও লেগেছিল। তার পর সয়ে যায়। গত কয়েকদিন তো তোমার খুব উচ্ছল ব্যস্ত সময় গেছে। সেসব ভাবো। ভালো লাগবে। অন্ধকারে বাইরে কিছু দেখতে পাবে না। নইলে বলতাম পাহাড় দ্যাখো আকাশের রংবদল লক্ষ করো, ফসলের মাঠের উপহার। এখন তোমার গল্প করতে ভালো লাগবে না জানি, তবু বল তো প্রথম খবরটা পেয়ে কেমন লেগেছিল?

সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল বলে বাবাই ধীরেসুস্থে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সাইকেল নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেবল এসে বলল, এক্ষুনি চল্, হেড়ু তোকে খুঁজছে।

কোনো অন্যায় কিছু করলেই সচরাচর হেডমাস্টার ডেকে পাঠান। পরীক্ষার আগে বা পরে, ও তেমন কিছু করেনি। স্কুলের ধারও মাড়ায়নি পরীক্ষার পর। তা হলে কেন খুঁজবেন?

সাইকেলে উঠে বাবাই জানতে চায়, রেজাল্ট এসে গেছে?

— তাই তো শুনলাম।

— তোর খবর কী?

— যা হওয়ার তাই। সেকেন্ড ডিভিশন।

— কত বলেছি তোকে আর-একটু মন দিতে।

— ছাড় তো। এই যথেষ্ট হয়েছে। এবার একটা কাজটাজ জোটাতে পারলে বেঁচে যাই।

— সে কী। আর পড়বি না?

— খেপেছিস? ফাদার বলে দিয়েছে, নো আর্নিং; নো ইটিং।

বাবাইয়ের মনে পড়ে, অল্প কিছুদিন আগেই কেবল 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবির একটা গানের প্যারডি শুনিয়েছিল—

বেকার বাঙালি ছেলে, চাকরি জোটে না বলে
মাগো আর কত খিঁচুনি খাব।

বাবাই বলল, গানটা সেদিন দারুণ গেয়েছিলি। আর-একবার শুনতে হবে।

—একবার কেন, এখন ও-গান আমি রোজ গাইব। যদিন কাজ না জোটে।

স্কুলে ঢুকতেই এক দল ছেলে ছুটে এসে অভিনন্দন জানায়। বাবাই হাসিমুখে হেডমাস্টারের ঘরের দিকে যেতে-যেতে বলে, স্যারের সঙ্গে দেখা করে আসছি।

সবাই বলল, আমরাও যাব।

ওদের পিছনে নিয়ে মিছিলের নেতার মতো দরজায় দাঁড়িয়ে বাবাই বলল, আসব স্যার?

হেডমাস্টার উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত ছড়িয়ে ডাকেন, এসো—এসো। ইউ হ্যাভ মেড আস প্রাউড।

ছ-সাতজন শিক্ষক বসেছিলেন হেডমাস্টারের টেবিলের উলটো দিকে। তাঁরাও উঠে বললেন, মেনি মেনি কনগ্র্যাচুলেশনস!

বাবাই হেডমাস্টারকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি সিক্সথ হয়েছ। ফার্স্ট বয়ের থেকে মাত্র দশ নম্বর কম।

স্তম্ভিত বাবাই ভাবে, ঠিক শুনেছে তো? সিক্সথ? যাঃ হয় নাকি এমন? হেডমাস্টার বলেছেন। তিনি তো মশকরা করবেন না।

—এবার কী করবে?

— কলকাতায় প্রেসিডেন্সিতে ভরতির চেষ্টা করব।

বাঃ! দেরি কোরো না। তিন-চার-দিনের মধ্যেই চলে যাও।

বাইরে বেরুতেই বন্ধুরা চেপে ধরল খাওয়াতে হবে। বাবাই টাকা নিয়ে বেরোয়নি। পরে নিশ্চয় খাওয়াবে বলতেই দেবল বলল, গরমাগরম না হলে কোনো মজা নেই। চল্, আমি টাকা দিচ্ছি।

নীতিশ আর নরেশকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে এক ধারে কথা বলতে দেখে বাবাই জিজ্ঞেস করে, নীতিশদের রেজাল্ট কী?

দেবল বলল, নরেশ বেরিয়ে গেছে। নীতিশ পারেনি।

— সে কী!

বাবাই ঘোরগ্রস্তের মতো ছুটে গিয়ে নীতিশের হাত ধরে বলে, আয়্যাম সো সরি নীতিশ। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি— কী করে হল—

নীতিশ ক্ষিপ্ত হয়ে বাবাইকে ধাক্কা দিয়ে বলে, শালা, বঙালিকেলা, ধামালি করিবলৈ আহিছা!

—সিম্প্যাথি?

বাবাই তবু বলে, নীতিশ, আমি সিনসিয়ারলি বলছি—

—গেট লস্ট এলস্ আই উইল থ্রো ইউ আউট।

নীতিশের ক্রুদ্ধ মুখ আর লাল চোখ দেখে বাবাই পিছু হটে। দেবল ওর হাত ধরে বলে, আয়, সাইকেলে ওঠ।

বন্ধুদের সন্দেশ শিঙাড়া খাইয়ে বাবাই দেবলকে বলল, আমাকে পৌঁছে দিবি তো?

—নিশ্চয়। তার আগে এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে নে।

— কেন?

— বাড়ি গেলেই দেখতে পাবি।

বাড়িতে এসে দেখে অনেক মানুষ। সীমা, পবিত্র, তরলা, প্রণতির দু-জন সহশিক্ষিকা এবং আরও কয়েকজন। প্রতিবেশী বসুমাতারি দম্পতিও এসেছেন।

সাইকেল থেকে নামতেই যমুনা বাবাইকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন— দাদুভাই— দুঃখী মায়ের মান রেখেছে— দাদুভাই—বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ—আজ যদি—

প্রণতি মাকে টেনে সরিয়ে বলে, মা, আজ এমন দিনে দুঃখের কথা আর বোলো না।

বাবাই মাকে প্রণাম করলে প্রণতি ছেলেকে বুকে চেপে ধরে কপালে চুমু খায়। মনে মনে বিনোদকে উদ্দেশ করে বলে, তুমি কি দেখছ, তোমার ছেলে কত বড়ো হয়েছে। স্ট্যান্ড করেছে। বিনোদের কথা ভাবলেই চোখে ভেসে ওঠে উদয়নের মুখ। দেখুন মাস্টারমশাই, দেখুন, আমি পেরেছি। কথা রেখেছি আপনার।

প্রণাম প্রশস্তিপর্ব শেষ হলে বাবাই বলে, মেসো, তোমাদের কে খবর দিল?

পবিত্র বলল, সকাল থেকেই শুনছিলাম এবার তোমাদের স্কুল থেকে এক জন স্ট্যান্ড করেছে। তরলা এসে বলল, সে এক জন তুমি। কী পজিশন হল?

দেবল জবাব দেয়, সিক্সথ। আর দশ নম্বর পেলেই ফার্স্ট হত।

সীমা আপশোস করে—ইস্, মাত্র দশ!

প্রণতির হাতে মিষ্টির বাক্স দিয়ে দেবল বলল, মাসিমা সবাইকে একটু মিষ্টিমুখ—

যমুনা বললেন, আমি ভাবছিলাম কারুকে পাঠার।

তরলা প্রণতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিষ্টি বিতরণ করে।

একটু পরে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস থিতিয়ে এলে একে-একে সবাই বিদায় নেয়। থেকে যায় দেবল আর তরলা। পবিত্র যাওয়ার সময় ডেকেছিল, তরলা যাবে নাকি?

দেবল বলে, এখনই যাবে কী তরলাদি! বসো, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

সীমা বলল, বাবাই, কলকাতা যাবি কবে? কালই সবিতাকে খবরটা দিস। ও থাকলে যা খুশি হত!

তরলা বলল, খবর পেয়ে ও নেচে উঠবে।

প্রণতি বলল, জামাইবাবু, আপনি ছুটি নিতে পারেন কি না দেখুন। একলা ওকে পাঠাতে পারব না কিছুতেই।

বাবাই বলল, হেডস্যার বললেন তিন-চার দিনের মধ্যেই যেতে।

পবিত্র বলল, আমি কাল অফিসে গিয়েই ছুটির দরখাস্ত করব। পাসের জন্যও বলতে হবে।

কিছুক্ষণ আরও গল্প চলে। যমুনা নাতির পাশে বসে সারাক্ষণ ওর পিঠে মাথায় হাত বোলান। তাঁর বুকের মধ্যে থইথই করে বেপথু হৃদয়ের উন্মুখ আবেগ। দেখতে পান আগুন জ্বলছে দাউদাউ। বঞ্চনার, যন্ত্রণার। স্মৃতির, সংগ্রামের।

বাবাই বলল, তরলাদি, তুমি কিছুতেই পরীক্ষা দিলে না। দিলে হয়তো পাস করে যেতে। কী ভালো হত।

তরলা বলল, বার বার ফেল করলে ভালো হয় বুঝি?

—আগামীবার দাও। আমার সব বই খাতা, নোটস—সব তোমাকে দেব।

—তোমার মাথাটা তো দিতে পারবে না।

ওর বলার ভঙ্গিতে প্রণতি হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে, চেষ্টা করতে দোষ কী!

কৌতুকের স্বরে তরলা বলে, মাসিমা, ব্যাঙের নাকে সোনার নোলক কি মানায়?

যমুনা বলেন, ছিঃ মা, এমন কথা বলতে নেই।

প্রণতি বলল, নিজেকে কখনও ছোটো করবে না। আত্মগ্লানি আত্মার বিকাশের প্রধান শত্রু!

দেবল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এবার যেতে হয়।

বাবাই বলল, তোর কত টাকা খসেছেরে?

— ছাড়্ দেখি। ভারি তো ক-টা টাকা। আজকের দিনে ওসব তুচ্ছ হিসেব কেউ কষে নাকি!

যমুনা বলেন, টুনু, ছেলেটা মিষ্টির বাক্স নিয়ে এসেছিল বুদ্ধি করে। ওর দামটা—

দেবল প্রতিবাদ করে, দিদা, মাসিমা— আজকের দিনে, বাবাইয়ের এই দুর্দান্ত সুখবরে আমি সামান্য একটু মিষ্টি আনতে পারি না!

বাবাই বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলে, আলবাত পারিস। নে, চল্ এখন।

প্রিয় বন্ধুকে দেবল খুবই ভালোবাসে। বাবাই জানে ওই ক-টা টাকাও ওর কাছে অনেক। নিশ্চয়ই সংসার খরচের টাকা কিংবা মা-র অসুখের জন্য রাখা টাকা থেকে খরচ করেছে। ঘাটতি কীভাবে মেটাবে? বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার উচ্ছ্বাসপ্লাবনে হয়তো চাপা পড়ে যাবে ঘাটতির খোঁড়ল।

মোড়ের মাথায় এসে তরলা বলল, এবার একটা রিকশা ধরে দাও।

দেবল বলল, আমি তো পৌঁছে দেব বলেছিলাম।

—আমি কি তোমার সাইকেলের রডে বসে যাব?

বাবাই বলল, ঠিক আছে। আমিই পৌঁছে দিচ্ছি। দেবল তুই বাড়ি যা। কাল সকালে আসিস।

রিকশায় বসতেই তরলা বাঁ হাতে বাবাইকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। ঘাড়ের কাছে মুখ নামিয়ে ঘষে। —আমার খুশিটা যদি তোমাকে বোঝাতে পারতাম!

—বুঝিনি বলছ?

—ছাই বুঝেছ! যা হাঁদারাম তুমি। কলকাতার মেয়েরা তোমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

—ওখানে বুঝি হাঁদারামদের খুব ডিমান্ড?

তরলা বাবাইয়ের হাত কোলে নিয়ে বলল, তিন-চার দিনের মধ্যেই যাবে? কবে আসবে আবার?

—আগে তো যাই। দেখি কখন ছুটি হয়।

—এসে যদি দ্যাখো, আমি আর নেই—

—ধ্যাত, কী যে যা-তা বল।

—যা-তা কেন? আমি কি চিরকাল থাকব এখানে?

—তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে?

— হতে তো পারে।

বাবাই নিরুত্তরে ভাবে, এই সম্ভাবনার কথা মাথায় আসেনি কেন! মেয়েরা বিয়ে হয়ে চলে তো যাবেই। ওর কি খুব দুঃখ হবে? কষ্ট পাবে? জানে না বাবাই। খারাপ তো লাগবে নিশ্চয়ই।

রিকশা ছেড়ে দিয়ে সেদিনের গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় দু-জনে। এদিকটায় এখন কারও আসার সম্ভাবনা কম। তরলা বাবাইকে সজোরে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি চলে যাবে ভাবতেই আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আর যদি দেখা না হয়!

তরলা ওর সারা মুখে ঠোঁটে চুমু খায়। বাবাইয়ের সাফল্যের আনন্দে ওর শরীরে যেন মন্দিরা বাজে। অজস্র চুমু খেয়েও ওর সাধ মেটে না। বাবাইয়ের বুকে নিষ্পিষ্ট দুই স্তন যেন কাতর শিহরণে কঁকিয়ে ওঠে। বাবাইয়ের উত্তপ্ত করতল বেলের মতো দুই বুকের উপর প্রথমে মৃদু আবর্তন করে, পরে দৃঢ় মুঠিতে চেপে ধরে। বাবাইও তরলার ওষ্ঠে চুমু খায়। মুখ নামিয়ে স্তনসন্ধিতে ঘষে। আরও আগ্রাসী হয়ে ওর এক হাত ব্লাউজের ভিতরে নগ্নস্তন স্পর্শ করে। অন্য হাতে ব্লাউজের বোতাম খুলতে উদ্যোগী হয়। তরলা ওর হাত চেপে ধরে—না, এখন না। এখানে না। এবার যেতে হবে। তুমি এগিয়ে যাও।

বাবাই ওকে জড়িয়ে ধরে আবার চুমু খায়। স্তনে হাত রেখে বলে, একটা কথা রাখবে?

—বলো।

—একবার দেখতে দেবে—একবার—আমি দেখব।

—এখন? এখানে? পাগল কোথাকার! যাও। বাড়ি যাও এখন।

— না তুমি কথা দাও।

—ধ্যাত ! ভুদ্দুরাম!— বলে ওর গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে তরলা অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বাবাই গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। সারা শরীরে অগ্নিদাহ। উদ্ধত পুরুষাঙ্গ যেন প্যান্টের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য অস্থির। ডান হাত প্যান্টের উপর বুলিয়ে একটা-একটা করে বোতাম খোলে। দণ্ডধারী হয়ে মনে হয়, তরলা কি আড়াল থেকে দেখছে? দ্রুত বোতাম লাগিয়ে হাঁটতে শুরু করে বাবাই। ঝিলের ধারে সলিল সান্নিধ্যে গিয়ে দাহমুক্ত হবে।

তার পরের কয়েকটা দিন দুর্বার গতিতে যেন উড়ে গেল। এত নিমন্ত্রণ সারা জীবনে কখনও পায়নি। মেয়েদের চোখের ভিন্নতর দৃষ্টি—আহ্বানের, প্রশ্রয়ের। অর্চনারও। হঠাৎই যেন বাবাই ভি.আই.পি. হয়ে গেছে। সীমামাসি তো বটেই, দেবলদের বাড়িতেও এক দিন যেতে হল। তরলার মাও প্রণতিকে বলে গেছেন এক দিন ওদের বাড়িতে খাওয়ার জন্য। সবচেয়ে অবাক আর খুশি লেগেছিল বসুমাতারিরা নিমন্ত্রণ করায়। আলাপচারিতা থাকলেও ঘন হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি ওদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ কথা বলতেই ধরা পড়ে ওরা খুব আন্তরিক মানুষ।

দেবেন বসুমাতারি বাবাইকে বলেন, আমিও কলকাতায় পড়েছিলাম। আশুতোষ কলেজে। তুমি প্রেসিডেন্সিতে পড়তে যাচ্ছে, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তুমি তো আমার ছেলেরই মতো।

বাবাই সুযোগ বুঝে বলল, একটা অনুরোধ আছে। আমার মা-দিদা একা থাকবেন। একটু যদি দেখাশোনা-খোঁজখবর করেন। মেসো আছেন, তা উনি তো ব্যস্ত থাকেন খুব, আর বাড়িও

তো দূরে।

দেবেন বলেন এটা কি বলার কথা, বাবাই? কিছু ভেবো না। আমরা আছি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনা করো।

গলা চড়িয়ে দেবেন ডাকেন নীরজা—

মেখলা-পরা নীরজা বাবাইকে দেখে মাথা নিচু করে বাবাকে বলে, মাতিছে নিকি?

—হ্যাঁ। বাবাইয়ের খবর শুনেছিস?

মাথা ঝাঁকিয়ে নীরজা বলে, কনগ্র্যাচুলেশনস।

বাবাই জবাব দেয়—থ্যাঙ্কস। তুমি কী পড়ছ?

—ময় নেক্সট ইয়ার পরীক্ষা দিম।

— বাঃ, তোমার কোনো বই বা নোট লাগলে বোলো। আমারগুলো সব পড়ে আছে।

নীরজা গাঢ় চোখে বলল, আপনি কি মোক দিব?

— কেন দেব না?— দেবেনের দিকে তাকিয়ে বলল, ও যদি কাল আসে একবার, দেখে-শুনে যা দরকার নিতে পারবে।

—এ তো খুব ভালো কথা। কাল সকালেই চলে যাস।

নীরজা যখন এল, প্রণতি স্কুলে চলে গেছে। যমুনা রান্না নিয়ে ব্যস্ত।

বাবাই দিদাকে ডেকে বলল, ওকে চেন?

যমুনা বললেন, চিনব না কেন! কী গো মেয়ে আমার দাদুকে দেখতে এসেছ?

— না, দিদা। ও আগামী বছর পরীক্ষা দেবে, তাই ক-টা বইখাতা নিতে এসেছে।

— ঠিক আছে দাদুভাই। তুমি বই দেখাও। আমি ওর জন্য কিছু নিয়ে আসি।

বাবাইয়ের ঘরে ঢুকে নীরজা বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে যায়। এত বই— এত রকমের বই, পত্র-পত্রিকা।

—আপনি ইমানখনি কিতাব পড়িছে?

— না। সব না হলেও প্রায় সব বলা যায়। তবে সব বই আমার নয়। মা-রও অনেক বই আছে। কিছু আমাদের দু-জনের। কিছু আবার আমার একার।

যমুনা একটা প্লেটে দুটো মিষ্টি আর জল দিয়ে বললেন, এটুকু খাও।

নীরজা আপত্তি করে—আমি তো এই খেয়ে এলাম।

— তা হোক। তবু আমার দাদুভাইয়ের কাছে প্রথম এলে, মিষ্টিমুখ তো করতে হবেই।

টেবিলের উপর রেখে যমুনা বললেন, দাদুভাই দেখো যেন ফেলে না যায়। রান্না চাপানো আছে। আমি যাই।

বাবাই ইংরেজি আর অঙ্কের দুটো খাতা দিয়ে বলে, এগুলো উলটে-পালটে দ্যাখো, কাজে লাগবে। আর শোনো, তুমি পরেও যখন খুশি এসে যে-বই দরকার নিয়ে যেয়ো। আমি মাকে বলে দেব। তবে সিলেবাসের বই ছাড়া অন্যগুলো ফেরত দেবে।

কবিতার বইগুলো দেখে নীরজা বলল, আপনি খুব কবিতা পড়েন বুঝি?

—খুব না হলেও পড়ি। ভালো লাগে। একটা কবিতা শোনো। তোমারও ভালো লাগবে।

বাবাই বললতা সেন আবৃত্তি করে জানতে চায়, বুঝতে পেরেছ?

—গোটেটো ন হয়। কিন্তু বহুখিনি। আপনি দেখুন খুব ভাল। আবৃত্তি করে। এঃ ময় তো

খতালি না জানু।

আমি কিন্তু অসমিয়া জানি। অল্প অল্প। তুমি এই গানটা জানো— হাগর হঙ্গমত কত না হাতুরিলু তথাপিও হুয়া নাই ক্ষান্ত?

—ময় গাব ন আরু। কিন্তু হুনিছু।

বইখাতা নিয়ে নীরজা যাওয়ার উদ্যোগ করলে বাবাই বলে, ওই প্লেটটা খালি করো।

—খাবই লাগিব?

—বাবাই মাথা নাড়ে।

তেনা হলে তুমিও এটা খোয়া।

চকিত উচ্চারণের সঙ্গে নীরজার হলুদাভ মুখে মধুলজ্জার লালিমা লাগে। অস্বস্তি কাটাবার জন্য একটা মিষ্টি নিজের মুখে দিয়ে প্লেটটা এগিয়ে ধরে বাবাইয়ের সামনে। বাবাই ওর চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করে মিষ্টিটা তুলে নেয়।

নীরজা প্লেটটা নামিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

তুমুল বজ্রপাতের শব্দে বাবাই উপরের দিকে তাকায়। আকাশের মসীবর্ণ পেটে যেন সহস্র হিরণ্ময় ছুরি কাটাকুটি খেলছে। বজ্রের সঙ্গে সংগত করার জন্যই যেন ট্রেন তারস্বরে হুইসল বাজায়। বাবাই জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখে বৃষ্টি পড়ছে কি না। পড়ছে না। ভিজে হাতে শীতল বাতাসের ঢেউ লাগে। ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে অন্ধকার। হাতটা মুখে বুলিয়ে চোখ বোজে বাবাই।

গতকালই রিকেলটা যখন সন্ধ্যার দিকে হেলে পড়েছে বাবাই বাড়িতে একা সঙ্গে নেওয়ার জন্য বই ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। মা আর দিদা কালীমন্দিরে পুজো দিতে গেছে। ছেলে-নাতির জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে প্রণতি নিজে হয়তো যেত না। মা-র নির্দেশ অমান্য করতে চায়নি। নাতির আসন্ন বিরহে যমুনা ইতিমধ্যেই অশ্রুভারাতুর। তাঁকে আর মনোকষ্ট দেওয়া সম্ভব ছিল না।

বাবাইয়ের মনটাও সোঁদা হয়ে উঠছিল। অদ্যই শেষ রজনী এখানে। আপাতত। আবার কবে আসবে জানা নেই। এলেও যে-বাবাই যাচ্ছে সে-ই কি ফিরে আসবে? দিদা আর মাও কি অবিকল থাকবে? সময়, বয়স দূরত্ব, মাস্টারমামা যাকে বলেছেন জীবনবীক্ষা— এসবের প্রভাব কি উপেক্ষা করা যাবে? মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়। মানবের অন্তর্গত মানুষ? সেও থাকে কি!

গেট খোলার শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে বাবাই অবিশ্বাস্য চোখে চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। গেট বন্ধ করে ধীর পায়ে তরলা এগিয়ে আসে। ওর মুখের হাসির উপর দিনান্তের আলোর বর্ণময় বিচ্ছুরণ। বাবাই মুগ্ধ চোখে দেখে, যেন নিসর্গ বিদীর্ণ করে আবির্ভূত এক অপরূপা। পরিচিত সপ্রতিভার পরিবর্তে চোখের পাতা ব্রীড়ানত। ঠোঁটের মৃদু হাসির বিভাসে কুণ্ঠার আঁচড়।

বাবাইয়ের কণ্ঠ থেকে বিহ্বলতা ঝরে— তরলাদি, তুমি।

ওর মুখের উপর দীপ্ত দৃষ্টি ছড়িয়ে তরলা বলল, এলাম। তুমি কাল চলে যাবে।

এসো, এসো।

হাত ধরে তরলাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে বাবাই। খোলা সুটকেস, ব্যাগ নজরে পড়ায় তরলা বলে, সব গোছানো হয়ে গেছে?

—প্রায়। যেটুকু বাকি আছে তুমি করে দেবে।

— বলো, কী করতে হবে?

বাবাই নিজের দিকে আকর্ষণ করে তরলার ঠোঁটে মুখ ডুবিয়ে দৃঢ় আশ্লেষে জড়ায়। চোখ, চিবুক, গাল, স্তনসন্ধিতে অজস্র চুম্বনেও তৃষ্ণা মেটে না। একটা চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী চুম্বনের তৃষ্ণা তাড়িত করে।

তরলা বলল, তুমি এমন করবে জানলে আমি আসতাম না।

উত্তর না দিয়ে বাবাই গোলক-স্বর্গের হদিশ খোঁজে। অনভ্যস্ত আঙুল ব্লাউজের হুকের বিরুদ্ধতা অতিক্রমে প্রয়াসী।

তরলা বলল, খুব সাহস হয়েছে দেখছি।

কাতর অনুনয়ে বাবাই বলে, একবার—তরলাদি একবার দেখতে দাও। দূর থেকে দেখব। ছোঁব না। প্লিজ—

তরলা ধীর হাতে ব্লাউজের হুক খোলে। চোখ বাবাইয়ের চোখে। সাদা ব্রা পরা তরলার সুপুষ্ট বুক দেখে বাবাই বিমুগ্ধ। মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপনে এমন ছবি দেখা যায়। এ-দৃশ্য ছবির থেকে ঢের-ঢের বেশি মনোহর। বাবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নগ্ন ত্বকে ওষ্ঠ লেপন করে, লেহন করে। আগ্রাসে চেটে নেয় স্তনসন্ধির স্বেদ। তরলার দেহের সুঘ্রাণ মদিরার মতো মস্তিষ্কের কোষে ছড়ায়। বাবাই একবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়, আরও কি উন্মোচন দরকার? শুভ্র মেঘে ঢাকা পাহাড়চূড়া নিরাবরণ করে কোন্ ভাস্কর? তবু ধৈর্যহীন অস্থির আঙুল ব্রার হুকের অভিসন্ধি খোঁজে। সহায়তা করে তরলা। হুক খুলতেই এক ঝটকায় ব্রা নামিয়ে দেয় বাবাই। মেঘের আবরণ চিহ্ন -মুক্ত দুই হেমবর্ণ পর্বতশীর্ষ। বাবাই এক পা পিছিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে অতলান্ত মুগ্ধতায় অবলোকন করে যুগল স্বর্গের উন্মুখ প্রতিভা।

লাজুক সশঙ্ক স্বরে তরলা বলে, এ-কী আলো জ্বাললে কেন?

— তোমাকে দু-চোখ ভরে দেখব বলে।

তরলার দেহের রং ময়লা পিতলের। কিন্তু কুচকুম্ভ স্বর্ণাভ। বাদামি বৃন্তে নিটোল চেরি। অনামিকার চেয়েও এর গড়ন ও আকার শ্রেষ্ঠতর। চিত্রবৎ স্থির তরলা। বাবাইয়ের দৃষ্টি - অর্চনায় ও সংকুচিত বোধ করে। আঁচল টেনে বুক ঢাকার চেষ্টা করতেই বাবাই এগিয়ে এসে বাঁ হাতে আঁচল ধরে বাধা দেয়। ডান তর্জনী বিমগ্ন তুলি হয়ে বাম স্তনের সমারোহ প্রদক্ষিণ করে চেরি-বৃন্তে স্থির হয়। তরলা আমূল স্পন্দনে কম্পমান। বাবাই অস্ফুটে উচ্চারণ করে— তুমি এত সুন্দর, তরলাদি।

তরলা ওর বুকে মাথা রেখে বলে, আমাকে আর তরলাদি বোলো না তুমি।

বাবাই ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তরলার ডান স্তনচূড়ায় ঠোঁট চাপে। বেলুনের মতো দুই গোলক নিয়ে খেলতে-খেলতে বাবাই তরলাকে বিছানায় বসায়। অসহ্য শিহরনে তরলার শরীর এলিয়ে পড়ে। বাবাই মাতাল উন্মাদের মতো ওর সারা শরীরে চুমু খায়। দলিত নিষ্পিষ্ট করে। শাড়ি সায়া তুলে উরুসন্ধিতে হাত বোলায়। অলৌকিক দৃশ্যের সম্মোহনে গুন্মময় খাঁড়িতে মুখ ডুবিয়ে পাজামার দড়ি টেনে নিজেকে উন্মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়। আবেশে তরলার দুই চোখ আচ্ছন্ন হলেও ওর স্নায়ুকেন্দ্রে সতর্কীকরণের বিউগল বাজে। ঝটকা মেরে উঠে বসে শাড়ি-সায়া ঠিক করে বাবাইকে ঠেলে দেয়— না— বাবাই, না। তুমি শুধু দেখতে চেয়েছিলে—আর কিছু না, প্লিজ।

বাবাই হাত টেনে বলে, দ্যাখো, আমার অবস্থা দ্যাখো—

তরলা বলে, না—বাবাই। না।

ক্ষিপ্র হাতে ব্রা-ব্লাউজ পরে তরলা বলল, একটু জল খাওয়াবে?

ক্ষুব্ধ চোখে তরলাকে দগ্ধ করে নিজেকে গুছিয়ে বাবাই বেরিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই ফিরে জলের গ্লাস বাড়িয়ে ধরে।

তরলা এক ঢোঁকে গ্লাস শেষ করে বলল, রাগ কোরো না। একসঙ্গে সব হয় না। একবারেই সব পাওয়া যায় না। থামতে হয়। কখন থামতে হবে তাও জানতে হয়।

বাবাইয়ের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে তরলা আবার বলে, আমি যাই। কাল স্টেশনে আসব।

তাচ্ছিল্যের স্বরে বাবাই বলে, কোনো দরকার নেই।

তরলা ওর মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল, তোমার নেই, আমার আছে। আমি তোমাকে ভালোবাসি বাবাই। তুমিও আমাকে একটু ভালোবেসো। খুব বেশি চাই না। অল্প বাসলেই হবে। মন্দ মেয়েরও সহৃদয়তা বা দাক্ষিণ্যের দাবি থাকতে পারে। বলো, পারে না?

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। জানলা দিয়ে সামান্য ছাঁট আসছে। তবু জানলা বন্ধ করে না বাবাই। ওর চোখের সিক্ততায় চুম্বন করে বর্ষাবিন্দু। কণ্ঠ আঁকড়ে ধরে এক অজ্ঞাত কষ্টবোধ।

আজ সকালে নীরজাও এসেছিল। বাবাইয়ের নোটস পড়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। বলে, আমার টিচারও অবাক। বলছিলেন, তুমি কার কাছে টিউশন নিয়েছ?

বাবাই জবাব দেয়, আমি তো কোনো টিউশন নিইনি।

তেনাহলে ইমান একস্ট্রা রেফারেন্স কোথ পালে?

— মা দিয়েছে। আর আমার এক মামা আছেন কলকাতায়। তিনিও কিছু-কিছু লিখে পাঠিয়েছেন।

—ইস্ তোমার কাছতে যদি ময় আগত আহিব পারিলু হেতেন!

—আসোনি কেন? কেউ বারণ করেছিল।

—তুমি তো কথাই বলতে না। দেখা হলেও মুখ ঘুরিয়ে নিতে। অবশ্য আমার মাও চাইত না ছেলেদের সঙ্গে কথা বলি, মিশি।

—এখন কী করে আসছ?

—তুমি যে ভীষণ ভালো ছেলের তকমা পেয়েছ। মোর দেওতা (বাবা) তুমার খুব মরম করে দেখুন।

—আর তুমি?

নীরজার ফরসা গালে অরুণ-আভা। লাজুক ঢঙে চোখ নামিয়ে মেখলার নকশা দেখে।

বাবাই ওর সামনে এগিয়ে এসে বলল, ভালো রেজাল্ট করলাম, তুমি কিছু দিলে না। এই খাতা নোটবই দিলাম, তবুও কিছু দেবে না?

সরল চোখ তুলে নীরজা বলে, ময় কী দিব পারে!

ঠোঁটের ভাঁজে চপল হাসি ফুটিয়ে বাবাই বলল, একটা চুমু দিলেই হবে।

হতচকিত নীরজা তীক্ষ্ণ চোখে বাবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ধ্যাৎ। এজন্যই মা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে বা মিশতে বারণ করেন। আমি যাচ্ছি।

কৌতুকময় ভেংচি কেটে বেরিয়ে যায় নীরজা।

আরও এক অভাবনীয় বিস্ময় অপেক্ষায় ছিল বাবাইয়ের জন্য।

গোছগাছ শেষ। বইপত্র যা থাকছে, সেগুলো ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে রেখেছে। হাতে ময়লা জমেছে। বিজবিজে ঘাম সারা শরীরে। স্নানে যাবে কি না ভাবে।

প্রণতি ঘরের দরজা থেকে ডাকে, বাবাই—

দরজায় মাকে দেখে বাবাই বলে, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন। ভিতরে এসো।

প্রণতি ঘরে ঢুকে হাতের প্যাকেট ছেলের হাতে দিয়ে বলল, শেভিং সেট। আজ দাড়ি কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হ।

বাবাইয়ের গাল-ভরা হালকা গোঁফ-দাড়ি। কোনোদিন মুণ্ডন করেনি। সবিতা বলত ছাগল দাড়ি। যমুনা প্রতিবাদ করে বলতেন, সিংহের কেশর।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে বাবাই বলল, আমি তো দাড়ি রাখব ভাবছিলাম।

প্রণতি বলল, না, বাবা। নিজেকে সবসময় ঝকঝকে পরিষ্কার রাখবে। শুচিতাবোধ সুস্বাস্থ্যের আকর। ঘরের সীমাবদ্ধতা ত্যাগ করে তুমি এখন বাইরের বিস্তীর্ণ জগতে পদক্ষেপ করতে চলেছ। তার জন্য নিজেকে নতুন করে প্রস্তুত করবে, নতুন রূপে আবিষ্কার করবে। আমি চাই আমার সীমনেই তোমার পুরুষ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটুক। এসো

রেজার, শেভিং ক্রিম, ব্লেড, ব্রাশ সবই এনেছে প্রণতি। ডেটলের ছোট্ট শিশিও। কখনও করেনি। শঙ্কা ছিল পারবে কি না। অথচ দিব্যি পারল বাবাই। দু-একটা জায়গায় সামান্য কেটে গিয়ে রক্ত বেরুল। প্রণতি তুলোতে ডেটল লাগিয়ে বাড়িয়ে ধরে। বাবাইয়ের মুণ্ডনক্রিয়া তন্ময় নয়নে চাক্ষুস করে প্রণতি। শেষ হলে বলে, মুখ ধুয়ে স্নান সেরে আয়।

সব সেরে বেরিয়ে এলে বাবাইকে যমুনার সামনে এনে বলল, মা, তোমার নাতিকে দ্যাখো।

যমুনা ঠাকুরের আসন থেকে উঠে আসছিলেন। বাবাইকে দেখে তার চোখে চিকমিকি করে অন্তরের উচ্ছ্বাস। কে এই নবীন পুরুষ? হরিশ? নাকি বিনোদ? উদগত অশ্রুতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। এগিয়ে এসে বাবাইয়ের মুখ কতরলে ধরে উচ্চারণ করেন, দাদুভাই—

আমার দাদুভাই—কন্দর্পকান্তি বাসুদেব যে!

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়, পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

১১.

বেলা সাড়ে এগারোটায় একটু পরে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পা রাখে বাবাই। সুটকেস আর ব্যাগ দু-হাতে নিয়ে অভয়ের সঙ্গে হাঁটতে থাকে। অভয় কুলি নেওয়ার জন্য বললেও বাবাই রাজি হয়নি। এটুকু বোঝার বহনক্ষমতা আছে। হাঁটতে হাঁটতে বাবাই বহমান মানবস্রোত দেখছিল। পর পর সব প্ল্যাটফর্মে অনুরূপ স্রোত। অনেকের হাতে লাল পতাকা। স্লোগানও শোনা যাচ্ছে, তবু শব্দগুলো ঠিক বোঝা যায় না।

অভয় বলল, ময়দানে কোনো মিটিং আছে বোধ হয়।

গেটে টিকিট জমা দিয়ে বড়ো গোল ঘড়ির দিকে এগোয় ওরা। এত বড়ো ঘড়ি বাবাই আগে কখনও দেখেনি। এত বড়ো প্ল্যাটফর্মও দেখেনি। দেখেনি মানুষের এমন চলা। মাস্টারমামা লিখেছিলেন এই ঘড়ির কাছেই তাঁর বন্ধু অপেক্ষা করবেন। সন্ধানী চোখে মানুষের দিকে

তাকাতে তাকাতে ঘড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। তখুনই এক ভদ্রলোক বাবাইকে জিজ্ঞেস করে, বাই এনি চান্স আর ইউ স্বাধীন চৌধুরী—বাবাই?

মাথা নেড়ে বাবাই হ্যাঁ বলতেই ভদ্রলোক বলেন, ওয়েলকাম টু ক্যালকাটা। আমার নাম জিতেন সামন্ত। উদয়নবাবুর মেসমেট। তিনিই আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন টু রিসিভ ইউ। লাগেজ কী আছে?

হাতের ব্যাগ আর সুটকেস দেখিয়ে বাবাই বলল, এই-ই।

—ও-ও। তবে তো ট্রামেই যাওয়া যাবে। চলো।

বাবাই অভয়ের সঙ্গে জিতেনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে তো মেসের ঠিকানা দিয়েছি। সময় করে এলে ভালো লাগবে। আমি তো কিছুই চিনি না।

নিশ্চয় আসব। আমি তবে যাই।

আপনি কোনদিকে যাবেন? জিতেন জিজ্ঞাসু হয়।

বেহালা।

কারুকে বলতে হয়নি। স্টেশনের ভিতর থেকে বেরিয়েই বাবাই বিখ্যাত হাওড়া ব্রিজ দেখে চিনতেও পারে। ট্রামে, বাসে ব্রিজ পেরোতে সতর্ক চোখে চার দিকে মানুষের ভিড়, যানবাহনের জটলা, বিশাল অট্টালিকা, ফুটপাথের আদুড় বালিকার কোলে মুমূর্ষ্যু শিশু, হাইড্রেন্টের ঘোলা জলে ক্রীড়ারত বালক, ট্রামের জানলায় জানলায় হাত পাতা ভিখারিনি দেখে। ট্রামের পাশাপাশি চলছে লাল পতাকাধারী মানুষের মিছিল। স্লোগানগুলো বুঝতে পারে—সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তি চাই। খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই। নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম কমাতে হবে। পুলিশি জুলুম বন্ধ করো, ইত্যাদি।

বন্দিদের মুক্তি চাই। তবে কি ওরা মাস্টারমামার মুক্তির জন্যও পথে নেমেছে? মিছিল করলেই মুক্তি দেবে? দিলে বাবাইও মিছিলে যোগ দিতে প্রস্তুত।

মেসে পৌঁছে জিতেন বাবাইকে ম্যানেজার যোগেন হালদার আর পাচক দশরথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে উদয়নের বিছানা দেখিয়ে বলল, আপাতত এখানেই শোবে। প্রথম প্রথম অসুবিধে হবে। কী আর করা। আস্তে-আস্তে সয়ে যাবে। কোনো কিছুর দরকার হলে বিনা দ্বিধায় বোলো। আজ স্নান-খাওয়া সেরে বিশ্রাম করো। আমি এখন বেরুচ্ছি। রাতে দেখা হবে।

সর ও তার পরিবেশ দেখে খুবই হতাশ হয় বাবাই। বিবর্ণ দেয়ালে কত কাল যে রং পড়েনি তা নির্ণয়ের জন্য ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। কয়েকটা অংশে ইট কুরোটির হাসির মতো বিবৃত। টেবিলের উপর বইয়ের স্তূপ। খাট—আসলে চৌকির নীচে পত্র-পত্রিকা, এক-পাশে সুটকেস, চটি। জলের কুঁজো—অ্যালুমিনিয়াম। মাসে মুখ দাবা। ছোটো আলনায় গামছা, গেঞ্জি, লুঙ্গি।

বারো চোদ্দো বছরের একটি ছেলে ঘরে ঢুকে বলল, আমি মান্তু। বাবুদের ফাইফরমাশ খাটি। সরো তোমার বিছানা ঠিক করে দিই। কিচ্ছু ভেবো না। আমি সব গুছিয়ে দেব। সরকারবাবুর যা-কিছু আমিই রাখি।

মান্তু গোটানো তোশক পেতে, বালিশের তলায় রাখা ধোয়া চাদর বিছিয়ে দেয়। বালিশের ওয়ার বদলায়। বলে, তুমি জামাকাপড় ছেড়ে নীচে কলঘরে যাও। এটা বাচ্চায় জন্য আছে

এখনও। স্নান সেরে নাও। আমি একটু ঝাড় দিয়ে, কুঁজো ভরে দিয়ে যাব। তা তুমি এখানে থাকবে নাকি পারমনেন্ট?

—কয়েকদিন থাকব।

—সরকারবাবু না-আসা পর্যন্ত থাকো। তার মধ্যে একটা সিট খালি হতেও পারে।

খাওয়া সেরে বাবাই মাকে চিঠি লেখে—সারা পথে অভয় যে খুব খেয়াল রেখেছে, কোনো অসুবিধে হতে দেয়নি, জিতেন সামন্ত মাস্টারমামার প্রতিভূ হয়ে ওকে আনতে স্টেশনে ছিলেন, মেসে ভালোই আছে। দিদা যেন চিন্তা না করেন।

চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে পুরোনো কাগজপত্রে চোখ বোলাতে - বোলাতে ওর চোখে পড়ে খাদ্যের দাবিতে জনতা-পুলিশের সংঘর্ষের সংবাদ। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ মুখোমুখি সংঘর্ষে বসিরহাটে পুলিশের গুলিতে আহত ৬ জন। ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বরূপগঞ্জে নিহত তেঁতুলিয়া হাইস্কুলের ছাত্র নুরুল ইসলাম, গুরুতর আহত ক্লাস সিক্সের মণীন্দ্র বিশ্বাস। তার পরই বাংলা উত্তাল, ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে। গণশিল্পীরা গান রচনা করেন—'শপথ নিলাম, শপথ নিলাম প্রাণ দেব বলিদান/বাংলা মায়ের নবীন শহিদ নুরুল ইসলাম'।

অসামে এসব খবর কিছু-কিছু শুনেছে, পড়েছে বাবাই। কিন্তু তার কোনো প্রভাব ছিল না অনুভবে। বা হয়তো অনুভবই করতে পারেনি। তার উপর তখন ছিল পরীক্ষার জন্য উর্ধ্বশ্বাস প্রস্তুতি। এখন মাত্রই কয়েক মাস পূর্বের ঘটনাবলীর বিবরণ পড়তে-পড়তে বাবাইয়ের মনোজগতে এক বিপুল বিবর্তনের সূচনা ঘটে। একটার পর একটা নতুন গবাক্ষ উন্মোচিত হয়, আর মনে হয়, আরও অনন্ত তোরণ প্রতীক্ষায়।

সন্ধেবেলা ভবতোষের সঙ্গে পরিচয় হল। ভবতোষ বলল, ভাগনেবাবু, মামা নাই বইলা চিন্তা করবা না। কোনো অসুবিধা হইলে বলবা। কোথায় ভরতি হবা মনে করতেস?

বাবাই বলে—ইচ্ছে আছে প্রেসিডেন্সিতে।

প্রেসিডেন্সি শুনে একটু চমক লাগে ভবতোষের। ওর ধারণা ছিল সাংঘাতিকরেজাল্ট করা বড়ো লোকের সন্তানরাই পড়ে ওখানে। বাবাই পারবে?

—কলেজ স্ট্রিট এখান থেকে কতদূর?

—কাছে। ট্রামে পাঁচ-সাত মিনিট। হাঁটলে পনেরো মিনিট। সোজা রাস্তা।

জিতেন ফিরে বলল, তুমি ভেবো না। কাল আমি নিয়ে যাব তোমাকে।

বাবাই বিনীত স্বরে বলে, ডিরেকশন দিলে আমি নিজেই যেতে পারব। আপনার অফিস আছে। শুধু-শুধু আমার জন্য—

জিতেন বলল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাব।

ভবতোষ চিমটি কাটে, ভাগনেবাবু, বুঝলা না, এই অজুহাতে একবার প্রেসিডেন্সিতে ঢুঁ মাইরা আইব। দ্যাশে গিয়া গালগল্প ঝাড়নের নতুন সাবজেক্ট।

বাবাই জানতে চায়, মামা কবে ছাড়া পাবেন।

জিতেন জবাব দেয়, যে-কোনো দিনই চলে আসতে পারেন। ওঁর সঙ্গীদের অনেককেই ছেড়ে দিয়েছে।

ভবতোষ বলে, তোমার মামার মাথায় ক্যাড়া আছে। ঘাড় কাইত তো কাইত-ই। দুই দিন সুস্থির হইয়া থাকন তার কুষ্ঠিতে নাই।

জিতেন মন্তব্য করে, একলা মানুষ, না-আগে না-পিছে।

—ছাড়েন দিকি। আগে পিছে না থাক, নিজে তো আছে। অখনও সংসার কইরতে আপত্তি কী।

পর দিন জিতেন বাবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসে। ছাত্রছাত্রীর বিপুল ভিড়ের সঙ্গে দেয়ালের পোস্টারের যেন প্রতিযোগিতা চলছে। ছোটো-ছোটো জটলা, চিৎকার, আচমকা স্লোগান। বাবাই বিহ্বল বোধ করে। মনে প্রশ্নও আসে, এই পরিবেশে পড়াশোনা হয় এখানে? ওই কলেজ সম্পর্কে যা শুনেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল, সেসব কি ভুল? দু-এক-জনকে জিজ্ঞেস করে ভরতির ফর্ম সংগ্রহ করে। তখনই ভরে জমা দেয়। কয়েকদিন পরে নির্বাচিত তালিকা ঘোষিত হবে।

ফর্মের জন্য ইতিউতি করার সময় এক জন যেচে আলাপ করে—আমার নাম অনীশ স্যানাল। থার্ড ইয়ার, ফিজিক্স। তুমি কোত্থেকে?

বাবাই সংক্ষেপে নিজের কথা বলে। সিক্সথ হওয়ার সু-সমাচারে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় না অনীশ। বলে, মার্কশিট দেখি।

মার্কশিট দেখে বলল, গুড। কী পড়বে?

—অঙ্ক নিয়ে পড়ব ভেবেছিলাম।

—অঙ্ক? মানে ম্যাথ্স? ইউক্লিড হবে, না পিথাগোরাস? অত ভালো নম্বর তোমার, ফিজিক্স পড়ো। দ্য ফিউচার ইজ ইন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। আমিও হোস্টেলে থাকি। আমার কাছে বইপত্র থেকে সব হেল্প পাবে। নাও ভরে ফ্যালো।

অচেনা, প্রায় আরণ্যক নৈরাজ্যের মধ্যে অনীশকে দেবদূতের মতো মনে হয়েছিল। বাবাই অন্যথা করেনি। ফর্ম জমা দিয়ে বলেছিল, হোস্টেলের জন্য কী করতে হবে।

— ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। যা করার আমি করব। লিস্ট বেরুলেই ভরতি হয়ে যেয়ো।

—আপনাকে কোথায় পাব?

—এখানেই পাবে। ইউনিয়ান অফিস বা ক্যান্টিনে। চলো তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

নির্দিষ্ট দিনে টাকা জমা দিয়ে ভরতিহয় বাবাই। উদ্বেগমুক্ত মনে অনীশকে খোঁজে। ক্যান্টিনে না পেয়ে ইউনিয়ন অফিসের দিকে এগুতেই দেখে করিডর দিয়ে হেঁটে আসছে অনীশ। সঙ্গে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে উত্তেজক আলোচনা করছে। ওকে দেখে অনীশ চলা থামিয়ে বলে, ভরতি হয়েছ?

—হ্যাঁ। কিন্তু হোস্টেল—

—ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই পেয়ে যাবে। এর মধ্যে থাকার জায়গা না থাকলে আমার গেস্ট হয়ে থাকতে পারো।

— না, না। তার দরকার হবে না।

—তুমি তা হলে দিন চারেক পরে এসো। তোমার দরখাস্ত প্রসেস করা হয়ে গেছে। অ্যালটমেন্টও হয়ে যাবে। ডোন্ট ওয়ারি। চলো, চা খাওয়া যাক।

ক্যান্টিনে বসে সেদিনেই আলাপ হয় অসীম চট্টোপাধ্যায়— যাকে সবাই কাকা বলে, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অশোক সেনগুপ্ত, মিত্রা গোস্বামী ও অমৃতা সোমের সঙ্গে। তখন দূর

কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি, বাবাইয়ের চোখের সামনেই উন্মহৃদয় স্নেহশীল কাকা, লিভিং লিজেন্ড হয়ে উঠবেন।

মেসে যে এমন মধুর বিস্ময় উপহৃত হবে তাও কি ভেবেছিল? ঢুকতেই যোগেন হালদার বলল, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ— সরকারবাবু এসে গেছেন। এসেই খোঁজাখুঁজি করছেন।

মামা মুক্তি পেয়ে গেছে। আজই? বাবাই লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে আসে। নিজের বিছানায় বসে কাগজ পড়ছে উদয়ন।

—মামা! কখন এলে—ইস আমি যদি জানতাম—

বাবাই প্রণাম করে। উদয়ন বাবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, দাঁড়া তোকে একটু দেখি। কত বড়ো হয়েছিস! রেজাল্ট শুনে খুব খুশি হয়েছি। এখানে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

—না, এঁরা সবাই ভীষণ ভালো। জিতেনবাবু নিজে আমাকে কলেজে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

—কলকাতা ঘুরে দেখলি?

—কোথায়! অ্যাডমিশনের চিন্তায় যাইনি। চিনিও না তো। আজ ভরতি হয়ে নিশ্চিন্ত।

উদয়ন খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে প্রণতির কথা, যমুনার কথা। অসমের জীবনযাপন, বাঙালি-বিরোধী আন্দোলনের কথা। সে বাবাইকে শোনায় ফ্রান্সের ছাত্রবিদ্রোহের কাহিনী। আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবকের প্রতিবাদ। শোনায় এখানকার ধূমায়মান গণসংগ্রামের ইতিবৃত্ত।

বাবাই যে সব বোঝে তা নয়। শুনতে ভালো লাগে। উদয়ন যেই বলে— The history of all hitherto existing society is the history of class struggles, এবং Society as a whole is more and more splitting into two great hostile camps, into two great classes directly facing each other: Bourgeoisie and Proletariat— বাবাই আপন চেতনায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিজ্ঞানের প্রসার অনুভব করে।

কলেজের ক্লাস শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ইডেন হোস্টেলের আবাসিকদের নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। হোস্টেলের সুপারকে ঘেরাও করলে অপমানিত সুপার পদত্যাগ করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে ছাত্রদের প্রতিবাদ তীব্রতর হওয়ায় কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ করে দেন। ধারাবাহিক ছাত্র আন্দোলনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অন্যান্য কলেজের ছাত্ররাও এখানে সমবেত হয় নিয়মিতভাবে। গড়ে ওঠে আর একটা সংগঠন— প্রেসিডেন্সি কনসালটেশন। এই উত্তুঙ্গ উত্তাল তরঙ্গের রোমাঞ্চকর আকর্ষণ ও আহ্বান, উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না বাবাইয়ের।

চার মাসেরও বেশি সময় ধরে সংগ্রাম চলার পর কলেজের অচল অবস্থার অবসান ঘটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের শর্তভিত্তিক প্রতিশ্রুতি ছাত্র সংগঠনগুলি মেনে নেয়। এই দীর্ঘ সময়ে বাবাই আ-সন্ধ্যা-সকাল অন্তরঙ্গ হয়ে ছিল অনীশ অমৃতা সহ অজস্র ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। বন্ধুদের সঙ্গে উদ্দীপ্ত আলোচনা, নতুন-নতুন কাগজ বেরুচ্ছে— সেগুলো গোগ্রাসে পড়া, ক্লাসিক মার্কসবাদী বই পড়ে দীক্ষিত হওয়ার চাপে বাবাই উদয়নের সঙ্গেও নিয়মিত দেখা করতে পারে না। উদয়ন বলেছিল প্রতি রবিবার সকালে যেতে। অন্য সময়ে ওর থাকাটা নিশ্চিত নয়। অবশ্য যে-কোনোদিন গিয়ে থেকেও যেতে পারে। বাবাইয়ের সময় হয় না।

ফেব্রুয়ারি মাসে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে অভাবনীয়ভাবে আটটি রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ কংগ্রেসের একচ্ছত্র ক্ষমতার অবসান ঘটে। বামপন্থীরা পশ্চিমবাংলায় দুটি ভিন্ন ফ্রন্ট করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। কংগ্রেস বৃহত্তম দল হয়েও গরিষ্ঠতার অভাবে সরকার গঠনে অনাগ্রহী থাকে। এই পরিস্থিতিতে নিছক ক্ষমতার লোভে যুযুধান দুই ফ্রন্ট অন্য অকংগ্রেসি দলের সঙ্গে মিলে ১৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে চোদ্দোদলের যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ২ মার্চ শপথ নেয়। কলকাতায় হোলির উৎসব। রাইটার্সের সামনে লক্ষ-লক্ষ উদ্বেলিত মানুষের উচ্ছ্বাসমুখর সমাবেশ। কারণ কর্মসূচিতে যুক্তফ্রন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভূমিসংস্কারের, ন্যূনতম কৃষিমজুর, উপজাতি ও অনগ্রসর মানুষের অবস্থার উন্নতির এবং শ্রমজীবী, শিক্ষক ও সকল মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবি ও অভাব-অভিযোগ নিরসনের। অগণন মানুষের অত্যুৎসাহ হিংসা অনিবার্য, অনুমেয়ও। অভিজ্ঞতার অভাবে নারি অতি উৎসাহের উদ্দামতায় কোনো-কোনো মন্ত্রী ভুলে গেলেন রাজনৈতিক আন্দোলন আর সরকারি প্রশাসন এক নয়। বিস্মৃত হলেন তাঁরা ভারতীয় সংবিধানের অধীন, এক অঙ্গরাজ্যের নানা মতাদর্শের জোটে আছেন। কোনো বিপ্লব উত্তর সরকার নয়। ফলে জনসমক্ষে হরণকারী ঘোষণা, বিবৃতি ও ক্রমিক প্রশাসনিক প্রজ্ঞাশূন্যতা শিল্পে বাণিজ্যে আতঙ্কজনক নৈরাজ্যের সূচনা করে। কৃষিক্ষেত্রেও পড়ে তার প্রকোপ।

সে প্রসাদজোতে মহিলাসভার উপর আসাম ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের আচমকা গুলিবর্ষণে সাতজন মহিলা ও দুটি শিশু সহ এগারো জন নিহত হলে ইতিহাসের পাতায় সংযোজিত হয় একনতুন শব্দ— নকশালবাড়ি। দেশ জুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তনে সঞ্জাত হয় নবীন দিশা। রক্তাক্ত দিগ্ভ্রান্ত বলা চলে।

জীবনবিমার বিপুল কাজে উন্নতি ও প্রগতির জন্য কম্পিউটার বসবে। ইলাকো হাউসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্য ব্যবস্থার আয়োজন করা হচ্ছে। সে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিদ্ধান্ত নেয়, কিছুতেই কম্পিউটারের মতো অতি আধুনিক প্রযুক্তি প্রবৃত্ত করানো চলবে না। কারণ, তাতে চাকরি সংকুচিত হবে, ছাঁটাই বাড়বে, কর্মীদের কঠিন ট্রেনিং নিয়ে কম্পিউটারের কাজে পারদর্শী হতে হবে। এই ময়দানবের মতো মেশিন একাই একশো বা তারও বেশি মানুষের কাজ অনেক অল্প সময়ে করে দেবে। আরও ভয়, জীবনবিমায় সফলভাবে চালু হলে অন্যান্য সংস্থাতেও এর প্রবেশ রোধ করা দুরূহ হবে। সুতরাং রাত জেগে পাহারার নামে ইলাকো হাউস ঘিরে রাখার সুসংগঠিত প্রয়াস চলল।

এই নিয়ে বিপুল তর্ক, বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে উদয়ন। ওর মতে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ ভুল। প্রগতির বিরুদ্ধে মুখ ফিরিয়ে থাকা। মেশিন এলে মানুষের উৎখাত অবশ্যম্ভাবী। মেশিনের বিরুদ্ধতা করতে গেলে তো সেফটি রেজার থেকে শুরু করে টাইপটাইটার, ট্রাক্টর, রাইসমিল সহ সব কিছুরই বিরুদ্ধাচরণ করে মধ্যযুগীয় জীবনে ফিরে যেতে হয়। সোভিয়েত দেশ পত্রিকায় এক মহিলার বিশাল খামার পরিচালনার ছবি দেখে সবাই মুগ্ধ। বামপন্থী নেতাই ও দেশ ঘুরে এসে লেখেন, একটা সিমেন্ট কোম্পানিতে মাত্র চার জন মানুষ। রাশিয়ায় যা সমৃদ্ধিকর তা

ভারতে ক্ষতিকারক হবে কেন!

শ্রমিকনেতা নিরঞ্জন দে, সরোজ চৌধুরী, দীপক দত্ত বলে, কত লোকের চাকরি যাবে জানেন?

—কর্তৃপক্ষ তো বার বার বলছে ছাঁটাই হবে না। আর আপনারা কি সত্যি বিশ্বাস করেন এল.আই.সি.-র মতো পাবলিক সেক্টরে ছাঁটাই সম্ভব?

সরোজ বলে, ছাঁটাই না হলেও ভবিষ্যতে চাকরির সুযোগ কমে যাবে।

উদয়ন জবাব দেয়, কিছু কাজ কমতে পারে, কিছু কাজ উঠেও যেতে পারে— যেমন পাল্কাপুলার, পানিপাঁড়ে, পালকির বেহারা, ঘোড়ার গাড়ির সহিস এখন আর কোনো দপ্তরে নেই। কিন্তু নতুন কাজ তৈরি হয়েছে— ড্রাইভার, মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান। কম্পিউটার তৈরি, চালানো, রক্ষণাবেক্ষণে লোক লাগবেই। নীলের চাষও আবার চালু করবে নাকি? দ্যাখো সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়নে মানুষের উচ্ছেদ, জীবিকা হারানো, জীবিকা বদল অনিবার্য। কত মানুষের জমি নিয়ে ডিভিসি হয়েছে? দুর্গাপুর হয়েছে। চাষের জমি কমে যাবে বলে গোঁ ধরলে হত? খালাসির চাকরি কমে যাবে বলে রেলে বৈদ্যুতিকরণ বন্ধ থাকবে? ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা মানতে অনিচ্ছুক। তাদের চিন্তায় সম্ভবত সুরেন ব্যানার্জীর এজিটেশন অ্যান্ড মোর এজিটেশন-ই কায়েম রয়েছে। মনে রাখে না—Automation is the technology of communism । এদের সঙ্গে উদয়নের মতবিরোধ দীর্ঘদিনের। উদয়ন মনে করে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে দেশীয় কোম্পানি, বিশেষত পাবলিক সেক্টরগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভিন্নতর ধ্যানধারণার উন্মেষ হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় তাবড়-তাবড় নেতৃবৃন্দ বাঁধাধরা ট্র্যাডিশনাল পথ ছাড়া আর কিছু ভাবতে চাননি। দাবির কথা যত বলা হয়েছে, দায়িত্বের কথা আদৌ বলা হয়নি। কর্মসংস্কৃতি সর্বতোভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। বিশেষত পশ্চিমবাংলায়। শ্রমিকদের সচেতন ও সজাগ না করে সব দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মালিকপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর।

অন্য অনেক কারণের সঙ্গে শ্রম সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতিও যে প্রথম যুক্তফ্রন্টের পতনের অন্যতম কারণ তাও নেতারা স্বীকার করতে নারাজ। তবু উদয়ন নিজের বিশ্বাসের কথা, যুক্তিবদ্ধ মতামত জানাতে দ্বিধাহীন।

এখন পার্টিতে ত্রিমুখী চোরাস্রোত। সন্দেহও। কারুর গায়ে লেবেল এঁটে দেওয়া হচ্ছে হঠকারী নকশালবাদী বলে। কারুকে বলা হচ্ছে শোধনবাদী বুর্জোয়াতোষক। ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের উন্মাদনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সি. পি. আই. (এম.)-এর সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত প্রমুখ নেতা সহ, বহু পার্টিসদস্যকে নকশালপন্থী হঠকারী ঝোঁকের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করে। নকশালবাড়ির পথই মুক্তির পথ— মানতে পারে না উদয়ন। আবার দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এল জ্যোতি বসু যেভাবে পুলিশ দিয়ে ওদের আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন, তা-ও মানতে পারে না। প্রবোধের সঙ্গেও তর্ক, মতবিরোধ চলতে থাকে।

উদয়ন বলে, ছাত্ররা পোস্টার দিচ্ছে, 'ঘটনা ঘটাও, ফয়দা ওঠাও/শহরে চে, গ্রামে মাও'। চারু মজুমদার বলছেন, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো। আর তোমাদের সাধারণ সম্পাদক বলছেন, কেন্দ্রে কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করার একমাত্র রাস্তা অকংগ্রেসি রাজ্যে-রাজ্যে গণ-আন্দোলন। তিনি বলে চলেছেন ঘেরাও চলবে, অবস্থান ধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘটও চলবে। এই তিন ধারার

অন্তর্মিল বোঝার চেষ্টা করবে না?

প্রবোধ বলে, পার্টির ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে যাওয়া চলে না, উদয়ন।

—কিন্তু ভুল দেখলেও, বুঝলেও বলবে না? এমন ভুল যা এই রাজ্যের সমূহ সর্বনাশ ঘটাচ্ছে!

সর্বনাশ যে কী তুমুলভাবে ঘনিয়ে আসছে উদয়ন সেদিন ভাবতেও পারেনি।

হঠাৎ স্কুলে প্রণতির চিঠি এল। লিখেছে গত তিন মাস বাবাইয়ের কোনো চিঠি পাইনি। পার্ট টু-র পরীক্ষা কবে, তাও জানায়নি। আপনি কষ্ট করে ওর খোঁজ নিয়ে জানালে বাধিত হব। আপনাকে ছাড়া আর কাকে বাবাইয়ের জন্য অনুরোধ করতে পারি!

বাবাই তো এমন ছেলে নয়। পার্ট ওয়ানে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেছে। অনেক দিন মেসে আসেনি অবশ্য। উদয়ন ভেবেছে, নিশ্চয়ই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। এই বয়েসের ছেলে, বন্ধুবান্ধব নাটক কবিতায় মগ্ন থাকাটাই স্বাভাবিক। তবু মাসে এক দু-বার এসে দেখা করে যেত। বইটইও দেয়া-নেয়া করত। কিন্তু মা-দিদাকে চিন্তায় রাখা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আজই একবার হস্টেলে গিয়ে বুঝিয়ে আসবে।

স্কুল থেকে মেসে ফিরে উদয়ন দেখে, বাবাই ওর বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। মাস্তু জানায় দুপুরে এসে স্নান-খাওয়া করেছে। ঘুমন্ত বাবাইয়ের মুখে সরল প্রশান্তি। ঝকঝকে স্বাস্থ্যশ্রীতে যৌবনের দীপ্তি। রিলকের কয়েকটা লাইন মনে আসে—

Hail to you ! For my soul can see
that you are ripe and teen.
You lofty gate, that any day
may open for our good:
you ear my longing songs assay,
my word—I know now—lost its way
in you as in a wood.

বুকের মধ্যে স্নেহ মমতার ঘূর্ণি ওঠে উদয়নের। ইচ্ছে হয়, বাবাইয়ের কপালে মাথায় হাত বুলোয়। ঘুম ভেঙে যাবে বলে ইচ্ছে দমন করে। টিটির কথা মনে আসে। ও নিশ্চয় এখন ক্রমশ তরুণী হয়ে উঠছে। শৈলেশের চিঠি আসেনি অনেকদিন। নিজেও লেখেনি। আজকালের মধ্যে লিখবে ভাবল।

ঘরে ঢুকেই বিরক্তির সঙ্গে প্রবোধ বলল, তুমি আবার কী ফ্যাসাদ বাধালে, উদয়ন?

ঘুমন্ত বাবাইকে দেখিয়ে উদয়ন বলল, আস্তে। বসো। জল খাও। তার পর শুনব।

নিজে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে গ্লাস বাড়িয়ে ধরে উদয়ন। প্রবোধ চুমুক দিয়ে বুঝতে পারে তৃষ্ণা ছিল প্রখর। গ্লাস শেষ করে বলল, তুমি নিতাই মুখোটির বরখাস্তে মত দিয়েছ।

—হ্যাঁ, দিয়েছি। নিতাই মুখোটি কী কী করেছে জানো সব?

—অনেকটাই জানি। স্কুলের অনেক টাকা চুরি করেছে। ভরতি করিয়ে দেবে বলে লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। লাইব্রেরির বই কেনা নিয়েও গোলমাল করেছে।

—স্কুলের সিমেন্টের বস্তা দিয়ে নিজের বাড়ি তুলেছে, কিছু বস্তা বিক্রিও করেছে। এমন লোককে বরখাস্ত না করে উপায় কী!

—ওর অপরাধ নিয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু একেবারে ফাঁসির হুকুম? বাড়িতে বউ ছেলেমেয়ে আছে।

— ওতো সরাই থাকে। ওসব বিবেচনায় আনলে কোনো অপরাধীকেই শাস্তি দেওয়া যাবে না। তোমরা এত মাইয়োপিক [ক্ষীণদৃষ্টি] হও কেন? নিতাইকে সামনে দেখছ বলে চাকরিপ্রার্থী কত লোক লাইনে আছে তাদের দেখতে পাচ্ছ না। ওর জায়গায় একজন সৎ কাজের মানুষ আসবে অন্য একটা পরিবারের সুরাহা হবে।

— নিতাই আমাদের দীর্ঘদিনের কর্মী। টেস্টেড কমরেড।

— চাকরির ক্ষেত্রে সেটা কোনো যোগ্যতা নয়।

— নিতাইয়ের জায়গায় যাকে নেওয়ার কথা হচ্ছে, সেই রমাপতি ব্যাপারে শুনেছি আমাদের বিরোধী দলের সঙ্গে দহরম-মহরম।

— তোমাদের এই মুশকিল, প্রবোধ। তোমাদের অনুগামী না সমর্থক না হলেই বিরোধী বলে ধরে নাও। সেটা নাও হতে পারে।

—দ্যাখো, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নিরপেক্ষতার কোনো স্থান নেই। নিরপেক্ষরা আসলে সুবিধেবাদী।

—সুবিবেচকও হতে পারে। আর তাকে উইন ওভার করা—সমর্থক করে তোলার দায়িত্ব তোমাদের। হাঙ্গেরিতে, চেকোশ্লোভাকিয়াতে, রাশিয়ার অন্যায় আক্রমণ তোমরা সমর্থন করেছিলে। পোল্যান্ডের শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছ, আবার নিতাই মুখোটিকেও সাপোর্ট দিতে চাইছ। প্রবোধ, ইংরেজের জেলে বসে বছরের পর বছর আমরা কি এই শিখেছি, এই বুঝেছি! নিজের বিশ্বাসের প্রতি সৎ না থাকতে পারার মতো মর্মান্তিক আর কী হতে পারে!

— নাঃ, তোমার মুড ঠিক নেই আজ। আমি চলি।

— বোসো, বোসো। চা-শিঙাড়া খাও। তবে মুড অন্যায় ঠিকই আছে। আসলে প্রতি অফিসে কারখানায় নিতাই মুখোটিদের জন্য লেড়ে যায়। ইউনিয়ন নেতারা। ধর্মঘটও করে এইসব অপকর্মীদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্যে। থিয়োরি আর প্র্যাকটিসের রিপিটেড বিরোধ বড়ো পীড়াদায়ক। এই ভয়ংকর বিচ্যুতি সম্পর্কে পার্টিনেতৃত্বের সচেতন হওয়া ভীষণ জরুরি। কংগ্রেসের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে উদয়নের উল্লাসে না মেতে, সঠিক শিক্ষা নিয়ে আত্মানুসন্ধানী হওয়া আবশ্যক।

মাস্তুর দিয়ে যাওয়া চা-শিঙাড়া সম্ভবত বিশেষ উপাদেয় মনে হয়নি প্রবোধের। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মিটিং আছে বলে তড়িঘড়ি চলে গেল।

বাবাই অনেক দিন পর এমন পরিপাটি ঘুমিয়েছে। ঘুম ভেঙে উঠে শরীর-মন দুটোই ঝরঝরে লাগে। চোখেমুখে জল দিয়ে এসে মাস্তুকে ডাকে—এক কাপ গরম চা চাই।

উদয়ন ব্রেড, সাবান জাতীয় টুকিটাকি কেনার জন্য নীচে নেমেছিল। চা পানরত বাবাইকে দেখে বলল, উঠেছিস। এতদিন আসিসনি কেনু? ফাইনাল হয়ে গেছে?

—পরীক্ষা হয়ে গেছে। কেমন দিয়েছিস? মাকে নাকি তিন মাস কোনো চিঠি দিসনি। ওঁরা চিন্তায় আছেন।

—পরীক্ষায় পাস করে যাব হয়তো। কিন্তু কী লাভ? শুধু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

বাড়ানো। মাকে অহেতুক ভাবতে বারণ করে দিয়ো তো।

উদয়ন প্রতিবাদ করে, অহেতুক কী বলছিস? দুটি মহিলা তোর আশায়, তোর মুখ চেয়ে অত দূরে দিন গুনছেন, কবে বাড়ি যাবি চিন্তা হবে না? পরীক্ষা হয়ে গেছে, এবার বাড়ি যা। রেজাল্ট বেরুলে ফিরে আসবি।

বাবাই বলল, না মামা। এখন আমার বাড়ি যাওয়া হবে না। বাংলার মুখ দেখিনি এতদিন। এবার দেখতে যাব। ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে। আজো চায়।

কানু সান্যাল ১ মার্চ, ১৯৬৯, সি. পি. আই. (এম.-এল.) প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পর ছাত্র যুব মহল, বিশেষত প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত উদয়ন। সন্দিগ্ধ চোখে বাবাইকে জরিপ করে বলল, কী বলছিস, কোথায় যাবি তুই?

বাবাই মুখস্থ বলে, 'আমরা তো চেয়েছিলাম শান্তিতে থাকতে। কিন্তু তারা থাকতে দিল কই? আমরা তো চেয়েছিলাম কোনোমতে দুটো আহার জোটাতে। কিন্তু তাই বা তারা দিল কই? আমরা বুঝলাম বাঘে-মানুষে এক সাথে বাস চলে না। তাই সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে হবে। মামা, তুমি ইয়েভতুশেঙ্কোর কবিতা পড়েছ?

There were so many hardships
anxieties of survival,
however much they bent their labouring backs,
it always turned out not to be them
who ate the bread, it was the bread that ate.

উদয়ন বলল, বাবাই, এ-ভুল তুই করিস না। এই সাইসাইডাল পথ ছেড়ে দে। তুই ছাড়া তোর মা-দিদার কেউ নেই। ওদের কথা, ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাব।

—তুমি যখন জেলে গেছ তখন ভেবেছিলে সংসারের কথা, বাবা-মার কথা?

— সেটা ছিল ভিন্ন সময়। বিদেশি শাসকের অধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রাম। না ভাবলেও বাড়ি ছিল, জমি ছিল, ভাইবোন ছিল। তোদের তো কিচ্ছু নেই।

— শোষক শাসকের স্বদেশি বিদেশি বলে কিছু নেই। কিছু হয় না। দে আর ওনলি টু বি আপরুটেড অ্যান্ড অ্যানিহিলেটেড। চেয়ারম্যান মাওও'র ভাবধারায় তা করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

হতাশ উদয়নের অনুভবে তীব্র আলোড়ন। প্রণতি জানলে কী করবে? কী অবলম্বন হবে যমুনার? উদয়ন কি সাথী থাকবে না? সে যথাযথ খোঁজখবর করেনি বারাইয়ের, বলতেই পারে। শিথিল শাসন-প্রহরার অভিযোগও সম্ভব। বারাইকে চিনতে বুঝতে কি এত ভুল হয়েছিল? কোনোদিন সামান্য আঁচও পায়নি যে, ওর এমন উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ আছে। সামনে উপস্থিত এই যুবক সম্পূর্ণ অচেনা বাবাই। অচেনা হলেও চেনা ওর আত্মপ্রত্যয়, অকুতোভয় উচ্চারণ।

বাবাইকে বোঝাবার জন্য শিক্ষক-সুলভে উদয়ন বলল, মার্কসবাদ এতোটা কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছিস জানি না। তবে আমি যা পড়েছি, জেনেছি, শিখেছি তার নির্দেশনা থেকে বলছি, তোদের মোগানের মতো প্রথাও ভুল। মাওের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান হতে পারে না। লেনিন চীনা পার্টির কেউ ছিলেন না। শুধু তাই নয় লেনিন, এম.এন.রায়কে যে

নির্দেশবার্তা দিয়ে চীনে পাঠিয়েছিলেন, চীনা পার্টি তা অনুসরণ করলে মাওয়ের লং মার্চ তথা চৈনিক বিপ্লব সম্ভবত ব্যর্থ হত। প্রত্যেক দেশের পার্টিকে নিজেদের দেশের বাস্তব অবস্থা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে কর্মপন্থা স্থির করতে হয়। মেকানিক্যাল প্রেসক্রিপশনে বিপ্লব হয় না। মস্কোয় বৃষ্টি হলে ডাঙ্গেরা এতকাল হেঁচে এসেছে, আর পিকিংয়ে বরফ পড়লে তোরা এখানে আগুন জ্বালছিস—এর চেয়ে বড়ো নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা আর কী হতে পারে! দেশের সমাজের মানুষের আত্মানুসন্ধান করে নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্মাণ করার প্রত্যয়হীনতা ও অক্ষমতাই ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুরপনেয় দুর্বলতা।

— মাপ করো, মামা। না বলে পারছি না, তুমি ঠিক নয়া শোধনবাদীদের মতো বলছ। এসব পচা বুকনি অনেক শুনেছি। আমি এখন চলি।

— কোথায় যাবি?

—এখন যাব যাদবপুর, সবিতাদিকে একবার দেখে যাব, অনেকদিন যাওয়া হয়নি। তার পর রওনা দেব গোপীবল্লভপুরে। বীরভূমও যেতে পারি।

— মাকে চিঠি দিবি তো?

— দেবো। আজই লিখব।

— আবার কবে আসবি?

— আমি আসব আবার —এখানে?

—নিশ্চয় আসবি। যখন খুশি আসবি। কোনো দরকার হলে খবর দিবি। আর, শোন্ বাবাই, রেজাল্ট বেরুলে চলে আসিস। তোকে অনেক বড়ো হতে হবে।

—মামা, এই বুর্জোয়া শিক্ষায় সো-কলড বড়ো হয়ে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনকারী শোষক সরকারের তল্পিবাহক হওয়ার কোনো অভিরুচি নেই আমার।

ব্যথাতুর চোখে বাবাইয়ের দিকে চেয়ে উদয়ন বলল, তুই জিজ্ঞেস করছিলি আমি ইয়েভতুশেঙ্কোর পড়েছি কি না— ওরই এই দুটো লাইন মনে রাখিস—

It would be far more terrible to mistake
a friend than to mistake an enemy.

মেস থেকে বেরিয়ে ৮বি বাসের দোতলায় উঠল বাবাই। শিয়ালদা ছাড়ালে সামনের দিকে বসার জায়গা পেল। মামার সঙ্গে সরাসরি কথা হওয়ায় ও হৃষ্ট। এবার মাকে শুধু জানিয়ে দেওয়া। মা হতাশ হবেন, দুঃখ পাবেন। কিন্তু ও অনন্যোপায়। 'ডাকিছে কাণ্ডারী/এসেছে আদেশ/বন্দরে বহুনকাল এবারের মতো হল শেষ'।

উদয়নকে বাবাই বলেনি, ও ইতিমধ্যেই ডেবরা গোপীবল্লভপুর ঘুরে এসেছে। মূল আকর্ষণ ছিল সন্তোষ রাণা— যিনি অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ তাচ্ছিল্য করে গোপীবল্লভপুরে চলে গিয়েছিলেন কৃষক সংগঠন জোরদার করার উদ্দেশ্যে। সেখানেই প্রথম, সফল খতম অভিযানের সূচনা ঘটে। বাবাই এবার কলকাতায় এসেছে কিন্তু যোগাযোগ স্থাপন, পরিস্থিতি অনুধাবন করে আস্তানা গুটিয়ে চলে যাওয়ার জন্য।

বাবাইকে দেখে সবিতার গলায় অভিমান ঝরে, এতদিন পরে মনে পড়ল দিদিকে।

সবিতার সিক্সথ ইয়ার চলছে। চেহারায় সুষমার সঙ্গে কর্তৃত্বের প্রসাধনও লেগেছে।

—পরীক্ষার পর বাড়ি যাসনি কেন? মাসি চিন্তায়-চিন্তায় অস্থির হয়ে আছেন।

— নিজেদের দেশটাকে একটু ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম। এবার যাব। তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

—ছাই হচ্ছে। রোজই তো প্রায় গোলমাল লেগে আছে। কোর্স আদৌ শেষ হবে কি না, হলেও পরীক্ষা কবে হবে ভগবান জানে।

— তোমার বান্ধবীর কী খবর?

— তরলার? প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় ওর বিয়ে হয়েছে, আর দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময় বাচ্চা।

—ধুর! এসব তো পুরোনো খবর। আমি বলছি তোমার প্রতিবেশিনী বান্ধবীর কথা।

—ও-ও, অমৃতা। ওর খোঁজে এসেছিস বুঝি?

কলেজে ভরতি হয়ে সবিতার সঙ্গে দেখা করতে আসার দিনই দেখেছিল, অমৃতারা পাশের বাড়িতেই থাকে। সে-কারণে এখানে এলে অমৃতার সঙ্গেও দেখা হয়। অবশ্য কলেজেই এত দেখাশোনা আর আড্ডা হত যে বাড়িতে আসার দরকার হত না।

বাবাই সহাস্যে জবাব দেয়, সেটাও একটা কারণ। তবে একমাত্র কারণ নয়।

— হুঁ, কথার গোঁসাই হয়েছিস দেখছি। বোস্, ডাকছি তোর অমৃতস্য পুত্রীকে।

অমৃতা অবাক ওকে দেখে। সে জানত বাবাই মেদিনীপুরে। এভাবে আসা কতটা নিরাপদ সে-বিষয়ে ও সন্দিহান। বলল, তুমি!

—অনীশদা তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।

বাবাইয়ের হাত থেকে খামটা নিয়ে অমৃতা হাতের মুঠোয় রাখে।

—পড়লে না?

— পরে পড়ব।

ওদের দু-জনের মুখের দিকে তাকিয়ে সবিতা বলল, হাঁউ মাঁউ খাঁউ, রহস্যের গন্ধ পাউ। তোমরা কথা বলো। আমি আসছি।

অমৃতা বলল, তোমার প্ল্যান কী?

— দু-একদিনের মধ্যে ডেবরা যাব।

চিঠিটা পড়ে অমৃতা বলল, আমাকে বাঁকুড়ায় যেতে লিখেছে। তুমি অ্যাকশনে থাকছ?

—কখনও-কখনও। যেমন নির্দেশ পাই।

— ওখানে পার্টির সমর্থন কেমন?

— দারুণ! ভূমিহীন কৃষক, আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছে। এখানে?

—কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে, ছাত্ররা স্লোগান দিচ্ছে, 'বুর্জোয়া শিক্ষা যত পড়বে তত মূর্খ হবে, সেরা বিপ্লবী গ্রামে যাও'। বেহালা, যাদবপুর, সিঁথি, বরানগর, বেলেঘাটা সব আমাদের ঘাঁটি। তবে পুলিশের জুলুমও বাড়ছে দিন দিন।

— সে তো হবেই। আমি চলি তবে।

—সাবধানে থেকো। আবার কবে দেখা হবে?

জানি না। সহসা তো নিশ্চয় নয়।

—অনীশদাকে বোলো আমি চার পাঁচ দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবো। খুব সাবধানে মেয়ো। টেক অল কেয়ার।

১৩

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-এ গঠিত দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরমায়ু ছিল তেরো মাস। সরকার ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। রাজ্য জুড়ে আন্দোলন, অস্থিরতা, খুন, দমন-পীড়ন। সূত্রপাত কাশীপুর থানায় এক সাব ইন্সপেক্টার খুনের মধ্যে দিয়ে। তার পর এখানে-ওখানে খুন হয় পুলিশ, ছাত্র -যুবক। শিক্ষক-অধ্যাপকও বাদ যায় না। মেদিনীপুর বীরভূম বর্ধমানেও খুনের জোয়ার চলতে থাকে। লুঠ হয় পুলিশ ক্যাম্প। বতমের তালিকায় নাম ওঠে সুদখোর, অত্যাচারী, জোতদার মহাজনের। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই মনে হয় রাজ্য জুড়ে মানুষের মৃত্যু নিয়ে অবাধ কন্দুকক্রীড়া চলছে। বাবাই আর আসেনি। কোনো খবরও দেয়নি। উদয়নের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দেয় প্রণতির ক্রন্দনময় আকুতি। পরিচিত সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর ছেলেদের প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় না। বরং তারা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সরে যায়। উদয়ন এখন নিয়মিতভাবে নকশালপন্থী পত্র-পত্রিকা— *দেশব্রতী, দক্ষিণদেশ, লিবারেশন, কালপুরুষ* সংগ্রহ করে পড়ে। মাঝে-মাঝেই স্বাধীন চৌধুরীর নেতৃত্বের কথা থাকে। কিন্তু এই খবর কত পুরোনো বা কতটা নির্ভরযোগ্যতা বোঝা যায় না। প্রাত্যহিক হত্যা খুনের জোয়ারে ভেসে যায় বিগত স্মৃতির চর।

আগস্ট মাস পড়তেই শুরু হয় গণহত্যার উৎসব। প্রথমেই বারাসাত গণহত্যা— হাত বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায় আট যুবকের লাশ। তার পরদিনই বেলেঘাটায় সি.আই. টি. কোয়ার্টারের পাশে খালধারে গুলি করে হত্যা করা হয় কতিপয় যুবককে। নভেম্বরের এক গভীর রাতে ওই এলাকা থেকেই পুলিশ চিরুনি তল্লাশি করে ৫০ জন যুবককে গ্রেফতার করে। এদের কয়েকজনকে 'বালুচর' নামে এক নির্জন স্থানে হত্যা করে পুলিশ। তার পরই ঘটে ডায়মন্ডহারবারের গণহত্যা। কোন্নগরের নিকটবর্তী কানাইপুরে মেলে ন-টি গলিত শব—সবাই নবীন যুবক। এর পরই ঘটে বরানগর-কাশীপুরের পুলিশ কর্তৃক সংগঠিত নারকীয় গণহত্যা। প্রায় তিরিশ জন যুবককের হত্যা করা হয়। এই সময়ে রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যা পনেরো হাজার ছাড়িয়ে যায়।

হত্যার খবর পেলেই উদয়ন ছুটে যায় লাশ শনাক্ত করতে। বলা তো যায় না, যদি বাবাই—। না, ভাবতে চায় না। তবুও যায়। যেতে হয়। নিজের নিঃসংশয় হওয়ার দায় আছে। প্রণতিকে কথা দিয়েছে, যাই খবর পাক বা আসুক, জানবে। প্রতিরাত শনাক্তকরণে ব্যর্থ হলে সন্তর্পণে স্বস্তির শ্বাস ফেলে। আঃ নির্মম খবরটা প্রণতিকে জানাবার নিষ্ঠুর কাজ করতে হয়ে না। ছুটে-ছুটে গিয়ে বিফল হওয়াতে এত মানসিক শান্তি মিলবে কখনও ভাবেনি।

হঠাৎ পুলিশ মেসে এসে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে গেল।

—স্বাধীন চৌধুরী কি এখানে আসা-যাওয়া করে?

—করত।

— শেষ কবে এসেছিল?

—বছরখানেক আগে।

—এখন কোথায় আছে?

— ও জিজ্ঞাসা তো আমারও।

— কোনো চিঠিপত্র দেয় না?

— না।

—অসমের বাড়ির ঠিকানা জানেন?

— জানি।

ঠিকানা নিয়ে পুলিশ বলে, ওর কোনো খবর পেলে আমাদের জানাবেন।

— কেন?

—ওর বিরুদ্ধে একাধিক মার্ডার চার্জ আছে।

—ও-ও। আপনারাও যদি কোনো খবর পান আমাকে দয়া করে জানাবেন।

দিন-দশেক পরে সকালে খবরের কাগজের হেডলাইন দেখে স্তম্ভিত উদয়ন। বড়ো-বড়ো হরফে লেখা হত্যার অভিযোগে চিত্রাভিনেত্রী গ্রেফতার। সঙ্গে মিমির লাস্যময় ছবি। গত রাত্রে এগারোটা নাগাদ নিউ আলিপুরে চিত্রাভিনেত্রীর বাড়ির গেটে নিহত হন হিমাদ্রি নন্দী (৩৮)। নিহত ব্যক্তি নিজেকে রঞ্জনা নন্দীর স্বামী বলে দাবি করলে তীব্র বচসা হয় বলে অভিযোগ। হিমাদ্রিকে জোর করে বের করে দেওয়ার আগে রঞ্জনা নন্দী তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন বলে শোনা যায়। পুলিশের মতে পাঁচ-ছ গজ দূরত্ব থেকে হিমাদ্রিকে গুলি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ রঞ্জনা নন্দীকে গ্রেফতার করে। আজই তাঁকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

খবরটা বার বার পড়ে উদয়ন। মূল খবরের সঙ্গে মিমির সিনেমা-জীবনের নানা বৃত্তান্তও ছেপেছে। যার কিছু সত্য হলেও, অনেকটাই বানানো বলে মনে হয়। ওর কী করা উচিত ভেবে বিমূঢ় বোধ করে। মিমির অর্থ ও লোকবল আছে। এদের সাহায্য করার জন্য প্রভাবশালী মানুষের অভাব হয় না। প্রয়োজক পরিচালকরা আপন স্বার্থেই সহায়তা দিতে আগুয়ান হবে। তবুও, ও তো দাদা। ওর যাওয়া উচিত। নায়িকা-জীবনের বাতাবরণে দূষণ থাকেই। কিন্তু মিমি খুন করতে পারে, ভাবাই যাচ্ছে না। হিমাদ্রি নন্দী— এতকাল কোথায় ছিল? হঠাৎই হাজির হল কেন?

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল উদয়ন। মিমির বাড়ির সামনে বিশাল জনতা। পুলিশের প্রহরা। কৌতূহলী জনতা সামলাতেই ব্যস্ত পুলিশের সঙ্গে কথা বলাই দুষ্কর। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে দেখে বিকাশ সিংহ পুলিশের এক অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। কাছাকাছি গিয়ে ডাকে—বিকাশবাবু—আমি—আমাকে চিনতে পারছেন?

বিকাশ এক পলক দেখে স্মৃতি হাতড়িয়ে বলে, আপনি দাদা তো—আসুন, আসুন। মিমি আপনাকে খবর দেওয়ার কথা বলছিল।

পুলিশ অফিসারের কাছে ওর পরিচয় দিয়ে বিকাশ বলে, ইনি ফ্রিডম ফাইটার। এখনও সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। কিন্তু দেখুন বোনের দুঃসময়ে না ডাকতেই হাজির। আর দাদা, ইনি ডি.এস.পি. রূপক ভৌমিক।

উদয়ন জানতে চায়, সত্যিই কি ও খুন করেছে?

রূপক বলে, দেখুন সারকাম্‌স্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স রঞ্জনা দেবীর বিরুদ্ধে। তবু এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আরও তদন্ত করে দেখতে হবে। বিশেষত দ্যাট ম্যান, হিমাদ্রি নন্দী লোকটা কে, কোত্থেকে এল, কেন এল— জানা দরকার। হি ক্লেইমড টু বি হার হাজব্যান্ড। আপনি জানেন কিছু?

উদয়ন জবাব দেয়, আমি হিমাদ্রি নন্দীকে কখনও দেখিনি।

বিকাশ বলল, দাদা, বেইলের জন্য চেষ্টা করছি। জ্যোতিপ্রকাশ লাহিড়িকে দিয়ে মুভ করাচ্ছি। তবে কয়েকটা দিন হয়তো পুলিশ কাস্টডিতে থাকতে হবে।

রূপক বলে, তদন্তের স্বার্থে এটা খুব দরকার।

— কোথায় রেখেছেন ওকে?

— আমাদের থানার লকআপে তো ওঁকে রাখা যায় না। লালবাজারে সেন্ট্রাল লকআপে আছেন।

— একবার দেখা করা যাবে?

— এখন তো হবে না। আজ কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখা যাক কী অর্ডার হয়।

উদয়ন বিকাশকে বলে, জানি, আপনারা যা কিছু করার সবই করবেন। তবু আমি যদি কিছু করতে পারি বলবেন। আমাদের মেসে ফোন এসেছে। নম্বরটা রাখুন। খবর দেবেন। আমি অবশ্য কালও আসব। যদি সম্ভব হয় মিমিকে বলবেন, আমি আছি।

জনতার ভনভনে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে উদয়ন। ভাবার চেষ্টা করে এখন কার কাছে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য যাওয়া যায়। প্রবোধ বা পার্টির কারুর কাছে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। অমন খ্যাতিময়ী চিত্রতারকার দাদা, ওটা জানলে ওদের কূপমণ্ডুক মনের প্রতিক্রিয়া কী হবে অনুমেয়।

—স্যার, আপনি! এখানে?

প্রশ্নকর্তা, যুবক ছেলেটির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে উদয়ন স্মৃতি হাতড়ায়।

—আমাকে চিনতে পারছেন না, স্যার? আমি কিশোর দেবনাথ। আগরতলায় আপনার কাছে চার বছর পড়েছি।

— হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমরা তো মহারাজগঞ্জে থাকতে। সুকুমার, অবনীদের ক্লাস। এখন কী করছ?

— ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভরতি হয়েছি। যাদবপুরে।

— বাঃ। খুব ভালো লাগল। পড়াশোনা ঠিক করছ তো, যা গন্ডগোল চলছে—

—আপনি স্যার রঞ্জনা দেবীর বাড়িতে — কোনো বিশেষ কারণ আছে?

— হ্যাঁ, কিশোর। রক্তের টান, না এসে কি পারা যায়! তোমরা যাকে রঞ্জনা বলে জান, সে আমার ছোটো বোন মিমি। এমন একটা বিশ্রী কাণ্ডে জড়াবে ভাবতেও পারিনি।

—স্যার, আমরা আপনাকে এখনও শ্রদ্ধা করি। কোনো দরকার হলে আমাকে বলবেন। রঞ্জনা দেবীর জন্য চিন্তা করবেন না।

—নিশ্চয়। তুমি নিজে থেকে আমাকে চিনে এগিয়ে এসেছ— এ তো কখনও ভুলতে পারব না।

কোর্ট মিমিকে তিন দিন জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। বিখ্যাত অভিনেত্রীর ক্লোরে

অনেক ছবি। প্রযোজকদের সম্ভাব্য ক্ষতির কথা বিচারপতিকে মাথায় রাখতেই হয়েছে।

পরদিন বিকাশের সঙ্গে লালবাজারে গেল উদয়ন। যদি মিমির সঙ্গে দেখা করা যায়। বিকাশ জানাল উপর মহলে তদবির করে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে রেখেছে। পুলিশ অফিসার প্রদ্যোৎ নিয়োগীর ঘরে ঢুকতেই তিনি গলা চড়িয়ে বলেন, এই যে, বিকাশবাবু, আপনি বলেছিলেন, রঞ্জনাদেবীর দাদাকে নিয়ে আসবেন। আর এই ভদ্রলোক আধ ঘণ্টা ধরে আমাকে বলে যাচ্ছেন, ইনিই সেই দাদা।

প্রদ্যোতের টেবিলের সামনে বসা স্যুট পরা মানুষটির চওড়া কাঁধ, মাথা ভরতি কালো চুল আর ভরাট কণ্ঠ শুনতে পায় বিকাশ ও উদয়ন— টেল মি হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু, টু মেক ইউ বিলিভ হু অ্যাম আই। আমি আপনাকে সব বলেছি, আমার সব ক্রেডেনশিয়ালস দেখিয়েছি স্টিল—

উদয়ন প্রশ্ন করে, উনি কী পরিচয় দিয়েছেন?

উদয়নের কণ্ঠস্বর শোনামাত্র স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে ওঠে মানুষটি, যুগপৎ প্রদ্যোতের জবাবও আসে —সুজন সরকার।

অবিশ্বাস্য বিস্ময় ও অভাবনীয় আনন্দে উদয়নের অনুভবে সৃষ্ট সংবেগ আপন নিহিত অভিব্যক্তি একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে—বটু!

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পর পিঠাপিঠি অনুজের সম্মুখীন। কলেজে ঢোকা বটু, আজ চেহারায় পোশাকে মার্জিত সুপুরুষ, কৃতীর কারুকার্য খচিত।

বটু অগ্রজকে দেখে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে। বয়সের আঁচড়ে ও দীর্ঘ কারাবাসের কৌলিন্যে শরীর চূর্ণ, চুলে কালের সমারোহ। ধুতি আর সাদা শার্টের পরিচিত মূর্তি যেন ছাব্বিশ বছরের স্মৃতির ফ্রেম থেকে নির্গত। সমুদ্রসমান উত্তুঙ্গ আবেগ বটুর কণ্ঠ রোধ করে। কোনো মতে বলে— দাদা!

বিকাশ ও প্রদ্যোৎ যেন সিনেমার ভ্রাতৃমিলন দৃশ্য দেখে। অনুজকে বুকে জড়িয়ে উদয়ন বলল, ও ঠিকই বলেছে। আমরা দুজনেই রঞ্জনার দাদা।

বিকাশ বলল, দাদা, আপনারা কথা বলুন। আমি ফর্মালিটিগুলো সারি।

ঘর থেকে বেরিয়ে দু-ভাই করিডোরে দাঁড়ায়। উদয়ন জানতে চায়, কোথায় ছিলি এত দিন? কী করছিস?

—আমি ম্যাঙ্গালোরে থাকি। কাল কাগজে খবরটা পড়ে ফ্লাইটধরেছি। আমি — আমারই জন্য দাদা, মা গেছেন, মিমির এই অবস্থা। এক দিনের জন্যও মিমির কথা ভুলিনি,কিন্তু কোন্ লজ্জায় আসব! কী বলব ওকে! জীবনে ওর মুখোমুখি হব না ভেবেছিলাম। খবরটা পড়ে না এসে পারলাম না। তোমার তো কোনো খবর জানি না। আমাকেই দাঁড়াতে হবে একলা ওর পাশে।

— উঠেছিস কোথায়?

— থিয়েটার রোডে কোম্পানির এক গেস্টহাউসে। তুমি কোথায় থাকো, কী করছ?

— একটা স্কুলে পড়াই আর মেসে থাকি।

— তুমি আর বদলালে না। পলিটিক্স করছ এখনও?

— না করে বাঁচব কীভাবে! প্রথম তারুণ্যে যে-স্বপ্ন দেখেছিলাম আজও তা মুছে ফেলতে

পারিনি। তুই কী করছিস বললি না তো।

— ছোটোখাটো ব্যাবসা করছি। ভালোই চলছে।

বিকাশ এসে বলল, দাদা, আসুন।

আগেই বলে রেখেছিল বিকাশ। নইলে দুই দাদাকে একসঙ্গে দেখে মিমির অন্তর্ভূমের বিস্ফোরণ হত অসহ। তবু দুজনকে দু-হাতে ধরে ঝরঝর কেঁদে বলে, বড়দা—মেজদা—তোমরা এসেছ! আমাকে ফেলে কোথায় চলে গিয়েছিলে মেজদা—

উদয়ন বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, কাঁদিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বটু বলল, মিমি, আমি এসে গেছি। তোর কোনো চিন্তা নেই। সব বুঝে নেব।

মিমি বলল, তোমরা বিশ্বাস করো, আমি খুন করিনি। আমি শুধু ভয় দেখিয়েছিলাম। ওই বদমাশ লোকটা আবার আমাকে এক্সপ্লয়েট করবে— তা কিছুতেই হবে না।

বিকাশ বলল, কোনো চিন্তা কোরো না তুমি। সব শ্যুটিং রি-শিডিউল করতে বলে দিয়েছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি ফ্লোরে যেতে পারবে। শুধু একটাই মুশকিল হচ্ছে প্রেসকে নিয়ে। তুমি রঞ্জনা নন্দী, আর লোকটা দাবি করেছে সে তোমার স্বামী হিমাদ্রি নন্দী।

বটু সজোরে বলে ওঠে— ও হিমাদ্রি নন্দী নয়। হি ওয়াজ আ ফ্রড। ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল।

মিমি ডুকরে ওঠে, মেজদা!

উদয়ন বিভ্রান্ত— কী বলছিস তুই!

বটু ধীরগলায় বলে, ঠিকই বলছি। ওর আসল নাম প্রতুল বাগচি। বিকাশবাবু, একবার ডি.সি.ডি.ডি.-কে বলুন তো, কাঁকিনাড়ার প্রতুল বাগচির বিরুদ্ধে কোনো কেস পেন্ডিং আছে কি না খুঁজে দেখতে।

উদয়ন বলল, তুই যে কী বলছিস, কিছুই বুঝতে পারছি না।

— চলো, বুঝিয়ে বলছি।

বোনকে বলল, একদম ভাববি না। তোকে না ছাড়িয়ে আমি যাচ্ছি না।

বাইরে বেরোবার আগে বিকাশ বলল, একটা অনুরোধ। প্রেসকে দয়া করে কিছু বলবেন না।

বটু বলল, আমরা রঞ্জনা নন্দীর কাছে আসিনি। ওকে চিনিও না। দেখবেন, পুলিশ যেন আমাদের কথা না বলে দেয়।

উদয়ন জিজ্ঞাসু চোখে ভাইয়ের দিকে তাকালে বিকাশ শব্দ করে হেসে ওঠে।

বটু আবার বলে, বিকাশবাবু আপনি ওই খোঁজটা নিয়ে থিয়েটার রোডে আমার গেস্ট হাউসে চলে আসুন। ল ইয়ারকেও যদি আনতে পারেন ভালো হয়। পুরো ব্রিফিংটা দেওয়া যাবে। আমরা একসঙ্গে ওখানেই লাঞ্চ সেরে নেবো।

বিকাশ বলল, মাফ করবেন। খোঁজটা নিয়েই আমাকে স্টুডিয়োতে যেতে হবে। ল ইয়ারের কাছে আপনাকে সন্ধেবেলা নিয়ে যাব। আপনার ফোন নম্বরটা বলুন।

ফোন নম্বর দিয়ে বটু বলল, দাদা, এসো।

সাংবাদিক ও চিত্রগ্রাহক গোপন মাইনের মতো। কখন যে ফুটে ওঠে বলা দুষ্কর। দু-ভাই বেরুবার সময় এক দলের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে পারে না। পুলিশের গুলির মতো প্রশ্ন আসে—

—রঞ্জনা দেবী আপনাদের কে হন?

— মৃত ব্যক্তিই কি ওঁর স্বামী হিমাদ্রি নন্দী?

—রঞ্জনাদেবীই কি গুলি করেছিলেন?

উদয়নের এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা আছে। ও দু-হাত তুলে বলল, আপনারা ভুল করছেন। আমরা এসেছি আমাদের নিরুদ্দেশ ভাগনের খোঁজে।

—কী হয়েছে তার?

— প্রেসিডেন্সিতে পড়ত। পরীক্ষার পর থেকে আর কোনো খোঁজ নেই।

কেউ এক জন মন্তব্য করে, নিশ্চয় নকশাল হয়ে গেছে।

আর-একজনের উক্তি, কিংবা লাশ।

— কী নাম ভাগনের?

—স্বাধীন চৌধুরী।

নাম শোনামাত্র ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নীরবে। বোঝা যায় নামটা নিতান্তই অপরিচিত নয়।

সাত তলার ওপরে গেস্টহাউস, দামি হোটেলের আড়ম্বরশূন্য পারিপাট্যময়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। চায়ের অর্ডার দিয়ে বটু বলল, দাদা, আরাম করে বোসো। আমি পোশাক বদলে আসছি।

উদয়ন ভাবে, লালবাজারে গেলেই যদি, বাবাইয়ের খবর নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত ছিল। বন্দি আছে জানলেও স্বস্তি পাওয়া যেত। কোনো খবর না-থাকা, কোথায় আছে, আদৌ আছে কি না-র সংশয় বড়ো পীড়াদায়ক।

পাজামার উপর হলুদ টি শার্ট চাপিয়ে এল বটু। বেয়ারা চা দিয়ে গেছে। চুমুক দিয়ে বটু বলল—তুমি সিগারেট খাও?

— না, তুই খেতে পারিস।

সিগারেট ধরিয়ে বটু বলল, মিমির কাছে নিশ্চয় ওর বিয়ের বৃত্তান্ত শুনেছ?

—শুনেছি। কিন্তু তুই এত দিন কেন মিমির সঙ্গে যোগাযোগ করিসনি?

—লজ্জায়। আত্মধিক্কারে। বিয়ের পরই তো ও নিখোঁজ হয়ে যায়। সিনেমায় নামার পর পত্র-পত্রিকায় ওর ছবি দেখে চিনতে পারি। ও যে আছে, মোটামুটি ভালোই আছে—এই ভেবেই সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেছি।

—আমিও ওর ছবি দেখেই খুঁজে বের করেছি। তুই ম্যাঙ্গালোরে গেলি কেন?

—ওদের খুঁজতে। বলছি সে-কথা।

মা-র আত্মহত্যা বটুর চিত্তের গভীরে আত্মবিদীর্ণকর আলোড়ন তোলে। যেন দু-দুটো হত্যা করেছে— বোন ও মায়ের। বারবার প্রশ্ন করে, সব দেখেশুনে জেনে এমন ভুল করল কীভাবে? ধীরে-ধীরে মনে সংশপ্তক প্রতিজ্ঞা জাগে, যেন-তেন প্রকারণে হিমাদ্রিকে খুঁজে বের করবেই। বাড়ি বিক্রি করে হাওড়ায় ট্রেন ধরে। গন্তব্য ম্যাঙ্গালোর, যেখানে হিমাদ্রির থাকার কথা। যে কোম্পানিতে চাকরি করে বলেছিল, সেখানে প্রথমেই জানালো হিমাদ্রি নন্দী বলে কেউ কাজ করে না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায় সাত-আট বছর আগে এই নামের এক জন ইঞ্জিনিয়ার ছিল, তবে তিনি কাজ ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ভিজিটিং কার্ডে

লেখা কোম্পানির অস্তিত্ব নেই।

বটুর অন্বেষণ চলে। যত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ও অফিস আছে প্রায় সবই ঘোরা হয়ে যায়। চূড়ান্ত হতাশা নিয়েও উদ্যম হারায় না। না চাইলেও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী দেখিয়েছিল হিমাদ্রি। অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি। চাকরি করত এটা মিথ্যে নয়, প্রমাণ হল। এখন কোথায়?

এক জন পরামর্শ দিল, কুদিরমুখ প্ল্যান্টে গিয়ে খোঁজ করতে পারেন। ওখানে কয়েকজন বাঙালি আছেন।

প্ল্যান্টে গিয়ে জানতে পারে ওখানে এইচ. নন্দী নামে এক জন সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার বছর ছয়েক ধরে কাজ করছেন। বিশেষ অনুমতি নিয়ে বটু তাঁর চেম্বারে ঢুকে হতভম্ব দাঁড়িয়ে থাকে। প্রকৃতই বাক্যহারা।

—বসুন। বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য?

বটু কোনোক্রমে বলে, আমি হিমাদ্রি নন্দীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

—আমিই হিমাদ্রি নন্দী। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

পুরু চশমা ও গোঁফের নীচে কৌতুক ঝাঁকিয়ে ওঠে।

—আপনি কি কখনও এস. এস. ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কাজ করেছেন?

—হ্যাঁ। ওখান থেকেই তো শুরু করি।

একটা ভিজিটিং কার্ড টেবিলের উপর রেখে বটু বলে, এই কার্ড তো আপনার?

কার্ড হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন হিমাদ্রি। বলেন, না, এ কার্ড আমার নয়। আর যতদূর জানি এই নামে কোনো কোম্পানি কর্ণাটকে অন্তত নেই।

ভদ্রলোক এবার কৌতূহলী হয়ে বলেন, আপনি কোত্থেকে আসছেন? কী ব্যাপার বলুন তো?

বটু নিজের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে মিমির বিবাহ-বিপর্যয়ের কথা বলে। সব শুনে হিমাদ্রি বলেন, আপনার কাছে হিমাদ্রির কোনো ফোটো আছে?

বিয়ের ফোটো ছিল। একটা শুধুই বরবধূর।

ফোটো দেখে হিমাদ্রি স্খলিত স্বরে বলেন, মাই গড! এ তো প্রতুল বাগচি!

— প্রতুল বাগচি!

—হ্যাঁ। ও কোনো একটা ব্যাঙ্কে কাজ করত। সেখানে গোলমাল করায় ওর চাকরি যায়। তার পর একে-তাঁকে ধরাধরি করে এস. এস. ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্যাশিয়ার হয়। টাকা তছরুপের জন্যে তাড়িয়ে দেওয়া হলে, গ্রেফতার এড়াতেই ও ফেরার হয়ে যায়। কিন্তু আপনি বলছেন ও আপনাকে ডিগ্রির কাগজ দেখিয়েছে! থ্যাঙ্কস মিস্টার সরকার। আপনি একটা সমস্যা সমাধানের সূত্র দিলেন।

— কীরকম?

— বলছি। তার আগে পুলিশে একটা ফোন করি।

ফোনের কথা থেকে বটু বুঝতে পারে বছর-কয়েক আগে হিমাদ্রির ফ্ল্যাটে বড়ো রকমের চুরি হয়। টাকাপয়সার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কাগজপত্র সহ একটা সুটকেসও খোয়া যায়। যাওয়ার পথে চোর কেয়ারটেকারকে খুন করে। এত বছরেও পুলিশ ওই কেসের কোনো কিনারা করতে পারেনি।

হিমাদ্রি ফোনে বলেন, প্রতুল বাগচি ইজ দ্য ম্যান—ওর আরও ডিটেলস আপনাদের ফাইলে নিশ্চয়ই আছে।... হ্যাঁ। হ্যাঁ। আসবেন বইকী। এনি টাইম।

— বুঝলেন কিছু?

বটু মাথা নাড়ে।

—আয়্যাম সরি, মি. সরকার। আপনি সর্বতোভাবে প্রতারিত হয়েছেন।

— কী আর করব। আমার মূর্খতা আর দুর্ভাগা বোনের কপাল! আমি চলি।

— কোথায় যাবেন? কলকাতা?

— না। কোথাও একটা কাজ-টাজ খুঁজতে হবে। যে-আশা নিয়ে এসেছিলাম তাও শেষ হয়ে গেল! প্রতুল বাগচিকে আমি আর কোথায় খুঁজব!

হিমাদ্রি কয়েকদিনের মধ্যেই বটুকে কাজ জুটিয়ে দেয় এক কনট্রাক্টারের অফিসে। বছর চারেক কাজকর্ম শিখে নিজেই শুরু করে। হিমাদ্রির সহায়তায় ধীরে ধীরে ব্যাবসা দাঁড়িয়ে যায়। ব্যাবসা বাড়ার সঙ্গে মূলধনের অনটন ঘোচাতে রেবতীকে বিয়ে করে। রেবতীর বাবা ভাস্করণ শেঠি অর্থ-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন মানুষ। এক সময় মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উরসের খুব কাছের মানুষ ছিলেন।

উদয়ন স্তব্ধ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তার পর বলে, পুলিশ বা কোর্ট কি এসব বিশ্বাস করবে?

—করতেই হবে। আমি সব তৈরি করে এনেছি। দরকার হলে হিমাদ্রিবাবু এসে সাক্ষ্য দেবেন বলেছেন।

সন্ধেবেলা ব্যারিস্টারের চেম্বারে দুজনে এল। বিকাশ আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। জ্যোতিপ্রকাশ বলেন, ডি.সি.ডি.ডি. কিছু জানিয়েছেন?

বিকাশ বলে, হ্যাঁ, যদি এ-ই প্রতুল বাগচি হয়, তবে ওর বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপ, বহুবিবাহ, নারী পাচার ও অন্তত তিনটি খুনের চার্জ আছে।

—পুলিশ রিপোর্টে দেখছি মৃতের বডি সার্চ করে হিমাদ্রি নন্দীর কাগজপত্র ছাড়াও, প্রতুল বাগচির নামে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, ব্লাড রিপোর্টও পাওয়া গেছে।

বটু জ্যোতিপ্রকাশের দিকে একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে সংক্ষেপে ম্যাঙ্গালোরের ঘটনা বলে। জ্যোতিপ্রকাশ ফাইলের কাগজপত্র দেখে বলেন, আপনি তো দারুণ কাজ করেছেন। খোদ ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে সার্টিফাই করে এনেছেন! বিকাশবাবু, মৃত, রঞ্জনা দেবীর স্বামী নয় কারণ সে হিমাদ্রি নন্দীই ছিল না। অতএব চুরি ও বলাৎকারের চেষ্টার অভিযোগ আনা যেতে পারে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে খুনের বিবরণ পেলে বোঝা যাবে বাকিটা।

বিকাশ বলল, রঞ্জনা খুন করতেই পারে না। কারণ তার কাছে কোনো রিভলভার নেই। ও খেলনা পিস্তল— যা দিয়ে রিহার্সাল দেওয়া হয়, দেখিয়ে ওকে ভয় দেখিয়েছিল শুধু। পুলিশও অস্ত্রের সন্ধান পায়নি।

—তা হলেও প্রশ্ন থাকে, কে খুন করেছে? কেন করেছে?

—ওটা পুলিশের কাজ। ওরা তদন্ত করুক। আপনি শুধু রঞ্জনার রিলিজের ব্যবস্থা করে দিন।

জ্যোতিপ্রকাশ বললেন, বেইল পাওয়া এখন আর কোনো সমস্যাই নয়।

দিন-দুয়েক পর রূপক ভৌমিক বিকাশকে জানায়, চেতলার আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

সেন্টার টেলিফোনে জানিয়েছে, প্রতুল বাগচি দীর্ঘদিন ওদের খতমের তালিকায় ছিল। কাঁকিনাড়া ইউনিটের সদস্যরা ওকে খতম করেছে।

পোস্ট মর্টেম রিপোর্টও জানায় গুলি ঘরের থেকে নয় রাস্তার দিক থেকে করা হয়েছে। রঞ্জনার খেলনা পিস্তল পাওয়া গেলেও অন্য কোনো আগ্নেয়াস্ত্র রঞ্জনা নন্দীর গৃহে পাওয়া যায়নি।

জামিনে মুক্ত হয়ে আসার পর তিন ভাইবোনের সম্মেলন হয়ে ওঠে হর্ষবিষাদের অনুষ্ঠান। না বলা বাণীর অঝরা অশ্রু আর অকথিত বেদনার স্বরলিপি জীবন পারাবারের কাণ্ডারীহীন তীর হয়ে ভাসে।

বোনকে জড়িয়ে ধরে বটু বলল, মিমি, তুই আমাকে ক্ষমা করতে পারবি?

মিমি বলল, ও-কথা বোলো না মেজদা। তোমার কী দোষ! আমার নিয়তি ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। সেখান থেকে নিয়তিই আবার এখানে পৌঁছে দিয়েছে। সে তো তোমাদের আশীর্বাদের জন্যই।

বটু বলল, দাদা, তুমি কি জীবনটা এভাবেই কাটাবে?

মিমি যোগ করে, আমি কতবার বলেছি আমার কাছে এসে থাকতে। শোনেই না।

— কী দরকার। এই তো বেশ আছি। আর ক-বছরই বা বাকি আছে!

—বলবে না বড়দা, এসব কথা কক্ষনো বলবে না। তোমার থাকাটাই যে আমার কাছে কী ভরসার, বোঝাতে পারব না। মেজদা, তোমার ছেলেমেয়ে কী?

—একটা, একটা। মেয়ে বড়ো।

—ওদের নিয়ে একবার আসবে? এই পুজোয়? আমার কাছে থাকবে।

বটু বলল, আসব। দাদাকে, তোকে যখন আবার পেয়েছি, আর হারাতে চাইব না।

১৪.

'সত্তরের দশক মুক্তির শতক'—শহর ও শহরতলির দেয়ালে-দেয়ালে উৎকীর্ণ এই স্লোগান। আরও একটা স্লোগান শোনা যেতে থাকে রেডিয়োতে, মাইকে ও বিভিন্ন জনসভায়—এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। শেখ মুজিবরের উদাত্ত কণ্ঠ আকাশ-বাণীর মতো ধ্বনিত হয়। ওপার বাংলার আবেগ আকাঙ্ক্ষা আর্তির বাঁধনহীন প্লাবনের তরণী আছড়ে পড়ে এ-পারেও। মুক্তিসেনার সাফল্যের খবর পেলে উল্লসিত হয় এ-পারের বাঙালি। প্রতি সীমান্তে শরনার্থীর স্রোত। পাকিস্তানি সৈন্যের অত্যাচার, নিপীড়ন, গণহত্যা ও অরাজক ধর্ষণের নৃশংসতা থেকে বাঁচার জৈবিক তাগিদে, ও-পার থেকে অসম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় নেয় লক্ষ-লক্ষ মানুষ— হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। যারা একদা পাকিস্তানের জন্য জীবনপণ করে হিন্দু-নিধন করেছিল, সেইসব মুসলমানও পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে নিরাপত্তা খুঁজে নিতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন শিবিরে এক কোটিরও বেশি শরণার্থী। তাদের আহার, চিকিৎসা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিপুল দায়ভারের জন্য ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে দু-শো কোটি টাকার সাহায্য দাবি করে।

আরও একটি পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ মানেই হত্যা, ধ্বংস, অপচয়, গুজব আর মিথ্যা প্রচার। শরণার্থীরা সত্য। তাদের দুঃখকষ্ট, যন্ত্রণা রোগ মৃত্যু বাস্তব। মানুষের সহানুভূতি

এ-সময়ে ছিল উদার ও প্রশংসনীয় রকম ধর্মনিরপেক্ষ। সকলের যুদ্ধ সম্পর্কে ঔৎসুক্যও ছিল ঐকান্তিক। যুদ্ধের গতি যত ভারতের অনুকূলে লক্ষণীয় হচ্ছিল মানুষের প্রত্যাশাও বাড়ছিল। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণে যুদ্ধের অবসান এবং পূর্বঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।

বিংশ শতাব্দীতে হিটলারের ষাট লক্ষ ইহুদি নিধনের পর সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম হত্যা ও ধ্বংস ঘটে বাংলাদেশে। নয় মাসে পাকিস্তানি সামরিকশক্তি তিরিশ লক্ষ বাঙালি নরনারী ও শিশুনিধন করে। ও-পারে, বিশেষত ত্রিপুরা ও পশ্চিমবাংলার সামাজিক ও আর্থিক পরিমণ্ডলের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় জনজীবনে ঘনায় দীর্ঘস্থায়ী সংকট। বহু শরণার্থী আর স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যায়নি। যাওয়া সম্ভব ছিল না।

সুরেনকে দেখে যমুনার অশ্রু আর বাঁধ মানে না। স্মৃতির বেদনার সঙ্গে ফিরে পাওয়ার আনন্দও মেশে। চল্লিশ বছরে সুরেনের বয়স যেমন বেড়েছে তেমনই শরীরও হয়েছে বিক্ষত। আবাল্য যাকে পুত্রবৎ মানুষ করেছেন, স্নেহ আদর দিয়েছেন তার ক্লিষ্ট মূর্তি যমুনার প্রাণে বেদনার সঞ্চার করে।

—শরীরটার এমন হাল কেন রে?

— মাসি, গত ক-টা মাস আমাগো যে ক্যামনে কাটছে ভাইবতে পারবা না। একদিকে মিলিটারি আর অন্যদিকে বদরু শেখ আর মজিদ আলিদের টনটনানি।

—হামিদ ইদ্রিসরা কেমন আছে?

—হামিদ মারা গেছে বছরদুই আগে। ইদ্রিস ভালোই আছিল। কিন্তু হ্যাও থাইকতে পারে নাই। আইছে এ-পারে। হ্যা গ্যাছে বিলোনিয়া। কুটুম আছে তার।

—আমাদের জমিজমা আছে অখনও?

— হে তো ৬৫ সালেই গরমেন্ট এনিমি প্রপার্টি কইর‍্যা লইয়া গেছে।

— তোর তবে চলত কিভাবে?

—মামার দয়া বা আশীর্বাদ, যাই কও।

—তার মানে?

—মামা তিন বিঘা জমি— বাঁশতলা মনে আছে — তার পাশের জমিটা আমার নামে দলিল কইরা হামুদাদাকে দিছিল। আমি জানতাম না। সরকারের ঝামেলার সময় হামুদাদা আমারে দলিলটা দেয়। ওইটা দিয়াই চালাইয়া দিতাম। ছোটো কইর‍্যা টেলারিংয়ের কামও করতেছিলাম। কিন্তু বদরু শেখের নজর পড়ল আমার জমির উপর। তাই পলাইতে হইল।

সুরেন পালিয়ে প্রথমে আগরতলায় ডলির বাড়িতে ওঠে। ওদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে চলে আসে মাসির কাছে। ও আসায় প্রণতিও খুশি। এক জন পুরুষ বাড়িতে থাকলে আত্মনির্ভরতা বাড়ে। যমুনার মনোযোগ সুরেনের দিকে থাকলে বাবাইয়ের কথা কম জিজ্ঞেস করবেন। প্রণতি এখনও মাকে বলতে পারেনি যে আদরের নাতি, পড়া ছেড়ে বিপ্লবে মেতেছে। খবরের কাগজ ও রেডিয়োর প্রচারে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বিপ্লবী নকশাল আর চম্বলের 'বাগী' ডাকাতের মধ্যে তফাত সামান্যই। এবং যমুনার পক্ষে তা সহ্য করা দুরূহ হবে।

মাকে যা বলে, সুরেনকেও তাই বলল প্রণতি, বাবাই কলকাতায় পড়ছে।

—হ্যায় নাকি অনেকদিন আসে নাই। চিঠিপত্র দ্যায় না। ব্যাপার কী রে?

— জানি না সুরোদা। বড়ো চিন্তায় আছি।

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রণতি প্রণীত নির্মোক— বে-আব্রু হয়ে ওকে চরম মানসিক বৈকল্যে জর্জরিত করে। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। বাতাস হিম-আদ্র। বিকেল না হতেই অন্ধকার ছেয়ে গেল। বৃষ্টি পড়ে অবিরাম। গাড়ির শব্দে জানালা খুলে প্রণতি দেখে তিনটে জিপ থেকে নেমে জনা-কুড়ি বন্দুকধারী পুলিশ বাড়ি ঘিরেছে। একটু পরেই দরজার কড়া আর্তস্বরে কঁকিয়ে ওঠে। প্রণতি শান্ত মুখে দরজা খোলে।

—স্বাধীন চৌধুরী আছে?

— না। ও তো কলকাতায়।

— বাড়িতে আর কে আছে?

—আমার মা আর দাদা। আমি স্বাধীনের মা।

কড়া নাড়া ও পুলিশের দাপুটে কণ্ঠ শুনে যমুনা আর সুরেন এগিয়ে এসেছিল। ওদের দেখিয়ে প্রণতি বলল, এই যে আমার মা। ইনি দাদা, সম্প্রতি পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন।

—আমরা একবার বাড়িটা সার্চ করব।

—কেন? কী করেছি আমরা?

এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না কেউ। পুলিশকর্তা হুকুম দেয়—সার্চ। চার জন পুলিশ ঘরে ঢুকে পরিচিত পদ্ধতিতে সব জিনিসপত্র ছুঁড়ে-ছিটিয়ে তছনছ করে। বাবাইয়ের ঘরে ঢুকে বইপত্র তন্নতন্ন ঘাঁটে।

শাদা পোশাকের এক জন পুলিশ বাংলায় জিজ্ঞেস করে, স্বাধীনবাবু লাস্ট কবে এসেছিলেন?

প্রণতি উত্তর দেয়, বছর-তিনেক আগে।

যমুনা বলেন, কী করেছে আমার দাদুভাই—আপনারা এইভাবে সব ভাঙচুর কেন করছেন?

পুলিশ সুরেনকে বলল, আপনি কবে এসেছেন এখানে?

—দিন-দশেক।

— পাসপোর্ট আছে?

—আমি কি বেড়াইতে আইছি?

— কেন এসেছেন?

— হাজার-হাজার মানুষ ও-পার থেইকা এই পারে ক্যান আইতেছে জানেন না আপনে?

ভিতরে সার্চ-করা পুলিশ বেরিয়ে এসে জানায়, স্যার ভিতরে কেউ নেই। কিছু পাওয়া গেল না।

প্রণতিকে আবার প্রশ্ন—চিঠিপত্র পান ছেলের?

—মাঝেমধ্যে লিখত। গত কয়েকমাস আর চিঠি আসেনি।

—আপনারা খোঁজ করেননি?

— কোথায় খোঁজ করব?

— আপনি জানেন আপনার ছেলে কী করেছে?

—আপনারা যখন এসেছেন নিশ্চয় কিছু করেছে। আপনিই বলুন।

শাদাপোশাক বলে, আমি কলকাতা থেকে স্বাধীন চৌধুরীর খোঁজে এসেছি। হি ইজ এ ব্যাডলি ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল। এ মার্ডারার।

— কী বলছেন আপনি!

—ঠিকই বলছি। পুলিশ মেরে বিপ্লব করছেন। চারু মজুমদার, কানু সান্যালের নাম শুনেছেন?

—কখনও-কখনও কাগজে পড়েছি।

—আপনার গুণধর ছেলে পড়াশোনা শিকেয় তুলে খতমের রাজনীতিতে হাত পাকিয়েছে। উনি এলে বা কোনো খবর পেলে থানায় জানাবেন। মনে রাখবেন কোনো ক্রিমিনালকে আশ্রয় দেওয়াও অপরাধ।

পুলিশ-জিপের কর্কশ শব্দ ভিজে বাতাসে হারিয়ে গেলে যমুনা বলেন, টুনু, মাস্টার কিছু জানায়নি?

সুরেন বলল, টুনু তোর কোনো সন্দেহ হয় নাই?

প্রণতি বলল, সন্দেহের সুযোগ ছিল না সুরোদা, থার্ড ইয়ারের পরীক্ষার পর বাবাই নিজেই জানিয়েছিল, ও শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করছে। মাস্টারমশাই ওকে বোঝাবার অনেক চেষ্টাই করেছে। ও শোনেনি। তবে ফাইনাল দিয়েছিল।

যমুনা বললেন, তুই তো আমারে কস নাই!

— কী বলব, মা! তুমি কষ্ট পাবে শুধু-শুধু। তবে এখন যখন সব জানলে, মনকে তৈরি করো যে-কোনো কিছুর জন্যে।

— রোজই কাগজে দেখি সা-জোয়ান পোলাগুলারে পুলিশ নির্বিচারে মারতেছে। সোনার ছেলে সব— অকালেই—যমুনা চোখে আঁচল চাপা দেন।

—আশা করা যায় তোমার নাতি এখনও বেঁচে আছে। মাস্টারমশাই গোলমালের খবর পেলেই গিয়ে খোঁজ নেন। পুলিশ যখন ওর খোঁজে এত দূর এসেছে, তার মানে সে ধরাও পড়েনি।

সুরেন অবাক চোখে প্রণতির শান্ত স্থিতধী মূর্তি দেখছিল। যেন নিজের একমাত্র পুত্রের জীবনমরণের কথা নয়, ইতিহাসের কোনো সংঘর্ষের কথা পড়াচ্ছিল। বলল, টুনু, তুই এমন পাষাণ হলি ক্যামনে?

ম্লান হেসে প্রণতি বলল, জীবনের জন্য। বাঁচার জন্য। তা ছাড়া নিয়তির নির্দেশ তো আমি বদলাতে পারব না। বাবা গেছেন, স্বামী গেছেন, বাবাইও যদি—সংহত কান্নায় গলা বুজে আসে। উদ্‌গত আর্তনাদ আঁচলের দলায় ব্লটিংয়ের মতো শুষে নেয়।

সুরেন এগিয়ে এসে ওর মাথায় হাত রাখে।

যমুনা বুকফাটা চিৎকারে ভেঙে পড়েন। ওঁর হাত-পা কাঁপতে থাকে। সুরেন ওঁকে ধরতে পারার আগেই তিনি জ্ঞান হারান।

প্রণতি মা-র মাথা কোলে নিয়ে ডাকে, সুরোদা, একটু জল—

ওখান থেকে অনেক দূরে রানীবাঁধের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটছিল তিন জন যুবক। দু-জনের কাছে রিভলবার, এক জনের হাতে গ্রেনেড। বর্ষামেদুর সন্ধ্যার অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ

করে পুলিশের এক গোয়েন্দাকে খতম করে জঙ্গলের অভ্যন্তরের আস্তানায় পরবর্তী অ্যাকশনের পরিকল্পনায় বসেছিল স্থানীয় ইউনিটের সাত জন। জনবিরোধী সুদখোর ও লম্পট এক ভূস্বামীকে খতম করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ রাতেই আদিবাসীদের নিয়ে ওর বাড়ি ঘেরাও করে গণবিচারের পর তাকে খতম করা হবে। আলোচনার মাঝপথে বীরেন মুর্মু এসে খবর দেয়, পুলিশের এক বিশাল বাহিনী জঙ্গলের উদ্দেশ্যে আসছে। বাবাই শান্তি হাজরার নেতৃত্বে চার জনকে দিয়ে বলল, তোমরা তিন নম্বর ক্যাম্পে চলে যাও। আর অশোক ও তারাপদকে বলল, তোমরা চলো আমার সঙ্গে।

ছুটতে-ছুটতে ক্লান্ত তারাপদ বলল, কমরেড অনেক দূর চলে এসেছি। পুলিশ আর খোঁজ পাবে না। এখানে একটু জিরিয়ে নিই।

বাবাই বলল, ঠিক কোথায় এসে পড়েছি অন্ধকারে বুঝতে পারছি না। চলো আর একটু এগিয়ে চলো।

আরও কিছুটা যাওয়ার পর ওরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ে। বিদ্যুতের আলোয় আবছা অন্ধকারে অশোকই ঠাহর করে, দূরে যেন একটা জিপ। ও বাবাইকে বলল, কমরেড, লুক দেয়ার—ডেঞ্জার—

বাবাই এক পলক দেখেই বলল, টার্ন।

খোলা মাঠে ছুটন্ত ছায়া পুলিশের দৃষ্টি এড়ায় না। ওরা জিপ নিয়ে তাড়া করে। আবার জঙ্গলের কাছাকাছি হতেই গুলি ছোঁড়ার শব্দ হয়, বাবাই বলে, তারাপদ, চার্জ।

তারাপদ পর পর দুটো গ্রেনেড ছুঁড়ে জঙ্গলের ভিতরে ছোটে। মুহুর্মুহু গুলি তাড়া করে তিনজনকে। জিপের শব্দ এগিয়ে আসে। দূরের আলো দেখে বাবাই বুঝতে পারে ওরা জনপদের কাছাকাছি এসে গেছে। বাবাই, লেটস স্প্লিট নাউ। সাবধানে যাবে। কাল সকালে হাইড আউটে— বাই এইট। ওকে? দু-জনেই বলল, ওকে কমরেড।

বাবাই জঙ্গল থেকে বেরোবার আগে নিজেকে সামান্য পরিচ্ছন্ন করে। তার পর যেন বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে দ্রুত পা চালাচ্ছে এমন গতিতে চলতে থাকে। পিচরাস্তা পেরিয়ে সাঁওতাল গ্রামের পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে দেখে হেডলাইট জ্বেলে দ্রুত ছুটে আসছে একটা গাড়ি। ও একটা ঝুপড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিকট শব্দে হর্ন বাজিয়ে গাড়িটা — একটা ট্রাক — চলে যায়। ও আবার এঁকেবেঁকে চলতে থাকে। এবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। ও আন্দাজে বাজারের দিকে দৌড়োয়। বাজারের কাছেই বরদা চক্রবর্তীর বাড়ি। আজ রাতে সেখানেই ঠাঁই গাড়বে। ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। উঠতে গিয়ে টের পেল প্রবল ব্যথায় মাটিতে পা পাতাই কঠিন। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে কিছুটা যাওয়ার পর ব্যথা অসহনীয় হয়ে ওঠে। নিরুপায় হয়ে নিকটবর্তী বাড়ির বারান্দার এক কোণের অন্ধকার আড়ালে পা ছড়িয়ে বসে। হাত দিয়ে বুঝতে পরে গোড়ালি ফুলে উঠেছে। উপশমের ব্যবস্থা না করে আর চলা সম্ভবই নয়।

একটা শিশুর কান্না বাড়ির ভিতর থেকে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে নারীকণ্ঠে শিশুকে শান্ত করার অব্যয়ধ্বনি বাজে। কোনো পুরুষশব্দ বোঝা যায় না। বাবাই জুয়াখেলার ঝুঁকি নিয়ে দরজায় কড়া নাড়ে।

— কে?

—দয়া করে দরজাটা খুলুন। একটু সাহায্য দরকার—ভীষণ যন্ত্রণা—

—কে আপনি? এত রাতে—

—আমি আর চলতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে—প্লিজ, আমাকে একটু গরম জল যদি দেন—

বাবাইয়ের নম্র পরিশীলিত উচ্চারণের আন্তরিকতা ও কণ্ঠে ফুটে ওঠা যন্ত্রণার আর্তি সম্ভবত মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল অচেনা রমণীকে। বারান্দার আলো জ্বেলে দরজা খুলে বাবাইকে দেখেই চরমতম বিস্ময়ে স্তম্ভিত উচ্চারণ করে—তুমি! ঝড়বৃষ্টির উচ্ছৃঙ্খল রাতে, এত বছর পর, বাঁকুড়ার এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে বঙ্গাইগাঁও রেল কলোনির দৃপ্ত যুবতী তরলাকে আবিষ্কারের দূরতম কল্পনাও ছিল না।

অভাবনীয়ের চকিত চমকে পায়ের যন্ত্রণাও বিস্মৃত হয় ক্ষণিক। চোখের আলোয় নির্ভুল চিনে পরম মুগ্ধতায় বাবাই বলে, তুমি! এখানে?

— এসো, ভেতরে এসো। কোথায় যন্ত্রণা?

— পায়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

পায়ে হাত দিয়ে ফোলা পরখ করে তরলা বলল, বসো। গরম জল আনছি।

কুশন-চাপা নরম চেয়ারে বসে বাবাই ঘরের পারিপাট্য লক্ষ করে। সচ্ছলতা ও সুরুচির সম্মিলনের পরিচয় অবারিত। এক দেয়ালে শ্মশ্রুগুম্ফময় পরিচিত রবীন্দ্রনাথের ছবি। অন্য দেয়ালে জাতির জনকের ফোকলা হাসি। সেন্টার টেবিলের সিনেমা পত্রিকার প্রচ্ছদে লাস্যময়ী জীনত আমন। স্বল্পাবৃত বক্ষবৈভবের আকর্ষণ দুর্বার। বিপ্লবী চোখেও মানুষের আদি মৌলিকতা অবিকল।

বড়ো বাটিতে নুন গরমজল এনে তরলা বলল, পা ডোবাও। অন্য বাটিতে ঠান্ডা জল। ঠান্ডা-গরম ঠান্ডা-গরম লাগাও। আমি দেখি ঘরে ওষুধপত্র কী আছে। ভেজা জামা খোলো। তোয়ালে দিচ্ছি, মাথা মুছে নাও। যা ভিজেছ, ঠান্ডা না লেগে যায়।

বাবাই নিজের শুশ্রূষায় মগ্ন হয়। একটু পরে তরলা একটা ছোটো বাক্স হাতে এসে বলল, দেখছি ব্রুফেন আছে আর এই অয়েন্টমেন্ট। লাগিয়ে দ্যাখো।

ভিতরের ঘর থেকে লুঙ্গি আর শার্ট নিয়ে এসে তরলা দেখে বাবাই জামা খুলে গা-মাথা মুছে গোড়ালিতে একাগ্রে অয়েনমেন্ট লাগাচ্ছে। ঝুঁকে-থাকা বাবাইকে ছবির বইতে দেখা অ্যাডনিস সর মতো লাগে। সুগঠিত পেশি থেকে ঠিকরে পড়ছে পিছল আলোর কণা। মুখের রুক্ষ রেখা মনোহর দার্ঢ্য। বাবাই মুখ তুলতেই তরলা বলল, এগুলো পরে নাও। পোশাক বদলে বাবাই ব ল, তোমাকে এসে ইস্তক কত ভোগাচ্ছি। অথচ আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোম রস্বামী কোথায়? —বাবার অসুখের খবর পেয়ে দেশে গেছে—শিলচর। কালই ফিরে আসবে। —আ মতো শুনেছিলাম তোমরা দিনাজপুর না মালদা কোথায় যেন ছিলে—অবশ্য তা অনেকদিন আগে। এখানে ত দিন?

—ওর তো ট্রানসফারের চাকরি। বদলি লেগেই আছে। এখানে বছরদুয়েক হল। তোমার কথা বলো। তুমি এত রাত্রে এখানে কী করছিলে?

—আমি এক জনের সাথে দেখা করব বলে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টির জন্য দেরি হল। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে তোমার দরজায় ভিক্ষার্থী—অবশ্য না জেনে।

—ব্যথা কমেছে?

— মাচ বেটার।

—নিশ্চয় কিছু খাওনি। বসো, ভাত চাপিয়ে আসছি।

— এত রাতে আর কিছু করতে হবে না। বৃষ্টি ধরলেই আমি চলে যাব।

—কী মুশকিল! আমিও তো খাব আর এখন চলে যাবে মানে?

—তোমার স্বামী নেই এখানে— তা ছাড়া আলো ফোটার আগে আমাকে তো যেতে হবেই। বাচ্চার কান্না শুনছিলাম—ক-টা বাচ্চা তোমার?

—দুটি। দুটোই মেয়ে। ওদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিজের ব্যবস্থার জন্য যাচ্ছিলাম। তখনই—

খেতে বসে বুঝতে পারে বাবাই, ক্ষুধার তীব্রতা কী প্রবল ছিল। ডাল, আলুপোস্ত আর পোনা মাছের ঝোল দিয়ে পরিপাটি খেল। এভাবে ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিচিত নারীর প্রীতিময় অন্তরঙ্গতার স্বাদ খুঁটে খাওয়ার স্মৃতিও ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। বরদা চক্রবর্তী বা পশুপতি বাগের মতো সমর্থকদের বাড়িতে কখনও-কখনও আশ্রয় মিললেও মনের মধ্যে সন্ত্রস্ত উদ্বেগ থাকেই। পুলিশের নজর নখের আঁচড়ের মতো পড়তে পারে যে-কোনো সময়ে। আজ রাতে এখানে সেই দুশ্চিন্তা নেই। আজ অন্তত এ-বাড়িতে ওর খোঁজে পুলিশ হানা দেবে না আশা করা যায়।

খাওয়া সেরে বাবাই দেখে পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছে তরলা। ওর ভেজা শার্ট-প্যান্ট পাখার হাওয়ায় শুকোচ্ছে। কোমর থেকে রিভলবার বার করে বালিশের নীচে রাখল। এটা দেখলে তরলার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ও সন্দিহান। বিছানায় বসে জানলা দিয়ে ঝামর বাতাসের ছোঁয়া পেল। উঠে জানলা বন্ধ করে বাবাই। আবার বসতেই মনে হল, শরীর নিদ্রা দাবি করছে। কিন্তু খুব ভোরে উঠতে হবে। বাবাই নিজের মস্তিষ্কে অ্যালার্ম বসায়— মনে মনে বার বার উচ্চারণ করে, ভোর চারটে, ভোর চারটে।

জলের গ্লাস নিয়ে এল তরলা। মাথার কাছেই ছোটো টেবিলে গ্লাস রেখে তরলা বলল, ওষুধ খাবে আর? টেবিলে রাখা আছে।

বাবাই বলল, দেখেছি। দরকার হলে নেব। শোনো, এখানে বসো। তোমাকে দুটো কথা বলার আছে। এ-ঘরে কোনো চেয়ার নেই। তরলা বিছানার এক ধারে বসে বলল, কী বলবে?

বাবাই ওর বাঁ হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বলল, কেউ কখনও জিজ্ঞেস করলে কিছুতেই বোলো না স্বাধীন চৌধুরী তোমার এখানে এসেছিল বা স্বাধীন চৌধুরীকে তুমি চেনো। আমার ধারণা অন্ধকারে এখানে ঢুকতে কেউ আমাকে দেখেনি। তোমার প্রতিবেশীদের ঘরও বেশ দূরে। তবুও যদি কেউ প্রশ্ন করে কী জবাব দেবে ভেবে রেখো।

— ওসব নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। কিন্তু বাবাই, তুমি এখনও এই ভয়ংকর লাইনে চলবে। মা-দিদার কথা একটুও ভাববে না!

— দ্যাখো, আমার আর ফেরার উপায় নেই। ইচ্ছেও নেই। অনেকটা হিন্দি সিনেমার অন্ধকার জগতের মতো। হয় আমার দল আমাকে মারবে, নয়তো পুলিশ। কিন্তু আমি মরব না। আই শ্যাল ফাইট ইট আউট! এক দিন তো মরবই— সব মানুষের মতো। আমার সংকল্প সেদিন যেন প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি—'All my life and my strength were given to

the first cause of the world— to the liberation of mankind.' নিকোলাই অস্ট্রোভস্কির এই অমর কথাগুলো আমাকে প্রতিদিন অনুপ্রাণিত করে।

—আমরা সাধারণ মেয়ে। আমরা যে প্রিয়জনের জন্য ভয়ে মরি। দেখেছ তো তোমার বাবা-দাদুর মৃত্যু তোমাদের কী অসহায় দুর্বিপাকে ফেলেছিল!

বাবাইয়ের দিকে সরে এসে ওর বাহু ধরে তরলা বলল, কথা দাও, তুমি সাবধানে থাকবে। কথা দাও।

বাবাই হাসে— ইচ্ছে করে কেউ কি অসাবধানী হয়!

তরলা বলল, সবি কত দুঃখ করছিল। বি.এস.সি.-তে অত দারুণ রেজাল্ট করেও আর পড়লে না!

—সবিদির সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?

—ওর বিয়েতে।

—সবিদির বিয়ে হয়ে গেছে?

—বছর ঘুরে গেল। তুমি জানতে না?

—সন্ন্যাসীর মতো আমাদেরও পূর্ব জীবনের হাতছানি ভুলে যেতে হয়।

— কই, আমাকে তো ভোলোনি!

—ভুলে ছিলাম। তবে দেখতেই সব মনে পড়ল। তা ছাড়া, আমার কাছে তুমি ভেরি স্পেশাল। তুমিই আমাকে সত্যিকারের পুরুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছ। আই ক্যান নেভার ফরগেট দ্যাট!

বাবাইয়ের ওষ্ঠে ডানহাতের তর্জনী রেখে তরলা বলল, এভাবে বোলো না। আমি যা করেছি সে সবই ভালোবাসার তাড়নায়।

—এখন?

—এখনও তোমাকে ভালোবাসি, আমার নিজের মতো করে। এ তো আমার সারা জীবনের পারিতোষিক।

— তোমার স্বামী— সংসার—

— তারা আছে তাদের নিজেদের জায়গায়। তুমি তোমার স্বভূমে। সেখানে কোনো বিরোধ নেই! কোনোদিন বিয়ে করলে বুঝবে, স্বামীরা ভালোবাসা চায় না। চায় সেবা, শরীর আর আনুগত্য।

বিছানা থেকে নামার উদ্যোগ করে তরলা বলল, রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়ো। আমি যাই।

বাবাই হ্যাঁচকা টানে তরলাকে বুকে চেপে ধরে ওষ্ঠে প্রগাঢ় চুম্বন করে। চুম্বনে-চুম্বনে তরলার ঘাড় গলা, গালে ফুটিয়ে তোলে অসংখ্য অদৃশ্য শিহর-মঞ্জরি। বুকে হাত দিয়ে দেখে আগের তুলনায় নম্র হলেও এখনও সুডৌল। বাবাই ব্লাউজের হুকে হাত দেয়। তরলা বলল— আলোটা নেভাও।

পরে বিধ্বস্ত মথিত তরলা নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বাবাইয়ের চুলে হাত বুলিয়ে বলল, সত্যিকারের ডাকাত একটা।

বাবাই বলল, তোমার স্বামীর নাম তো বললে না!

তরলা বলল, মিহির বসাক।

শুনেই অন্ধকারে ঝিম ধরা বুকে শুয়ে থাকে বাবাই। এই নাম রয়েছে খতমের তালিকায়। ভোর চারটেয় চলে যাওয়ার সময় টেবিলে এক লাইন লিখে রাখে—মিহির বসাককে এক সপ্তাহের মধ্যে এখান থেকে চলে যেতে বলবে।

১৫.

পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের সৃষ্টি স্বভাবতই স্বাগত ছিল ভারতের মানুষের কাছে। বিশেষত তারা একে দেখেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধজয়ের কীর্তি রূপে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের সপ্তাহ-তিনেকের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঐতিহাসিক জনসভায়, লক্ষ মানুষের সঙ্গে উদয়নও শোনে, উদাত্ত ভাষণ : 'আমার বাংলা— তিতুমিরের বাংলা, আমার বাংলা—সূর্যসেনের বাংলা, আমার বাংলা সুভাষ বসুর বাংলা, ফজলুল হকের বাংলা, সোহরাওয়ার্দির বাংলা'। তিনি আজও বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আমাদের দুই দেশেরই আদর্শ। এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে আমাদের দুই দেশের মৈত্রী। এই মৈত্রীতে ফাটল ধরানোর ক্ষমতা বিশ্বের কোনো শক্তিরই নেই।'

বুকে ঘুলিয়ে ওঠা রোদনবিধুর শ্বাস গোপন করে উদয়ন ভাবল, এই বিশ্বাসের কথাগুলো দেশভাগের আগে কেন বলা গেল না? যদি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে বাস্তবায়িত করা যেত তবে বারে বারে লক্ষ-লক্ষ মানুষের অনির্ণীত অবহেলিত আহুতি অনিবার্য হত না। আজ যা বললেন তারও পরমায়ু কতদিন? জনতার স্মৃতির অনুরূপ রাজনৈতিক বিবৃতিও ক্ষীণজীবী।

মাসখানেকের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধি ঢাকা সফরে গিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পঁচিশ বছরের মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তির এক ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন। জাত্যাভিমানের উগ্র আহ্লাদে দেশ আলোড়িত।

এমত আবহে পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে কংগ্রেস রিগিং, জাল-জোচ্চুরি ও পেশিশক্তির নগ্ন প্রদর্শনী করে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনায় সফল হয়। প্রহসনে পরিণত নির্বাচনে ক্ষমতাশীল হয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রীর শিরোপা ধারণ করলেন। অচিরেই দেশবন্ধুর দৌহিত্র, রাজ্যে আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদলিত করার সার্থক রূপকাররূপে বিখ্যাত হলেন।

নকশাল নিধন ও সেই অজুহাতে নিষ্ঠাবান বামপন্থীদের দমন নিপীড়ন অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারণে—মতাদর্শ, চিনা লাইনের ভুল অনুধাবন, খতমের রাজনীতির অবমূল্যায়ন ইত্যাদির ফলে সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর মধ্যে দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। জুলাই মাসে চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর পার্টি বহুধা বিভক্ত এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে সন্দেহ করে। কিছু দুর্ভাগ্যজনক অন্তর্ঘাতের ঘটনাও ঘটে। মাসে-মাসে জেল ভেঙে পালানোর প্রয়াস চলে। আরও মৃত্যু, আরও জেল, আরও নিগ্রহ। উপর্যুপরি অসফলতা সত্ত্বেও নকশালপন্থীরা জেল ভাঙার তত্ত্বকে রাজনৈতিক লাইন হিসেবে অনুসরণ করেছে। তাদের আদর্শ ছিল চারু মজুমদারের বাণী—'রক্তঝরা পথই তো একমাত্র বিপ্লবের পথ। মানুষের মুক্তির জন্য মূল্য দেব না, এ তো হতে পারে না'।

জেল ভাঙার ঘটনা ঘটে আর উদয়ন ছুটে যায়—মেদিনীপুর, বহরমপুর, শিলিগুড়ি, বর্ধমান। বাবাইয়ের সন্ধান নেই। এখন কারুকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। প্রণতি বারবার লেখে, আপনি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবেন। কী জানাবে উদয়ন? নো নিউজ ইজ গুড নিউজ?

পুলিশ বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করার পর প্রায় প্রত্যহ কোনো না কোনো বিড়ম্বনার মুখে পড়েছে প্রণতি। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা যমুনাকে নিয়ে। সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, আর সুস্থ হচ্ছেন না। ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রামে থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন মানসিক প্রফুল্লতা অত্যাবশ্যক। মেয়ের বিরুদ্ধে যমুনার তীব্র অভিমান। এত দিন ধরে বাবাইয়ের বিষয়ে অনৃত ভাষণ করেছে। মরণ-খেলায় মাতা ছেলের সম্পর্কে সব জেনেও কিছু না বলে নিজেই তার যন্ত্রণাভার বহন করেছে একাকী। এখন বুঝতে পারেন যমুনা, প্রণতি কেন এত চুপচাপ হয়ে গেছে। মুখের প্রাণময়তা উধাও। বুঝতে পারেন বলেই, বুকের মধ্যে গুরুগুরু করে ভয়ংকর শঙ্কা। ষাট পেরিয়েছেন। তাঁর সময় ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু বাবাই যদি অসংখ্য তেজি যুবকের মতো হারিয়ে যায়, প্রণতি কীভাবে অনন্ত শূন্যতাদীর্ণ জীবনের সাহারা প্রান্তর পরিক্রমা সাঙ্গ করবে! মা ডাকার কেউ থাকবে না— জীবনের একটা পর্যায়ে তা গ্রাহ্য। মা বলে ডাকারও কেউ থাকবে না—নিয়তি এতই নিষ্করুণ হবে প্রণতির প্রতি? এই দুর্ভাবনা যমুনার গভীরতম অনুভবে খাঁড়ি কাটে ক্রমাগত। আপন অভিজ্ঞতায় জানেন, সন্তান আসলে দেহের বাইরে হৃৎপিণ্ডের চিরপদচারণা।

প্রতিবেশীদের কৌতূহলও অসীম। দেবেন বসুমাতারি মাঝেমাঝেই এসে খোঁজ নেন। নীরজাও আসে। ওর বিশ্বাস হতে চায় না যে বাবাই এমন ভ্রান্ত পথের যাত্রী। এমন ভালো ছেলের মতিভ্রম হয় কীভাবে। বাবাইয়ের নোটস পড়ে ও অভাবনীয় ভালো রেজাল্ট করেছিল। বি. এ. পাসও করা হয়ে গেছে। কলেজে ভরতি হওয়ার পর বাবাই কলকাতা থেকে তিন বার এসেছিল। নীরজার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বার দুয়েক। নিজের সাফল্যের সংবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল নীরজা।

বাবাই বলেছিল, থ্যাঙ্ক ইউ বলাটা আমাদের দেশের প্রথা ছিল না। সাহেবদের কাছ থেকে অনুকরণ করেছি। তবে তোমার মুখে শুনতে ভীষণ কেঠো আর বানানো লাগে।

নীরজা বলেছিল, ম্যয় অন্তরর পরা কইয়াছু।

—আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে।

— কেন?

—আন্তরিক হলে উপহারস্বরূপ একটা চুম্বন তুমি নিশ্চয় দিতে পারতে।

—ধ্যাত। তুমি দেখুন বেয়া বেয়া কথায়ে কও।

এখন কোনো সন্ধানহীন বাবাইয়ের কথা ভাবলে নীরজার বুকে অন্তর্লীন যন্ত্রণার নির্ঝর বয়ে যায়। মনে হয়, ওর ওই সামান্য আবদারে সম্মতি জানালে কী এমন ক্ষতি হত। সহসা ওর বিয়ে হবে। বাবাইয়ের সঙ্গে এ-জীবনে আর দেখাই হবে না হয়তো।

এইসব বিষণ্ণ মুহূর্তে নীরজা আসে প্রণতির কাছে। দুজনে নিশ্চুপ বসে থাকে। চিনাবাদামের খোসা ভাঙার মতো দু-চারটে শব্দ বিনিময় হয়। দুই নারীর প্রাণে রণিত একই ভাবনা, শব্দ ও

শঙ্কা আচ্ছাদিত করে রাখে হিমাদ্রি নীরবতা।

মাঝে মাঝেই পুলিশ আসে। কোনো খবর পাওয়া গেল? চিঠি এসেছে? কোথায় আছে এখন? নাস্তিবাচক উত্তর তাদের খুশি করে না। বিদ্বিষ্ট মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে শাসানো উচ্চারণে, অশালীন ব্যবহারে। প্রণতির স্তব্ধতা বাড়ে। মনভূমে আরও শীতলতা। এবং কাঠিন্য।

প্রণতিকে বলা বৃথা জেনে সীমা যমুনাকে বলে, মাসি, গড়বেতায় এক জন খুব ভালো গণৎকার আছেন। উনি ঠিকুজির ছক গুণে বলে দিতে পারেন হারানো মানুষ কোথায় আছে। চলো, একবার দেখিয়ে আসি।

যমুনা বলেন, টুনুকে বলেছিস?

সীমা বলে, ওকে বলা তো অর্থহীন। পাত্তাই দেয় না। বলে ওসব নাকি বুজরুকি।

যতদিন সুরেন ছিল, সীমা সুরেনকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে এসেছে। পবিত্রকে কামাখ্যা পাঠিয়ে তান্ত্রিক জ্যোতিষীর কাছে বাবাইয়ের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করেছে। সবাই প্রভূত আশার বাণী শোনালেও আশাব্যঞ্জক কিছু ঘটেনি।

প্রণতি বলল, সীমাদি, এত তো ঘোরাঘুরি করলে। এখনও বিশ্বাস কর এরা বুজরুক নয়?

—সবাই নিশ্চয় নয়। বুজরুক হলে এত মানুষ যাবে কেন ওদের কাছে!

—কেন যায় জানো? অজ্ঞতায়। অন্ধ বিশ্বাসে। সত্যকে স্বীকার করতে না-পারার অক্ষমতার দুর্বলতায়।

— তুই বলছিস, সবাই মিথ্যে বলে!

— জানি না। তবে এটা জানি, মিথ্যার প্রবল গতি, তবে সত্য ঢের বেশি টেকসই।

তবু যমুনা হয়তো কিছু মানসিক শান্তি পেতেন। অথবা ভাবতেন সক্রিয় প্রচেষ্টা আছে বাবাইয়ের খোঁজের জন্যে। তাঁর বিবেচনায় বিপ্লবনিষ্ঠ বাবাই আর এক নিরুদ্দিষ্ট যুবকের অনুসন্ধান কর্ম প্রায় একই। সুরেন চলে যাওয়ায় আপাতত মন্দির, আশ্রম, আখড়ায় ছোটাছুটি বন্ধ।

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি সম্পাদনের এক মাসের মধ্যেই সুরেন ফিরে যায় দেশে। যমুনাকে বলে, গিয়ে দেখি জমিজায়গার বিলি-ব্যবস্থা করতে পারি কি না। এবারে সব গুটিয়ে চলে আসা। কবে সে আসবে, আদৌ আসবে কি না— তা নিয়ে ভাবে না প্রণতি। জীবনের অনিবার্যতা নীরবে মেনে নেওয়ার সহিষ্ণু মানসিকতা এখন আয়ত্তাধীন।

ফাদার জোনস সাহস জোগান, সান্ত্বনাবাক্য বলেন। তিনি এক বিপুল আশ্রয়। ইদানীং তাঁরও কণ্ঠে কখনও-কখনও সংশয়ের ও সন্দেহের আভাস। বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পর যারা এসে অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে ঠাঁই গেড়েছিল, তারা অনেকে আর ফিরে যায়নি। অনেকে দু-দিকেই আস্তানা রেখে আসা-যাওয়া করছে। নতুন অনুপ্রবেশও ঘটছে। এদের বৃহদংশই মুসলমান। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্থানীয় মানুষের অসন্তোষ। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের আবেগ মুছে গিয়ে ধূমায়িত হচ্ছে ভিন্নতর ক্ষোভ। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে আয়োজন চলছে আর-এক গণবিক্ষোভের সূচনার। সমতল অসমের সঙ্গে-সঙ্গে আদি জনজাতির মধ্যেও বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাবের বিকাশ ঘটছে।

ফাদার বলেন, দেশের একটা অঞ্চলে নকশালবাড়ির মতো ঘটনা ঘটলে তার ঢেউ অন্যত্রও পড়বে। তবে তার রং, রূপ একরকম নাও হতে পারে। তেলেঙ্গানায় যা হচ্ছে তা হয়তো

এখানে হবে না। মেঘালয় বা অরুণাচলের মতো কিছু ঘটা অসম্ভব নয়।

প্রণতি শোনে, সঠিক অনুধাবন করতে পারে না। বস্তুত কাজের বাইরে ওর সমগ্র সত্তায় শুধু একটি স্বরগুঞ্জন—বাবাই, ফিরে আয় বাবা। এক একবার ভাবে কলকাতায় যাবে। পরে নিজেই প্রশ্ন করে, কী হবে গিয়ে? কারুকে চেনে না, জানে না। সেই উদয়নের উপরই নির্ভর করতে হবে। বরং উদয়ন ভাবতে পারে, ওর উপর আস্থা হারিয়েছে প্রণতি। তাই নিজে এসেছে। অবুঝ মনে তবুও জিজ্ঞাসা উঁকি দেয়, মাস্টারমশাই সঠিক চেষ্টা করলে কি একটা খবরও সংগ্রহ করতে পারতেন না? তিনি তো স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনৈতিক কর্মী, তাঁর জানাচেনার পরিধিও বিপুলায়তন। তবুও পারছেন না? এই মানসিক অবস্থায় প্রণতি আবার লেখে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বারংবার একই কথা লিখে আপনাকে বিরক্ত করছি। আমার পক্ষে লজ্জা স্বীকার বা ক্ষমা ভিক্ষা করাও আর সম্ভব নয়। কেন না সেসবও বহু ব্যবহৃত, বহু উল্লিখিত। তবুও আমি নিরুপায়। কলকাতায় আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। প্রকৃতপক্ষে আপনার ভরসাতেই বাবাইকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছিলাম। না, আমি কোনো অভিযোগ করছি না। করতে পারিও না। এও জানি ওর জন্যে আপনি যেমন যথাসাধ্য করেছেন, এখন ওর খবরের জন্যে তার চেয়েও ঢের বেশি করছেন। তবে তা যে যথেষ্ট নয় তা লেখার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বলতে পারেন, এই অভাগিনী মা কী করবে!

আপনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। দেশের মানুষের মুক্তির জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, দীর্ঘ কারাবাসের কষ্টসহিষ্ণুতার প্রমাণ দিয়েছেন। আমি অতি নগণ্য এক সাধারণ নারী, অভীষ্ট পূরণের লগ্নেই পতি ও পিতৃহারা হয়ে দেশান্তরিত। স্বাধীন দেশের মাটিতে থেকেও রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তির আস্ফালনে চাক্ষুস করতে বাধ্য হলাম আপন গৃহদাহ। পদচ্যুতির অনুগ্রহে পুনরায় বাস্তুচ্যুত। উৎখাত শাসককুলের এক প্রতিভূর বদান্যতায় পুনর্বার পায়ের তলার ভূমি সন্ধান করে একমাত্র পুত্রকে শিক্ষিত স্বাবলম্বী সজ্জন করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। তখন মানুষের মুক্তির সংকল্পে 'ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে/ছেলে গেছে বনে'। একটু বোঝাবেন, আপনারা তবে কোন্ মুক্তির তপস্যা করেছিলেন? তা কি অসম্পূর্ণ ছিল? অসম্পূর্ণ ছিল বলেই বাবাইয়ের মতো অসংখ্য ছেলে আত্মাহুতি দিচ্ছে? তা হলে কী আপনাদের অর্জন? কোন্ অনিবার্যতার কারণে আপনারা ত্যাগ করেছিলেন মানুষের মুক্তিসংগ্রামের পতাকা— যা খুঁজতে বেরিয়েছে এখনকার দিশেহারা ধৈর্যহারা তরুণ যুবকেরা? একটু বলবেন, ১৫ আগস্ট ঘটা করে যে-পতাকা উত্তোলন হয় সেটা আসলে কী? শুধুই তিনরঙা এক টুকরো কাপড়!

আপনি আমাকে বারাসাত, বেলেঘাটা, বরানগর-কাশীপুরের গণহত্যার কথা জানিয়েছেন। খবরের কাগজেও পড়েছি কিছু কিছু। হাজার-হাজার বন্দি যুবকের কথাও। আমার জানতে ইচ্ছে করে, স্বাধীন ভারতের বুলেটগুলি কি তেরঙা? হাতকড়াতেও নিশ্চয়ই তেরঙার অভিচার উৎকীর্ণ?

শেষ অনুরোধ—যদি কোনোমতে বাবাইয়ের দাহক্ষেত্র বা কবরের সন্ধান করতে পারেন, সেখানকার এক মুঠো ছাই বা মাটি অনুগ্রহ করে, আপনার অসীম দয়ায়, পাঠাবেন। এ ছাড়া এই হতভাগিনী আপনার কাছে আর কী প্রার্থনা করতে পারে!

আমার স্পর্ধা ও মূর্খতাকে ক্ষমা করবেন।

চিঠিটা পড়ে উদয়ন রুদ্ধবাক। জবুথবু। মনে হয় সারা জীবনের অতলান্ত বিফলতার নগ্ন ভ্রূকুটির সম্মুখে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। প্রণতির উপর রাগ বা বিরূপতার বদলে ঋদ্ধ চেতনার জন্য জাগে শ্রদ্ধা। নিজেকে আত্মাবলোকনে বাধ্য করায় মনে-মনে ধন্যবাদ জানায়। যুগপৎ এও উপলব্ধি করে, প্রণতির জিজ্ঞাসাবলীর যথাযথ জবাব ওর অনায়ত্ত।

গতকালই উদয়ন কৃষ্ণনগর থেকে ফিরেছে। সেখানে জেল থেকে কয়েকজন নকশালবন্দি পালাবার চেষ্টা করে। কয়েকজন পালাতেও পারে।

পলাতকের তালিকায় বাবাইয়ের নাম নেই। ওই জেলেই কখনও যায়নি বাবাই। একমাত্র নিহতের নাম, কালিপদ সাহা। বিছানায় শুয়ে উদয়ন ভাবছিল, নামটা স্বাধীন চৌধুরী হলে কার কাছে ভস্ম ভিক্ষা চাইত!

ভবতোষ কর উদয়নকে শোওয়া দেখে অবাক হয়ে বলল, কী অইল সরকার মশয়, শরীলটা খারাপ?

চোখ-চাপা হাত না-সরিয়ে উদয়ন বলল, না। শরীর ঠিক আছে।

—অ! মন খারাপ! পোলাডার লাইগা আর কত দৌড়ঝাঁপ করবেন।

ডি.এস.পি. রূপক ভৌমিক উদয়নকে বলেছিল, আপনার অনুরোধে আমি সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছি। স্বাধীন চৌধুরী ধরা পড়েনি এখনও। তবে হি ইজ ভেরি মাচ ওয়ান্টেড বাই পুলিশ।

তবু আশ্বস্ত হতে পারে না উদয়ন। ধরা পড়ে বাবাই অন্য নাম বলতে পারে। পার্টি ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন নাম ব্যবহার করে। উলিয়ানভ যেমন লেনিন।

ভবতোষ আবার বলে, আচ্ছা, এট্টা কথা কন দেহি, বিদ্যাসাগরের মুন্ডু কাইট্যা, লাইব্রেরির বই পুড়াইয়া কোনো বিপ্লবের কী ঘন্টা করতাছে এরা। শুদুমুদু মায়ের কোল খালি হইতাছে। সিদ্ধার্থ রায় তো জোয়ান পোলাগুলারে নির্বাণ দ্যাওনের লাইগা বুদ্ধদেব হইয়া বইসেন। উদয়ন বলল, আমি ওদের সহযাত্রী নই। কিন্তু ওদের স্বপ্নটা আমারও। তেরঙ্গা ওড়ানোর উল্লাস দিয়ে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার ও বুভুক্ষার আর্তনাদ ভোলাতে চাইছে যারা, তাদের সংবিৎ ফেরাবার চেষ্টায় আত্মবলি দিচ্ছে এই যুবকেরা। যৌবনের উপজীব্য স্বপ্ন। স্বপ্ন হারানোর শূন্যতার আকাল যেন ওই দেশে কখনও না আসে।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তং
হতশ্চেন্মন্যতে হতম।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে

হন্তা ও হত মনে করে তারাই মারছে ও মরছে। কিন্তু আত্মা মারেও না, মরেও না।

আমার কাছে আত্মাই স্বপ্ন।

১৬.

বীরভূম-মুর্শিদাবাদের পুলিশ চিরুনিতল্লাশি চালাচ্ছে স্বাধীন চৌধুরীর জন্য। এই অঞ্চলের বহু নেতা ও কর্মীকে খুন ও বন্দি করার পরও 'খতমের অভিযান' অব্যাহত। পার্টির নির্দেশে এই

অঞ্চলে এসে মতপার্থক্যে বহুধাবিভক্ত বিভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে গেরিলা সংগ্রামের কাজ এগিয়ে নেওয়ার ব্রতে নেতৃত্ব দিচ্ছে স্বাধীন চৌধুরী। পুলিশের চোখ ও বন্দুকবাহী হাত এড়িয়ে পৌনঃপুনিক সফল 'অ্যাকশন' সংগঠিত করতে পারায় স্বাধীন চৌধুরী যত দলের কর্মী ও কৃষিবিপ্লবীদের প্রাণের মানুষ হয়ে উঠেছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়েছে পুলিশের লক্ষ্য।

ইতিমধ্যে মাটির তলায় সফল আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে আরও একবার বিচারবুদ্ধিবিবর্জিত জাত্যাভিমানের প্লাবন সৃষ্টি করেছে। ভারতও পারে— প্রমাণ হল। আমেরিকার সমকক্ষ হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। আমেরিকা অবশ্য বলল, চীন যেহেতু আণবিক শক্তিধর, ভারতকে এটা করতেই হত। এশিয়ার প্রভুত্বের জন্য এই অতিরিক্ত পেশিশক্তি অনিবার্য। ভারতের সরকারি বক্তব্য হল— এই পরীক্ষা শুধুই শান্তিপূর্ণ উপযোগের জন্য।

দলীয় সভায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। মানুষের মনে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে বিভ্রান্ত জনগণকে চীন-পাকিস্তান বিরোধী বটিকা সেবনে উদ্বুদ্ধ করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা চলে না। চীন-বিরোধী যে-কোনো বক্তব্য বা কর্মসূচির বিরোধিতা করা হবেই। স্বাধীন বলল, আমি এই বাজি ফাটানোর খেলাকে কোনো গুরুত্ব দিতে চাই না। যে গুন্ডাটা এত দিন হকিস্টিক আর সাইকেলের চেন দিয়ে মাস্তানি করত, সে হাতে একটা পিস্তল পেয়ে শূন্যে গুলি ছুঁড়ছে যাতে ওকে ছায়ার চেয়ে বড়ো দেখায়। আসলেই কি তা হয়?

সভায় দীপঙ্কর সাহা, পরিমল রায়, পরিতোষ পাইন, দুলাল বাগদীর সঙ্গে ছিল অমৃতা সোম, স্বরূপা ভট্টাচার্য, অতসী হেমব্রম।

অতসী বলল, কমরেড, হরিনাথপুরের ডাক্তার জগন্নাথ চট্টরাজ ভয়ানক অত্যাচার চালাচ্ছে। বিশেষত ট্রাইবাল মেয়েদের উপর।

—গণ আদালত বসিয়ে বিচারের ব্যবস্থা করো। যত শীঘ্র সম্ভব। —স্বাধীন বলল।

—আপনি উপস্থিত থাকবেন?

—নিশ্চয় চেষ্টা করব।

অমৃতা জানায় মহিলা কর্মীদের অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

স্বাধীন বলল, থিয়োরিটিক্যাল শিক্ষা দাও। প্র্যাকটিক্যাল দেওয়ার মতো গুলি-সম্পদ আমাদের নেই। আর তাতে পুলিশের নজর এড়ানো কঠিন হবে। আপাতত নিঃশব্দে কাজ করে যাও।

দুলাল বলল, কমরেড, আমাদের মহল্লায় খোঁচড়ের বড়ো আনাগোনা চলছে।

—কেন?

—স্বাধীন চৌধুরীর খবর চাই।

—খোঁচড়টিকে খতম করো।

মিটিং সেরে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে অমৃতা বলল, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল। ব্যক্তিগত।

স্বাধীন বলল, বলো।

—কমরেড স্বাধীন চৌধুরী নয়, আমি বাবাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আমি কি দুটো আলাদা মানুষ?

— দুটো না, অনেকগুলো। প্রতিদিনই আমি এক নতুন তোমাকে দেখতে পাই।

মৃদু হেসে স্বাধীন বলল, তোমার কি শরীর খারাপ?

— কেন?

— তোমার গলায় যেন রোমান্টিক মিড়ের আভাস।

— রোমান্টিক না হলে কেউ বিপ্লবী হতে পারে না। বিপ্লব-চেতনার ঋত্বিক রোমান্টিকতা।

— তর্ক করব না। বলো, কী বলার আছে।

— বলছি তুমি নিজের সুরক্ষার-নিরাপত্তার ব্যাপারে বড়ো কেয়ারলেস। শত্রু এখন শুধু বাইরে নয় ভিতরেও। অথচ মুখোশ পরা। তাই বিপদ আরও বেশি।

— জানি। টুডু আমার সঙ্গে থাকে। সবসময়। ভয়ের কিছু নেই। তা ছাড়া—

'মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা—
জন্ম আগে—মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ,
পথের পর পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের
সেখানে মাইল-পোস্ট নেই— নেই টেলিফোন তার
মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ—
পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের'

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

হরিনাথপুরের গণ আদালতে ডাক্তার জগন্নাথ চট্টরাজকে গাছে বেঁধে বিচার শুরু হয়। প্রায় আড়াইশো আদিবাসী নারীপুরুষ সম্মিলিতভাবে দোষীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। মৃত্যুদণ্ড সে-রাতেই কার্যকর করা হবে। তার আগেই মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বাবাই। সঙ্গে টুডু— সশস্ত্র। গ্রাম পেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দুটি জিপ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। বাবাই বলল, টুডু, ঝুপড়ির দিকে চলো।

জোর গতিতে দৌড়ে ওরা এগোয়। অল্প দূরেই আদিবাসীদের ঝুপড়ি ভরা মহল্লা। সেখানে আশ্রয় পাওয়া অসুবিধে হবে না। কিন্তু ফাঁকা পথে জিপ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বাবাই ও টুডু ছোটে। জিপ থেকে চিৎকার আসে—হল্ট। নইলে গুলি করতে বাধ্য হব।

ওরা নিরুত্তরে দৌড়োয়। ঝুপড়ির কাছাকাছি প্রায় এসে গেছে। পুলিশ গুলি চালায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট।

টুডু বাবাইকে বলল, কমরেড বাঁ দিকে—

বাবাই বাঁক নিতেই গুলি এসে লাগে বাঁ পায়ের ডিমে। ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। টুডু ওর হাত ধরে বলল, কমরেড, আপনি যান। আমি দেখছি।

বাবাই এঁকেবেঁকে ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি পেরোয়। কানে আসে রিভলবারের শব্দ, বন্দুকের শব্দ। একটা ছোটো নালা লাফিয়ে পেরুবার সময় টের পায় রক্তে প্যান্ট ভিজে গেছে। পা অবশ হয়ে আসছে। বাবাই আড়াল খুঁজে বসে দেখে গুলিটা পায়ে গেঁথে আছে। ও নিকটবর্তী ঝুপড়ির সামনে যাওয়ার সময় আর্ত চিৎকার শুনল—আঃ! ইনকিলাব—জিন্দাবাদ। টুডুর এই স্বর সারাজীবনেও ভুলবে না বাবাই।

পুলিশ বাবাইকে খুঁজে পেল না। ঝুপড়িবাসীরা সমস্বরে জানায় ওদের মহল্লায় কেউ আসেনি। ওদের আশ্রয়ে সাত দিন কাটিয়ে বাবাই ফিরে গেল নিজের আস্তানায়। কমরেডরা

হতচকিত হয়ে দেখল, স্বাধীন খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

সেদিন স্বাধীন চৌধুরীকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ পুলিশের তৎপরতা বাড়ে। বহু ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে— স্বাধীন চৌধুরী কোথায়?

অপছন্দের উত্তর দিয়ে অনেকে গ্রেফতার হল। তাদের মধ্যে ছিল অমৃতা সোম।

নিজস্ব সূত্র ও তদন্তে পুলিশ জানতে পারে অমৃতা সোমের সঙ্গে স্বাধীন চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় দীর্ঘদিনের। একসঙ্গে কলেজে পড়া ছাড়াও যাদবপুরে স্বাধীনের যাওয়া-আসা ছিল। দলের কাজে সহযাত্রী। সুতরাং অমৃতাকে বার বার জেরা করা হয়। লালবাজারে নিয়ে গিয়ে করা হয় অকথ্য অত্যাচার। হাতে পায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা, নখে সুঁচ ফোটানো তো ছিলই। ধর্ষণকামীর বিকৃত উল্লাসে এক কুখ্যাত পুলিশ অফিসার অমৃতার স্তনাগ্রে চেপে ধরে জ্বলন্ত সিগার। তাতেও উত্তর না-পেয়ে ক্ষিপ্ত ক্রোধান্ধ ক্ষমতা-ব্যভিচারী অমৃতার কুমারী যৌনাঙ্গে রুল ঢুকিয়ে চিৎকার করে—এবার বল্, বল্ হারামজাদি— তোর নাগর স্বাধীন চৌধুরী এখন কোথায়?

রুধিরসিক্ত যন্ত্রণাজর্জর অমৃতার জবাব— জানি না, জানি না, জানি না।

রুলের চাপ বাড়িয়ে হুংকার হয়—এবার?

— জানি না।

—এবার—এবার?

— জানি না— জানি না। জানলেও বলতাম না।

— বলবি না?—রক্তাক্ত রুল অমৃতার চোখের সামনে পেন্ডুলামের মতো দুলিয়ে আবার হুংকার,—এবার তোর পিছনে ঢোকাব। নাকি এটা মুখে নিবি? তোর ঠোঁট দেখে মনে হচ্ছে ভালো চুষতে পারিস। চুষবি নাকি এটা? নাকি আসল জিনিস দেবো?

অসহনীয় অপমানে ও চূড়ান্ত নিগ্রহে অমৃতার শরীরে তীব্র কাঁপুনি লাগে। ও তড়িৎ-বেগে একদলা থুথু পুলিশ অফিসারের মুখে ছিটিয়ে বলল, কথাগুলো নিজের মাকে বা যদি থাকে, বোনকে গিয়ে বলুন।

ভুবন অন্ধকার-করা থাপ্পড়ে জ্ঞান হারায় অমৃতা। কিন্তু অত্যাচার বন্ধ হল না। ন্যায়নীতি-বর্জিত অতি অমানবিক নিপীড়নের ধারাবাহিকতা রইল অব্যাহত।

ঠিক এই সময়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক অখ্যাত বিচারপতি জগমোহনলাল সিনহা শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন অবৈধ। চার বছর মামলা চলার পর সাহসী বিচারক রায় দেন, নির্বাচনে সরকারি আমলা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিগত নির্বাচন বাতিল এবং আগামী ছয় বছরে তিনি কোনো নির্বাচিত পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। বিচারক দেশের শাসনব্যবস্থা যাতে অচল না হয়ে পড়ে তার জন্য ওই রায় কার্যকর করার জন্য কুড়ি দিন সময় প্রদান করেন।

সারা দেশ জুড়ে বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অন্য দিকে কীভাবে গদি আঁকড়ে থাকা যায় তার জন্য কংগ্রেস পার্টি ও তার ক্ষমতার অলিন্দে-অলিন্দে চলে নিভৃত শলা-পরামর্শ। অন্যতম মুখ্য ভূমিকায় থাকেন পশ্চিমবাংলার আইনবিশারদ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরই সুচিন্তিত প্রস্তাবানুসারে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, বিনা প্রশ্নে, অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার ঘোষণা স্বাক্ষর করেন ২৫ জুন, ১৯৭৫। রাত ১১ টা ৪৫ মিনিটে— নির্ধারিত সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পনেরো মিনিট পূর্বে।

ঘোষণা জারি হওয়ার পূর্বেই তালিকা নিরূপণ করা হয়েছিল সারা দেশের কোনো কোনো বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার করা হবে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই থেকে শুরু করে দক্ষিণপন্থী জনসংঘ ও অতি বামপন্থী সি. পি. আই. (এম.) দলের সকল প্রধান নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কেবল মস্কোপন্থী জনসংখ্যা ও অতি বামপন্থী সি. পি. আই এম.) দলের সকল প্রধান নেতাদেরই গ্রেফতার করা হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণায় ভারতীয় জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করে দেশে দমন-রাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলল। খবরের কাগজের স্বাধীনতা কেড়ে সেন্সর প্রথা চালু হল। বহু কাগজ, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা সাদা রেখে প্রকাশ পেল। জার্মানির হিটলারের জমানায় যা ঘটেছিল তারই অনুবৃত্তি ঘটল ভারতে।

গণতান্ত্রিক ভারতের কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনায় ইলামবাজার থেকে নলহাটি যাওয়ার পথে গ্রেফতার হয় বাবাই। মিসায় বন্দি করার জন্য কোনো কারণ বা ওয়ারেন্ট লাগে না। পরে বাবাই শুনেছিল দলছুট এক ছাত্রনেতা ওর খবর পুলিশকে দিয়েছিল।

চোখে পড়ার কথা ছিল না। কেন না খবরের কাগজে শুধু প্রধানমন্ত্রীর বাগাড়ম্বর ও তাঁর বিদূষকদের স্তুতি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট দেবকান্ত বড়ুয়ার অমর উক্তি 'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা' ছাপার পর খবরের কাগজে স্থান সংকুলান কঠিন। তবু ছোট্ট করে ছাপা হয়েছিল, 'নকশাল নেতা স্বাধীন চৌধুরী গ্রেফতার।' চোখে পড়া মাত্র উদয়ন খোঁজ শুরু করে। করতে গিয়ে টের পায় পুলিশের ক্ষমতার মদমত্ততা কী ভয়াবহ!

কিছু মানুষের জরুরি অবস্থা পছন্দসই। কারণ ট্রেনগুলো সময়ে ছাড়ছে, অফিসে আদালতে কর্মীরা সময়ে আসছে যাচ্ছে। বিশৃঙ্খল সমাজজীবনে শৃঙ্খলার বিকাশ তো স্বাগত। আপন স্বার্থান্ধ মানুষের কাছে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের মুক্ত অধিকার কোনো অর্থ বহন করে না। সেজন্য এখনও এমন মানুষের অভাব নেই যারা মনে করে, ব্রিটিশ শাসনই ছিল এদেশের উপযুক্ত। এরা শোষণ ও শাসনের প্রভেদ সম্পর্কে চির-অজ্ঞান।

মানুষের মূল্যবোধের অধঃপাত লক্ষ করে হতাশায় মুহ্যমান হয় উদয়ন। দেশের সুধী সমাজ-শিক্ষাবিদ, বিচারক, আইনজীবী, ডাক্তার, অধ্যাপক, কবি, লেখক সাংবাদিক— কেবল যে মৌনতা অবলম্বন করল তাই নয়, অনেকেই জরুরি অবস্থা সমর্থন করলেন। তাঁদের কাছে জীবন এখন অনেক নিরাপদ— ধর্মঘট, হরতাল, সত্যাগ্রহ নেই। সব শান্ত, নিয়মানুগ। সমাজ যে সুবিধাভোগী মানুষের নন্দনকানন এবং নগ্ন ভোগবাদের অভিলাষী ও উপাসক হয়ে উঠছে তার প্রাত্যহিক উদাহরণ উদয়নের অন্তর্গত চেতনায় ক্রমাগত প্রহার হানে।

উদয়নের বিস্ময়বোধও শূন্য হয়ে যায় এটা দেখে যে সাংবাদিক সাহিত্যিক, 'রূপদর্শী' গৌরকিশোর ঘোষ বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হলেও কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদে গর্জে উঠল না। সম্ভবত এই পাপমুক্তির জন্যই পরে মুক্তিপ্রাপ্ত গৌরকিশোর ঘোষ মুণ্ডিতমস্তক হয়ে বলেন, 'ইর্মাজেন্সি আমার কাছে মাতৃদশা সমতুল্য'।

বাবাইয়ের খবর দিয়ে উদয়ন প্রণতিকে লেখে— এমনিতে ভালোই আছে। তবে কবে ছাড়া পাবে, বা আদৌ পাবে কি না বলা যাচ্ছে না। জামিন পাওয়াও সম্ভব নয়। আমার বিচারে বর্তমান পরিস্থিতিতে জেলেই বরং নিরাপদ থাকবে। ওর জন্য দুশ্চিন্তা করে শরীর খারাপ কোরো না।

আমি স্কুল থেকে অবসর পেয়ে গেছি। তোমাকে জানিয়েছি কি না মনে পড়ছে না। সহসা

এই মেস ছেড়েও চলে যাব। আমার এক প্রাক্তন ছাত্র-র ঠাকুর্দা ডায়মন্ডহারবারের কাছে একটি অনাথ শিশুর আশ্রম চালাচ্ছেন অনেক বছর। বয়সের ভারে অশক্ত হয়ে আমার সক্রিয় সাহায্য চেয়েছেন। আমিও কথা দিয়েছি। আশা করছি শিশুদের নিয়ে থাকতে ভালোই লাগবে।

তোমার মানিক সেনকে মনে আছে? ও আগরতলা ছেড়ে চলে এসেছে। কয়েকদিন আগে মেসে এসে দেখা করে গেল। সোনারপুরে থাকে। আমাকে বলল, ওখানে সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে, বাড়ি করতে চাইলে ও ব্যবস্থা করতে পারে। আমি আর বাড়ি করে কী করব! সে - সংগতিও আমার নেই।

আশ্রমে গিয়ে আবার লিখব।

বাবাইকে বলেছি তোমাকে চিঠি লিখতে।

চিরশুভানুধ্যায়ী উদয়ন।

বাবাইয়ের খবর পেয়ে যমুনা খুশি। জেলে থাকলেও সুস্থ আছে, সশরীরে আছে, তাঁর কাছে এই-ই গভীর আশ্বাসের। জেলে কেউ চিরকাল থাকে না। ছাড়া তো পাবেই। মাস্টারও তো কতদিন জেলে ছিল।

প্রণতি বলল, মা, আমি ভাবছি ভিন্ন কথা। বাবাই পড়াশোনা শেষ করল না। সাতাশ বছর বয়েস হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে কী করবে ও?

যমুনা বললেন, পুরুষমানুষ লেখাপড়া জানে, কিছু না কিছু ঠিক করবে তুই ভাবিস না তো। আগে ছেলেটা ঘরে আসুক। হ্যাঁ রে, সুরেনের আসার কথা ছিল না?

—এখন কী আর আসতে পারবে!

— কেন, আবার কি হল?

— তুমি শোনোনি, শেখ মুজিব সপরিবারে খুন হয়েছেন আজ ভোর রাতে!

— কী বলছিস তুই। কারা মারল?

— মিলিটারি, বাড়ি ঘিরে সকলকে গুলি করেছে। ছোটো ছেলে রাসেলকেও ছাড়েনি।

— বংশের কেউ বেঁচে নেই?

— মেয়ে জামাই আছেন বিদেশে।

স্বগতোক্তির মতো যমুনা উচ্চারণ করেন, মুসলমানরা যে কী চায় খোদায় মালুম। হিন্দুদের মেরে ধরে তাড়িয়ে এখন আবার মুসলমানদেরই মারছে! অতবড়ো মানুষটাকে মারল— ওদের কি কোনো মনুষ্যত্ব নেই!

প্রণতি বলল, ইতিহাস মনে নেই তোমার? আওরঙজেব বাবা শাজাহানকে বন্দি রেখে বড়োভাই ছোটোভাইকে মেরে সিংহাসন দখল করেছিল। ক্ষমতার কোনো ধর্ম নেই মা।

পর দিন স্কুলে গিয়ে শুনল, প্রিন্সিপাল প্রণতিকে দেখা করতে বলেছেন। বছর-দুয়েক হল ফাদার জোনস বদলি হয়ে গেছেন দার্জিলিঙে। এখানে এসেছেন ফাদার মরিস। ইনিও ফাদার জোনসের মতোই স্নেহশীল, কর্মনিষ্ঠ। তবে স্থানীয় ভাষা এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। বাংলা তো জানেন না।

ফাদার মরিস বললেন, তোমাকে দুটো খবর দেওয়ার আছে। একটা ভালো, আর-একটা হয়তো তত ভালো নয়। কোন্‌টা আগে বলব?

প্রণতি বলল, ফাদার আপনি তো আমার কথা সবই জানেন। কোনো খবরই আমার কাছে

তত খারাপ না। যে-কোনো মুহূর্তে একমাত্র ছেলের মৃত্যুসংবাদ আসতে পারে। এই আশঙ্কা বুকে পুষে কাটিয়েছি গত পাঁচ-ছ বছর। আপনি তার চেয়ে খারাপ আর কী বলবেন!

ফাদার বললেন, আয়্যাম স্যরি, মাই চাইল্ড। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়। সুখবর হল—তোমার প্রোমোশন। কিন্তু — সেটাই হয়তো তত সুখবর নয়, তোমার ট্রান্সফার। খুব দূরে নয় অবশ্য। রঙ্গিয়া।

— রঙ্গিয়াতে?

— হ্যাঁ। ওখানে আমাদের স্কুল আছে, সে তো তুমি জানো। এবার কলেজ খোলার চেষ্টা চলছে। তুমি হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রিন্সিপাল। ওখানে কোয়ার্টারও আছে। তুমি রাজি থাকলে আমি ওখানে জানাতে পারি।

— রাজি না হলে?

— আমরা তোমাকে তাড়াব না। তবে প্রোমোশন পাবে না।

— আপনার কী পরামর্শ, ফাদার?

— দ্যাখো, তোমার সামনে অনেক সময় পড়ে আছে। এই প্রোমোশন তোমার জন্য আরও উন্নতির সুযোগ এনে দেবে। চেঞ্জ ইজ আ নেচারাল ফেনোমেনন। আমি নিজে এটা নিয়ে আটবার বদলি হয়েছি। ফাদার জোনসও প্রায় তাই।

একটু ভেবে প্রণতি বলল, একবার মা-র সঙ্গে কথা বলি। ওঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কীভাবে নেবেন বুঝতে পারছি না। ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তির কারণ নেই। দেখি, তবুও, মা কী বলেন।

এখান থেকে যাওয়ার কথা শুনেই হাউহাউ করে উঠলেন যমুনা—ভগবান কী কোথাও আমাদের থিতু হতে দেবে না! দ্যাশবাড়ি ছাইড়্যা আইসা একবার আগরতলাতে বাড়ি বানাইলাম। হেইটাও পুইড়্যা গেল। এখানে আইলাম তাও পোনরো বছর। অখন ইখান থেইকাও যাইতে লাগব। ক্যান? আমরা এই দ্যাশের মানুষ না!

প্রণতি লক্ষ করেছে আজকাল আবেগাহত হলেই, খুশিতে বা বেদনা, মা-র মুখে দেশের ভাষা ফোটে। নইলে হুগলি টান থাকলেও যমুনার মুখের ভাষায় বিপুল পরিবর্তন— যা ছিল অবশ্যম্ভাবী।

প্রণতি যমুনাকে বোঝায়, আমরা নাও যেতে পারি, মা। কেউ জোর করছে না। না-গেলে প্রোমোশন হবে না। প্রোমোশন হলে আয় বাড়বে। বাবাই যে কী করতে পারবে বলা অসম্ভব। এ-অবস্থায় আমার যদি রোজগার বাড়ে কিছু সুবিধে তো হবে। তা ছাড়া এটাও ভাড়াবাড়ি, ওখানেও কোয়ার্টার— সেও ভাড়াবাড়িই।

—তবু সীমারা ছিল এখানে।

— মা, রঙ্গিয়া এখান থেকে খুব দূর নয়। তোমার ইচ্ছে হলেই আসতে পারবে।

অভিমানী সুরে যমুনা বললেন, যাবে বইলা যখন ঠিকই করছ, আমারে আর জিগাও ক্যান!

—ঠিক করিনি, মা। বিশ্বাস করো। তুমি না চাইলে যাবও না।

পবিত্র ও সীমার সঙ্গে পরামর্শ করেন যমুনা।

পবিত্র বলল, আমি এ-বছরই রিটায়ার করছি। তার পরই কলকাতা চলে যাব। প্রোমোশন

যখন পাচ্ছে, টুনুর যাওয়াই উচিত।

এখানে এসেছিল প্রায় শূন্য হাতে। এত বছরে অনিবার্যভাবে হয়েছে অনেক আহরণ— তৈজস, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী, পোশাক। বাবাইয়ের মেডেল ও বই। যাওয়ার দিন দেবেন বসুমাতারি বললেন, আপনাদের মতো সজ্জন প্রতিবেশী হারাতে হবে কখনও ভাবিনি।

১৭.

'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে!' কবির কথাকে কি ঘুরিয়ে বলা যায়, প্রলয় এলেও মানুষ অন্ধ সেজে থাকে—অন্তত বাঙালিরা! বন্যা, খরা, মহামারী, যুদ্ধ বা জরুরি অবস্থা যাই ঘটুক আশ্বিন এলেই পুজোর তারস্বর ঝলমলানিতে কলকাতায় মানস-চেতনা অন্ধ হয়ে যায়। প্যান্ডেলের আলোর উৎসব ভুলিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীনতার স্মৃতি। ঢাকের ও মাইকের শব্দে ঢাকা পড়ে বন্ধ কারখানার বেকার শ্রমিকের ক্ষুধার্ত আর্তনাদ। শহরজোড়া বিপণি বাহার, উৎসব-মাতাল মানুষের ঢল নির্বিকার উপেক্ষায় নীরব থাকে, জেলে-জেলে বন্দি অসংখ্য ছাত্র যুবক, রাজনৈতিক অরাজনৈতিক মানুষ সম্পর্কে। কলকাতার জনতা, মানুষ সমাজ দেশ জীবন বিষয়ে এত নিস্পৃহ হয়ে পড়ছে কেন— বড়ো ভাবায় উদয়নকে। ওর কেবলই মনে হয়, মানবপ্রাণের অন্তর্গত শিখার দীপ্তি যেন ম্লান হয়ে আসছে ভোগবিলাসের আরাধনায়। দূরদর্শন চালু হতেই টিভি কেনার ব্যাকুল হুড়োহুড়ি প্রমাণ করে কলকাতার মানুষের লক্ষ্য, মোক্ষ আপাতত ওই বোকাবাক্সটাই।

বটু বলল, দাদা, আমাকে তো কাজের জন্য নানা শহরে যেতে হয়— দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ—সর্বত্রই মানুষ যেন বোবা হয়ে আছে। শুধু নিজের সুবিধেটুকু খুঁটে নেওয়ার ধান্দা।

—শাসকগোষ্ঠী তো তাই চায়।

বিকাশ জানতে চায়, আপনার আশ্রম কেমন চলছে? ওখানে ভালো লাগছে আপনার?

উদয়ন বলল, নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, কাজটাও নতুন—মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে। তবে ভালো লাগছে খুবই। কিন্তু প্রচুর সন্তাপেও ভুগতে হয়।

—সন্তাপ কেন?

— এত দারিদ্র, এত অভাব অনটন— আর মানবতার উলঙ্গ অপমানের প্রতি সমাজের নির্বিকার উদাসীনতা, অসহনীয় লাগে। আমরা যা করছি—অনাথ অসহায় শিশুদের সামান্য আশ্রয় ও শিক্ষার ব্যবস্থা— সামগ্রিক প্রয়োজনের নিরিখে তা তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ। অথচ আমাদের এর বেশি করার সংগতি বা সাধ্য নেই। আমার আরও খারাপ লাগে, কারণ আমি জানি, এই আশ্রম করাটা প্রকৃত সমাধান নয়।

—কীভাবে সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন?

বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উদয়ন বলল, আমি কি বিধান রায় যে প্রেসক্রিপশন লিখলেই মরমর রোগী চনমনে হয়ে উঠবে!

পরে বলল, দেখ সমস্যাটা তো জানা—অভাব, অশিক্ষা, বৈষম্য, শোষণ, অত্যাচার। এগুলো দূর করাই সমাধান। কথা হল, দূর করবে কে, কীভাবে। তখনই কথা ওঠে সম্পদের সমবণ্টনের— যার অন্য নাম ক্ষমতার হস্তান্তর! কিছু লোকের হাত থেকে সর্বস্তরে।

বটু বলল, আবার সেই রাজনীতি।

—অবশ্যই। সমস্যাটা তো রাজনীতিরই। ক্ষমতা গেরুয়াপরা জহ্লাদ হতে পারে, সুবিধাভোগী মধ্যবর্তী শ্রেণি ওদের পুষ্পমাল্য দিয়ে অর্চনা করে নিজের পকেট সমৃদ্ধতর করবে— এটাও বুঝি। কিন্তু যা প্রহেলিকার মতো লাগছে, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, লেখক সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা যেন হঠাৎ বৃহন্নলা সিনড্রোমে ভুগছে।

বিকাশ বলল, ওদের আপনি কী করতে বলেন?

—আমি বলার কেউ নই। আমি কেবল আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। চল্লিশের আন্দোলনে আমরা যখন জেলে যাই, অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে দুটো বই আমাদের উদ্বুদ্ধ করত— *আনন্দমঠ*, যতই হিন্দুত্ববাদী হোক—আর *পথেরদাবী*। গোর্কির *মাদার*-এর কথাও বলতে বাধ্য। অথচ সেই সাতষট্টি সাল থেকে যে-আলোড়ন চলছে, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত, তার কোনো প্রতিফলন—সমর্থন করতে বলছি না—সাহিত্য, সিনেমায় তেমনভাবে পড়ল না। নাটকে তবুও উৎপল দত্ত 'কল্লোল', 'তীর', 'টিনের তলোয়ার' 'দুঃস্বপ্নের নগরী' ইত্যাদি মঞ্চস্থ করে তাঁর দায়বদ্ধতার প্রমাণ রেখেছেন। একজন কবিও রবার্ট ফ্রস্টের মতো লিখলেন না—

Our life runs down in sending up the clock.
The brook runs down in sending up our life.
The sun runs down in sending up the brook.
And there is something sending up the sun.
It is this backward motion toward the source,
Against the stream, the most we see ourselves in,
The tribute of the current to the source.

বিকাশ বলল, সিনেমার জন্য প্রযোজকদের প্রচুর টাকা ঢালতে হয়। যে-কোনো ব্যাবসার মতো এখানেও লক্ষ্য থাকে মুনাফা। তাই মনের মধ্যে ভয় থাকেই। এখন অবশ্য দুটো ভয়— এক, ছবি যদি ফ্লপ করে তো বিপুল লোকসান, আর দুই, সরকারের বিরূপতা, রোষ। খুঁচিয়ে ঘা করতে কে চায়!

—আমি শুনেছি যত ছবি বছরে করা হয় তা বেশির ভাগই নাকি ফ্লপ।

—ঠিকই শুনেছেন। তবুও প্রযোজকরা বুকে আশা বেঁধে এখনও 'বিল্বমঙ্গল','স্বয়ংসিদ্ধা', 'ছুটির ঘণ্টা', 'সুদূর নীহারিকা' বা 'সেই চোখ'-এর মতো ছবি করতে আসেন। আমরাও কাজ করতে বাধ্য হই। রোজগার তো চাই।

রঞ্জনা ভ্রাতৃবধূ রেবতীকে নিয়ে খাওয়ার টেবিল সাজাচ্ছিল। বসার ঘরে এসে বলল, তোমাদের আড্ডা খুব জমে উঠেছে মনে হচ্ছে।

বটু বলল, আড্ডা দেবো কী! দাদা এমন সব ওজনদার কথা বলে, মাথায় ঝিম ধরে যায়।

উদয়ন বলল, মিমি তোরা বোস। আমি চুপচাপ তোদের কথা শুনব। বাচ্চাগুলোকে কোথায় পাচার করে এলি?

বটু এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার সপরিবারে কলকাতায় এসেছে। ওদের সঙ্গে দেখা করা ও কিছু সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে উদয়ন মিমির বাড়িতে হাজির। পুজোর দিনগুলোতে মিমির

শ্যুটিং থাকে না। বটুর ছেলে ভাস্কর আর মেয়ে প্রজ্ঞাকে পেয়ে মিমি দারুণ উল্লসিত। উদয়নের বুকেও স্নেহের ছলাৎ। রেবতীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় সুষমার সঙ্গে শিক্ষা ও বৈভবে প্রতিপালিত হওয়ার বিভা থাকলেও নম্র সম্ভ্রমশীল আচরণে উদয়নের সপ্রশংস প্রশ্রয় অর্জন করতে পেরেছে অনায়াসে। স্বাভাবিকভাবেই রেবতী বাংলা জানে না। তবে ইলিশ, চিংড়ি, দই, সন্দেশ, পুজো, দাদা, ডালনা অ ার পাতুড়ির মতো কিছু-কিছু শব্দ শিখেছে। এবারে মিমির কাছে শিখছে কয়েকটি পূর্ণ বাক্য।

প্রজ্ঞা আর ভাস্কর ইংরেজি স্কুলে পড়ে। বাংলা শেখেনি। বাবার কাছে শুনে-শুনে অল্প কয়েকটি শব্দ জেনেছিল। গতবার কলকাতা থেকে যাওয়ার সময় দাদার কথায় বটু *আবোল তাবোল, হযবরল* সহ কিছু শিশুপাঠ্য বই নিয়ে গিয়েছিল। অক্ষর পরিচয়ের পর এখন ভাইবোন দুজনেই বানান করে *আবোল তাবোল* পড়তে পারে। প্রজ্ঞার কণ্ঠ বেশ সুরেলা। বটুর ইচ্ছে মেয়েকে শান্তিনিকেতনে পাঠায়। রেবতী রাজি হচ্ছে না।

মিমি প্রস্তাব দেয়, শান্তিনিকেতনে কেন, ও আমার কাছে থাক। সেরা গানের স্কুলে ভরতি করে দেব।

বটু সম্মত হয়নি। দাদার চোখের অসম্মতি নির্ভুল পড়েছিল। এখানে বেড়াতে আসা যায়, বাড়ন্ত মেয়েকে রাখা যায় না।

বহু বছর বাদে এই পারিবারিক সম্মেলনে তিন ভাইবোনের মনেপ্রাণেই আনন্দলহরীর সঙ্গে স্মৃতিমেদুরতা। মিমি মা-র কথা ভেবে অশ্রুপাত করে। তখন বোঝা যায় বয়সের নখরতা রুপালী পর্দায় কুহকিনীকেও অব্যাহত দেয়নি। এখন আর কেউ রঞ্জনাকে নায়িকার ভূমিকায় চাইছে না। সেজন্যই ওর মনস্তাপ গভীর। ক্রমশই কাজ কমে আসবে। অথচ এখনও জীবনের দীর্ঘপথ বাকি। বম্বেতে যে প্রতিষ্ঠা পেলে বিত্ত-বিভূতির সম্ভাবনা ছিল বাস্তবে তা হয়নি। দ্বিতীয় ছবির পর আর আহ্বান আসেনি।

কথাটা তুলেছিল বটুই—দুঃস্বপ্নের অবসান যখন ঘটেইছে, আবার নতুন করে শুরু করতে দোষ কী!

উদয়ন বলে, আমি তো দাদা হিসেবে কোনো দায়িত্বই পালন করিনি। আমার কিছু বলা সমীচীন কিনা তাও জানি না। তবে মিমি বটুর কথাটা তোর বিবেচনা করা উচিত।

মিমি বলে, বড়দা, তুমি আমাদের এ-লাইন সম্পর্কে জানো না। এখানে তিমি—তিমিঙ্গিলের খেলা চলে। চারদিকে শুধু লোভী আর ধান্দাবাজ মানুষ। আমাকে ভাঙিয়ে রোজকার করবে কিংবা আমার সবকিছু হাতিয়ে নেবে।

—হতে পারে। তবে ব্যতিক্রমও থাকে। আমার তো বিকাশকে চমৎকার লেগেছে। তোর দুঃসময়ে যেভাবে বার বার সাহায্যের পশরা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে তার কোনো তুলনা নেই।

মিমি বলল, মানছি বিকাশদা মানুষ ভালো। আমার জন্য অনেক করেছেন। রণধীর ঢোলাকিয়ার বাগানবাড়ি থেকে উনিই আমাকে ক্যামেরার সামনে হাজির করেন। আমিও তাঁর জন্য অনেক করেছি। উনি অনেক কাজ পেয়েছেন আমার জন্য। তবু ওঁকে আমি মান্য করি। তবে তোমরা যা ভাবছ তা সম্ভব নয়। বিকাশদা বিবাহিত। তিনটে বাচ্চা আছে।

বটু বলল, ঠিক আছে, বিকাশের কথা বাদ দিলাম। কলকাতায় কি আর কোনো ভালো মানুষ নেই?

মিমি বলল, মেজদা, জীবন বড়ো নিষ্ঠুর। একেই সিনেমা-করা মেয়েকে মহার্ঘ্য গণিকার বেশি সম্মান কেউ দেয় না। আর আমার ইতিহাস তো দ্রৌপদীর উপাখ্যান নয়। ওসব ভুলে যাও।

রেবতী যোগ দিয়ে বলে, দ্যাখো, এজিং ইজ আ ন্যাচারাল ইন-এভিটেবিলিটি, উইথ অল ইটস্ প্রবলেমস।

মিমি বলল, তা আর জানি না। দেখছি তো আশেপাশে। পুরোনো দিনের শিল্পীদের অনেকেরই যা দুরবস্থা! আমি আশা করি তেমন দুর্দশায় পড়ব না।

—বাট মিমি, লোনলিনেস ইজ আ টেরিবল এইলমেন্ট। শরীরের হয়তো কিছু হয় না, কিন্তু আত্মা আর্তনাদ করে।

উদয়ন বলল, ভালো বলেছ রেবতী। আমি রোজ একটু-একটু করে আবিষ্কার করছি।

মিমি বলল, তেমন হলে বড়দা, তোমার কাছে তোমার আশ্রমে চলে যাব। আমাকে থাকতে দিতে তোমার আপত্তি হবে না তো?

—আশ্রম বলতে সাধারণভাবে লোকে যা বোঝে ওটা তা নয়। ওটা অনাথ নিবাস। তুই নিশ্চয়ই থাকতে পারিস। আশ্রমে না থেকে আমার কাছেও থাকতে পারিস। কিন্তু কথাটা কোথাও জাস্ট থাকার নয়—পছন্দমাফিক পরিপূর্ণ জীবনযাপন করার। বলছি না, তুই এক্ষুনি যাকে হোক বিয়ে কর্। বলছি, বিষয়টা নিয়ে ভাব্। মনটা মুক্ত রাখ। স্মৃতিকে পুরাবৃত্তের কর্ষণক্ষেত্র করে রাখিস না। ইচ্ছে হলে মাঝেমধ্যে আমাদের অনাথ নিবাসে আসতে পারিস। ওখানে তোর ফ্যানেরা তাড়া করবে না আশা করা যায়।

খাওয়া-দাওয়ার পর রেবতী বলল, দাদা, একবার অন্তত আমাদের ওখানে আসুন। কাছেই সমুদ্র। আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে।

উদয়ন বলল, ইচ্ছে তো করে আমাদের বিশাল দেশটাকে দেখি। আমার চোখ দিয়ে আমি আবিষ্কার করি। হল আর কোথায়! তবু, একটু সময় করতে পারলেই চলে যাব।

তোর হলেই উদয়ন চলে যাবে অনাথ নিবাসে। বটু দু-দিন পর সপরিবারে শান্তিনিকেতন যাবে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজেও বাঙালির সাংস্কৃতিক তীর্থকেন্দ্র দেখবে। রেবতীর ভালো লাগলে মেয়েকে ভরতি করার স্বপ্নও সফল হতে পারে।

শুতে যাওয়ার আগে বটু দাদার কাছে এসে সংকোচের সঙ্গে বলে, একটা কথা বলছি, কিছু মনে কোরো না। তুমি তো এখন আর পড়াও না। আমি যদি মাসে-মাসে কিছু টাকা পাঠাই—

হাত তুলে উদয়ন বলল, না, না, তার কোনো দরকার নেই। অনাথ নিবাসে থাকতে খেতে দেয়। এর বাইরে আমার প্রয়োজন অতি সামান্য। পোস্ট অফিসে কিছু টাকা আছে। চলে যায়।

বটু বলল, দাদা, তোমাকে বলেছি আমার ব্যাবসা ভালো চলছে। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

—আমার হবে রে। বেশি টাকা কী করে খরচ করব! না, ভাই। তুই বলেছিস, আমার খুব ভালো লাগল। কথা দিচ্ছি কখনও তেমন দরকার হলে তোকে জানাব। ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করতে হবে। আজকাল শিক্ষা খুব ব্যয়বহুল।

— তা আর বলতে। আমাদের ওখানে আরও বেশি।

উদয়ন ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল, ভাইরে, ছেলেমেয়েদের বলিস আমাদের

পিতৃপুরুষের কথা, দেশের কথা। বাংলার সঙ্গে পরিচয় রাখার চেষ্টা করিস। বার বার ওদের নিয়ে আসবি। মাটির ঘ্রাণ প্রাণে না লাগলে টান তৈরি হয় না। মিমি ওদের খুব ভালোবাসে। ওরা যেন তার সম্মান দেয়।

—আর তুমি—তুমি বাসো না?

উদয়ন বলল— হয়তো এ পৃথিবীতে মানবের
অনন্ত চারণ
লোভ থেকে লোভে শুধু—
ব্যথা থেকে ব্যথার ভিতরে
ভুল থেকে উল্লোল ক্ষমতাময়
ভুলের গহ্বরে;
চাঁদের কুয়াশা থেকে অঘ্রাণ রাতের
নক্ষত্রের অনুসারে;—
তার পর নক্ষত্রেরা নেই।

১৮.

মানুষের সাহসের অনুপাতে জীবনের প্রসারণ বা সংকোচন ঘটে— কোথাও পড়েছিল বা শুনেছিল প্রণতি। এখানে আসার পর পুঁটিমারী নদী দেখে যমুনার শীর্ণ মুখের হাসিতে নবীন উষার বিভঙ্গ দেখে অনুভব করে, সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে রঙ্গিয়ার উপকণ্ঠে না এলে এই মনোরম অভিজ্ঞতা অনাস্বাদিত থেকে যেত। ওদের বাড়িটা নদীর খুব কাছে। প্রকৃতির সবুজ ঔদার্য মনোমুগ্ধকর। প্রথমদিন যমুনার মনে হয়েছিল যেন আবার স্মৃতির সুজনপুরে ফিরে এসেছে। শুধু দিগন্তরেখা ঘিরে পাহাড়ের হাতছানি বুঝিয়ে দেয় এ অন্যভূমি। নদীর ধারে হাঁটতে গিয়ে যমুনা কিশোরী কালের চপলতা উপভোগ করেন। স্থানবদল, নদীর ছন্দময়তা কিংবা শান্তির বাতাবরণ অথবা সবকিছুর সাযুজ্যে যমুনা এখন অনেক সুস্থ। বাবাইয়ের জন্য উদ্বেগ কমেছে বলেও হতে পারে। উদ্বেগের বদলে এখন উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা— কবে ওর চিঠি আসবে। জেল থেকে চিঠি লিখেছে বাবাই। সেন্সরের কাটাছেঁড়ার প্রসাধন মেখে চিঠির আবির্ভাবের সময়, কোনো হিসেব অনুসারী নয়। জেল বদল ঘটলে, আরও দেরি। তবু বাবাইয়ের নিজের হাতের লেখা। যমুনা অক্ষরগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখেন। বাবাই সব চিঠিতে লেখে আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভালো আছি। কিন্তু দুই নারীই অবগত, জেলখানাভ্রমণ-সরাই নয়। খাওয়া-দাওয়ার কষ্টের কথা ভেবে এতই কষ্ট পান যে নিজেদের ভাল কিছু খেতে মন ওঠে না।

প্রণতির এখানে দায়িত্ব বেশি। সহকর্মীদের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। ও নিজে পরিশ্রমী। পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতা মানুষের সাধুবাদ অর্জন করে অনায়াসে। এখানকার প্রিন্সিপ্‌ল ফাদার জোসেফ কেরালার মানুষ। দীর্ঘদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কাজ করছেন। নাগাল্যান্ড মণিপুরেও ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সারা বছর এখানে চমৎকার লাগবে তোমার। শুধু বর্ষার সময় সাবধানে থাকবে। বন্যা হলে তার যে কী আকার হবে বলা কঠিন আর মুশকিল হচ্ছে বন্যা এখানে নোটিশ দিয়ে আসে না। হঠাৎই হুড়মুড় করে এসে পড়ে। গ্রামের মানুষদের তখন দুর্দশার সীমা থাকে না। আমরা যথাসাধ্য করার চেষ্টা করি।

গত বর্ষা তেমন ভয়ংকর ছিল না। তবু বানভাসি মানুষের কিছু পরিচয় পেয়েছে প্রণতি। দেশের বাড়িতেও বন্যা হত। অনেক গরিব মানুষ কিছুদিনের জন্য ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিত। জল নামলেই ওরা ফিরে গিয়ে আবার নতুন কুঁড়ে বাঁধত। নদীর অববাহিকার এ তো চিরন্তন চিত্র।

ক্যাম্পাসের বাইরে প্রণতির বাড়ির অদূরেই একটি হিন্দু-মুসলমানের বসতি আছে। দরিদ্র এই মানুষগুলো মূলত খেতমজুর। এদের অনেকেই বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ও-পার থেকে এসেছিল, আর ফিরে যায় না। এরা এখন নিজেদের অসমিয়া বলে। ওদেরই একটি মেয়ে প্রণতির বাড়িতে কাজ করে। প্রথমে নাম বলেছিল শেফালি। মেয়েটিকে বহাল করেছিল দুটি কারণে—এক, এত রোগা মেয়ে আর দেখেনি বললে ভুল হবে না। হাড়ের উপর চামড়া যেন তেন মুড়ে দেওয়া। বছর চোদ্দো বয়স হলেও শরীরে ঋতু সমাগমের কোনো বহির্চিহ্ন নেই। দুই, ওর কালো চোখের দীধিতি। কৃশ মেয়েটির এমন বাঙ্ময় চোখ অভাবনীয়। প্রণতি জানতে চেয়েছিল, স্কুলে যায় না কেন? জবাব পেয়েছিল, বাবা মারে।

কিছুদিন পর যমুনা ধরতে পারেন মেয়েটি নাম ভাঁড়িয়ে কাজ করছে। সতর্কতা সত্ত্বেও মুখ ফসকে গোসলের পানি বলে ফেললে যমুনা চেপে ধরেন। প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে শেফালি বলতে বাধ্য হয় ওর প্রকৃত নাম আমিনা। নাম বলেই ও আবার জানতে চায়, আপনারা আমাকে আর কাজে রাখবেন না তো!

— এত মিথ্যে বললে কেন রাখব!

— বাবা আমাকে খুব মারবে। দয়া করে কারুকে বলবেন না সত্যিটা। তা হলে কেউ আমাকে কাজ দেবে না।

মেয়েটির করুণ কণ্ঠ ও কাতর চোখ দেখে মায়া হল যমুনার। এই বয়েসী একটি নাতনি তাঁর থাকতেই পারত। বললেন, আমি কারুকে বলব না। তুইও বলবি না। যেমন কাজ করছিলি করবি।

ঝরঝর করে কেঁদে মেয়েটি বলল, আপনে বড়ো ভালো দিদিমা — বড় ভালো।

প্রণতি সব শুনে বলল, এইসব দেখেশুনে মনে হয়, আমরা কোন্ সমাজে বাস করছি। ওইটুকু মেয়ে শুধু কোনোমতে বেঁচে থাকার জন্য নিজের অস্তিত্বকেও মিথ্যার বেসাতি করছে! কী মর্মন্তুদ, মা!

সেন্দরের ছাড়পত্র নিয়ে বাবাইয়ের চিঠি এসেছে। যমুনা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, নাতি কী লিখেছে জানার জন্য। প্রণতি, তিনি জানেন, সময় নিয়ে চিঠি পড়বে। মাকে লুকিয়ে কাঁদবে। তার পর পড়ে শুনিয়ে মা-র হাতে দেবে। যমুনা আবার পড়বেন। প্রতিটি শব্দের উপর আঙুল বোলাবেন। নিঃশব্দে উচ্চারণ করবেন, ভালো থাকো দাদুভাই, ভালো থাকো। আমরা তোমার পথ চেয়ে বসে আছি, দাদুভাই তুমি যে আমাদের কাঙালের কানাকড়ি! যমুনাকে অপেক্ষায় রেখে পাশের ঘরে প্রণতি পড়ে—

মা,

কয়েকদিন ধরে তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। দিদার কথাও। যখন মাঠে-ময়দানে, জঙ্গলে-অরণ্যে ছুটে বেড়িয়েছি তখন তোমাদের কথা মাথায় ছিল না। এখন এই বন্দিগৃহে, সম্ভবত সংকীর্ণ পরিসরের প্রভাবে, কুণ্ডলিত মন কেবলই তোমার সর্বংসহ কোলে মাথা

রাখতে চাইছে। আমি জানি, তুমি আমার বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ। আমি তোমার সব স্বপ্নের মূলে নির্মম কুঠারাঘাত করেছি। তোমাকে ঠেলে দিয়েছি বরাভয়শূন্য করাল অনিশ্চিত অসহায়তায়। বিশ্বাস করো, মা, আমার কোনো উপায় ছিল না। কলেজে ভরতি হতে এসেই দেখি ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ। হস্টেলে স্ট্রাইক। কলেজ বন্ধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল না হওয়ার শিক্ষা তুমি বা মাস্টারমামা দাওনি। শৈশব থেকে আমার আদর্শ মাস্টারমামা, তিনিই আমাকে রুশ বিপ্লবের কথা বলেন, চীনের লংমার্চের কাহিনীও। সুতরাং নকশালবাড়ির আন্দোলনের আহ্বানে আমার ছুটে যাওয়া ছিল স্বতঃসিদ্ধ। সন্তোষ রাণা বা অসীম চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিখরজয়ী খ্যাতকীর্তি মানুষ যদি শূন্য কাগজের ঠোঙার তুচ্ছতায় ডিগ্রি বা কেরিয়ারের লোভর্দ্র আকর্ষণ ত্যাগ করে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন, তবে আমার মতো ছেলেদের স্থাণু হয়ে থাকা ধিক্কারেরও অযোগ্য অ-কর্ম হত। সে শিক্ষাও তুমি দাওনি আমাকে।

গ্রামে-গ্রামে জঙ্গলে বাজারে ঘুরতে-ঘুরতে কত হিরে মুক্তোর চেয়েও দামি মানুষের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পেয়েছি, আমার বার বার মনে হয়েছে দেশমৃত্তিকার গর্ভ থেকে উঠে আসা এইসব খাঁটি, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, অমায়িক ও বৎসল মানুষজনকে অবহেলা করে শহুরে, মেকি চাকচিক্যের অন্তঃসারশূন্য অবিবেকী, ভণ্ড, নিপীড়ক, ধান্দাবাজ মানুষকে তোষণ করে দেশ ও সমাজের কোনো উন্নতি বা বিকাশ অসম্ভব। সহস্রাব্দ প্রাচীন এই জগদ্দল ব্যবস্থার অবসান অনিবার্য। এই অনিবার্যতার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতাধর হাতগুলির বিকেন্দ্রিকরণ। বন্দুকের নলের দিকে পুনর্নির্ধারণ। এত কাল বন্দুকের নল ছিল শোষিত নিপীড়িত মানুষের দিকে, এখন সময় গুলো লুঠেরাদের দিকে তাক করার।

আমাকে লুঠেরাদের দলে দেখলে তুমি কি খুশি হতে? হয়তো বলবে বিপদে পড়তে হত না, জীবনের ভেলা এখনই এমন টলমল করত না। তাও কি বলা যায়! কিছু নিশানা অভ্রান্তরূপে লুঠেরাদের বিদ্ধ করেছে। নিন্তরঙ্গ জলে আলোড়ন উঠেছে। চক্রবৃদ্ধিহারে, কিংবা তার চেয়েও ঢের বেশি গতিবেগে চলতে থাকবে বলায় বিকাশন। রাঘবেন্দ্র রায়কে আমি ভুলে যায়নি। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

প্রায় একশো বছর লেগেছে আরও একশো বছর আগে শুরু হওয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে। আমরা বলছি জরাজীর্ণ সভ্যতার শিকল ছেঁড়ার কথা। এ অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ — আমরা জানি। এও জানি পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তনই অমোঘ স্থিতাবস্থা, অনৃত, অনিত্য। ইতিহাস আমাদের দিশারী। ভবিষ্যৎ পাঞ্চজন্য।

মা, জানি না আবার কখনও তোমার সামনে দাঁড়াতে বা যা আসলে আমার কাম্য— তোমার কোলে মাথা রাখতে পারব কি না। ওপার বাংলার কবি শামসুর রহমানের ভাষায় বলি, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছি, এ-আমার এক ধরনের অহংকার'। নাও থাকতে পারতাম। ক-দিন থাকব তা জন্মাদেরা জানে। আমি না থাকলেও জেনো তোমার সহস্র সন্তান আছে যারা তোমার বাবাইয়ের বিশ্বাসে অনুরক্ত ভাই। তারা প্রাণপণে দূষিত দুনিয়াকে জঞ্জালমুক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাহসিনী মা আমার, বলো তো প্রসব আর্তনাদের শঙ্কায় কোনো রমণী কি মাতৃত্বে অনীহ হয়! ভাবো সমগ্র নারীসমাজ যদি এই ভয়ে মাতৃত্বে অনীহ থাকে তবে মানবপ্রজাতির কী হবে! অন্ধকারে কারুকে না কারুকে তো দেয়াশলাই জ্বালাতেই হয়। খুঁজে

নিতে হয় যথাযথ সুইচ। আমি বিশ্বাস করি, তুমি কাপুরুষ সন্তানের জননী হওয়ার অবমাননা প্রার্থনা করোনি। আমি না থাকলে জানবে, আমি তোমাকে রেখে গেছি অনিবার্য বিপ্লবের হাতে।

তোমাদের বাবাই

চিঠিটা কতবার পড়েছে গোনা হয়নি। প্রণতির চোখ অক্ষর লাইনের সারি পেরিয়ে গেছে বার বার। কিন্তু মস্তিষ্কের জমাট কুজ্ঝটিকা, বুকের মধ্যে ফেনিল বিপ্রতীপ অনুভবের কূটাভাসেও নিথর। বাঁধভাঙা বন্যার মতো অশ্রু বয়। আবার অনন্যব্রতী পুত্রের জন্য মমতাময়-শ্লাঘাবোধও জাগে। যারপরনাই বিমূঢ়তায় চেতনা আচ্ছন্ন। আবেগের ঢেউগুলির কোনোটা যদি হয় অব্যক্ত বেদনার, অন্যরা পুলকিত হর্ষের।

দরজায় করাঘাত। যমুনা ডাকেন, টুনু—

আঁচলে চোখ মুখ মুছে বেরিয়ে এল প্রণতি। অন্যদিন ছেলে কী লিখেছে তা নিয়ে নানা কথা বলে। আজ কিছু না-বলে চিঠিটা মা-র দিকে বাড়িয়ে ধরল।

যমুনা বললেন, কথা বলছিস না কেন? দাদুভাই কেমন আছে?

— কেমন আছে জানি না। বেঁচে আছে এখনও। তুমি পড়ে দ্যাখো।

—তুই এভাবে বলছিস কেন!

কিছু না বলে প্রণতি আবার ঘরে ঢুকে গেল।

যমুনা চোখের চশমা ঠিক করে চিঠিটা খুললেন। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়া শুরু করলেন। অনেকটা সময় ধরে পড়েন তিনি। কোনো-কোনো লাইন দু-বার তিনবারও পড়লেন। পড়া শেষ হলে বিহ্বল বসে থাকেন যমুনা। হঠাৎ তাঁর ভীষণ শীত-শীত লাগে। হাত পা যেন সাড়হীন। ভাবলেন মেয়েকে ডাকবেন। ওর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকা দরকার।

তখনই আদিগন্ত মড়মড় ধ্বনি ছড়িয়ে প্রবল বজ্রপাত হল। সন্ধ্যার কালো আকাশ ছিঁড়ে খুঁড়ে বিদ্যুৎ জ্বলে। প্রপাতের শব্দে বৃষ্টি নামে। প্রণতি বেরিয়ে এসে বলল, ভিতরে যাও মা। জলের ছাট আসছে।

যমুনা বললেন, আমার খুব শীত করছে টুনু।

প্রণতি মাকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে ধীরে-ধীরে ঘরের ভিতরে নিয়ে বলল, শোবে একটু?

— না, না। এখন শোবো কী! সন্ধ্যাপুজো বাকি। একটা চাদর দে আমাকে!

মা-র গায়ে এন্তি চাদর চাপিয়ে প্রণতি বলল, গরম চা খাও। আমি করছি।

বৃষ্টির প্রকোপ বাড়ে। টিনের ছাউনিতে ঘুঙুরের বোলা বাজে। হঠাৎ তবলা লহরার মতো শব্দ হয়। প্রণতির মাথায় বিনবিন করে গানের সুর—'আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে'। কখন যে গুনগুন আরম্ভ করল বলা কঠিন। 'তার ছিঁড়ে গেছে কবে/একদিন কোন্ হাহা রবে' গাইবার সময় গলা কাঁপিয়ে উঠল। মনে হল স্বরতন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে যেন! মুখে আঁচল চাপা দিয়ে প্রণতি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির অবিরাম ঝরে পড়া দেখে। জগৎসংসারে এখন বারি-পতনের ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। জেলে কি বৃষ্টি দেখা যায়? শোনা যায় বৃষ্টির শব্দ? হাতের কোষে বৃষ্টির ফোঁটা ধরার খেলা খুব প্রিয় ছিল বাবাইয়ের। কত যে বকুনি দিয়েছে প্রণতি। মনে পড়তেই চোখ ভিজে ওঠে।

—টুনু—

মা-র কাছে দাঁড়িয়ে প্রণতি বলল— কী মা?

— মনে হচ্ছে শেফালি আজ আর আসতে পারবে না।

— বৃষ্টি একটু না-ধরলে কী করে আসবে?

— এই বৃষ্টি সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না।

— তুমি কী খাবে? রুটি, নাকি খিচুড়ি করব?

— রুটির ঝামেলা বাদ দে। খিচুড়ি করে নিলেই হবে।

— তোমার পুজো শেষ হয়েছে?

— আর পুজো! নেহাত অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই। নইলে আমিও বুঝি এখন, পুজোআচ্ছা করে কিছু হয় না। কপালের লিখন খণ্ডাবার কোনো উপায় নাই।

সারারাত টানা বৃষ্টির পর সকালে আকাশ একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। সেই সুযোগে তৈরি হয়ে স্কুলে গেল প্রণতি। যমুনার গায়ে জ্বর। শরীর না-দিলেও ঘরের কাজে হাত লাগাতেই হয়। প্রণতি যতই বলুক, স্কুল থেকে ফিরে সব সারবে, যমুনা কি চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারেন! মেয়েটা আর কত করবে? একটু বেলা হলে কাজ শুরু করবেন ভেবেছিলেন যমুনা। তার আগেই এল শেফালি। বলল, গত সন্ধ্যায় বৃষ্টির জন্য আসতে পারেনি। তবে নদীতে জল বেড়েছে। ওদের মহল্লা ভাসি-ভাসি করছে। আরও বৃষ্টি হলে যে কী হবে বলা দুষ্কর।

স্কুলে ফাদার জোসেফও সকলকে আপৎকালীন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। জলমগ্ন অঞ্চল থেকে দুর্গত মানুষ যদি স্কুলে আশ্রয়ের সন্ধানে আসে তার জন্য কী-কী ব্যবস্থা করা দরকার হবে, কে কোন্ দায়িত্বে থাকবে তারও বিশদ সূচি তৈরি করা হল।

প্রণতি বলল, ফাদার, আমি বৃদ্ধা মাকে নিয়ে একা থাকি। আমাকে এমন দায়িত্ব দেবেন না যা পালন করতে অপারগ হই।

ফাদার বললেন, তোমার অবস্থা জানি আমি। সেজন্যে লিস্টে তোমার নাম রাখিনি। যেমন দরকার হবে বলব।

প্রণতি জানতে চায়, আপনি সত্যি ভাবছেন বন্যা হবে?

—ভাবছি না। শুধু সাবধান হচ্ছি। প্রস্তুতি নিচ্ছি। দু-বছর আগের বন্যায় আমরা অপ্রস্তুত থাকায় দিশাহারা হয়েছিলাম। অথচ আমাদের ক্যাম্পাসে অন্তত হাজার খানেক মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

—এত মানুষের খাবারদাবার ওষুধপত্র—

—আমরা যতটা পারি করি। প্রশাসনও এগিয়ে আসে। অন্যান্য মানুষ ও সংগঠনও সাহায্য করে। সবচেয়ে দরকার হয় সেবা-র আর মানুষের মধ্যে সাহস ও বিশ্বাস জাগিয়ে রাখার। হিয়ার আই উইল নিড ইউর হেল্প।

মাঝেমাঝেসামান্য বিশ্রাম নিলেও বৃষ্টি চলল সারাদিন। উত্তাল বয়ে চলে পুঁটিমারী কানা-ভরা জলভার নিয়ে। গায়ে জ্বর নিয়ে যমুনা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন সারাদিন। দুপুরে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। শেফালি ধরে সামলে নেয়। ও-ই মাথা ধুইয়ে গা মুছিয়ে দেয় গরম জলে। মাত্র একটা রুটি খেয়েই উঠে পড়েন যমুনা। তাঁর মুখে কোনো স্বাদ নেই। বার বার নাতির কথা মনে আসে। জেলে ছেলেটা কী খেতে পাচ্ছে? এমন একবস্ত্রা ছেলে,

নিজের কথা কিছুই লেখেনি। অথচ যমুনার তো সব জানতে ইচ্ছে করে। কী খাচ্ছে, কেমন থাকছে, বিছানাপত্র কতটা পরিচ্ছন্ন, পাথর ভাঙার মতো খাটুনি দিতে হয় কি না, অসুখবিসুখ হলে কী করে। কবে ছাড়া পাবে তার কোনো আভাসও দেয়নি। ওর কি মা-দিদাকে দেখতে ইচ্ছা করে না?

স্কুল থেকে ফিরে মাকে শুয়ে থাকতে দেখে প্রণতি কপালে হাত দিয়ে জ্বরের আন্দাজ নেয়। জ্বর তেমন বেশি নয়। তবু বলল, কেমন লাগছে মা? ডাক্তারকে আসতে বলব?

যমুনা বললেন, ডাক্তার কী হবে! এখন তো বেশ ভালো আছি। বৃষ্টির জন্যে ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে এই যা।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও যমুনা বিছানা ছাড়লেন না। প্রণতি বলল, মা, পুজো দেবে না?

যমুনা বললেন, উঠতে ইচ্ছে করছে না। তোর ইচ্ছে হলে যা পারিস কর। না পারলে থাক।

— রাতে কী খাবে?

—একটু পোস্তর বড়া করবি? আর খিচুড়ির সঙ্গে বেগুনি।

খেলেন খুব অল্প। তবু যমুনার মুখের তৃপ্তির হাসির আঁচড় ছিল অনবদ্য। নিজের হাতে মেয়ের মুখেও গ্রাস তুলে দিলেন। বললেন ছেলেবেলায় তোর খুব বেগুনির লোভ ছিল। দাদুভাইও তোর স্বভাব পেয়েছে।

শোওয়ার সময় যমুনা ডাকলেন, টুনু, আয় আমার কাছে শো।

প্রণতি বলল, আমাকে ভোরে উঠেই যেতে হবে। ফাদার বলে দিয়েছেন।

— বেশ তো, যাবি। ঘুমিয়ে থাকলে আমাকে আর ডাকিস না।

বুকের কাছে টেনে যমুনা মেয়ের মাথায় কপালে হাত বোলান। অনেকক্ষণ ধরে চুলে বিলি কাটেন। স্নেহের উষ্ণতায় প্রণতির ঘুম আসে। স্নিগ্ধ নিশ্চিতির ঘুম। এক সময় যমুনার আঙুলের চঞ্চলতা থেমে যায়।

একটু পরে যমুনা দেখেন একটা হাঁটু জলে ডোবা খেত পেরোচ্ছেন। অনেকটা সামনে স্বামী হরিশ দত্ত। যমুনার পায়ের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে অসংখ্য মাছ। কই, ল্যাটা, কেকে, মৌরলার ঝাঁক। হরিশ ডাকেন, তাড়াতাড়ি এসো। বাড়ি গিয়ে হামিদকে পাঠিয়ে দেব জাল দিয়ে। যমুনা বললেন, আমি ধরব? হরিশ মাথা নাড়েন। হাত বাড়িয়ে ডাকেন, পা চালিয়ে এসো। জল বাড়ছে। যমুনা পা বাড়ান। জলের ঢেউয়ের শব্দ শুনতে বেশ লাগে। ভাটিয়ালির টুকরো সুর যেন। হরিশ ডাকেন, কই এসো। হঠাৎ বাবাইয়ের হাততালি। ও নেচে-নেচে বলছে, হরু ছোয়ালি—হরু ছোয়ালি—আমাকে ধরতে পারে না, আমাকে ধরতে পারে না! যমুনা বললেন, ওরে দুষ্টু ছেলে, আমি ধরতে পারি না! ভেবেছ দরজার আড়ালে লুকোলে আমি খোঁজ পাব না! দরজার কপাট খুলে যমুনা দেখলেন বাবাই মায়াচ্ছন্ন জলমগ্ন উঠোনে নেচে-নেচে বলছে, দ্যাখো দিদা, দ্যাখো— ময় কিমান ডাঙর হইছু (আমি কত বড়ো হয়েছি)। হরিশ ডাকলেন, আর কত দেরি করবে!

পা বাড়াতেই যমুনা চাতাল থেকে পদস্থ হয়ে জলে পড়ে গেলেন। জলের প্রবাহে তাঁর শরীর বন্দি। যমুনা ডাকার চেষ্টা করেন—টুনু। ডুবন্ত মুখের উপর বৃষ্টির তাণ্ডব। যমুনার খুব ঘুম পায়। তিনি জানতে চান, দাদুভাই, মাকে দিয়ে গেলে বিপ্লবের হাতে, আমাকে কার কাছে

ফেলে গেলে?

ভোরের আগেই দুদ্দাড় জলের তোড়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় প্রণতির। পাশে মা নেই। ঘরের দরজা খোলা। জলে ঘরের মেঝে ডুবে গেছে। প্রণতি চিৎকার করে—মা—মা। সাড়া না পেয়ে বাথরুমে উঁকি দেয়। কেউ নেই। বারান্দায় পা রেখে দ্যাখো জল প্রায় পায়ের ডিম ছোঁয়। উঠোন বারান্দা রাস্তা সব একাকার। প্রণতি এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করে বার বার ডাকে, মা—মা—মা।

ভোরের আকাশে ছায়াময় আলো বিকশিত হয়। সেই আলোয় প্রণতি দেখে উঠোনের জলে এক টুকরো কাদামাখা শাদা কাপড় জলের ঢেউয়ে শিশু হাতের ভীরু পতাকার মতো কাঁপছে। উঠোনে পা নামাল প্রণতি। হাঁটু ডুবে গেল। কাপড়ের কাছে পৌঁছবার আগেই ওর পা লাগে যমুনার হাতে। প্রণতি ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে তুলে ধরল যমুনার নিঃস্পন্দ দেহ। ওর আর্তস্বর বজ্রনাদের মতো আদিগন্ত ছড়ায়।

ছুটে এল প্রতিবেশীরা। খবর গেল ফাদার জোসেফের কাছে। এবারের বন্যায়, প্রথম বলি সন্দর্শনের জন্য বাড়ে মানুষের ভিড়। সমবেদনার প্লাবনে টইটুম্বুর প্রণতির চোখে আর একবিন্দু জলও দেখা গেল না। পরে ফাদার জোসেফকে জিজ্ঞেস করেছিল, এর পরও আপনি আমাকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দেবেন?

১৯.

জরুরি অবস্থা ঘোষণায় যত অবাক হয়েছিল, তার চেয়েও ঢের বিস্মিত হল উদয়ন, আচমকা নির্বাচন ঘোষণায়। মিসায় বন্দি হাজার-হাজার মানুষকে মুক্তি দেওয়া হল। সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিম বাংলায়ও শুরু হল নির্বাচনের প্রস্তুতিতে জোট বাঁধা। প্রত্যাশিত ফলাফলে কেন্দ্রে সরকার বদলায়। কয়েকমাস পরে নয়টি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গে আসীন হয় বামফ্রন্ট সরকার। প্রবোধের চাপে এই নির্বাচনেও উদয়ন সক্রিয় থাকে। প্রচারের জন্য বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে গেলে ওর মনে পড়ত ভবতোষ করের মন্তব্য—আমি তো কংগ্রেসকে ভোট দ্যাওনের কথা চিন্তাই করতে পারি না। উদ্বাস্তুরা ক্যান কংগ্রেসকে ভোট দিব কইতে পারেন? যে রিফিউজিরা কংগ্রেস করে, তারা হগ্গলে বিভীষণ নয়তো বেজন্মা। আর নয়তো ধান্দাবাজ।

উদয়ন প্রতিবাদ করে বোঝাবার চেষ্টায় বলত, অত কঠিন কথা বলা ঠিক নয়। গণতন্ত্রে সকলেরই আপন মতের অধিকার আছে।

নতুন সরকার নকশালদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও বাবাইয়ের মুক্তি পেতে চার মাস দেরি হয়। হত্যার অভিযোগ প্রত্যাহার করা নিয়ে সরকারের মধ্যে চাপান-উতোর চলে।

জেল থেকে বেরিয়ে বাবাই ভাবে, কোথায় যাবে? মার কাছে যাওয়ার আগে সতীর্থদের খোঁজ দরকার। ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কী হবে তাও ভাবতে হবে। পুরোনো আড্ডা বা যোগাযোগ কেন্দ্রে গিয়ে হতাশ হল। পরিচিতরা কেউ নেই। অনেকেই মৃত বা নিরুদ্দেশ। কেউ-কেউ পঙ্গু। বিপ্লবের শিখার আঁচ পেল না কোথাও। ভাবল কলকাতায় কয়েকদিন থেকে আরও খোঁজ-খবর নেবে। কিন্তু থাকবে কোথায়? সবিতা বিয়ের পর কোথায় আছে জানা নেই। যাদবপুরের

বাড়িতে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। সেখানে শুনল সবিতার ঠাকুর্দা মারা গেছেন। সম্পত্তি ভাগাভাগির পর পবিত্র তার অংশ বিক্রি করে গড়িয়ায় ফ্ল্যাট কিনে চলে গেছে। সবিতাও গড়িয়ায় থাকে। ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বছর-আটের একটি ছেলে বলল, আপনি স্বাধীন চৌধুরী?

বাবাই মাথা নাড়লে ছেলেটি বলল, পিসি আপনাকে ডাকছে। আসুন।

— কে তোমার পিসি? কোথায় থাকেন?

— এই তো কাছে। আসুন।

বাবাইয়ের পা টেনে চলা দেখে ছেলেটি বলল, পায়ে কী হয়েছে আপনার?

—গুলি লেগেছিল।

— কে মেরেছে—পুলিশ?

বাবাই মাথা ঝাঁকায়।

— পুলিশরা খালিখালি গুলি চালায়। হাতে বন্দুক থাকে তো। ওদের বন্দুকগুলো কেড়ে নিতে হবে।

— কে কাড়বে?

— আমি কাড়ব। আর-একটু বড়ো হই।

ছেলেটির সঙ্গে ঘরে ঢুকে বাবাই দেখে সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে অমৃতা। কিন্তু এ কোন্ অমৃতা? পরিপাটি ঘন কালো দীর্ঘ চুলের বদলে ঘাড় পর্যন্ত অবিন্যস্ত চুল। মুখের রেখায় ক্লিষ্টতা। চোখের নীচে গাঢ় কালির ছোপ। পরনে সবুজ ফুল-তোলা ম্যাক্সি। ওকে দেখে অমৃতার চোখে উজ্জ্বলতা ফোটা ছাড়া অবয়বে আর কোনো বদল হয় না। বাবাই বলল, এ কী এ কি চেহারা হয়েছে তোমার?

ম্লান মুখে অমৃতা বলল, বোসো, কবে ছাড়া পেলে?

মুখোমুখি সোফায় বসে বাবাই জবাব দেয়—পরশু।

অমৃতা বলল, তোমার গলা শুনতে পেয়ে বুবুনকে পাঠালাম। নইলে তো আসতে না।

— তোমাদের বাড়িতে আগে কখনও আসিনি। তাই সবিদির খোঁজে এসেছিলাম। কিন্তু এ-অবস্থা কেন?

—নিজেকে দেখেছ? ওই প্রশ্ন তো আমারও। আমরা তো কেউ স্যানিটোরিয়ামে ছিলাম না। সুতরাং সেসব থাক। খুঁড়িয়ে হাঁটছ, গুলি লেগেছিল?

—হ্যাঁ।

—তাই ধরা পড়লে?

— না। ধরা পড়েছি অনেক পরে। বাসস্টপে।

— তোমার অ্যারেস্টের খবরে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি— জানো। তোমাকে বাঁচাবার জন্য যা করেছি সব বৃথা গেল।

— কেন?

—আমাকে ধরেছিল তোমার খবরের জন্য। খবর না পেয়ে আক্রোশে যা করেছে তার কাছে বর্বরতাও লজ্জা পাবে। যাকগে, এখন কী করবে?

— সেটাই তো ভাবছি। কারোর সঙ্গেই যোগাযোগ হল না। অনীশদা কোথায় জানো?

জয়ন্ত, সুব্রত, অশোক, রঞ্জন, দেবারতি, বিশাখা—

—স্মৃতিভারে শুধু আমরা পড়ে আছি, স্বাধীন। অনীশদা, রঞ্জন আমেরিকায়। সুব্রত লন্ডনে। বিশাখাও। জয়ন্ত আই.এ.এস. হয়েছে। প্রবালকে মনে আছে— ও অধ্যাপনা করছে হুগলি মহসিনে।

— কে বলল এসব! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

— তোমার কি ধারণা মিথ্যে খবর দেওয়ার জন্য তোমাকে ডেকে এনেছি? প্রবাল খবর পেয়ে আমাকে দেখতে এসেছিল। ওই সব বলল। তোমার খোঁজ করেছিল। এখন তো বামফ্রন্ট সরকার। অনেকে সরকারি অনুগ্রহের আশায় এ-দলে সে-দলে ঢুকে পড়ছে।

—তুমি কিছু করছ না?

—কী করব ভাবছি। শরীরের যা অবস্থা—

— কী হয়েছে তোমার বলছ না কেন?

— কত বলব। কীভাবে বলব! সব বলা যায় না, স্বাধীন। যত কদর্য অত্যাচারের কথা ভাবতে পারো সব করা হয়েছে আমার উপরে। ভাবিনি বাঁচব। আশ্চর্য তবু বেঁচে আছি। এখনও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারি না।

বাবাই উঠে অমৃতার মাথায় হাত রাখল। অমৃতা হাত টেনে নিজের দুই হাতে ধরে বোলায়। নিথর শব্দহীন সময়। ওই সময়ে উচ্চারণ বেমানান।

একটু পরে বাবাই বলল, বেলা বাড়ছে। এবার যাই, অমৃতা।

— কোথায় যাবে? তোমার মা-দিদা কোথায় আছেন?

— দিদা আর নেই। মা কার্শিয়াংয়ে।

— সে কী! আসামে ছিলেন না?

—বন্যায় সব ভেসে গেছে। দিদাও। মা একা আর ওখানে থাকতে পারছিলেন না।

—মার কাছে যাবে এখন?

— যেতে তো হবেই। এখনই কি না বলতে পারছি না।

—আবার এসো। আসবে তো? আর, নতুন করে কিছু শুরু করলে আমাকে ভুলে যেয়ো না যেন।

যাদবপুর থেকে বাসে এসপ্লানেড এসে ডায়মণ্ডহারবারের বাস ধরল বাবাই। শেষবার দেখা করতে গিয়ে উদয়ন অনাথ আশ্রমের ঠিকানা দিয়েছিল। ওই অঞ্চলে কয়েকজন পুরোনো কমরেডের বাড়ি। তাদেরও খোঁজ করার চেষ্টা করা যাবে। বিশেষত আক্রাম হোসেন, রফিক আলি, পবন ঢাল।

ওকে দেখে উদয়ন অবিশ্বাস্য চোখে বলল, এ কী চেহারা করেছিস?

— জেল ফেরত আসামির মতো লাগছে না?

শীর্ণ শরীর, জীর্ণ পোশাক, না-কামানো দাড়ি-গোঁফ, উশকোখুশকো চুলে বাবাইকে ভঙ্গুর দেখাচ্ছিল। জেলে ওকে এমন দুঃস্থ মনে হয়নি উদয়নের। হয়তো তখন মানসিক মগ্নতা থাকত অন্যরকম। স্মৃতির ছবি সবল পরিশীলিত যে যুবক, প্রত্যক্ষ মূর্তি যেন তার কার্টুন। উদয়ন বলল, যা, স্নান করে পরিচ্ছন্ন হ দেখি।

—মামা, আগে বলো, মা কেমন আছে?

—মার কথা ভাবিস তুই? কত বলেছিলাম। শুনিসনি। তোর পথ চেয়ে আছেন।

পাঁচ দিন উদয়নের কাছে থাকল বাবাই। আলোচনা করল নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। উদয়নের পুনরায় পড়ার পরামর্শ পছন্দ হল না। চাকরি পাবে কি না বলা অতীব দুরূহ। রাজনীতি— ওর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা। উদয়ন বলল, অরাজকতাও বলা যায়, যতদূর শুনি।

খোঁজ নিতে গিয়ে শুনল, পবন খুন হয়েছে। আক্রাম বাসের পারমিট জোগাড় করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে বাস মালিক বনেছে। রফিকের ডান পা হাঁটুর নীচ থেকে নেই। হাসপাতালে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। ও আবার সংগঠন গড়ার স্বপ্ন দেখে। রফিক বাবাইকে অমৃতার উপর পুলিশি অত্যাচারের বিশদ জানিয়ে বলল, ওর মানসিক শক্তি আর সহনক্ষমতা বর্ণনার ভাষা নেই। শুধু তোমার হদিসের জন্য। ওর মুখ থেকে একটা শব্দও বের করতে পারেনি। রুল ঢুকিয়ে যেভাবে—

—থামো রফিক, থামো।

— না, কমরেড শোনো। আমাকে ওরকম করলে কী করতাম বলতে পারি না। অমৃতা কেমন আছে এখন?

বাবাই উদয়নকে বলল, আশ্রমজীবন তোমার কেমন লাগছে?

—খুব ভালো লাগছে। এইসব অসহায় খুদেগুলোকে দেখে অনুভব করি, জীবনটা একেবারেই বৃথা যায়নি। মানবতার জন্য কিছু করছি এত প্রত্যক্ষভাবে আগে কখনও বুঝিনি। তোর কেমন লাগছে? ঘুরেটুরে তো দেখলি।

—ব্যবস্থা খুব সুন্দর। মানুষজনও খুব সজ্জন, আন্তরিক মনে হল। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এমন আশ্রমের দরকার হবে কেন? রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের প্রাথমিক দায়িত্বও পালন করবে না?

উদয়ন বলল, তোর যখন ইচ্ছে হবে চলে আসিস। পছন্দ হলে এখানে কাজও করতে পারবি। এক জোড়া অতিরিক্ত হাত সদাই স্বাগত। এখানে কাজ করার জন্য সন্ন্যাসীও হতে হয় না, বিপ্লবীও হতে হয় না। তবে আন্তরিক মানুষ হওয়া আবশ্যক।

বাবাই বলল, মামা, তুমি তো সারাজীবন রাজনীতির আবহে কাটিয়েছ। স্বদেশি করেছ, গণ-আন্দোলনেও ছিলে। এরা বলছে গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে বামফ্রন্ট। নতুন সরকার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

—ঠিকই বলছে। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমেই বামফ্রন্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এদের সামনে বিশাল সুযোগ। কিন্তু আগের যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে আমি খুব আশাবাদী হতে পারছি না।

— কেন?

—এই বামফ্রন্টে অনেক ভালো সৎ গুণী ও আদর্শবাদী মানুষ আছেন। কিন্তু এঁদের চোখে ঠুলি। এঁদের মধ্যে একজনও নেই যিনি এমার্সনের মতো বলতে পারেন, রাশিয়া ও চীনকে অনুকরণ অনুসরণ করা বা তাদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার দরকার নেই। নিজের দেশের মাটি-মানুষ থেকেই আমরা উপাদান সংগ্রহ করব, প্রেরণা খুঁজব। 'Events, actions arise,... that will sing themselves... there are creative manners, there are creative

actions and creative words... that is indicative of no custom or authority, but springing spontaneous from the mind's own sense of good and fair'.

—তুমি তবে মার্কসীয় আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করো না!

— তোরাও চোখে ঠুলি লাগিয়ে চেঁচিয়ে গেলি, রেড বুক লাল সেলাম। লিন পিয়াও — লাল সেলাম। আমি মনে করি চ্যারিটির মতো আন্তর্জাতিকতাও নিজের ঘর থেকে শুরু হয়। দ্যাখ্, আমি আদৌ নেহরুর ভক্ত নই, কোনোদিনই ছিলাম না। তবু তাঁর এই কথাগুলোর আমি সমাদর করি —'a real internationalism is not something in the air without roots or anchorage. It has to grow out of national cultures and can only flourish today on a basis of freedom and equality and true internationalism.'।

একটু থেমে উদয়ন যোগ করে, ইউফোরিয়া কেটে গেলে আমি আশা করব আগের ভুলগুলো এঁরা আবারও করবেন না। আর গিমিকের বদলে সত্যিকারের গঠনমূলক কাজে অগ্রাধিকার দেবেন। যেখানে-যেখানে সম্ভব ঔপনিবেশিক আইনকানুন, কর্মপদ্ধতি বদলাবেন। এটা অত্যন্ত জরুরি। এটা করলেই কেবল মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝবেন যে বামফ্রন্টসরকার অন্য সরকারের তুলনায় কতটা ভিন্ন ও অনন্য।

শিলিগুড়ি রওনা হওয়ার আগে আর-একবার অমৃতার সঙ্গে দেখা করল বাবাই। আলাপ হল ওর মা অনুভা ও বউদি সুনয়নার সঙ্গে। সুনয়নার শারীরিক আকর্ষণ লক্ষণীয়ভাবে তীব্র। তরলার মতোই ভলাপচুয়াস। ঠোঁটের ভাঁজে চাপা হাসি।

অনুভা বললেন, আগের দিন আমরা ছিলাম না। আমার বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম। পুপু বলল, ছাড়া পেয়ে দেখা করতে এসেছিলে।

সুনয়না বলল, জেলে আপনাকেও মারধর করেছে?

কৌতুকের স্বরে বাবাই বলল, জেল তো ঠিক কীর্তনের আখড়া নয়। আমি শুনেছি অমৃতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল।

অনুভা বললেন, কী যে তোমরা করলে বাবা! পুপুর পাঁচ বছরের ছোটো বোনের বিয়ে হয়ে গেল, অথচ পুপু বিয়ের কথা বললেই—

পুপু ওরফে অমৃতা ডাকে, মা— সেদিন ওকে কিছু দেওয়া যায়নি। আজ একটু চা-টা দাও।

সুনয়না বলল, ব্যস্ত হোয়ো না। আমি বলে আসছি।

বাবাই বলল, চা লাগবে না। আমি এখনই উঠব। ট্রেন ধরতে হবে।

অমৃতা বলল, আজই যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

মা বউদির কৌতূহল নিরসনের জন্য অমৃতা জানায়, স্বাধীনের মা থাকেন কার্শিয়াং।

বাবাই অমৃতাকে রফিক আক্রমের কথা বলল। পবনের কথাও। ওদের কাছে শোনা অন্য সহযোদ্ধাদের বর্তমান অবস্থান জানিয়ে বলল, তুমি ঠিকই বলেছিলে। প্রায় সবাই দেখছি রঞ্জন-প্রবাল-সুব্রতর পথে চলে গেছে।

— তুমি কিছু ঠিক করেছ?

— এখনও করিনি। মার কাছে গিয়ে ভাবব।

— আবার এসো, বাবা।— বলে অনুভা উঠে গেলেন।

সুনয়না বলল, ও বিয়েতে রাজি হচ্ছে না কেন জানেন?

বাবাই বলল, না, জানি না। ইচ্ছে হলে নিশ্চয় করবে।

অমৃতা বলল, আমি কতটা নারী আছি জানি না। কিন্তু আমার উপর যা হয়েছে তা জানার পর কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে কি না, আই ডাউট।

—রাবিশ!—বাবাই চুপিস্বরে বলে, কী যা তা বলছ! তোমার মুখে এখন পচা ফিউডালিটিক কথা মানায় না।

সমর্পণের ভঙ্গিতে অমৃতা বলল, স্বাধীন, আমরা সমাজ-বদলে ব্রতী হয়েছিলাম, ঘটাতে পারিনি। জগদ্দল রয়ে গেছে অবিকল। তা ছাড়া

'To each his world is private,
and in that world one excellent minute.
And in that world one tragic minute,
These are private.

বাবাইয়ের মুখে হাসি ছলকায়—ইভতুশেঙ্কো! কত বছর আগে বলেছিলাম। এখনও মনে রেখেছ! যাকগে, আর দেরি করলে ট্রেন মিস করব।

নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়ে কীভাবে কার্শিয়াং যাবে ভাবছিল বাবাই। বাসে বা জিপে যাওয়া যেতে পারে। বাসস্টপ কোথায় দৃষ্টি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল। এটা ওর স্বভাব। প্রথমে নিজে দেখবে অন্যের সাহায্য ছাড়া খুঁজে পায় কি না।

না পারলে কারুকে জিজ্ঞেস তো করাই যাবে।

—স্বাধীনদা—

এখানে ওকে কে ডাকবে! তবু শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে দেখল ইটরঙের সাফারি সুট পরা এক সুদর্শন যুবকের আনন্দ উদ্ভাস।

—স্বাধীনদা, আমাকে চিনতে পারছেন?

চিনতে পারল না বাবাই। চেহারায় অনেক বদল। মহার্ঘ বেশভূষা। তবু মুখের আদলে স্মৃতির তারে পরিচয়ের টঙ্কার। বলল, কিছুটা পারছি। তবে নামটা মনে পড়ছে না।

—আমি চিত্ত, দেবলদার—

লোডশেডিং-এর পর আলো জ্বলার মতো স্মৃতির পসরা আছড়ে পড়ল বাবাইয়ের মাথায়। চিত্ত রায় ওদের তিন চার বছরের জুনিয়র ছিল। সম্পর্কে দেবলের পিসতুতো ভাই। দেবলের বাড়িতেই বার-কয়েক দেখা হয়েছিল। মনে আছে, বাবাইয়ের খেলা ও স্কুলের রেজাল্ট চিত্তর কাছে নায়কপ্রতিম ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছিল।

চিত্তর হাত ধরে বাবাই বলল, কত বড়ো হয়ে গেছ! তুমি এখানে কেন?

—আমি চা-বাগানে আছি। কলকাতায় হেড অফিসে কাজ সেরে ফিরছি। আপনি?

—মা আছেন কার্শিয়াঙে। ওখানেই যাচ্ছি। দেবলরা কেমন আছে? বহুকাল কোনো খোঁজ জানি না।

— দেবলদার মা-বাবা দু-জনেই গত হয়েছেন। দেবলদা বঙ্গাইগাঁওতেই আছেন। ছোটো

বোন সুলতা বি. এ. পড়ছে। অন্যদের বিয়ে হয়ে গেছে। আর ভাই কালু বি.এস.এফ -এ আছে, আপনি?

—বললাম যে, মার কাছে যাচ্ছি।

চিত্ত একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরে বলল, এটা রাখুন। কখনও দরকার হলে আমাকে জানাবেন বা চলে আসবেন। বেড়াতেও আসতে পারেন। খারাপ লাগবে না বলতে পারি।

কার্শিয়াং পৌঁছে খুঁজে-খুঁজে জননীর গৃহদ্বারে যখন পৌঁছোল বাবাই, আকাশের আলো ঢেকে পর্বতচূড়ার ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছিল। পাহাড়ের ঢালে বাড়িটা আধা-পাকা। দরজা জানলা বন্ধ। ভিতরের কাচ-ঢাকা আলো জানান দেয় বাড়ি জনশূন্য নয়। তবে শব্দহীন। বাবাই ডোরবেলে আঙুল ছোঁয়ায়। পাখির ডাকের মতো শব্দ বাজে।

প্রণতি দরজা খুলে রুদ্ধবাক। চশমা ঠিক করে ভাবে ঠিক দেখছে তো! বুকের ভিতরে সারাজীবনের আবেগ, আর্তি, স্নেহ, হাহাকার, প্রাপ্তি ও বঞ্চনার উথালপাথাল।

বাবাই বলল, মা—

আর কোনো উচ্চারণ অপ্রয়োজনীয়। কোনো ব্যাখ্যা বা বিস্তার অনভিপ্রেত। ওই একটি শব্দের স্মিত অস্ফুট উচ্চারণ প্রণতির চেতনার গগন-বর্তিকার উল্লাসে অনুরণিত হয়। শুধু এই শ্রুতির জন্যই এক বছরের তিতিক্ষু অধীর উন্মুখতা। যেন কোনো কিশোরকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে সরিয়ে আনছে এমন স্ত্রস্ত ব্যাকুল হাতে ছেলেকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে ওরই বুকে মাথা রেখে অপ্রশম্য রোদন বিলাপে ভেঙে পড়ে। শরীর ফুলে-ফুলে ওঠে। দু-হাতের কোষে ছেলের মুখ ধরে চেয়ে থাকে। বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে পুনরাবিষ্কার করতে চায় নাড়িছেঁড়া জীবনরতন। তার পরই আবার মাতৃবক্ষে আশ্লিষ্ট করে আত্মীক আশ্বাসের প্রত্যয় খোঁড়ে। অব্যাহত অশ্রুধারা অক্ষিপটে যেন অনন্ত জলসঞ্চয়ের অভিজ্ঞান।

পরে—অনেক পরে মাতা-পুত্রের অজানা, না-বলা কথার ভাণ্ডার প্রায় উজাড় হলে প্রণতি ছেলের পায়ে গুলির চিহ্নে হাত বুলিয়ে বলল, তখনই চলে এলে হয়তো এভাবে খুঁড়িয়ে চলতে হত না।

বাবাই বলল, সম্ভব ছিল না, মা। পুলিশ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। তুমি কেন রঙ্গিয়া থেকে চলে এলে?

প্রণতি বলল, মার মৃত্যুর পর আমি ওখানে একা আর থাকতে পারছিলাম না। খবর পেয়ে কানাই এসেছিল। বেচারা আর কতদিন থাকবে। ফাদার জোসেফ নিজেই বুঝতে পারছিলেন। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে ফাদার জোনসকে বলে এখানে কাজের ব্যবস্থা করে দেন। কানাই না থাকলে যে কী করতাম! বন্যায় সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছিল বা ভেসে গেছিল, তবু যা জিনিসপত্র ছিল কানাই বেঁধেছেঁদে এখানে আমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে গেছে।

—এভাবে আর কতবার বাড়ি ছাড়বে, জায়গা বদলাবে, মা!

—কী করব আমার ভাগ্যে কিছুই থাকে না। তোকে ফিরে পাওয়ার আশা তো করতে পারছিলাম না। আমি বোধ হয় আজীবনই বাস্তুহারা থাকব।

প্রাকৃতিক সুষমার সম্ভার, পার্বত্য পবনের অমল প্রবাহ, অলস অবসর ও জননীর পরিচর্যায় অল্প দিনেই বাবাইয়ের শরীরে মনে সবুজ সতেজতার সমাগম। ঘুরে-ঘুরে পাহাড় দেখে। শহরের সঙ্গে সখ্যতা গড়ার চেষ্টা করে। পরিচয় ঘটে মানুষজনের সঙ্গে। নেপালি ভাষা রপ্ত

করার প্রয়াস চালায়। কাজকর্মের সুরাহা হয় না কিছু। বাবাই ক্রমশ নিজের মধ্যে হতাশ অস্থিরতার সংক্রমণ অনুভব করে।

প্রণতি বলে, তোকে কিছু করতে হবে না। তুই শুধু আমার কাছে থাক। আর ফেলে যাস না।

— তা কি হয়! কাজ তো খুঁজতে হবেই। তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেল, আর কতকাল তোমার বোঝা হয়ে থাকব।

প্রণতি প্রতিবাদ করে, সন্তান কখনো মায়ের বোঝা হয় না।

চাওয়ার লজ্জা থেকে রেহাই দিতে প্রণতি ছেলের বালিশের নীচে প্রতিদিন কিছু টাকা রেখে দেয়। বাবাই বিড়ি-সিগারেট খায় না। তবু পকেটে পয়সা আদৌ না থাকলে নিজেকে বেকুব অসহায় লাগে। প্রণতি তা বোঝে।

রোজই বাবাই স্টেশনে আসে। বাস জিপগাড়ির চলাচল দেখে। মানুষ দেখে। স্টেশন ঘিরে বাজার, দোকানপাট। লামার চায়ের দোকানের আড্ডা। মাতালের স্খলিত পদচারণা, আকস্মিক চিৎকার। বাবাই দেখে নগ্ন দারিদ্রের মধ্যেও জীবন কী সরগরম! নকশালবাড়ির কথা কোথাও উচ্চারিত হয় না।

লামার চায়ের দোকানে আলাপ হল গণেশ সুব্বার সঙ্গে। বি.কম. পড়েছিল। পাস করেনি। হাসিখুশি, প্রায় সমবয়েসী ছেলেটিকে ভালো লাগে বাবাইয়ের। সে-ও একসময়ে বামপন্থী রাজনীতির অনুরক্ত ছিল। এখন বিমুখ কারণ বড়ো পার্টিগুলো পাহাড়ি মানুষদের সমস্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে অনাগ্রহী। অথচ সমতলের মানুষেরা সর্বতোভাবে শোষণ করছে পাহাড়ের সরল আনপড় মানুষদের। ব্যাবসাবাণিজ্য সবই প্রায় রাজস্থানি মানুষের দখলে। অফিস-কাছাড়ি, স্কুল-কলেজ, হাসপাতালের চাকরির বৃহৎ অংশে বাঙালির আধিপত্য। ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছে, অসন্তোষ বিক্ষোভ। উসকে দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই।

গণেশ বলল, তোমার মাকে চিনি। আমার ছোটোবোন তাঁর ক্লাসে পড়ে। তুমি কি এখন মার কাছেই থাকবে?

বাবাই বলল, আপাতত। কী করব ভেবে পাচ্ছি না যে!

— চা-বাগানে কাজ করবে?

— চা-বাগানে কাজ পাওয়া যায়?

— যায় না। আবার যায়ও।

— সেটা কীরকম?

— তোমার বোঝার দরকার নেই। আমি খোঁজ নিয়ে বলব তোমাকে।

লামার দোকান থেকে দু-জনে বেরিয়েছে। ওদের গা ঘেঁষে থামল পুলিশের জিপ। জিপ থেমে নেমে এক জন অফিসার বলল, স্বাধীনবাবু! আপনি এখানে?

মলয় শীলকে চিনতে একটুও দেরি হল না। বাবাইকে হাতকড়া পরাবার গৌরব এরই। বাবাই বলল, আপনি এখানে—

বদলি হয়ে এসেছি।

বাবাই বলল, আমার মা থাকেন এখানে।

গণেশ চুপচাপ শুনছিল। কৌতূহলী হয়ে মলয়কে বলল, আপনি একে কীভাবে চেনেন?

মলয় বলল, সে অনেক কথা। স্বাধীনবাবু, আমার উপর রাগ করে থাকবেন না। আমরা হুকুমের চাকর। আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হলে বলবেন।

জিপ চলে গেলে গণেশের জিজ্ঞাসার জবাবে বাবাইকে তার জেলযাত্রার কথা বলতেই হয়। সংক্ষিপ্ত করেই বলে। তবু গণেশের বিস্ময় বিপুল।—তুমি এত বড়ো নেতা! একদম ছুপা রুস্তম। এখন থেকে আমি আছি তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে থাকতে গেলে তোমাকে বুঝতে হবে গরিবের গোর্খা, ভুটিয়া, লেপচা বলে বিভাজন হয় না। পাহাড়ের পাথরভাঙা হাতগুলোর ভাষা বাঙালিও না, নেপালিও না। শুধু একটাই ভাষা ভাঙো। ভাঙো।

২০.

স্বাধীন চৌধুরী আবার স্বমূর্তিতে। কখন কোথায় যায় প্রণতি জানে না। সকালে বেরিয়ে রাতে ফেরে। কোনোদিন ফেরেও না। চা-বাগানের শ্রমিকের মধ্যে বাগান ঘুরে-ঘুরে সংগঠন করছে। কৃষকদের আন্দোলনেও শামিল হচ্ছে। বার-কয়েক দেখা করেছে কানু সান্যালের সঙ্গে। অগ্রগতি উল্লসিত হওয়ার মতো নয়। তবু মনোমতো কাজে ব্যস্ত থাকতে পারার স্বস্তিটুকুও কম কী! সোনাডাঙা চা-বাগানে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরোধ চলছিল। গণেশ খোঁজ নিয়ে জানে ওটা চিত্ত রায়ের কোম্পানির বাগান। স্বাধীন নিজে চিত্তর সঙ্গে দেখা করে দু-পক্ষকেই চাপ দিয়ে বিরোধ মিটিয়ে দিতে সক্ষম হল। ওর এই কৃতিত্ব অনেকেরই পছন্দ হল না।

গণেশের হাত দিয়ে কিছু টাকা আসে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। এবং অনিয়মিত। চিত্ত চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিল। স্বাধীনের কাছে অনুজপ্রতিমের অধস্তন হওয়াটা সম্মানজনক মনে হয়নি। তা ছাড়া চাকরির নিগড়ে আবদ্ধ থাকার মানসিকতাই ওর নেই। অথচ রোজগারের তাড়না আছে।

প্রণতি প্রতিনিয়ত বিয়ের কথা বলছে। ওর বিশ্বাস বিয়ে করলে ছেলের জীবনপ্রণালীর বদল ঘটবে। সাংসারিক দায়দায়িত্বে মনোযোগী হবে। ও নিজেও রেহাই পাবে একাকিত্বের পীড়ন থেকে।

বাবাই বলে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! নিজেরই সংগতি নেই, আবার শঙ্করাকে ডাকা—

প্রণতি বলল, তোর মুখে এসব মানায় না। স্ত্রী মানে ক্ষুধার্ত হাঁ নয়, সেও দুটো হাত-পা, মস্তিষ্ক মেধা নিয়ে আসবে। হবে সহধর্মিণী। — তুই সারাদিন ঘুরছিস। একা-একা আমার সময় কাটে না। তোর কাছে এটা কি আমার বেশি কিছু চাওয়া?

পরদিন গণেশের সঙ্গে স্বাধীনকে যেতে হল কালিম্পং। তার পর লাভা, রঙ্গিয়া হয়ে চার দিন বাদে বাড়ি ফিরে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। প্রণতির পাশে অমৃতা বসে।

—তুমি! কখন? কী ব্যাপার?

অমৃতা বলল, তুমি তো বলবে না কখনও, তাই নিজেই চলে এলাম।

প্রণতি বলল, সেই বিকেল থেকে এসে বসে আছে। আমি তো বলতেও পারছি না তুই কখন ফিরবি, আজ আদৌ ফিরবি কি না।

বাবাই জিজ্ঞাসা করে, তোমার শরীর কেমন?

অমৃতা জবাব দেয়, চমৎকার। নইলে শিলিগুড়ি থেকে এলাম কী করে! এখনই ফিরতে হবে।

— শিলিগুড়িতে! কেন?

— চাকরি। সঙ্গে সামান্য সমাজসেবাও আছে।

— মানে?

ইউনিসেফ-এর টাকায় হার্মিটেজ নামক বেসরকারি সংস্থা উত্তরবঙ্গে অনুন্নত শ্রেণির শিশুদের শিক্ষা স্বাস্থ্যের জন্য সাহায্য ও সেবার ব্যবস্থা করে। অমৃতা হার্মিটেজের কো-অর্ডিনেটর হয়ে এসেছে। শিলিগুড়িতে থাকলেও গত দশ দিনে ওর জলপাইগুড়ি, মালদা, দিনাজপুর ঘোরা হয়ে গেছে।

বাবাই বলল, এতদিন হয়ে গেল, আমাকে কিছু জানালে না!

অমৃতা বলল, তুমি যে অশক্ত পা নিয়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছ, জানিয়েছিলে আমাকে?

প্রণতি বলল, ঠিক বলেছ, অমৃতা। আমার কোনো কথাই তো শোনে না। তুমি একটু বলে দ্যাখো।

হাতের ছোট্ট ঘড়িতে চোখ দিয়ে অমৃতা বলল, সাড়ে সাতটা! এবার যাবো।

—কীসে যাবে?

—আমাদের জিপ আছে।

বাড়িটা হিলকার্ট রোড থেকে অনেকটা উঁচুতে। সরু পাহাড়ি রাস্তায় নামতে-নামতে বাবাই বলল, তোমার এখন চলাফেরায় অসুবিধে হয় না তো?

অমৃতা বলল, না। তোমার?

—আমাকে তো খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবেই।

—পাহাড়ি পথে একটা ওয়াকিং স্টিক রাখতে পারো।

—এখনই বুড়ো সাজতে বলছ!

দু-জনেই শব্দ করে হেসে উঠল।

খাওয়ার টেবিলে বসে প্রণতি বলে, তোদের ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝি না। অমন সুন্দর মেয়েটা কোথায় বিয়ে-থা করে থিতু হবে, তা না, গ্রামে বস্তিতে দুঃস্থ শিশু খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিয়ের সঙ্গে কি সেবার কোনো বিরোধ আছে?

বাবাই দ্বিধাজড়িত স্বরে বলল, অমৃতার বিয়ে করার অসুবিধে আছে বোধ হয়। ও-ই বলছিল। পুলিশ ওর উপর খুব বর্বর অত্যাচার করেছিল।

— কেন?

— মূলত আমার জন্য—মানে, আমার খবরের জন্য। অমৃতা কিছুতেই না দেওয়ায় অমানুষিক উৎপীড়ন— নির্মম শারীরিক লাঞ্ছনা করেছে।

ছেলের মুখের উপর চোখ রেখে প্রণতি বলল, তবে তো তোরই ওকে বিয়ে করা কর্তব্য।

—মা!

— ও তোকে ভালোবাসে বাবাই। ভালোবাসে বলেই এত দূর ছুটে এসেছে তোর খোঁজে।

তুই বুঝেও বুঝতে চাইছিস না। কেন? তোর এই নিষ্ক্রিয়তাও কি মানবিক?

মাসকয়েক পর অতি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ওদের বিয়ে হল। অমৃতার মা-বাবা এলেন কলকাতা থেকে। অসুস্থতার জন্য উদয়ন আসতে পারেনি। গণেশ সুব্বা সহ জনাকয়েক বন্ধু ও সহকর্মীর সঙ্গে ফাদার জোনসও উপস্থিত ছিলেন। প্রণতির ইচ্ছে ছিল ডলি, সীমাকে আমন্ত্রণ জানাবার। বাবাই রাজি হয়নি। মহিলা আত্মীয়স্বজন আসা মানেই আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, লৌকিক আচারের বিড়ম্বনা। সরল রেজিস্ট্রি। সরলতর আপ্যায়ন। উষ্ণ শুভেচ্ছাজ্ঞাপন-এর বেশি আর কী চাই!

অনুভা প্রণতিকে বললেন, জামাইকে কিছুই দিতে পারলাম না। মেয়েও কিছু নিল না। ওর বিয়ের আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা। তবু যে করল—শুধু আপনার ছেলের জন্য। দিদি, আমার মেয়ে সংসারের কিছুই শেখেনি। আপনি ওকে দেখিয়ে শিখিয়ে দেবেন।

প্রণতি বলল, কিছু ভাববেন না। অমৃতা আমার পুত্রবধূ শুধু না, আমার মেয়েও।

—উড়নচণ্ডী মেয়ে আমার, বউ হয়েও গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াবে—আমার পছন্দ হচ্ছে না।

— সে তো ওকে করতে হবেই। ওটা যে ওর কাজ। আমিও তো রোজ স্কুলে যাই। ঘরে ফিরেই মেয়েরা ঘরণী হয়। আপনি তো জানেনই, সংসার করা মেয়েদের শেখাতে হয় না।

প্রথমত বাসর বা ফুলশয্যা না হলেও গণেশ শোওয়ার ঘরে কিছু ফুলের আয়োজন করেছিল। বিছানায় ছড়িয়ে দিয়েছিল বর্ণময় পাপড়ি।

প্রণতি নববধূকে সস্নেহে আবেষ্টন করে যমুনার মালা-পরা ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের কী দুর্ভাগ্য—আমার বাবার, বাবাইয়ের বাবার কোনো ছবি নেই। তুমি এ-বাড়ির বউ হয়ে এলে, অথচ এ-বাড়ির পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলাম না। আমার মা-ই সকলের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের আঁকড়ে রেখেছিলেন। সেই দায়িত্ব আজ থেকে তোমার। তুমি একে ফুলে-ফলে ভাস্বর করে তুলবে।

অমৃতাকে প্রেমার্ত -আশ্লেষে বেঁধে পদ্মকোরকসদৃশ ওষ্ঠে প্রথম চুম্বন করে ফুল্ল সরোবরে নিমজ্জনের শিহরবোধ করে বাবাই। বারংবার চুম্বনে অমৃতার গাঢ় ওষ্ঠের কম্পিত আহ্বানে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ও। উন্মোচনে উদ্যোগী হলে অমৃতা বলল, আলোটা নেবাও।

বাবাই ওর স্তনসন্ধিতে ওষ্ঠ চেপে বলল, না। আমি আমার মানসীকে চাক্ষুষ আবিষ্কার করব।

—তুমি কি পুরোনো কথা ভুলে গেছ? সইতে পারবে না বাবি।

—তুমি নির্দয় যন্ত্রণা সয়েছ আর আমি তার স্মৃতিদৃশ্য সইতে পারব না।

বাবাই স্থির হাতে অমৃতার ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে। সুডৌল সমুন্নত হেমগোলকে কলকাতার রাজপথের মতো খানাখন্দ—সিগারেট চুরুটের দহন চিহ্ন। কী অসম্ভব—প্রকৃত অর্থে যারপরনাই কষ্ট সহ্য করেছে অমৃতা ভেবে বাবাইয়ের অন্তর্ভূমি কঁকিয়ে ওঠে। ও পরম আদরে হাত বোলায়। প্রতিটি ক্ষতচিহ্নে ঠোঁট ঘষে। প্রবল আবেগে অমৃতাকে বুকে জড়িয়ে ওর ঘাড়ের খাঁজে মুখ ডুবিয়ে বাবাই অস্ফুটে উচ্চারণ করে, অমৃতা! অমৃতা! আরও পরে উপগত হওয়ার সময় বার বার জানতে চায় অমৃতার কোনো অসুবিধা বা ব্যথা লাগছে কি না।

—কষ্ট লাগলে বলবে। না পারলে বোলো আমাকে।

অমৃতা ওর ঠোঁটে আঙুল চেপে বলল, কথা বোলো না। আমি সব ভুলে যেতে চাই। তোমার অত সাবধানী হওয়ার দরকার নেই। ডু ইট! জাস্ট ডু ইট!

মাসখানেক পর এক দিন রতিক্রিয়া-শেষে অমৃতা বলল, সত্যি করে বলোতো, তুমি খুশি? তোমার ভালো লাগছে, আই মিন, নর্মাল প্লেজার পাচ্ছ?

চমকিত বাবাই বলল, এসব কেন বলছ?

স্বামীর বুকে মাথা রেখে অমৃতা বলল, বলছি, কারণ আমি জানি না আমার শরীরের অভ্যন্তরে নারীত্বের সবকিছু অবিকল আছে কি না। আমার কেবলই মনে হয়, তুমি হয়তো কিছু মিস করছ। আমি হয়তো ফেল করছি।

— তোমার মনে হয়েছে কখনও?

—বুঝি না। তবে মনে সংশয় থাকছেই।

—আর ভেবো না এসব। ইউ আর পারফেক্টলি অলরাইট। আমি ভীষণ-ভীষণ খুশি। দেখছ না, যেখানেই যাই রাতে ঠিক ফিরে আসি। এখন আর-একবার প্রমাণ দেব?

অমৃতা গায়ে কম্বল জড়িয়ে বলল, না। এখন ঘুমাও।

কল্পনায় ছিল কি না বলতে পারবে না প্রণতি । পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে এমন আনন্দময় সংসারের স্বাদ এ-জীবনেই অর্জনের আশা প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। বাবাইয়ের গ্রেফতারের পর মনে হয়েছিল ধূসর জীবনের পাণ্ডুলিপিতে আর কোনো বর্ণিল অঙ্কন হবে না। অমৃতা বর্ণবাহারের সঙ্গে স্নিগ্ধ শান্তির অশেষ উৎসবও নিয়ে এসেছে। প্রণতি আরও খুশি, বাবাই হঠাৎ-হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় না।

স্বাধীন চৌধুরীর এখন অগাধ পরিচিতি। সাধারণ মানুষও ওকে চেনে, ওর খুঁড়িয়ে হাঁটা লম্বা চেহারার জন্য। আর জিপওয়ালির স্বামী বলেও। অমৃতার জিপ সারা অঞ্চলে নিত্য ভ্রাম্যমাণ। অমৃতা প্রতিদিন শিলিগুড়ি যায়। বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে। সরকারি বেসরকারি মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিটিংয়ে বসে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শাশুড়ির কাছে সুবাধ্য ছাত্রীর মতো রান্নাবান্না শেখে। স্বাধীনের ফিরতে দেরি হলে দু-জনে দু-জনকে আশ্বস্ত করে, একে অপরকে ছদ্ম দোষারোপ দিয়ে বলে, ওকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

চা-শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাধীন পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যেও কাজ শুরু করে। ন্যূনতম মজুরি ও নির্দিষ্ট শ্রমদিবসের দাবি নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যায়, আলোচনায় বসে। সামান্য সফলতাকে পুঁজি করে স্বাধীন মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর প্রযত্নে ব্রতী হয়।

পরিচিতি ও প্রভাব বৃদ্ধির হাত ধরাধরি করে চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরুদ্ধতা। সি.পি.এম.-এর বিরুদ্ধতার অন্যতম কারণ হল গোর্খাল্যান্ডের দাবি সম্পর্কে তাদের দলীয় নীতি—যার সরাসরি বিরোধিতা করে স্বাধীন। তার অভিমত সংকীর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ত্যাগ করে লেনিনবাদী সূত্র অনুযায়ী গোর্খাল্যান্ড সমস্যার সমাধান খোঁজা উচিত। লেনিন প্রতিটি জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করেছিলেন। স্বাধীনের মনোভাব আপাতভাবে গোর্খাল্যান্ডের দাবির অনুগ মনে হলেও তারা ওকে সন্দেহের চোখে দেখে। ওদের একটা অংশ মনে করে স্বাধীন ওসব বলে মাওবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি

নিচ্ছে।

প্রণতি তো বলেই, অমৃতাও বলল, অহেতুক বিতণ্ডায় জড়াচ্ছ কেন? তুমি কি ভোটের রাজনীতি করবে?

—তুমি কি আমাকে গৃহপালিত জন্তু হয়ে থাকতে বলো?

— না। মোটেও তা বলি না। বলছি, যে-বিতর্ক এড়ানো যায় তা নিয়ে খোঁচাখুঁচি নাই করলে। এটা হাইলি সেনসিটিভ ইস্যু। এসব ক্ষেত্রে মানুষের আবেগই নির্ধারক শক্তি, যুক্তি-তত্ত্বও নয়। আমিও তো এইসব মানুষের মধ্যেই কাজ করি।

— তোমার কাজ সেবার, আমার সংঘর্ষের। পছন্দ করি বা না করি সংঘাতের পথ এড়াবার উপায় নেই।

—সংসারের দায়িত্ব বাড়লে অনন্যোপায়ের অজুহাত চলে না মশাই।

—তার মানে?

ঠোঁট টিপে হেসে অমৃতা স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে বলল, বাবাইবাবু বাবা হচ্ছেন যে!

খবরটা শুনে প্রণতি খুশি ও আনন্দে আপ্লুত। তার হতমান বাস্তুহীন সংসারে নবজীবনের দূত হয়ে আসবে নবজাতক, বিম্বিত হবে তিমিরবিনাশী প্রাণদীপ! জীবনদেবতা তবে প্রণতিকে শূন্য আঁচলেও কিছু পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি উপহার দিলেন!

কলকাতা থেকে ছুটে এলেন অনুভা। প্রস্তাব দিলেন মেয়েকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার। যদি কোনো জটিলতা দেখা দেয় কলকাতায় তৎপর চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা সম্ভব। প্রথাগতভাবেও মেয়ের প্রথম সন্তান মাতৃসকাশে হওয়াই বিধেয়। অনুভা মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই ফিরতে চান।

প্রণতির আপত্তি করার কারণ নেই। স্বাধীনও মনে করে প্রসব কলকাতায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অমৃতা বলল, যাবো। তবে এখনই নয়। আমার হাতের কাজগুলো সেরে নিই। সময়ের মাসখানেক আগে গেলেই হবে।

অনুভা বললেন, অত দেরি করা উচিত হবে না। এখনই একবার ভালোভাবে চেকআপ করা দরকার । তোর শরীরের অবস্থা তুই জানিস।

—তা হলেও মা, আমাকে ক-দিন সময় দিতেই হবে। হুট করে বললেই যাওয়া যায় নাকি!

স্বাধীন অনুভাকে বলল, আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক সময়ে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

বামফ্রন্ট দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সিজারিয়ানে অমৃতার কোল আলো করে আসে রাই। নার্সিংহোমে সদ্যজাতাকে দেখে বাবাইয়ের মনে হয়েছিল, সব মানুষই এমন ছোট্ট পুতুলের মতো পৃথিবীতে আসে, ভবিষ্যতে তার বিপুল সম্ভাবনার সামান্য আঁচও তখন মেলে না। সম্ভাবনার উপযুক্ত করে তোলাই লালনপালনের লক্ষ্যশক্তি। ও পারবে তো?

নাতনি দেখার অধীরতায় প্রণতি কলকাতা এল। একমুখী মনের জন্য মহানগরীর প্রথম সন্দর্শনের আনন্দ বিস্ময়ের চমক তেমন অনুভূত হল না। নাতনিকে কোলে নিতেই মনে পড়ল কাঞ্চনগড়ের দিনগুলোর কথা। যেন বাবাই আবার ছোটোটি হয়ে ফিরে এসেছে। প্রণতির জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চেতনার ভুবনে শঙ্খধ্বনি বাজে। বাবাইয়ের কারণে পুঞ্জিত হতাশা-দুঃখ-বেদনা ক্ষোভ সব নিঃশেষে উবে গেল। চোখের কিনারায় ঢেউ ভাঙে নতুন স্বপ্ন।

প্রণতি উঠেছিল ডলি-পবিত্রর বাড়িতে। ওদের ফ্ল্যাটটা ছোটোর মধ্যে সুন্দর। কাছেই থাকে সবিতারা। অনেকদিন পর ওকে দেখেও ভালো লাগল প্রণতির। সবিতার এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে পরিপাটি সংসার। সবিতার বর দেবমাল্য টাটায় ভালো চাকরি করে। ওকে দেখে নিজের বুকের দীর্ঘশ্বাসের আছড়ে পড়া রোধ করতে পারে না।

অমৃতা রাইকে নিয়ে কার্শিয়াংয়ে আসার পর প্রণতির ঘরে প্রাণে চিরস্থায়ী কোজাগরী। স্কুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ নাতনিকে নিয়ে কাটে। প্রতি সপ্তাহে শিলিগুড়ি ছোটে খেলনা কেনার জন্য। অমৃতা খুশি মনে নিজের কাজে মনোনিবেশ করে। ওদের নতুন তৈরি করা 'শিশুস্বাস্থ্য কেন্দ্র' নিয়ে ব্যস্ত থাকে দিবারাত্রি।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির আপন নিরাপত্তা প্রহরীর হাতে নিহত হওয়ার সংবাদে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাবোধ জিজ্ঞাসাখচিত। গণশোকের অবসানের অল্পদিনের মধ্যে শীতল মৌন পাহাড় হয়ে উঠল লেলিহান।

সন্ধ্যার মুখে বাবাই গণেশকে নিয়ে ফিরছিল সোনাদা থেকে। দূরে কলরব শোনা যাচ্ছিল। একটা ঢাল পেরুতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের কোলে আগুন জ্বলছে। বাবাই বলল, গণেশ, ওদিকেই তো 'শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র'?

— দাজু —

তিনটে ছেলে উত্তেজিত স্বরে গণেশকে ডাকে। গণেশ এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলেই ছুটে এসে বলল, ওস্তাদ জলদি চলো। হেভি গোলমাল।

ছুটতে ছুটতে গণেশ বলল, কারও উসকানিতে 'শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র' পুড়িয়ে দিয়েছে। কারণ গতকাল আর আজ ওখানে চারটি শিশু মারা গেছে। শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা অমৃতাকে ওরা দায়ী করছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র শিশুদের খ্রিষ্টান করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। সমতলের মানুষের পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

গণেশ বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বাবাইকে নিয়ে ঢুকে বলল, তুমি এখনই সবাইকে নিয়ে চলে যাও—শিলিগুড়ি। আমি দেখছি কী করা যায়!

—বলছ কী তুমি?

— তোমার মা, বউ, বাচ্চা—এদের নিরাপত্তার কথা ভাবো আগে। প্রথমে জীবন, পরে আদর্শের তত্ত্ব।

আগুয়ান জনতার কলধ্বনি শোনা যায়। বাবাই ডাকে, মা, অমৃতা—যা পারো গুছিয়ে নিয়ে চলো। এক্ষুনি।

গণেশ বলল, আমি গাড়ির ব্যবস্থা করছি।

অনেক বছর আগের আর-একটা সন্ধ্যারাতের স্মৃতি প্রণতির মনে ভাসে। ইতিহাসের পুনরাবর্তন। প্রণতি প্রথমেই রাইয়ের খাবার পোশাক গুছিয়ে, টাকাপয়সা যা ছিল নিয়ে তৈরি হয়। অমৃতাও একটা সুটকেস গুছিয়ে নেয়।

গণেশ কয়েকজন সঙ্গী সহ জিপ নিয়ে আসে। তখনই পৌঁছে যায় সশস্ত্র উন্মত্ত জনতা। হিংসাত্মক স্লোগান ওঠে। এবং গোর্খাল্যান্ড-জিন্দাবাদ।

রাইকে বুকে জড়িয়ে প্রণতি কোনোরকমে জিপের পিছনদিকে উঠে পড়ে। গণেশ ও তার লোকজন আগ্রাসী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও লাঠির ঘা পড়ে বাবাইয়ের পিঠে।

ও অমৃতাকে আগলে কোনোক্রমে খোঁড়া পা টেনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রবল ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার, স্লোগানের গর্জন। পাথরের টুকরো ছোটে দরজা জানালায়। কাচ ভাঙার শব্দ। লাঠির ঘা লাগে বাবাইয়ের কপালে। দরদর রক্ত ঝরে। রক্তঝরা দেখে অমৃতা ওকে জিপে ওঠানোর জন্য ঠেলতে থাকে। গণেশ পাঁজাকোলা করে ওকে ওঠাবার সময় আর্তনাদ করে পড়ে যায় অমৃতা। শব্দতাণ্ডবের মধ্যে গুলির শব্দ বোঝা না গেলেও অমৃতার বুকের কাপড়ে রক্তের ঢেউ প্রামাণ্য। গণেশ বাবাইকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে অমৃতাকে তুলে নিয়ে ড্রাইভারকে বলল—স্টার্ট।

জিপের ধাক্কায় কয়েক জন ছিটকে যায়। কিছু লোক হাতিয়ার নিয়ে তাড়া করে। বাড়ি পড়েজিপের পায়ে। প্রণতি রাইকে নিজের বুকের ভিতরে ঢুকিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে অমানিশার প্রহর গোনে।

আধশোওয়া নিথর অমৃতাকে কোলে ধরে বাবাই বলল, ওকে এখনই হাসপাতালে নিতে হবে।

যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চালিয়ে জিপ এল তিনধারিয়ার হাসপাতালে। অমৃতাকে নামিয়ে গণেশ বলল, এদিকটা আমি দেখছি। তুমি মাইজিকে নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি চলে যাও। কলকাতার ট্রেন পেয়ে যাবে।

মা ও মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাবাই ফিরে আসে তিনধরিয়া। প্রণতি বলেছিল — বউমা—বউমাকে কোথায় রেখে এলি? বাবাই বলল, আমি ওর কাছেই যাচ্ছি।

উপসংহার

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান হচ্ছে দেশের নানা অঞ্চলে। খবরের কাগজে টিভিতে তার সরগরম সমাচার। বিবেকনগরেও তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। মন্ত্রীরা আসবেন। আসবেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, গায়ক। কবীর বারকয়েক এসেছে রাইকে দিয়ে অনুষ্ঠানে গান গাওয়ানোর দাবি নিয়ে। প্রণতি উৎসাহিত বোধ করেননি। করতে পারেন না। প্রকৃত অর্থেই শিকড়ছেঁড়া বাস্তুছাড়া হওয়ার — এক বার নয়, বার বার — ইতিহাস পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সরণি পেরিয়ে স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নিজের নাড়ি-ছেঁড়া শিবরাত্রির সলতেকে আহত রক্তাক্ত অবস্থায় ছেড়ে আসার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার। মাত্র তিন বছর বয়সে রাই মাতৃহারা হল পশ্চিমবাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই এক জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন লাভের হিংস্র লালসায়। এই স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল উদয়ন? কোন্ অন্বেষায় আজও ঘরছাড়া বাবাই?

প্রণতির কাছে জীবন এক ঘূর্ণিবৃত্ত। যেন কোনো জাগলার তাঁকে নিয়ে জীবনান্তক খেলায় মগ্ন। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলো জুড়ে-জুড়ে অবসরে বসে চেষ্টা করেন নিয়তির সঙ্গে তাঁর জীবনের 'ট্রাইস্ট' বোঝার। তবে অবসর আর মেলে কোথায়! কলকাতায় এসে রাইকে মানুষ করার জন্য স্বেচ্ছায় স্কুল থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তবু কাজ কমেনি। কাজ থামলে চলবেও না। ছাত্র পড়ানো ছাড়াও অঞ্চলের মেয়েদের নিয়ে গড়ে তোলা জীবনকেন্দ্র আছে। তাঁর

জীবনে উদয়ন সরকারের শেষ অবদান।

মাস্টারমশাই উদয়ন সরকারের কথা মনে এলেই চিত্ত দ্রব হয়ে ওঠে প্রণতির। এই এক জন মানুষ, যার কাছ থেকে সারাজীবন শুধু আঁজলা পেতে নিয়েছেন, দিতে পারেননি কিছুই। বৃদ্ধবয়সে বা রোগশয্যায় সামান্য সেবা বা শুশ্রূষা করার সুযোগও পাননি। বাবাই কলকাতা এলে অবশ্যই মাস্টারমামার সঙ্গে দেখা করত। কিন্তু তার আসা বা থাকা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিতির জন্য উদয়নকে শেষ দেখাও হয়নি। বাবাই থাকলে নিশ্চয়ই যেতেন প্রণতি। মনে হয় গভীর অভিমানের বেদনা নিয়ে নীরবে চলে গেছেন মাস্টারমশাই উদয়ন সরকার।

সন্ধ্যার পুজো সেরে, সব গুছিয়ে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রণতি। রুটিনের মতো প্রতিদিনের নিত্যকর্ম। যতদিন মা ছিলেন প্রণতি পুজোটুজো নিয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। মা-র মৃত্যুর পর নিছক সংস্কারবশতই মায়ের ঠাকুরের আসন ফেলে দিতে পারেননি। সকাল সন্ধ্যা কিছুক্ষণ সময় ফোটো-প্রতিমার সামনে বসাটাকে ধ্যানমুহূর্ত বলে গণ্য করেন। সারাদিনে ওইটুকু সময়ই কেবল নিজেকে নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের মুখোমুখি বসতে পারেন। নিজেকে খোঁজা এক জীবনে শেষ হয় না।

বারান্দায় দাঁড়ালে নরম জ্যোৎস্নার জাফরি চোখ টেনে নেয়। কথার শব্দে প্রণতি বোঝেন, রাই টেলিফোনে কথা বলছে। এখন অন্তত আধ ঘণ্টা চলবে। কী যে এত কথা বলে—অফুরান কথা, যার কোনো মাথামুন্ডু নেই, বলার আনন্দেই বলে যায়। স্নেহার্দ্র প্রশ্রয়ে হাসেন প্রণতি। এই তো জীবনের সেরা সময় রাইয়ের। আবার প্রশ্ন জাগে, তাঁর দুর্ভাগ্য নাতনির জীবনেও অভিসম্পাত নিয়ে এল কেন? মাতৃহারা শিশু পিতৃস্নেহ, সমাদর ও যত্ন থেকেও বঞ্চিত। প্রণতি নিজেকে ছাড়া আর কাকে দুষবেন?

সেই দুঃস্বপ্নের রাতের কথা মনে পড়লে এখনও বুকে হিম জমে। গণেশ সুব্বার সাহসী প্রত্যুৎপন্নতায় সামান্য বিলম্বও সকলের প্রাণঘাতী হতে পারত। অমৃতার জন্য আশঙ্কা, বাবাইয়ের জন্য উদ্বেগ নিয়ে রাইকে বুকে করে গড়িয়ায় পবিত্রর বাড়িতে উঠেছিলেন। খবর পেয়ে উদয়ন এসেছিল। ও-ই খোঁজখবর করে এই বাড়ির সন্ধান আনে। বাবাই অমৃতার শেষকৃত্য সেরে আসে মাসখানেক বাদে। অমৃতাকে পরদিনই শিলিগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অস্ত্রোপচার করেও বাঁচানো যায়নি।

অমৃতার মৃত্যুতে বাবাই নোঙরহীন উদ্‌ভ্রান্তিতে ভুগতে থাকে। কিছুদিন পর আবার উত্তরবঙ্গে চলে যায়। রাইয়ের ছোট্ট হাত শক্ত মুঠিতে ধরে অর্থাগমের পথ সন্ধান করেন প্রণতি। আগামী বছর রাই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে ভাবলেই মনে ভয় হয়, কলেজে ঢুকে রাই মা-বাবার অনুসারী হবে না তো! প্রণতির দুর্ভাবনা অমূলক। বর্তমান প্রজন্মের যুবচেতনা হুল্লোড় ইয়াঙ্কি প্রলোভনে আচ্ছন্ন—তাদের তিন ঈশ্বর এম. বি. এ. আই.টি. আর আমেরিকা।

উদয়ন এ-বাড়িতে শেষ এসেছিল তিন বছর আগে। বাবাইও ছিল তখন। সে-সময় চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের বিজয়কেতন উড়ছে, আর চলছে অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর। উচ্চ শিক্ষার সুযোগের অভাব ও চাকরির দুর্লভ্যতার জন্য পশ্চিমবাংলার যুবসমাজ পেরিয়ে যাচ্ছে অন্যান্য রাজ্যের সীমান্ত। সম্পন্ন সুযোগসন্ধানীরা যাচ্ছে বিদেশে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজীব গান্ধি উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের নবীন রূপরেখা চালু

করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর পুনর্বার কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে কংগ্রেস সরকার দেশের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তল্পিবাহক করে তুলল। এরই মধ্যে ভারতের ইতিহাসের কলঙ্কিত ঘটনা—অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে সংবিধানে সোচ্চারিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বিধ্বস্ত করা হল।

এই চণ্ডাশোক-কীর্তি উদয়নকে তীব্র আঘাত করেছিল। বাবাইকে বলেছিল, এই ঘৃণ্য অপকর্মের হোতারা বুঝল না, দেশের কী দুরপনেয় ক্ষতি করল! সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সংহতির জন্য এত বলিদান, এত অসভ্যতা এত বছরের নিষ্ঠাপূর্ণ শ্রম এভাবেই ব্যর্থ করে দিতে হয়? ওই পাষণ্ডরা কি দেশের অখণ্ডতাকে বিপন্ন করতে চায়?

উত্তেজিত উদয়নকে শান্ত করার প্রয়াস চালায় বাবাই। কথা বলতে-বলতে উদয়ন দরদর ঘামছিল। বুকে ব্যথা অনুভব করলে বাবাই ডাক্তার নিয়ে আসে। হার্ট অ্যাটাক। ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নার্সিংহোমে ভরতি করা হল। উদয়ন ফোন নম্বর দিয়ে বলল, প্রবোধকে খবরটা দিস, বাবাই।

প্রবোধ পরদিন এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিল। মোটামুটি সুস্থ হয়ে উদয়ন তার আশ্রমে ফিরে যায় সপ্তাহ-তিনেক পর। সঙ্গে ডাক্তারের দেওয়া, করা ও না-করার দীর্ঘ তালিকা। তালিকা দেখে হেসেছিল উদয়ন—এতসব বিধিনিষেধ মেনে বাঁচার কী দরকার! বাঁচা মানে তো শুধু শ্বাসপ্রশ্বাস নয়!

বস্তুত উদয়নের হৃদ্‌যন্ত্রে ছোবল লেগেছিল আরও আগে। সোভিয়েত ইউনিয়নের খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাওয়ার অবিশ্বাস্য বাস্তবতা মহাশোকের মতো আহত করছিল। শতাব্দীর স্বপ্নের সঙ্গে দীর্ঘ সহবাস এইভাবে শেষ হবে অসম্ভব দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেনি কখনও। নিজেকে শুধু অর্বাচীন নয়, প্রতারিতও মনে হয়েছিল। দেশের অনেক নেতা, বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিক অসংখ্যবার সোভিয়েত ভ্রমণ করে শুধু প্রশস্তি লিখেছেন, বলেছেন। কারোর একবারও মনে হয়নি, যাকে দুধ ভেবেছেন তা আসলে পিটুলি! কারোর চোখে ধরা পড়েনি প্রতিমার আড়ালের খড়কুটো? সবাই কি চোখে ঠুলি পরে ছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গিনেস বুকে নাম-ওঠার মতো রেকর্ড বার সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছেন। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়েছেন দিস্তার পর দিস্তা। একবারও কখনও লেখেননি, ওই ব্যবস্থা ক্যানসারে জর্জরিত। তিনিও কি ভেদকাচ্ছন্নতায় সত্যদর্শন বিস্মৃত হয়েছিলেন? রুবল তো কখনোই ডলার-কৌলিন্য অর্জন করেনি।

সমমনস্ক অনেকের সঙ্গেই এই বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে উদয়নের। বাবাই মন্তব্য করেছিল, সংশোধনবাদের অনিবার্য পরিণাম। দুর্নীতি ও নীতিবিচ্যুতি কতদূরগামী হলে সফল বিপ্লবী একটা পার্টির, বিপ্লবের পঁচাত্তর বছর পর এইরকম অধঃপতন হতে পারে—তুমি ভেবে দ্যাখো।

উদয়ন বলেছিল, বাবাই, মানুষ বড়ো নিঃস্ব হয়ে গেল। দেখার জন্য আর কোনো স্বপ্ন নেই। অবলম্বনের জন্য বিশ্বস্ত আদর্শের ধ্রুবালোকও রইল না। 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন!'

উত্তরবঙ্গে ফিরে যাওয়ার আগে আর একবার উদয়নকে দেখতে এসেছিল বাবাই। দেখে প্রবোধের সঙ্গে আরও এক জন সুবেশ মানুষ। উদয়ন পরিচয় দিয়ে বলল, আমার ছোটোভাই বটু, ম্যাঙ্গালোরে থাকে।

বটুকে বলল, এ হচ্ছে বিখ্যাত বিপ্লবী স্বাধীন চৌধুরী। আমার কাছে অবশ্য ভাগনে বাবাই।

বটু দাদাকে বলল, দাদা, তুমি ওকে বলতে পারতে আমাকে খবর দিতে। আমি বিজনেস ট্যুরে না এলে তো জানতেও পারতাম না। মিমিকেও খবর দাওনি। ও শুনলে কী করবে ভাবো তো!

— তুই আবার ওকে ব্যস্ত করিস না। তা ছাড়া বয়েস হয়েছে, এখন অল্পস্বল্প অসুখবিসুখ তো করবেই। ওই প্রবোধকে দ্যাখ্, ওর তো বাইপাস করতে হয়েছে।

বটু বলল, আমি সে-কথাই তোমাকে বলছি। ভালো স্পেশালিস্ট দেখিয়ে মতামত নাও। পেসমেকার না বাইপাস— কী করা দরকার জানতে হবে তো!

প্রবোধ বলল, এখন কিছু লাগবে না। তুমিও চিন্তা কোরো না। আমরা তো আছি।

বাবাই বলল, মামা, আমি কাল চলে যাব।

উদয়ন বলল, মা-মেয়েকে ফেলে রেখে ওখানে কী করিস?

—দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। গরিব মানুষদের যে কী দুরবস্থা, থানায় হাসপাতালে গেলে বোঝা যায়। খালি পার্টিবাজি আর তোলাবাজি। এই রাজ্যটা এখন লুঠেরাদের নন্দনকানন।

বটু সোৎসাহে বলল, যাক অন্তত এক জনকে পাওয়া গেল যার সত্য বলার সাহস আছে।

প্রবোধ প্রতিবাদ করে, ও যা বলল তা মোটেই সত্য নয়। ওরা—নকশালপন্থীরা—সবসময় আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

বটু বলল, দেখুন গত কয়েকদিনে বিভিন্ন অফিসে ঘুরে আমার যা অভিজ্ঞতা হল তাতে আমি অত্যন্ত হতাশ। দাদা যা বলেন, কাগজে যা পড়ি, আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার এত গরমিল! সরকারি যে-অফিসেই যাই দেখি কর্মীরা সিটে নেই। যারা আছে গল্পে মশগুল। ঘুষ-চাওয়া হাতগুলোর রঙে কোনো প্রভেদ দেখি না। তবে যে যত কামচোর, ফাঁকিবাজ আর দুর্নীতিগ্রস্থ সে ততবেশি ঝান্ডাধারী। সে-ঝান্ডার রং যাই হোক না।

উদয়ন বলল, এটা কি তোর এখানকার অভিজ্ঞতা?

— না, না। কলকাতার সঙ্গে দিল্লি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর লখনউ-র, এ-বিষয়ে অনন্ত, কোনো তফাত নেই।

উদয়ন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, প্রবোধ, আমি এটাই তোমাদের বলার চেষ্টা করে আসছি! আঠারো বছর তোমরা বিরোধী-বর্জিত ক্ষমতা ভোগ করছ। অথচ এখন কিছুই করতে পারোনি যাতে তোমাদের সরকারকে অন্য সরকারের চেয়ে ভিন্ন বলে চিহ্নিত করা যায়। সরকারি কর্মীদের মধ্যে মিনিমাম ডিসিপ্লিন ও সততার উন্মেষ ঘটাতেও ব্যর্থ। শুধু ভূমিসংস্কার আর পঞ্চায়েত নির্বাচনের টমটমি বাজিয়ে কি বিপুল ব্যর্থতার দগদগে নগ্নতা আড়াল করা যায়! ওগুলোও যা হয়েছে সেও ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যই। আমার দুঃখটা এখানেই— অসাধারণ সুযোগ হাতে পেয়েও বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের সফলতম এবং অবশ্যই ভিন্নতর সরকার হিসাবে প্রমাণ করতে পারল না। আমি বামপন্থী। পরের নির্বাচনেও বামফ্রন্টকেই সমর্থন করব। কিন্তু বুকে সতত বইতে থাকা হতাশার দুঃখবেদনা আর কত চেপে রাখব!

বাবাই বলল, তুমি এখনও ভুল বিশ্বাস আঁকড়ে থাকবে, মামা? সোভিয়েতের পতন, সিমেন্টের অপকীর্তি থেকেও যারা কোনো শিক্ষা নেয় না—

প্রবোধ বাধা দিয়ে বলল, একদম ভুল বলছ। আমরা অবশ্যই শিক্ষা নিয়েছি। পার্টি অত্যন্ত সচেতন সম্ভাব্য বিচ্যুতি সম্পর্কে।

— ভোট হারাবার ভয়ে আপনারা ওয়ার্কারদের সময়মতো আসতে-যেতে বলতে পারছেন না, ঘুষ নেওয়া বন্ধ করার সামান্যতম উদ্যোগও নিলেন না—তবুও বলছেন আপনারা সচেতন! ওটা তা হলে শোধনবাদের বিকৃত সচেতনতা। আপনাদের স্লোগান তো—এমন তো হয়েই থাকে!

বটু বলল, প্রবোধদা, আমরা যারা বাংলার বাইরে থাকি, আমাদের ভিন্নরকম আশা তৈরি হয়েছিল। এখন বাধ্য হচ্ছি সে-আশা জলাঞ্জলি দিতে।

উদয়ন বলল, আমি সারাজীবন একটা বিশ্বাসে অনড়। তা হল আনুগত্য নয়, অন্ধ বিরোধিতাও নয়। সমাজে পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দরকার সৃষ্টিশীল পরিকল্পনা এবং সিলেকটিভ স্ট্র্যাটেজির। মানুষকে দীক্ষিত করতে হবে নতুন নিয়মনীতি ও কর্মপদ্ধতিতে। দিতে হবে নতুন শিক্ষা। বৈপ্লবিক পরম্পরার পরিণতি হোক নতুন ভবিষ্যৎসৃজন।

সেই শেষ দেখা উদয়নের সঙ্গে। আবার অ্যাটাক হওয়ার পর আর সময় পাওয়া যায়নি কারোকে খবর দেওয়ার। বাবাই খবর পায় অনেক পরে মা-র চিঠিতে। প্রণতি অনাথ আশ্রম থেকে শ্রাদ্ধের চিঠি পেয়ে জেনেছিলেন মাস্টারমশাইকে শেষ সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগও পাওয়া হল না। প্রণতির দু-চোখ ভেঙে জল নামে। চেতনার তন্ত্রীতে হাহাকারের মতো আর্তনাদ দাপাদাপি করলেও তিনি চিৎকৃত বিলাপে ভেঙে পড়তে পারেন না। সাত দিনের স্বামীসঙ্গ তাঁকে সন্তান দিয়েছে, প্রায় অর্ধশতক জোড়া দীর্ঘ সময়ে মাস্টারমশাই— জীবনদেবতা— তাঁকে দীক্ষিত করেছেন জীবন চেতনা, মর্যাদা ও সম্মানপূর্ণ জীবনযাপনে। অশ্রুময়ী প্রণতিকে রাই জিজ্ঞেস করে, তুমি কাঁদছ কেন!

প্রণতি বললেন, আমার একমাত্র শরণাশ্রয়ও শেষ হয়ে গেল! 'আজি ত্রিভুবন জোড়া কাহার বক্ষে দেহমন মোর ফুরালো—/যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো'।

বাবাইয়ের কথা শুনে মনে হয়েছিল প্রণতির, উদয়ন হয়তো নিজের মধ্যে আসন্ন ইতির আভাস পেয়ে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিল, কারোকে বিপন্ন না করে নিঃশব্দে চলে যাওয়ার।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো
জীবতি কশ্চন
ইতরেণ তু জীবন্তি,
যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ।।

(শুধু প্রাণে আর অপ্রাণে জীব বাঁচে না, এছাড়াও কিছু আছে যেখানে জীবের আশ্রয়)

ক-দিন ধরে রাই বার বার জিজ্ঞেস করছিল, ঠাম্মা বাবা আসছে না কেন? কতদিন দেখি না!

কী জবাব দেবেন প্রণতি? আগে মাসে একটা হলেও চিঠি লিখত, গত চার মাস চিঠিও লেখে না। কোথায় আছে, কী করছে ভেবে নিজের মনেই দগ্ধ হন।

রাই বলল, বাবা আর আসবে না, ঠাম্মা?

— আসবে, নিশ্চয় আসবে।

— তুমি খালি বলো আসবে। তা হলে আসছে না কেন?

— ও যে স্বাধীন! ঠিক এসে যাবে এক দিন।

বাইরের গেটে গাড়ির শব্দ পেয়ে ত্বরিত বেরিয়ে এলেন প্রণতি। মনের ক্ষীণতম আশা পূর্ণ হল না। বদলে পেলেন প্রসন্ন চমক। বাবাই নয়, কানাই এসেছে। সঙ্গে এক যুবক। কানাইয়ের শরীরে বয়সের ছাপ। চুলে চকখড়ির এলোমেলো টান।

প্রণতিকে প্রণাম করে কানাই বলল, দিদি, এই আমার ছোটো ছেলে শেখর।

শেখর প্রণতিকে প্রণাম করে বলল, বাবা আপনাদের কথা এত বলেন।

রাইকে দেখিয়ে প্রণতি বললেন, কানাই রাই—বাবাইয়ের মেয়ে।

— রাইকে বললেন, শেখরকে ভিতরে নিয়ে যা।

কানাই অভিমানী গলায় বলল, দিদি, বাবাইয়ের বিয়েতে খবর দিলে না। বউটাকে চোখেও দেখলাম না।

প্রণতি বললেন, আমার কপাল। তা, তুই হঠাৎ—

— তোমাদের আশীর্বাদে শেখর পরশু আমেরিকা যাবে। স্কলারশিপ পেয়েছে। পাসপোর্ট টিকিট সব রেডি। যাওয়ার আগে একবার তোমার আশীর্বাদ যাতে নিতে পারে, তাই নিয়ে এলাম।

— বাঃ! এত ভালো খবরটা বলিসনি এতক্ষণ। তোর অন্য ছেলেমেয়েরা কী করছে?

— আমার দুই ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড়ো ছেলেটার কিছু হল না। আমার ব্যাবসা দেখছে। ছোটো শেখর—ওর শুরু থেকেই পড়ার মাথা ছিল। বাবাইয়ের মতো। দিল্লি থেকে এম. এ. করেছিল। আমেরিকায় গিয়ে কী করে দেখা যাক। সব দিদি তোমার, আর মা ঠানের আশীর্বাদ। মা ঠান থাকলে আজ — কানাই চোখ মোছে।

রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে শেখর বলল, টুনুমাসি, রাই বলছিল আপনারা নাকি চার-পাঁচবার বাস্তুহারা হয়েছেন!

— হ্যাঁ। পায়ের তলার মাটি খুঁজতে খুঁজতেই জীবনটা কেটে গেল।

প্রণতির মনে হল যদি আগরতলাতেই থেকে যেতে পারত, তা হলে জীবন হয়তো এমন মুসাফির হত না। বাবাইয়ের যা সম্ভাবনা ছিল তাতে অবশ্যই কীর্তিমান না হোক এক জন সফল প্রতিষ্ঠিত সচ্ছল মানুষ অবশ্যই হতে পারত। প্রণতির তো তার চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা ছিল না। শেখরের পাতে ভাত দিতে দিতে প্রণতির বুকের মধ্যে বেলুনের মতো ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস সন্তর্পণে গোপন রাখেন।

চোখের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যায় পঞ্চাশ বছরের টুকরো-টুকরো ছবি—আগরতলা, বঙ্গাইগাঁও, রঙ্গিয়া, পুলিশ, বন্যা, ভাসমান মানুষ, পাহাড়, গুলি, রক্তাক্ত বাবাই।

হঠাৎ মনে হল যমুনা ও উদয়ন সরকারের নিঃশব্দ তিরোধানে একটা কোনো অবোধ্য অথচ নিষ্ঠুর সাদৃশ্য আছে।

রাই জানতে চায়, শেখরকাকু তুমি আমেরিকা থেকে ফিরে আসবে না ওখানেই থেকে যাবে?

শেখর মৃদু হেসে বলে, এখনই কি তা বলা যায়!

কানাই বলল, কেন বলা যাবে না? দেশ হচ্ছে মা। মা কখনও বদলানো যায় না, মনে রাখিস।

পরদিন শুক্রবার। শেখরের ফ্লাইট শনিবার ভোরে।

কানাই ছেলেকে নিয়ে আমেরিকান কনসুলেট এয়ার লাইন অফিস ঘুরে, ছেলের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনে ফিরে প্রণতির সঙ্গে কথা বলছিল। শেখর ও রাই ভিতরে বসে টিভি দেখছে। একটু আগেই সন্ধ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। কয়েকজন মানুষের কণ্ঠ। পাড়ার কিছু ছেলেও ভিড় করেছে। কে যেন বলল, স্বাধীন চৌধুরী — স্বাধীন চৌধুরী—

অন্যকণ্ঠ — আমাদের স্বাধীনদারে — হেভি নকশাল—

ট্যাক্সির দরজা খুলে এক জন বলল, সাবধানে সাবধানে — দাদা, আসুন—

কোলাহল শুনে কানাই গেটের কাছে এসে বলল— কে —কী হয়েছে—

একজন বয়স্ক লোক চেঁচিয়ে ওঠে, স্বাধীন এসেছে, স্বাধীন—

কানাই ট্যাক্সি থেকে নামা বাবাইকে দেখে ছুটে যায়। বাবাইয়ের মাথায় ব্যান্ডেজ। জামায় শুকনো রক্তের ছোপ। কোটরগত চোখের নীচে কালি।

কানাই বাবাইকে ধরে বাড়ির বারান্দায় নিয়ে আসে। উদ্বিগ্ন প্রণতি ছেলেকে চেয়ারে বসান। বাবাই মাথাটা মা-র বুকে এলিয়ে দিয়ে বলল, মা, আমি এসেছি।

ভিড় সরে গেল একটু পরেই। পরিচয় জেনে শেখর বলে ওঠে, স্বাধীনদা। আমি ভাবতেই পারছি না—

বাবাই বলল, না শেখর আমি বাবাই।

কানাই বলল, তোর খোঁড়া পা আর ঠিক হল না?

— তা কি আর হয়!

প্রণতি বললেন, এ-অবস্থা হল কী করে?

বাবাই বলল, উচ্ছেদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে। নতুন কারখানা হবে, চা-বাগানের সীমানা বাড়বে, বাস্তু উচ্ছেদ করো, উৎখাত করো মানুষ। পুঁজির স্বার্থে প্রাণপাত। ডি. ভি. সি-র জন্য উৎপাটিত মানুষ আজও ধুঁকছে ফুটপাথে। মানুষ আর কত কাঁদবে? কোথায় যাবে? প্রতিরোধ তো করতে হবেই।

— তুই কী নিজের কথা কোনোদিন ভাববি না? আমার তো বয়েস হয়েছে। রাইয়ের কী হবে, ভেবেছিস?

— ভাবি, মা। ভাবি বলেই তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে পারি না।

খুব ভোরে উঠে কানাই ছেলেকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গেল। ছেলেকে তুলে দিয়ে নিজে ফিরে যাবে আগরতলা।

বাবাই চায়ে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে। রাই গলা সাধা শেষ করে পড়তে বসেছে। প্রণতি হারানের মাকে নিয়ে রান্নাঘরে।

— স্বাধীন—স্বাধীন আছ নাকি—বলতে-বলতে ঢুকলেন মানিক সেন।

বাবাই উঠে চেয়ার টেনে বলল, আসুন—আসুন।

আপনি দেখছি একইরকম আছেন।

চেয়ারে বসে মানিক বললেন, তুমি কেমন আছে এখন? শুনলাম মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

— এখনও আছে তো — মাথাটা। তাই।

— বউদি— তোমার মা, কোথায়? ওকে ডাকো। একটা খুব জরুরি কথা বলার আছে।

চায়ের কাপ হাতে প্রণতি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মানিকের হাতে কাপ দিয়ে বললেন, জরুরি কথা! আবার কি ভোট আসছে?

— না, বউদি। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস।

বাবাই জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

মানিক চায়ের কাপে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললেন এখানে একটা বাইপাস তৈরি করা হবে। গড়িয়া থেকে ইস্টার্ন বাইপাস পর্যন্ত কাজ চলছে। এবার বিবেকনগর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত কানেক্টরের কাজ চালু হবে। তার জমির মধ্যে তোমাদের বাড়ি সহ আরও বাইশটা বাড়ি পড়ছে। শীঘ্রই উচ্ছেদের নোটিশ আসবে।

বাবাইয়ের সঙ্গে প্রণতিও বলে ওঠেন, কী বলছেন।

মানিক বললেন, আমি খবরটা পেয়েই সকলকে বলতে বেরিয়েছি।

বাবাই বলল, অসম্ভব। আমরা কিছুতেই যাব না।

মানিক বললেন, বিকেলে একটা মিটিং ডেকেছি সমিতির অফিসে। তুমি আসবে তো?

— অবশ্যই।

মানিক সেন চলে গেলে প্রণতি স্বগত উচ্চারণ করেন, এখান থেকেও উচ্ছেদ!

সন্ধেবেলা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বাস মাইকে বাজে। কোনো কিশোরীর কণ্ঠ শোনা যায়—এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার—

কোন্ ঘর — কার বাড়ি — প্রণতির এক জীবনেও জানা হল না।

সাগর থেকে পাহাড়ে

বেনফিশের উষ্ণ আতিথ্যে ভ্রমণ হোক মাধুর্যময়

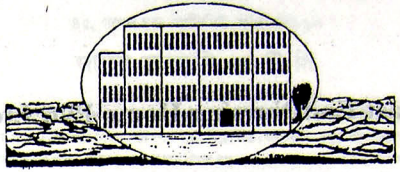

হোটেল বেনফিশ-পুরী

আমাদের ট্যুরিস্টলজে থাকুন আর আমাদের নিজস্ব বাতানুকুল রেস্তোরায় উপভোগ করুন বেনফিশের লোভনীয় ভোজ

মিনালয়-দীঘা
মেদিনীপুর

কিনারা-শংকরপুর
মেদিনীপুর

মিনাক্ষী-দীঘা
মেদিনীপুর

গঙ্গা-ডায়মণ্ডহারবার
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাগর কন্যা-ফ্রেজারগঞ্জ
দক্ষণ ২৪ পরগনা

সাগরী-ফ্রেজারগঞ্জ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আরণ্যক-মালবাজার
জলপাইগুড়ি

হিমালয়-আর.এম সিংহ রোড
দার্জিলিঙ্

হলদিয়া এ. সি. রেস্টুরেন্ট
দুর্গাচক সুপার মার্কেট, হলদিয়া
২/৩/২ বি বা দী বাগ, (পূর্ব) কোলকাতা-৭০০ ০০১,
একতলা, ফোন:২৪৮-৮২৭২

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়

BenFish

পি-১৬১/১, (৫ম তল) ভি. আই. পি. রোড, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৭০০ ০৫৪। ফোন - ৩৫৫ ৪৯৩১
২/৩/২, বিবাদী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১। ফোন - ২৪৮ ৮২৭২
হলদিয়া এ.সি. রেস্টুরেন্ট, দুর্গাচক সুপার মার্কেট, হলদিয়া

BIVAV

Price : Rs. 60 | Special Autumn Issue | Reg. No : 30017/76

Vol.24 No.1 | July-Sept 2002 | 86th issue

Published in October 2002

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO 0970-1885

Space Donated by

A

Well

Wisher